শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

"আমি বিশ্বলাগ্নিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীশ্রীবিত্যগোপাল

ফাল্গুন-ফাল্গুন, ১৩৭৬, ১৯৭০ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারওদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুই-এর সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

জনগণের উদ্দেশে ইউবিআই এর নিবেদন

১৯৬৯ সালে

আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ : ২৪ কোটি টাকা বা ১৭% ;

বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ : ৩ কোটি টাকা বা ৯% ;

ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ : ১৯ কোটি টাকা বা ১৯.৫% ;

কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং রপ্তানি খাতিরে প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ ১১.২৮ কোটি টাকা—ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৫১% .

মোট ঋণের ৯% দেওয়া হয়েছে অর্থনীতির অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে ;

মোট যে ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ, তার ২২%ই হ'ল অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে ঋণ বৃদ্ধি ;

৩৬টি শাখা অফিস খোলা হয়েছে—তার মধ্যে ৩২টিই আধা-শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে। ২৪টি খোলা হয়েছে এমন কেন্দ্রগুলিতে যেখানে আগে কোন ব্যাঙ্ক ছিল না।

১৯৬৯ সালের শেষে ইউবিআই-এর শাখা অফিসের মোট সংখ্যা ছিল ২০০—তার মধ্যে ১০৮টি আধা-শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে।

অর্থনীতির অবহেলিত ক্ষেত্রগুলিতে সহায়তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল মৃৎশিল্পী, কাঁসারী, হস্তচালিত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁতের শিল্পী, সমবায় শিল্প, ছোট ছোট দোকানদার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ দান।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

হেড অফিস :
৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি, কলিকাতা-১

UBI/1969-170

'দ্বন্দ্ব-বুদ্ধিই যখন ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্বনির্ণয়ে একমাত্র সারথি, তখনই ব্রহ্ম ও জগৎ কেবল একটী mechanism। 'All is given'—কোন কিছুরই আর ফাঁক নাই, ইহাই mechanism-এর প্রাণকথা। প্রতি দুইটী কণার মাঝে মাঝে যে ফাঁক রহিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্যই ব্রহ্মে 'আকাশ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ব্রহ্ম ও জগতের 'already made' 'closed' মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াই নানা সম্প্রদায় দলাদলির সূত্রপাত করিয়াছে। ব্রহ্ম ও জগৎ মিলিয়া একটী living unity, তাহাতে মড়ার বুকে ছুরি চালাইবার মত বিশ্লেষণ প্রণালী চলিতেই পারে না। কোন মতকেই একমাত্র সত্যজ্ঞানে আঁকড়াইয়া ধরিতে গেলে all is given ও closed ভাবা ছাড়া গত্যন্তরও নাই। ব্রহ্ম সম্বন্ধে বহুবিধ কল্পনা যে ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহা উপনিষৎ পাঠ করিলে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মের যে-কোন কল্পনাদ্বারাই কতগুলি জাগতিক ঘটনা যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তাহাও সত্য। জগতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার মূর্ত্তিও বদলাইয়া গিয়াছে, যাইতেছে এবং ভবিষ্যতেও যাইবে। এই সম্ভবমূর্ত্তি (probability) ব্রহ্মে না থাকিলে উহার দ্বারা জগতের বিশেষ কোন লাভই হইত না। ব্রহ্ম বস্তুত অনন্ত probability-র সমন্বয়। কোন সম্প্রদায়ই নিজে দাঁড়াইতে পারে না, যদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সকল তত্ত্বগুলিই সে অনুপলব্ধভাবেও ভিত্তিস্বরূপে মানিয়া না লয়। আস্তিক, নাস্তিক, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ই যেন 'অনন্তকালের হওয়া' ভগবানের একটি ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে চান। ব্রহ্মও যে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হইতেছেন, তাহা তাঁহারা ভাবেন না। ইহাদের ধারণা, ব্রহ্ম যেন স্বতন্ত্র স্থানে localised হইয়া সৃষ্টির আদি হইতেই স্বতন্ত্রভাবে আপনা আপনি ফুটিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহ হইলে সেখানে গিয়াই তাঁহাকে পাইব; আমার জীবন যে ভাবেই চলিতে থাকুক না, তাঁহার মূর্ত্তি যেন ঠিকই আছে। তাঁহার ভাব জীবের জীবন-নিরপেক্ষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বলিতেছেন; 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। জীবের গৌরবও তো ইহাই। আমি আমার ভগবানকে সৃষ্টি করিব, আমার ভগবানের জন্মদাতা আমিই, এবং তিনি আমার ভিতর দিয়া প্রকাশিত না হইয়া কখনই পূর্ণ হন না—ইহাতেই না তাঁহার ও আমার গৌরব?···জীবের শরণাগতিও যে তাঁহার অর্জনীয়, উহাই তো তাঁহাকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিবে। তাঁহাকে জীবন দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাঁহার আমার সৃষ্টি-ব্যাপারে তিনি ও আমি 'অর্দ্ধ' এক। তিনি 'given', ইহা স্বীকার করিলেই জীবন হয় নিরর্থক।'

—ব্রহ্মসূত্র—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

Bata

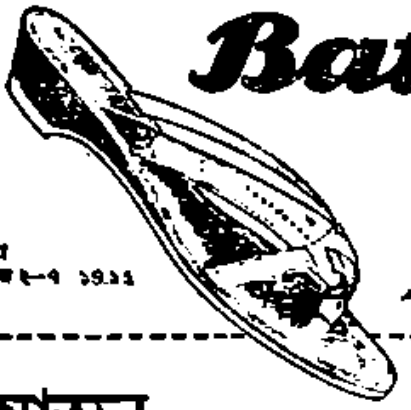

আসুন বসন্ত মেলায়

পথ চলতে পায়ের আরাম, চোখকাড়া খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম মনোরম স্টাইল...বাটার এই সব সান্ডাল বা চপ্পলে নিজেকে আপনি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন। সুঠাম, কোমল ওপর-চামড়া, তেমনি মোলায়েম প্রায় মজবুত সোল— প্রত্যেক পদক্ষেপে আরাম। স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের অনেকটাই নিশ্চিন্ত। আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে সান্ডাল ও চপ্পলের নানাবিধ সুদর্শন নকশা।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		বাংলার ঋষি	৩·০০
শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০	বাংলার বিদুষী	২·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·০০	বাংলার মনীষী	১·৩০
কর্মবাণী	১·২৫	জীবন গড়া	০·৭৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০	আচার্য জগদীশ	২·৫০
Soul of India Speaks	৫·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
পকেট গীতা	৩·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ		শ্রীশীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি	
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০		
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	সাহিত্যের গল্প	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বিদ্যাসাগর	২·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫, কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

উজ্জ্বলভারত

মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭০ ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

'উজ্জ্বলভারত' পত্রিকার দ্বাবিংশ বর্ষ শেষ হইল। মাঘ ১৩৭৬ হইতে ইহার ত্রয়োবিংশবর্ষ আরম্ভ হইল। উজ্জ্বলভারত-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের দৃষ্টি-পথে আজ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেই ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের যে চিত্রটী ছিল তাহা কবে রূপ পাইবে জানিনা; কিন্তু সে উজ্জ্বল চিত্র এক দিকে যেমন ব্যাপকতার বিস্তারে উদার, অন্যদিকে তেমনই গভীরতার অতলতায় মধুর হইতে মধুর। তাই তাঁহার উজ্জ্বলভারত হইতেছে মহান্ ভারত+রসিক ভারত—এক দিকে বুদ্ধির বিস্তারকে পরিতৃপ্ত করিয়া সে আদর্শ মহান্, আর এক দিকে প্রাণ-প্লাবনকে বহাইয়া দিয়া সে আদর্শ রসিক। তাই সেখানে সকল দিকে—ধর্মে অর্থে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্থূলে শীলে—বিশেষের স্থানও আছে যেমন, তেমনই আছে সেখানে নিজ গৌরবে অধিষ্ঠিত প্রাণবান জনসাধারণেরও মর্যাদাপূর্ণ স্থান—বিশেষে অবিশেষে সম্মিলিত হইয়া, প্রজ্ঞাবান প্রাণবানে গলাগলি হইয়া সে উজ্জ্বল ভারতে প্রত্যেকে অনন্য, আবার প্রত্যেকে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া রাসমণ্ডল রচনা করিয়া চলিয়াছে।

এই উজ্জ্বল ভারতের সংকল্প আজও স্বপ্ন হইতে পারে—শুধু ইহাই আগামী যুগের সাধ্য। এই সংকল্প লইয়াই নূতন বৎসরের যাত্রারম্ভে প্রণাম জানাই ব্যাপক গভীর ঐ জীবন-চেতনাকে বর্তমানের বুকে রূপ দিয়া গিয়াছেন যিনি আজ হইতে একশত চৌদ্দ বৎসর আগে সেই রাজ-তাপস পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে। তাঁহার জীবন কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেকার শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ও দর্শনকে বর্তমানের বুকে টানিয়া আনিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যানের কুহেলিকার রাজ্য হইতে বাস্তবের মাটিতে আনিয়া তাঁহাকে দিয়া বাস্তব জীবনকে মহীয়ান করিবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের এই একই সঙ্গে ব্রহ্মরূপ ও বিশ্বনাগরিক রূপকে যিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন সেই যুগ-বৈরাগী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে আজ আমাদের প্রণাম নিবেদন করি—শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের চলার পথে তিনি আমাদের পরিচালিত করুন আজ নূতন বৎসরের পদক্ষেপে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা।

রাজনীতিকে কূটনৈতিকতার জটিলাবর্ত্ত হইতে সেবা-ধর্মের জীবন-পথে বহাইতে প্রথম প্রয়াসী মহাত্মা গান্ধীজীকেও আজ এই ক্ষণে আমাদের প্রণাম। তাঁহার যে-আহ্বান ভারতের হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র দেশবাসীকে—উচ্চ স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত—প্রথম জীবন-চেতনায় তথা রাজনৈতিক চেতনায় সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, সে আহ্বানের শক্তিমূলে ছিল অহিংস অসহযোগের সত্য অস্তিত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়ার ও নিজেরও সত্য মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষা করার বীর্য। এই বীর্য আজ আমাদের আরও বিশেষ করিয়া প্রয়োজন। আজ চতুর্দিকে যে আবেষ্টনগত মত্ততা—জীবনের যে বেপরোয়া ভাব, গড়ে না তাহা জীবনের প্রয়োজনে নয়ে, তাহা মত্ততাই, সত্যের প্রয়োজন-মূলা ঐকান্তিক হইয়া পড়িয়া চিরন্তন সত্যের সঙ্গে তাহার সাযুজ্য-সূত্র হারাইয়া ফেলায় পরিণতিতে সর্বত্র দেহ-মনের যে উচ্ছৃঙ্খলতা, রাজনীতি যখন আর আপামর জনসাধারণের সেবা-কর্ম না হইয়া মুখ্যত দলগত প্রতিষ্ঠালাভের কসরৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন

গান্ধীজীর সত্য-চিন্তাকে ভিত্তি করিয়া আমাদিগকে পুরুষোত্তম-সত্য অবধারণ করিতে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। সেই ভিত্তি-ভূমিকে আজ আমরা নমস্কার জানাইয়া আবার নূতন দিনে রওনা হইতেছি।

পুরুষোত্তম জীবন-ধর্মের সামগ্রিকতার বাণী আজ বিজ্ঞানের বস্তু-তত্ত্বের শেষ সিদ্ধান্তে। সেই বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের নমস্কার করি যন্ত্রকে যাহারা 'dead, inert, block'-আখ্যা হইতে অব্যাহতি দিয়া তাহার মুক্ত ও উজ্জল রূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আর নমস্কার জানাই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অগ্রবর্তী করিয়া সেই সব সাহিত্যিক ক্রান্তি-দর্শীদের যাহাদের সাহিত্য এই সামগ্রিক জীবন-ধর্মদ্বারা প্রোজ্জল। দেশকালপাত্র-নির্বিশেষ যিনি যেখানে এই সামগ্রিক জীবনবাদের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকেই আজ আমাদের নমস্কার জানাই। সামগ্রিক জীবন-বোধ, সামগ্রিক সমাজ-চেতনা, বিশ্বের সকল মানুষে মানুষে নূতন সম্পর্ক-বোধদ্বারা আজ ব্যক্তি ও সমষ্টি-জীবনকে গড়িতেই হইবে। এই সামগ্রিকতার বোধ জাগ্রত করিতে হইলে প্রতি মানুষকেই সর্ব-মানুষ (All-men) হইতে হইবে—সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া পথ চলিতেই হইবে। এই সর্ব-মানুষ হইতে হইলে প্রত্যেক মানুষের জীবনের সর্ব দিকের—ঊর্ধ্ব অধঃ, ইহকাল পরকাল, ভোগ যোগ, জ্ঞানকর্মপ্রেমভক্তি প্রভৃতি সকল দিকের বিকাশ সাধন প্রয়াসদ্বারা সমন্বিত জীবন-যাপনের ব্রত লইতে হইবে। এই সর্ব-মানুষ হওয়ার কথা যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছিলেন সেই হাজার হাজার বৎসর আগে, আবার অন্নদাতীতের দৃষ্টিতেও ইহারই ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে যখন তিনি লিখিতেছেন

'There is only one Man in the world
And his name is All-men.
There is only one Women in the world
And her name is All-women,
There is only one child in the world
And the childs name is All-children.'

সত্য মানুষ হইয়া প্রত্যেকের যথা স্থান বিধান করিয়া আমরা বাঁচিতে চাই—কাহারও অস্তিত্বদ্বারা অপর কাহারও সমৃদ্ধি চাই না। অন্তহীন শ্রেণীসংগ্রাম সত্য মানুষের বাঁচিবার সুস্থ পথ নয়—উহা জঙ্গলের অধিবাসীদের পারস্পরিক হানাহানিদ্বারা কোনও একের প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস মাত্র। এই অন্তহীন শ্রেণীসংগ্রাম তথা পারস্পরিক অস্তিত্বের পথাবলম্বনের ফল যাহা হইতে পারে, আমাদের আফ্রিকার জীবন-নাট্যে তাহাই চলিতেছে। আমার পথানুসরণকারী না হইলেই যদি অপরকে বিনাশ করা কোনো নীতিতে বলে, তবে তাহা কোন্ মনুষ্য জীবন-নীতি? এই জঙ্গলের পশুবৃত্তি—এই পারস্পরিক হানাহানি-র পথ বন্ধ করিয়া সামগ্রিক জীবনবোধে সর্ব মানুষের মননদ্বারা, গলাগলিদ্বারা মহারাস-ক্ষেত্র সৃষ্টিদ্বারা—যেখানে সজাতীয় বিজাতীয় সর্ব রকম চিন্তার সমাবেশদ্বারা প্রীতি উৎসারিত হইতেছে—আমাদিগকে অগ্রসর হইতেই হইবে—যদি মানুষ হিসাবে বাঁচিতে চাই। পারস্পরিক হানাহানি বন্ধ করিতেই হইবে—সকলের মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতিদ্বারা মহারাসমণ্ডল রচনা করিতেই হইবে। এই মহারাসক্ষেত্র সৃষ্টির ব্রত লইয়া এই পথেরই দিকদর্শনকারী দার্শনিক যুগলের—শ্রীশ্রীনিতাগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের—পথানুসরণ করিয়া উজ্জল ভারত গঠন করিতে 'উজ্জলভারত' পত্রিকা রওনা হইয়াছিল আজ হইতে বাইশ বৎসর আগে, আজ এই ত্রয়োবিংশ বর্ষারম্ভ দিনে এই রাসক্ষেত্র-রচনার ব্রতেতেই অধিকতরভাবে সংকল্পবদ্ধ হইয়া সকলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা বার বার প্রার্থনা করিয়া আমরা নূতন বৎসরে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। শ্রীশ্রীনিতাগোপাল জয়যুক্ত হউন, মানুষের সামগ্রিক জীবন-সাধনা জয়যুক্ত হউক। ওঁ হরি ওঁ।

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

['লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নরনারায়ণ আশ্রম তথা 'উজ্জ্বলভারতে'র পতাকা। প্রতি বৎসর যাত্রারম্ভ ক্ষণে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেদিন সংক্ষেপে ইহার যে অর্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। সকলের সাথে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক যাহার চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের অভ্যুদয়—লাঙ্গল যাহার দ্যোতক—এই সমন্বয়ঘন তত্ত্ব-প্রকাশক এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি। ভবিষ্যৎ ভারত তথা ভবিষ্যৎ বিশ্ব একই সঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং 'আমি বিশ্বনাগরিক' এই দুই-ই আস্বাদন করিবে।]

—সঃ—উঃ তাঃ।

বিশ্বসভ্য রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাল'-চক্র-ও চক্রী-'পুরুষে'র সমন্বয় করিয়া দিয়া একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চলল বাহিরে মনুষ্যরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটি একান্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথা স্থানে ও মানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের অন্তর্দ্বন্দ্বাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে মাঠে স্বরাজ-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজমূর্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজের ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্য্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম্ রূপম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সংবাবৃত। কৃষি ক্ষেত্র-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত হইবে হলধরেরই বেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা 'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'।

উজ্জ্বলভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে।

ওঁ নমো গীতাজয়ন্তী

শ্রীসুনীতি সান্যাল

(বালী গীতা-সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় পঠিত)

ওঁ ব্রহ্মণ্য হিতায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোঃ নমঃ।
ওঁ নমো ভক্তমূর্ত্তয়ে ভক্তজনবতে নিত্যগোপালায়
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম-
ভগবৎ পুরুষোত্তমায়॥
ওঁ আজানুলম্বিতভুজ কনকাবদাতং
সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলাক্ষম্।
বিশ্ব-প্রেমধন নরনারায়ণপরৌবন্দে সমরস-গুরুং পুরুষোত্তমানন্দম্॥

আমার প্রিয়ভগ্নীগণ, আজ বৎসরান্তে গীতা-জয়ন্তী উৎসবে আমরা আবার মিলিত হয়েছি। আপনারা আমাদের এই আয়োজনহীন উৎসবে আমাদের আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে এসেছেন, আমি সকলকে গীতা-সংঘের পক্ষ থেকে প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানাচ্ছি। আপনারা এসেছেন; আপনাদের সকলকে নিয়ে গীতা-বক্তা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের সম্মিলিত প্রণাম জানাই।

আপনারা জানেন বেশ কয়েক বৎসর হল আমরা প্রতি শনিবারে ব্রহ্মসূত্র-উপনিষৎ-গীতার সমন্বয় ভাষ্যকার শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের গীতাভাষ্য পাঠ ও আলোচনা করছি। ধর্ম-জগতে যাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বর্ত্তমান জগতে মানুষের পরম প্রয়োজন, যিনি ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের সমন্বয় দর্শনের ভিত্তিতে জীবন ও দর্শন বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন সেই বিশ্ব-প্রেমিক নিত্যগোপাল-প্রাণ পুরুষোত্তমানন্দকে আমার সকল সত্তা দিয়ে বারো বারো প্রণাম জানাই। আজ গীতাজয়ন্তী বাসরে তাঁরই গীতার কথা সহজ ভাষায় আলোচনা করবার প্রয়াস পাব। আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন এতদিনকার গীতা-ব্যাখ্যা আলোচনা থেকে স্বামীজির গীতা-ব্যাখ্যা কতখানি বৈপ্লবিক!

গীতা "শ্রীভগবান উবাচ"—স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা নিজ মুখে কথা বলেছেন। গীতা কোন মুনি ঋষিবাক্য নয়। বিশ্ব-ধর্ম্মে এমনি অবস্থা সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল যখন কোন মুনি ঋষি প্রচারিত শাস্ত্রে ধর্মের সত্যতা রক্ষা করবার শক্তি কোন শক্তিমানেরই সেদিন ছিল না—তাই আমরা দেখতে পাই কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে অত্যাচারী রাজা দুর্য্যোধনাদির অত্যাচারকে স্তব্ধ করবার জন্য স্বয়ং পুরুষোত্তম অর্জুনের রথের সারথি হয়ে ধূলি-মলিন পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট রক্ত-প্লাবিত এই ধরার ধূলিকে ব্রহ্ম-ধূলি এবং ধরার মানুষকে ব্রহ্ম-মানুষে গড়বার কৌশল শিক্ষা দেবার জন্য মুখ খুললেন। পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা-শিক্ষা দিয়েছিলেন—ঘরের কোণে বসে নয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে। গীতা যে কড়ের শাস্ত্র। গীতা মানুষের জীবনের শান্তি-শাস্ত্র। সমস্যা-জর্জ্জরিত জীবন-যাপনে, প্রতিকূল আবেষ্টনীতে জীবন-যাপনে কি ভাবে ভাগবতী জীবনের রূপায়ন আনা যায় সেই ধরণই গীতা-বক্তা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ঘটনাকে এড়িয়ে, জটিল কুটিল অবস্থা থেকে পা বাঁচিয়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম করবার শিক্ষা গীতায় নেই। তাই গীতার প্রয়োজন হল এই কর্ম্মক্ষেত্রেই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গড়ে তোলা। কর্ম্মকে নৈষ্কর্ম্ম্যে পরিণত করাই গীতার কর্ম্মযোগ। কর্ম্মকে ক্লেশ বলে, বন্ধন বলে দূরে সরে যাওয়া গীতা-বক্তার মতে ক্লীবত্ব। অর্জুন ত যুদ্ধ করারূপ কর্ম্মকে বাদ দিয়ে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণই শ্রেয় মনে করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে

ধমক দিয়ে বললেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" ; বললেন, "ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ"—ক্লীবত্ব দূর কর যাজ্ঞা ভোগ কর। তিনি যাজ্ঞা ভোগ করতে বললেন—কিন্তু কেমন করে ভোগ করা হবে? যে ভোগের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি থাকবেনা, থাকবে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি, বিশ্বপ্রীতি তাইই সত্য বাস্তব ভোগ, মোহনভোগ। এই মহান সত্যই সমগ্র গীতাখানিতে প্রকট।

ভারতবাসী আমরা ধর্মকর্ম সকলেই কিছু না কিছু করি কিন্তু কি চিন্তা করে দেখি আমরা পরিবার-জীবনে সমাজ-জীবনে, রাষ্ট্র-জীবনে কতটুকু মানুষ হতে পেরেছি? পরিবারের ভেতরে, সমাজের ভেতরে, রাষ্ট্রের ভেতরে কজনকে নিজের মত করে ভালবাসতে পেরেছি? যুগ যুগ ধরে আমরা গীতা পড়ি কিন্তু অপরকে ভালবেসে, অপরকে হিংসা না করে কি আমরা জীবন কাটাই? গীতা বক্তা ত আমাদের পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসার কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন "সমং সর্বেষু ভূতেষু", সকলকে সমদর্শনের কথাই ত তিনি বলেছেন। কোন কৌলীন্যের স্থান পুরুষোত্তম-দর্শনে নাই অথচ আমরা ধনকৌলীন্যে, বিদ্যাকৌলীন্যে, বর্ণকৌলীন্যে যে কোন ভাবেই হোক নিজেকে বড়, অপরকে কি ছোট মনে করি না? তাই ভারতবাসী আমরা গীতাধনের অধিকারী হয়েও গীতা-জীবন যাপন না করার ফলে সকল প্রকারে বিভ্রান্ত, সর্বহারা, ভিখারী, যুগ যুগ ধরে কর্ম-মূঢ়তার প্রভাবে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন বেকার। সকল কর্মকেই যদি পুরুষোত্তম-কর্মজ্ঞানে গ্রহণ করতাম, তা হলে কখনই এভাবে কর্মের হাতে মার খেতে হ'ত না। পুরুষোত্তমানন্দ লিখছেন, "ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর পূজাই হয় না তখন ঠাকুর পূজারূপ কর্মের চেয়ে ঘর ঝাঁট দেওয়া কম কুলীন কিসে"? কাজেই সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যদি মনে করতেন যে আমরা সকলেই সমভাবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়নাদি দ্বারা যে বিশ্ব ও বিশ্বনাথের সেবা করছেন, ঐ যে অস্পৃশ্য হরিজন সেও মলমূত্র ও রাস্তা পরিষ্কার করে একই বিশ্বনাথ ও বিশ্বের সেবা করছেন, তাহলে কর্মকৌলীন্য এ ভাবে আমাদের গ্রাস করতে পারতো না। পায়ে কাঁটা ফুটলে যেমন মাথা টনটন করে তেমনি সমাজের নিম্নস্তরের বেদনায় যদি সমাজের উচ্চস্তরের বেদনা থাকত তা হলে কি বিশ্বদেহ এইভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেত? মানব-দরদী শরচ্চন্দ্রের কথা কাহিনীতে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাবেন। ছোটগল্পে দেখতে পাই পঙ্কুর জোলা দুর্ভিক্ষের চাপে এবং অমিয়ার ও বর্ণকুলীন ব্রাহ্মণের চাপে ঘটি বাটি বিক্রী করে গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে ছুটে চলেছে প্রাণ বাঁচাবার আশায়। গীতা-ক্ষেত্র এই ভারতে এই ছবি কত বেদনা ও কলঙ্ক-জনক। শ্রীভগবান নিজমুখে বললেন "কর্মৈব গুরুরীশ্বরঃ" তোমার কর্মকে এমনভাবে সম্পাদন কর যাতে কর্মই তোমার গুরু ও ঈশ্বর হউক। সেই কর্মই মানুষকে পুরুষোত্তমে পৌঁছে দেবে। নতুবা "পৃথক ব্যাপারঃ এব করণীয়ঃ" হয় না—আবেষ্টনীর চাপে, অন্নসংস্থানের চাপে আমাদের আলাদাভাবে ধর্মকর্ম করা একেবারে অসম্ভব। —তবে কী আমাদের কর্মজীবন যাপন করা হবে না? শ্রীভগবান বললেন—"যৎ করোষি তৎ কুরুষ মদর্পণম্"। যা কিছু করবে গোবিন্দে নিবেদন করে করবে। গোবিন্দে নিবেদিত কর্মই সার্থক, সত্য। এ কর্মে বন্ধন নেই, আছে শুধু মুক্তির আনন্দ। শ্রীভগবান অর্জুনকে তাই এই কর্মের প্রেরণাই দিলেন—এই কর্ম করতে বললেন। কিন্তু আমরা ভারতবাসী গীতা পড়ি বটে কিন্তু ভালবেসে ফাঁকি না দিয়ে কতটুকু কর্ম করি এবং যা-ও বা করি তাতে নিপুণতার অভাব কত থাকে? আমরা যে এতদিন ধরে কর্মকে শুধু বন্ধন বলেই জেনে এসেছি—আর পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে দেখুন—সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের মানুষ এসে ভারতবাসীকে দিয়ে আড়াইশে বছর ধরে জুতো বইয়ে ছেড়েছে। স্বামীজি একবার গল্প বলেছিলেন—এক ভারতবর্ষীয় বালক একজন ইংরেজ বালকের কাছে জিজ্ঞেস করছে, হ্যাঁরে তোদের ঠাকুরদারা আমাদের দেশে ঢুকলেন কি করে রে? ইংরেজ বালক উত্তর দিচ্ছে—তোদের ঠাকুরদারা যখন চোখ বুঁজে ধ্যানে বসেছিলেন সেই ধ্যানের ফাঁক দিয়ে আমাদের ঠাকুরদার

চুকেছিলেন। সত্যই তাই, জাগতিক কর্মকে হেয়জ্ঞানে গোলোক বৈকুণ্ঠের ধ্যানের ফাঁক দিয়েই এসেছিলো পরাধীনতা—যার ফলে আজকের ভারতবাসী আমরা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? দাসত্বজীবন ধরে শান্তি বলে কোন কিছু কি আমাদের আছে? আজকের দিনে অন্ন সস্তা গৌণ করে রেশনের দোকানে খবর না দিলে কি আমাদের চলে? আজ ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে আমরা বিদেশের দিকে তাকিয়ে আছি। গীতা পড়ে যদি সর্ব্বাঙ্গীণ মানুষই না হলাম, তবে গীতা পড়ি কেন? এই সর্ব্বাঙ্গীণ মানুষ হবার কথাই গীতা বলেছেন।

গীতাপড়া যাতে শুধু শুধু না হয় স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর-গীতা ভাষ্যে সেইভাবে অর্থাৎ সংসারের বাইরে মোক্ষলাভের জন্য নয়, সংসারের প্রতি পদক্ষেপে কি করে আমরা অধিকতর মানুষ হতে পারি, অথচ মুক্তিও থাকবে এবং এই মাটির জগতটাকেই স্বর্গলোকে গড়ে তুলতে পারি সেই ব্যাখ্যাই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

আবার বলছি শ্রীভগবান গীতা কোন্ সময়ে বলেছিলেন? যে কালে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়েছিল। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত অভ্যুত্থান মধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্। আমরা সেদিনকার মহাভারতের চিত্রে দেখতে পাই ভ্রাতৃবিরোধের ভয়ঙ্কর রূপ! মুক্তকচ্ছ দ্রৌপদী রাজ-সভায় উদ্ভিতা, লাঞ্ছিতা! অথচ রাজসভায় বসে আছেন দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী, ব্রহ্মচারী ভীষ্ম, দানবীর কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য গুরু। এদের চোখের সামনে রাজ্যের রাজা একটী মেয়ের বউকে কী ভাবে লাঞ্ছনা করছেন! যে রাজ্যে রাজা এবং জ্ঞানী গুণী নেতৃবৃন্দের সামনে এরূপ জঘন্য কাণ্ড অনায়াসে ঘটতে পারে, সেই রাজ্যের প্রজাবৃন্দও যে কতটা বিকৃত তা অনুমান করা খুবই সহজ। একজন নারীকে কেন্দ্র করে এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল যে সমাজের বুকে, সে সমাজে সে দিন ধার্মিক পদবাচ্য মুনি ঋষি, নরনারী নিশ্চয়ই ছিলেন, —ধ্যান ধারণা জপ তপ গৃহকর্ম সবই যেন সকলের ঠিক ঠাকই ছিল! দুর্য্যোধনের রাজসভায় সেদিন কোন নারীর দল এসে গর্জন করেনি, ধার্মিকের দল ধর্ম্ম গেল বলে দুর্য্যোধনের সভায় এসে সাবধান-বাণী বলেন নি। অর্জুন কিন্তু তাদের হয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ হত হবে, সমাজে বর্ণ সংকর আসবে, নারীরা দুষ্টা হবে ইত্যাদি অনেক শাস্ত্র-কথাই তুলে ধরেছিলেন। নারী হিসাবে দ্রৌপদী সমাজের কাছে ছোট কিনা তাই অপমানিতা দ্রৌপদীর চোখের জলের চেয়ে বড়দের জন্যই অর্জুন দুঃখ করলেন—এ যেন সমাজ কোন্ স্তরের? নারীর বেদনায় নারী বিচলিত হয় না, বেদনা বোধ করেনা, গর্জন করেনা—এ নারী-সমাজ পুরুষোত্তম-দৃষ্টিতে গ্লানিগ্রস্ত। তাই তিনি গর্জন করে বললেন "যদ্যপেতৎ প্রযুক্তং যে হৃদয়াৎ নাপিদর্পতি। যথা গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্।" হে অর্জুন, তোমার কাছে ভীষ্ম, দ্রোণ বড় হতে পারে, কিন্তু দ্রৌপদীর চোখের জল আমার কাছে শত গুণ বড়। তাই দ্রৌপদীর চোখের জলে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে কান্নার সুর আমার কাছে আগ্রহ। এমনি করে সমাজের সকল ছোটকে, সকল অসহায়কে মর্য্যাদার আসনে বসিয়ে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মহতো মহীয়ান্।

আমরা গীতা পড়ে রাগদ্বেষ দূর করব, হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যাব, ক্ষমা করতে শিখব, ভালবাসতে শিখব, আমি বিশ্বনাথের সেবক, বিশ্বের সেবক কেবল এই বুদ্ধি নিয়ে কর্ম করব। সব কিছু আমার করে নেবার বুদ্ধি সেবা-বুদ্ধি নয়। বিশ্বের সেবায় লাগিয়ে প্রসাদরূপে সব কিছু ভোগ করব। সেই ভোগেই বিষয় বিষ না হয়ে প্রসাদরূপে গড়ে ওঠে।

আজকের দিনে ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের যে গ্লানিকর অবস্থা এসে গেছে তাতে একমাত্র গীতা-জীবন-সাধনা ছাড়া নিজে বাঁচবার ও বিশ্বকে বাঁচাবার আর অন্য পন্থা নেই। আপনারা এসেছেন, আসুন আমরা সকলে মিলে তাঁর কাছে এই প্রার্থনা জানাই, আমরা যেন সকল সংস্কার মুছে ফেলে তাঁর গীতারূপ অমৃত-সাগরে স্নাত হয়ে নতুন করে নিজেকে গড়তে পারি, লাগতে পারি বিশ্ব-সেবার কাজে।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ সহস্র বার চোখের জলে বলে

গেছেন গীতা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে না পারার বেদনায় আমি পাগল। তাঁর এই বেদনার সাথী তিনি আমায় করুন—এই আশীর্বাদ একমাত্র প্রার্থনা আমার।

আজ তাঁরই শ্রীচরণতলে আগতপ্রায় পুরুষোত্তম বিশ্বকে আমার সকল সত্তা দিয়ে বরণ করছি। হে পুরুষোত্তম, আজ বিশ্ব-কুরুক্ষেত্রে সকল পরিবার-রথে, সকল সমাজ-রথে, রাষ্ট্র রথে তুমি সারথি রূপে প্রকট হও। বিশ্ব তাপ-মুক্ত হোক্। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ভাষায় বলি—ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি—ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন্।

মুক্তি-লগ্ন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ অনামী ॥

আট

আরও মাস তিনেক বাদে। তিনকড়ি সমরেশবাবুর বাড়ীতেই আছে। ঐ সময় বীরগঞ্জ ও তার নিকটবর্তী কয়েকটি জায়গার মেয়েদের স্কুল থেকে নির্বাচিত ৪০ জন মেয়েকে নিয়ে বীরগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও ফিজিক্যাল মহিলা টেইনার কলকাতা আসেন ৪ দিনের এডুকেশন ট্যুরে। এর যাবতীয় খরচের বেশীর ভাগটা বহন করবে সরকারের শিক্ষাদপ্তর ও বাকীটা বহন করবে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির কর্তৃপক্ষগণ। নির্বাচিত মেয়েদের মধ্যে তিনকড়ির মেয়ে অনিলাও ছিল। দলের সদস্যাদের চলা-ফেরার সুবিধার জন্য অনিলাদের স্কুলের দুজন বেয়ারাও সঙ্গে এসেছিল। দুদিন কলকাতার নানা দর্শনীয় বস্তু দেখার পর তৃতীয় দিন এরা বেলা ১টা পর্যন্ত বিশ্রাম উপভোগের সিদ্ধান্ত নেয়। এদের থাকার ও খাওয়ার সব ব্যবস্থা একজন শিক্ষক আগে এসে ঠিক করে রেখে-ছিলেন। তৃতীয় দিন সকালবেলা সাতটার সময় একঘণ্টা ছুটীর অনুমতি নিয়ে অনিলা তাদের স্কুলের বেয়ারা রামচরণ সহ সমরেশবাবুর বাড়ীতে আসে। রামচরণ চালাক, চতুর লোক। অজের বাড়ীর ঠিকানা অনিলা ওকে বলে দিয়েছিলো। কাজেই অজের বাড়ী খুঁজে পেতে কোন কষ্টই হয়নি। অনিলা রামচরণ সহ যখন সমরেশবাবুর বাড়ীতে পৌঁছায় তখন তিনকড়ি বিশেষ কোন কাজে বাড়ীর বাইরে যাওয়ার উদ্যোগ করছিলো। অনিলা বাবাকে দেখে ছুটে এগিয়ে এসে প্রণাম করে। তিনকড়ি অনিলাকে কাছে টেনে মাথায় পিঠে হাত বুলালো এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর পকেটস্থ মণিব্যাগ বের করে তিনটি টাকা অনিলাকে দিলো কলকাতা থাকার সময় ইচ্ছামত খরচ করার জন্য। ইতিমধ্যে অজপত্নী বিভাবতী, বড় বউ উর্মিলা, মেজ বৌ সাবিত্রী প্রভৃতি টের পেয়ে ওখানে এসে দাঁড়ালো। বউরা তখন কলকাতার বাড়ীতে ছিল। তিনকড়ির কাছে অনিলার পরিচয় পেয়ে সকলে অনিলাকে আদর যত্ন করতে লেগে গেল। তিনকড়ি বিভাবতীকে বল্লো, "আচ্ছা মা, আমি কাজে বেরোচ্ছি, ওকে আধঘণ্টার ভেতর ছেড়ে দেবেন।" তিনকড়ির যাওয়ার সময় অনিলা আবার তার বাবাকে প্রণাম করলো। তিনকড়ি দৃষ্টির বাইরে যেতেই বিভাবতী

ও বউরা অনিলাকে নিয়ে অন্দরে গেলেন। তিনকড়ির ক্রুকপরা ফুটফুটে সুন্দরী কিশোরী মেয়েটিকে সবাই আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সতীশ কোত্থেকে এসে উপস্থিত হয়ে বল্লো, "বা, বেশ মেয়েটি তো? কার মেয়ে মেজবৌদি?" "তোমাদের তিনকড়িদার মেয়ে, ঠাকুরপো"—জবাবে বলেন মেজবৌদি সাবিত্রী। সতীশকে খুব আগ্রহ নিয়ে অনিলার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সাবিত্রী সহাস্যে সতীশকে বলে ওঠে, "কি মনে ধরেছে নাকি ঠাকুরপো, তোমার সাথে মানাবে ভালো।" অনিলা একথার তাৎপর্য্য তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করেনি বলে তার কোন ভাবৈবৈষম্য দেখা যায়নি। সতীশ সাবিত্রীকে লক্ষ্য করে "যেৎ, মেজবৌদি যে কি বলে তার ঠিক নেই" এই বলে দ্রুতপদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। ব্যাপারটা লঘু ঠাট্টা তামাসা বলেই এরা সবাই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নিয়তি এর বাস্তব রূপায়নের কথা ভেবে হয়ত নেপথ্যে হেসে-ছিলেন।

যাহোক, এর পরে নানারকম খাবার খেয়ে সবাইকে একে একে প্রণাম করে অনিলা রামচরণের সাথে তাদের আস্তানায় ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে যায়।

* * *

প্রায় বছর দেড়েক পরে। তিনকড়ি মর্য্যাদাহীন সাধারণ কাজ করলেও কিছু লেখাপড়ার জন্য এবং খানিকটা স্ত্রীর প্রভাবে তার রুচি ছিল বেশ মার্জিত ও ভদ্রধরণের। কিন্তু চাকুরীর কাজে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর জন্য সাধারণ বেয়ারার মতই আচরণ করে যেতো। নিজের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতির কথা কখনও জাহির করার চেষ্টা করতো না। অন্য পরিবারে তিনকড়ি সততার জন্য সকলের আস্থাভাজন হয়েছিল। সম্মানের কাছে আসে সম্মান ও সমাদর। এদের দাবী তিনকড়ি করতে পারে না। কিন্তু অন্য-পরিবারে সে কখনও তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞার ব্যবহার পায়নি। অতি পরিচয়ের ফলে অনেক সময় আসে তাচ্ছিল্য—একথা প্রচলিত সত্য। কিন্তু তিনকড়ি সম্পর্কে অন্য পরিবারে তাচ্ছিল্যের ভাব এসেছিল একটা তুচ্ছ মনস্তাত্বিক কারণে।

সেদিন রবিবার। এক ভদ্রলোক ভাবি দুইদের লটারি টিকিট বিক্রীর জন্য আসেন সমরেশ বাবুর বাড়ীতে। তখন বেলা সাড়ে তিনটা। একতলার ড্রইংরুমে মিত্র মহাশয় ও ছেলেমেয়ে বউদের অনেকে ছিলেন। বিভিন্ন নামে "প্যালেস্" "টাওয়ার" "ম্যানসন্" ও "ক্যাপিটাল" ইত্যাদি নম ডি প্লুমে কয়েকখানা টিকিট কেনা হয়। সমরেশবাবু টিকিটগুলোর দাম চেকে দেন। তিনকড়ি অদূরে দাঁড়িয়েছিল। কাঁচুমাচু হয়ে যেন কোন অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছে এরূপ ভয়ে বিব্রত তিনকড়ি বললো "বাবু, আমিএকখানা টিকেট কিনবো"। তিনকড়ির কথা শুনে সকলের চক্ষুস্থির। একজনে বলে ওঠে "তোমার মাথা খারাপ তিনকড়িদা, তুমি টিকেট কিনবে কি? টিকেটের দাম জানো?" আর একজন বলে ওঠে "গরীবের ঘোড়ারোগ আর কি, যাও যাও কাজে যাও।" সমালোচনার গতি থামিয়ে সমরেশবাবু বলেন "ও যখন অতগুলো টাকা নষ্ট কর্ত্তে চায় করুক, আপত্তি করে লাভ কি?" তিনকড়ি শেষটায় একখানা টিকেট কিনলো ন্যায্য টাকাটা দিয়ে। নম্ ডিপ্লুমে লেখা হোলো "সম্পদ", ঠিকানা দেওয়া হোলো তিনকড়ির দেশের বাড়ীর। উপস্থিত সকলেই হয়ত মনে মনে নামটির তারিফ করলো। টিকেট বিক্রেতা নিষ্ক্রান্ত হওয়ার একটু পরেই তিনকড়ি তার পশ্চাৎ অনুসরণ করে তাকে ধরে ফেলে এবং নম ডি প্লুমে "সম্পদের" জায়গায় "পরিবর্ত্তন" কথাটি লিখিয়ে নেয়। মিত্র পরিবারের কেউ এ খবর না জানতে পারে তার জন্য সে টিকেট-বিক্রেতাকে অনুরোধ করে টিকেট-বিক্রেতা তাকে আশ্বাস দেয় যে তার অনুরোধ রক্ষা করা হবে।

এর পরে দিন সাতেক বাদে টিকেট-বিক্রেতার কাছ থেকে পাকা টিকেটখানি পেয়ে তিনকড়ি উহা রেজিষ্ট্রি করে স্ত্রীর নামে পাঠিয়ে দেয় এবং উহা সযত্নে বাক্সে রাখার নির্দ্দেশ জানায়। ঐ একই সময় তিনকড়ি স্ত্রীর নামে মনি অর্ডার করে বাট টাকা পাঠায়। যথাসময় পিয়ন

এসে রেডিটি চিঠি ও মনি অর্ডার অনামিকাকে দেয়। মনি অর্ডারের টাকা পিয়নের হাত থেকে অনামিকা গুণে নেয় এবং পিয়ন চলে গেলে রেডিটি খাম খুলে লটারির টিকিট ও চিঠি দেখতে পায়। চিঠির খবর ও লটারির টিকেট দুটোতেই অনামিকা খুব আনন্দ পায়। লটারির টিকেটখানি দেখে অনামিকা কেন যেন বিশেষভাবে খুশী হয়। দুই হাতে টিকেটখানি কপালে ঠেকিয়ে মা দুর্গাকে প্রণাম জানায় এবং উহা ঠাকুর ঘরে একটা কাঁসির মধ্যে রেখে দেয়। সন্ধ্যার প্রার্থনার পরে টিকেটখানি বাক্সবন্দী করে রাখে।

লটারির টিকেট কেনার পর থেকে তিনকড়িকে কেন্দ্র করে অজপরিবারে একটা অসোয়াস্তির ভাব দেখা যায়। টিকেট কেনার ব্যাপারে নিজেরা তিনকড়িকে যাই-ই বলে থাকুক, তিনকড়ির মিছ্ কারোর ভালো লাগে নাই। লটারির টিকেটের এমনি প্রভাব যেই কেনে সেই ভাবে টাকাটা জলে দিলাম, আবার সঙ্গে সঙ্গে ২ লাখ টাকা প্রাপ্তির যে স্বপ্ন না দেখে তাও নয়। তিনকড়ি যদি মোটা অঙ্কের টাকা পেয়েই বসে তখন তিনকড়ি মিত্র-পরিবারের সমপর্যায়ে এসে যাবে, তখন সে মিত্র-পরিবারকে তোয়াক্কা করবে না এরূপ একটা অহৈতুক দুর্ভাবনা কারোর কারোর মনে উঁকি মারে। মনের অবস্থা কার্যে প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করে। মিত্র মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী বিভাবতী অবশ্য টিকেটের কথা বেমালুম ভুলে যান। তিনকড়ি যে নীচুবংশের লোক এবং ছোট কাজ করে এ খোঁটা কি চাকরদের কাছে প্রায়ই শুনতে হয়। ওরা এও বলে "তিনকড়ি সাধু হলে টিকেট কেনার টাকা কি করে জোগাড় করে।" তিনকড়ি এ সব শুনে গায় মাখে না, মিত্র মহাশয় বা তাঁর স্ত্রীর কাছেও কোন অভিযোগ পেশ করে না। তিনকড়ির মনের জোর আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। যে কোন কাজ সৎ ও ভদ্রভাবে করলে মাসে শতাধিক টাকার বেশী সে আয় করতে পারবে এ ভরসা ও আত্মপ্রত্যয় তার হয়েছিল। সবার উপরে ছিল বুদ্ধিমতী, ধর্মশীলা ও পরিশ্রমী স্ত্রী অনামিকার উৎসাহ ও উপদেশ। "যখনই কোন কাজে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার উপক্রম হবে সে কাজ তখনি ছেড়ে দেবে। টাকার মায়ায় সে কাজ আকড়ে থাকবে না"। অনামিকার এ কথা তার মনে জেগে ওঠে। তিনকড়িকে কি চাকররা অসম্মান না করলেও শ্রদ্ধার চোখে মোটেই দেখতো না; তাদের ধারণা, তাদেরই মত তিনকড়ি অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক। পূর্বেই বলেছি তিনকড়ি নিজেকে লেখাপড়া জানা বলে কখনও জাহির করার চেষ্টা করতো না। কাজেই তিনকড়ি বাবুর নিজস্ব বেয়ারা হিসাবে নিছুটা আরামের কাজে নিযুক্ত বলে সে কি চাকরদের ঈর্ষার লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ষড়যন্ত্রে তিনকড়ি চুরির দায়ে দোষী বলে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র প্রদীপের অকপট বুদ্ধির জন্য ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায় এবং যে চাকরটি তিনকড়িকে মিথ্যা জড়িয়েছিল তাকে তৎক্ষনাৎ বরখাস্ত ও সতর্ক করে দেওয়া হয়। চুরির অপবাদ থেকে মুক্ত হলেও তিনকড়ি চাকুরী ত্যাগের সংকল্প করে। দিন দুই পরে, তিনকড়ি মনে মনে যাই-ই ভাবুক, বাহ্যতঃ ভদ্রের বাড়ীর সকলের কাছেই সবিনয় শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নেয়। প্রদীপকে ছেড়ে যেতে তিনকড়ির খুবই খারাপ লাগছিলো। প্রদীপকেও খুব আপনজন হারানোর দুঃখে ম্রিয়মান হতে দেখা গেলো। তিনকড়ি কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে তুচ্ছ মনস্তাত্ত্বিক কারণে অন্য পরিবারের অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। লটারির ভূত যে এতদিন মিত্র-পরিবারে একটা অসোয়াস্তির ভাব সৃষ্টি করেছিল, তাও তিনকড়ির সাথে সাথে অন্তর্হিত হয়ে গেলো।

॥ নয় ॥

তিনকড়ির বেকার থাকা সম্ভব নয়। আর, কোন বড় আফিসের অধস্তন কেরাণীর কাজ নিয়ে ঢোকা ছিল তার কাম্য। বহুদিন থেকে কোন বন্ধুদ্বারা তদবীর করিয়ে সে নিজ মহকুমা সহরে কোন একটা বড় অফিসে চাকুরীর চেষ্টা করে যাচ্ছিল এবং একটা আশার কথাও জেনেছিল। তিনকড়ি অজের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়ে সোজা নিজ মহকুমা সহরে চলে আসে এবং পূর্বোক্ত আফিসে গিয়ে বিশেষ কোন একটা সেকশনের বড়বাবুর

সাথে দেখা করে। বড়বাবু তিনকড়িকে মাস ছয়েক পরে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন। নিযুক্তিপত্র অবশ্য তখনই তাকে দেওয়া হয়। খুব খুশী মন নিয়ে তিনকড়ি গ্রামের বাড়ীতে এসে পৌঁছায়। আখিক অসচ্ছল বাড়ীখানি সরল আনন্দের স্বচ্ছলতায় ভরপুর। অনামিকা সাদরে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানায়, প্রণাম করে। ছেলে মেয়েরা পাশে এসে দাঁড়ায়, একে একে প্রণাম করে।

তিনকড়ি তার কলকাতা অন্ন পরিবারের চাকুরী ত্যাগের কথা অনামিকাকে বলে। মাসখানেক পরে নিজ মহকুমা সহরে নূতন চাকুরীতে যোগদানের কথাও জানায়। অনামিকা সব কথা শুনে খুশী হয় এবং কথা প্রসঙ্গে বলে "আমরা দুজনেই যখন সংসারে খাটছি এবং কোন ক্রমেই পেছপা হই না তখন আমাদের ভাবতে হবেনা।" ক্ষণকাল নীরব থেকে "মেয়েদের শিক্ষাটাই বড় দায়িত্ব। ওদের খাওয়া, শিক্ষার ব্যবস্থা এবং মোটা ভাত কাপড় আমাদের দুজনের আয়ে বেশ চলে যাবে। ধনী বড় লোক নাই বা হলাম।"

তিনকড়ি—কে জানে, তোমার যা ঠাকুর দেবতায় ভক্তি, তাঁদের কৃপায় বড়লোক হতেও পারো।

অনামিকা—"লটারির টিকেট কিনে সবাই ওরকম ভাবে।" অনামিকার মনে কিন্তু স্বপ্নের ছবি ফুটে ওঠে।

বাড়ীতে আসার ৮।১০ দিন পরে জমিদার পুত্র রথীন চৌধুরীর যোগ সাজসে তিনকড়ি এক অভাবনীয় বিপদের সম্মুখীন হয়। তিনকড়ির বাস্তুভিটার জমির প্রত্যক্ষ মালিক বিমান বিশ্বাস তার উপরস্থ জমিদার মালিককে ঐ জমির দায়ে খাজনা না দেওয়াতে তিনকড়ির জমি ডিক্রী হয়ে নিলামে ওঠে। রথীন চৌধুরী ঐ জমি কিনে নেয়। সেদিন দাওয়ায় বসে তিনকড়ি অনামিকার সাথে কথাবার্তা বলছিলো সেলায়েরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে। সহসা রথীন চৌধুরীর একটি লোক এসে গালা-মোহর আটা একখানা খামের চিঠি তিনকড়ির হাতে দেয় এবং নিরন্ন বুকে নিরিহ স্থানে তিনকড়ির সই নিয়ে চলে যায়। খামখানি ছিড়ে তিনকড়ি রথীন চৌধুরীর চিঠি ও আদালতের নির্দেশ পত্র পাঠ করে অনেকের মত হতবাক হয়ে যায়। অনামিকা সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করে "কি ব্যাপার, বলতো, তোমাকে অতটা বিব্রত দেখছি কেন!"

তিনকড়ি—রথীন চৌধুরী এক মাসের ভেতর আমাদের বাস্তুভিটা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশপত্র পাঠিয়েছে। খাজনা অনাদায়ের দায়ে বাস্তুভিটা ও তৎসংলগ্ন জমি জমা নিলামে উঠেছিল, রথীন চৌধুরী নিলামে কিনে নিয়ে আমাদের বাস্তুভিটার মালিক হয়েছেন।

অনামিকা—কেন, তোমার খাজনার টাকা তো নিয়মিত ভাবে দেওয়া হয়েছে। কোন কিস্তিই বাকী পড়েনি।

তিনকড়ি—হাঁ, খাজনা দেওয়া হয়েছিল আমাদের প্রত্যক্ষ মালিককে। তিনি আবার তার উপরস্থ মালিককে খাজনা না দেওয়াতে উপরস্থ মালিক আদালতে কেস্ করে নিলামের অনুকূলে ডিক্রী পেয়েছে। কি বিপত্তিতে পড়া গেলো বলতো!

অনামিকা—এসব আইন কানুনের ব্যাপার, তোমার আমার বোঝার কথা নয়। উকীলের কাছে যাও এবং তাঁর নির্দেশমত কাজ করো।

তিনকড়ি—হাঁ, তাই করবো। আমি এখনই উকীল বাড়ী যাচ্ছি। তিনকড়ি খাজনা দাখিলের আবশ্যকীয় রসিদপত্র ও রথীন চৌধুরীর প্রেরিত চিঠি ও আদালতের নির্দেশ পত্র নিয়ে স্থানীয় উকীল কিরণ বটব্যালের কাছে যায়।

উকীলবাবু সমস্ত তথ্য জেনে বললেন একটা হাঙ্গামা ও কিছু অর্থদণ্ডে পড়লে, তিনকড়ি। তোমার বাস্তুজমি নিলামে তোলা এবং রথীন চৌধুরীদ্বারা উহার ক্রয় দুটোই আদালতে নাকচ করা যাবে। কাজেই ভাবনার কিছু নেই। তোমার খাজনা দাখিলের সমস্ত রসিদপত্র আমার কাছে রেখে যাও। আজকেই কোর্টে গিয়ে নিলাম রদের ইনজাংশন আনার ব্যবস্থা করবো।

তিনকড়ি—কতদিন একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হবে, উকীলবাবু?

উকীলবাবু—১৫ থেকে ২০ দিন ধরে নিতে পারো।

তিনকড়ি—বাস্তুভিটে হাতছাড়া হবে না তো উকীলবাবু?

উকীলবাবু—তা যাতে না হয় তাই করবো। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ী যাও। গোটা ১৫ টাকার ব্যবস্থা রেখো, দরকার মত চেয়ে নেবো।

তিনকড়ি উকীলবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে ও অনামিকাকে উকীলের আশ্বাসের কথা জানায়।

অনামিকা সহজভাবে বলে এখন ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে হয়।

এরপরে অনামিকা পূজার ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য প্রার্থনায় বসে এবং তারপরে ঘরের কাজে লেগে যায়। সেলাইয়ের কাজের জন্য বিধুর মাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল গোড়া থেকেই। তা ছাড়া অনামিকা যাতে সেলাইয়ের এবং ঘরের অন্যান্য কাজে যথেষ্ট সময় পায় তার জন্য একজন নিঃসহায় দুঃস্থা মহিলাকে রান্নাবান্না ও বাসনমাজা ইত্যাদি কাজের জন্য রাখা হয়েছিল কয়েক মাস আগে।

॥ দশ ॥

জমিদারপুত্র রথীন চৌধুরীর বাসভবনের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে রথীন চৌধুরী একটা কুশন চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিয়ে একটা আর্যাদের পাতা উল্টিয়ে দেখছিলেন। সামনে একটা নীচু ছোট টেবিলের উপর ছিল ২ খানা দৈনিক পত্রিকা আর খান কতক ইংরেজী বাংলা উপন্যাস ও গোয়েন্দাকাহিনী। এমন সময় রথীনের স্ত্রী অতসী দেবী একখানা নূতন শাড়ী পরে উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে রথীনের কিছু দূরে এসে দাঁড়ায়। তারপর ঐ প্রকোষ্ঠের দেয়ালে টাঙানো শ্বশুর-শাশুড়ীর আলাদা দুখানা অয়েল পেন্টিংয়ের এনলার্জড্ ছবির সামনে দাঁড়িয়ে একে একে প্রণাম করে। তারপর সোজা স্বামী রথীন চৌধুরীর সামনে এসে মাথা নুইয়ে তার পা স্পর্শ করে প্রণাম করে ও মাথা তুলে মুখে হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রথীন একটু অবাক হয়ে বলে কি ব্যাপার, অতসী, মা বাবার ছবিতে প্রণাম করলে, আমাকে প্রণাম করলে!

অতসী—মা আমাকে সাধে তিনখানা সাড়ী যে পাঠিয়েছিলেন তার একখানা এতদিন পরা হয়নি, আজ পরলাম। এইসময় গুরুজনদের শুভাশীষ পাওয়া বড় প্রয়োজন।

রথীন—বুঝতে পেরেছি। তুমি এই প্রথম মা হতে চলেছো, আমার মনেই ছিল না। যাক্, আজ আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তো?

অতসী—অভিযোগ ও অনুনয় দুটোই আছে।

রথীন—বলে ফেলো।

অতসী—সত্যি কথা বলবো, রাগ দিচ্ছো?

রথীন—বেশ নির্ভয়েই বলো।

অতসী—আচ্ছা, তিনকড়ি দাশকে তিটে ছাড়া করতে যাচ্ছো কেন বলতে পারো? সে কি দোষ করেছে তোমার কাছে?

রথীন—তুমি এসব কথা কোথায় জানলে?

অতসী—যে ভাবেই হউক, কথাটা আমার কানে এসেছে।

রথীন—বসতবাড়ীর খাজনার টাকা তিন কিস্তি বাকী ফেলেছে ওর উপরস্থ মালিক, তারপরে আইনের নির্দেশে যা হওয়ার তাই হয়েছে।

অতসী—ও সব কাজের কথা নয়। বিয়ের পর পাঁচ বছর ধরে তোমার ন্যায় অন্যায় সব কাজ সহ্য করে এসেছি, টু শব্দ না করে তোমার ইচ্ছার অনুকূলে চলেছি। এখন তা আর সম্ভব নয়।

রথীন—তিনকড়ির ব্যাপারে তুমি কি বলতে চাও?

অতসী—তিনকড়ির উপর তোমার রাগ ছিল নিশ্চয়ই কোন কারণে, আর সে কারণও আমি জানি। তাকে বিপদে ফেলাই তোমার উদ্দেশ্য। তিনকড়ি ভাল লোক আর তার বউয়ের মত বউ কম দেখা যায়।

একটু ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হওয়ার ভাব দেখিয়ে রথীন বলে—কি বলছো তুমি, অতসী?

অতসী—আমি কিছুই আর বলবো না। তোমার

মনের প্রবৃত্তি ইচ্ছা অনিচ্ছা সব কিছু তুমি নিজেই জানো। সে বিষয় তোমাকে কিছু বলা হবে স্ত্রী হিসাবে মহাপাপ! (চাপা ক্রন্দন) শুধু এটুকু বলবো, পরের ক্ষতি করে নিজের কখনও ভাল হয় না।

রবীন—আমাকে কোন উপদেশ দিয়ে লাভ নেই, অতসী। আমার প্রপিতামহ কীর্ত্তি রায় জমিদারের বংশধর আমি; সেই বংশের প্রাচীন রীতিনীতি ও ঐতিহ্য আমি মেনে চলছি। এ নিয়তির বিধান।

অতসী—নিয়তির বিধান নয়। তোমার ধর্মপ্রাণ বাবা ও ধর্মশীলা মা কীর্ত্তি রায়ের কুকীর্ত্তির ইতিহাস ধুয়ে মুছে দিয়ে তোমাকে এক নূতন সুস্থ সুন্দর পরিবেশ রচনা করে তার ভেতরে তোমাকে রেখে কাশীবাসী হয়েছেন। তাঁদের গড়া নূতন ঐতিহ্য তোমার ও আমার মেনে চলা উচিত।

রবীন—জানো অতসী, ল অফ হেরিডিটিতে বলে, তিন পুরুষ অন্তর পূর্ব-পুরুষদের দোষগুণ নাকি বংশধরদের মধ্যে বর্ত্তায়।

অতসী—ওটা নিয়মের ব্যতিক্রম। ল-এর দোহাই দিয়ে নিজেকে ছোট করো না, আর তোমার মা বাবার নাম কলঙ্কিত করো না।

রবীন সহসা গম্ভীর ভাব ধারণ করে নির্বাক হয়ে থাকে। যেন অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে তার মন একটা শুভ পরিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অতসী—জানো, আমি নিজের কথা ভাবছি না। সারাজীবন তোমার ন্যায় অন্যায় মাথা পেতে নিয়ে তোমার সেবা করে যাওয়ার মনোবল আমার আছে। কিন্তু ভাবছি.....[দুহাত দিয়ে চোখ চেপে ফুঁপিয়ে ক্রন্দন]

রবীন—কেঁদো না অতসী, আর কি ভাবছ?

ক্রন্দনরতা অতসী—ভাবছি শুধু আমাদের বিরোধের সেতু হয়ে যে শিশু আসছে তার কথা। যে তোমার পিতৃদেবের সুকীর্ত্তির আলোকবর্ত্তিকার অধিকার পেয়ে হয়ত একদিন রায় পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে [ক্রমাগত ক্রন্দন]।

রবীন—অতসী, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তোমাকে নিয়ে আমি নূতন জীবন আরম্ভ করবো।

অতসী—তোমাকে আমি আর কি ক্ষমা করবো। তুমি ধৈর্য্য ধরে রাগ না করে আমার কথা শুনেছো ও কথার মান রেখেছো তাতেই আমি ধন্য। স্বামী স্ত্রীর দেবতা। আজ তোমাকে আমি দেবতা হিসাবেই পেলাম। বলে স্বামীকে প্রণাম করে অতসী।

রবীন—অতসী, আমি ঘোর পাষণ্ড ছিলাম, তুমিই দেবী। তোমার দেবীশক্তি আমার আসুরিক প্রবৃত্তি আজ ঘুচিয়ে দিলো।

অতসী—অতটা বাড়াবাড়ি করতে হবে না তোমার। তাতে আবার অকল্যাণই হবে। হ্যাঁ, একটা কথা। চলো শীগগিরই একদিন আমরা দুজনে কাশী গিয়ে বাবা মাকে ফিরিয়ে এনে দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করি।

রবীন—খুব ভাল কথা অতসী। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আর তিনকড়িকে আজই জানিয়ে দিচ্ছি তার বাস্তুভিটার অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার ব্যবস্থা আদালতে গিয়ে অবিলম্বে করা হবে।

* • • •

॥ এগার ॥

তিনকড়ির গৃহপ্রত্যাগমনের পর দিন পনের কেটে গেছে। ইতিমধ্যে সে সোজা সেলাইয়ের কাজগুলি শিখে নিয়েছে। একদিন দুপুরবেলা বারান্দায় বসে সেলাইয়ের কল চালিয়ে কাজ করছে এবং অনামিকা অদূরে চৌকির উপর বসে কাঁচি দিয়ে মাপমত ছিট কাপড় কাটছে। ছেলেমেয়েরা তখন স্কুলে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুজনের মধ্যে কথা-বিনিময়ও চলছে। ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা নিয়ে যখন স্বামী স্ত্রী মশগুল, তখন সাইকেলে চেপে পিওন এসে উপস্থিত হয় এবং একটা কাগজে সই নিয়ে তিনকড়ির হাতে একখানি টেলিগ্রামলিপি অর্পণ করে চলে যায়। টেলিগ্রামখানি দুজনকেই চিন্তান্বিত করে। কারোর কোন অসুখের খবর হয়ত এসেছে এই সন্দেহে একটা উৎকণ্ঠার ভাব এদের মুখে চোখে

প্রকাশ পায়। লটারির কথা ওরা সেই মুহূর্তে ভুলেই গেছে। আন্তভাবে টেলিগ্রামের কভার ছিঁড়ে টেলিগ্রাম-লিপি পড়ে তিনকড়ি আনন্দোৎফুল্ল চোখে অনামিকার দিকে তাকায় এবং বলে "অনু, তোমার স্বপ্ন ও সাধনা সার্থক হয়েছে। ভাবি লটারিতে আমরা এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা পেলাম"।

অনামিকা অনির্বচনীয় আনন্দে বলে ওঠে তাই নাকি, দেখি—এই বলে টেলিগ্রামটা পাট করে উহা কপালে ঠেকিয়ে মাথা নত করে এবং ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম জানায়। এ রকম অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির খবরে আনন্দে বেসামাল হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু স্বামী স্ত্রী কেউই বিচলিত ভাব দেখায় না।

টেলিগ্রাম পাওয়ার আধঘণ্টা পরেই তিনকড়ি সাইকেলে চেপে পোষ্টাফিসে চলে যায় এবং টেলিগ্রাফ মাষ্টারের সাথে দেখা করে। নিজের পরিচয় দেয়। মাষ্টারবাবু তিনকড়িকে নিয়ে একটা নিরালা কামরায় যান।

তিনকড়িকে অভিনন্দন জানিয়ে মাষ্টারবাবু বলেন দেখুন তিনকড়িবাবু, আপনার সৌভাগ্যের খবর আমি ছাড়া আফিসের দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি জানে না। যে পিয়নকে টেলিগ্রাম ডেলিভারি দিতে পাঠানো হয়েছিল তাকেও কিছু জানানো হয়নি।

তিনকড়ি—আমার খুব উপকার কর্লেন মাষ্টারবাবু। আজ আপনাকে মাত্র ২০৲ টাকা দিলাম। চেক্ পেয়ে ক্যাশ করার পরেই আপনাকে এ উপকারের স্বীকৃতি-হিসাবে সানন্দে একশত টাকা দেবো। আমার আর একটা অনুরোধ আপনার রাখতে হবে—সেটা হোলো—আমার লটারিতে টাকা প্রাপ্তির কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে কোনদিন বলবেন না।

মাষ্টারবাবু—আপনার অনুরোধ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এরপরে নমস্কার বিনিময়ের পরে তিনকড়ি পোষ্টাফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে।

পোষ্টাফিস্ থেকে ফিরে এসে তিনকড়ি দেখে, অনামিকা ঘরদোর সেলাইয়ের কাজে ডুবে আছে। পাশে বিধুর মাও তার সাহায্য করছে।

তিনকড়ি অনামিকার দিকে তাকিয়ে বলে, এখনও সেলাই নিয়ে……

তিনকড়ির কথার মাঝখানে অনামিকা চোখের ইশারায় তিনকড়িকে নির্বাক করার প্রয়াস নেয়। তিনকড়ি তা বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নেয় এবং অন্য প্রসঙ্গ তোলে। কিছুক্ষণ পরে বিধুর মা অর্ডারী তৈরী জামা ফ্রক সেলিমগুলি একটা ব্যাগে ভর্তি করে ঘরদোরটি ডেলিভারি দিতে বেরিয়ে পড়ে।

বিধুর মা চলে যাওয়ার পরে অনামিকা তিনকড়িকে বলে রাখো, লটারিতে টাকা পাওয়ার কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। এমন কি ছেলেমেয়েদেরও জানতে বুঝতে দেওয়া হবে না। কাজেই সেলাইয়ের কাজ আগের মতই নিষ্ঠা নিয়ে চালিয়ে যেতে হবে, এতটুকু ঢিলে দেওয়া চলবে না।

তিনকড়ি—ঠিকই বলেছো, অনু। আর লটারির টাকার চেক আসার পরে প্ল্যান মত কাজে এগোতে হবে।

দিন দশেক পরেই তিনকড়ির নামে রেজিষ্ট্রি করা খামে চেক আসে। তিনকড়ি পরদিনই কলকাতা গিয়ে তার ও অনামিকার যুক্ত নামে একটা ভাল ব্যাঙ্কে দশ টাকা জমা দিয়ে একটা কারেণ্ট একাউণ্ট খোলে এবং তারপর লটারির টাকার চেকখানি জমা দেয় এবং ঐ দিনই বাড়ীতে ফেরার জন্য রওনা হয়। আরও তিন দিন পরে তিনকড়ি অনামিকার সইয়ের নমুনা ব্যাঙ্কের কার্ডের উপর লিখিয়ে নেয় এবং ঐ কার্ড এবং চেক বই সহ আবার কলকাতা আসে। ব্যাঙ্ক থেকে ৫০০ টাকা তুলে আবার দেশের বাড়ীতে চলে আসে।

গ্রামের কোন লোকই তিনকড়ির বিপুল অর্থপ্রাপ্তির কথা জানতে পারেনি। একটা বিরাট পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তিনকড়ির মনে এসে উপস্থিত হয়। দিন দুই পরে তিনকড়ি মহকুমা আদালতে গিয়ে এফিডেভিট সাহায্যে নিজের নাম বদলে নূতন নাম রাখে হরিপ্রি

যায়। তিনকড়ি হরিপ্রিয়তে এবং দাস রায়ে রূপান্তরিত হলো। সামাজিক সুবিধার জন্য এরূপ নাম ও পদবী পরিবর্ত্তন গ্রামে আরও কয়েকটি বিভিন্ন সময় ঘটেছিল বলে, যারা তিনকড়ির নাম পরিবর্ত্তনের কথা কোনভাবে জানতে পেরেছিল তারা এ ব্যাপারে তিনকড়ির কোন উদ্বেগ আরোপ করেনি। তিনকড়ি এক্সিডেন্টিস্ করে বাড়ীতে এসে নাম পরিবর্ত্তনের কথা বলে। অনামিকা একটু বিস্মিত হয়ে বলে, নাম পদবী পরিবর্ত্তন কেন করলে?

তিনকড়ি জবাবে বলে—বাজার সরকার, বেয়ারা ও হকার হয়ে অনেক কাল কাজ করেছিলাম, নামটার জড়ানো আছে ঐ কাজগুলোর হীনতা। বড় হওয়ার পথে নীচবংশ জ্ঞাপক পদবীটাও অন্তরায় হতে পারে—তাই দুটোই ত্যাগ করলাম।

অনামিকা—তাহলে আমাদের এই গ্রামের বাড়ীও ছেড়ে যেতে হয় কোন দূর সহরে যেখানে আমাদের আত্মীয় বা পরিচিত কেউ নেই। এখানে থেকে গেলে পরিবর্ত্তনের কোন মূল্য হবে না।

তিনকড়ি—ঠিক কথা অনু, আমারও ইচ্ছা এখানের বাড়ীর পাট তুলে দেওয়া।

অনামিকা—হাঁ, তাই করো। আমাদের ঘর বাড়ী, জোত জমি কোন বিশ্বাসী লোকের তদারকীতে রাখো। আর বিনুর মা তার ছেলে মেয়েকে নিয়ে এ বাড়ীতে থাকবে। ও টাকা জমিয়ে একটা সেলাইয়ের কল কিনেছে। গোড়ায় কিছু টাকা দিয়েছে, বাকী টাকা ২০ কিস্তিতে শোধ করবে। বিনুর মা আমাদের জন্য অনেক করেছে। ওকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আমাদের দেওয়া উচিত।

তিনকড়ি অনামিকার প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং সেই অনুযায়ে সব ব্যবস্থা করা হয়। তারপরে এক শুভ দিনে তিনকড়ি সপরিবারে জিনিষপত্র সহ কলকাতা এসে একটা হোটেলে ওঠে। ৩।৪ দিন ঘুরে দালালের সাহায্যে কলকাতার অনতি দূরে বারাসতে ৬০ হাজার টাকায় পাঁচিল ঘেরা ছোট কম্পাউণ্ডবিশিষ্ট ও সদর রাস্তা সংলগ্ন একটি নূতন দ্বিতল বাড়ী ক্রয় করে। নূতন বাড়ীর সামনের দিকের প্রধান গেটের পার্শ্বস্থ দেয়ালে হরিপ্রিয় রায় নামাঙ্কিত একটি নিকেল প্লেট এঁটে দেওয়া হোলো। এরপর একদিন তিনকড়ি সপরিবারে নূতন বাড়ীতে এসে উঠলো। সঙ্গে অনেক জিনিষপত্র ও নূতন আসবাব এলো। হরিপ্রিয়ের বাড়ীতে নূতন একজন রাঁধুনি ও ছোকরামত একজন চাকরও এসেছে। মেয়েদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আসা হয়েছিল। ওদের স্থানীয় গার্লস্ স্কুলে ভর্ত্তি করা হবে ২।১ দিনের মধ্যে। অমিলার জন্য গানের মাষ্টারও ঠিক করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে তিনকড়ি লটারির বাকী জমা টাকা থেকে মাত্র ১৫ হাজার টাকা দিয়ে তার বাস ভবন থেকে ৪।৫ মাইল দূরে কোন ছোট রেল ষ্টেশনের কাছে অবস্থিত একটি চালু ও লাভজনক কাঠের আড়ত ক্রয় করেছিল। দেখাশুনার জন্য বিশ্বস্ত লোকের অভাব ও পারিবারিক গোলমালের জন্য আড়তের মূল মালিক উহা বিনা লাভে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।

হরিপ্রিয় ও তার পরিবারবর্গের চালচলন দেখে স্থানীয় লোকজন এদের বেশ সম্ভ্রমের চোখে দেখতে শুরু করে। হরিপ্রিয় একটা গাম্ভীর্য্য নিয়ে চলাফেরা করে, আড়তে গিয়ে কাজকর্ম দেখে। ইচ্ছা করেই লোক জনের সাথে বেশী গায়ে পরে মেলা মেশা করতো না। কদাচিৎ কারোর সাথে মুখোমুখী দেখা হলে ২।১ কথায় ভদ্রতা ও আপ্যায়নের কাজ সম্পন্ন করতো। স্ত্রী অনামিকা নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মিষ্ট ব্যবহার ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বদ্বারা পাড়া প্রতিবেশী মেয়ে মহলের মন অনায়াসে জয় করে নিয়েছিল মাসখানেকের মধ্যেই। অনামিকা তার অতি প্রিয় সেলাইয়ের কাজ তখনও একেবারে ছাড়ে নাই। তবে ঐ কাজের জন্য কোন চাপ তখন ছিল না। তবে সে মাসখানেক পরেই আরও একটি কল কিনে কাছে কোথাও ঘর ভাড়া করে সেলাই শেখাবার কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এখানে অবিবাহিতা ও বিধবা মেয়েদের জিন্তে যাবতীয় কাটিং ও সেলাইয়ের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হবে এ ছিল তার ইচ্ছা।

লটারিতে টাকা প্রাপ্তির পরে তিনকড়ির নাম পরিবর্তন, দেশত্যাগ ও ভিন্ন মহকুমা শহরে বাড়ী কিনে বসবাস অনামিকাকে একটা ভীষণ সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সে তার নূতন জীবনের কথা তখনি মা বিমলাসুন্দরী ও মাসিমা মীরাদেবীকে জানাতে চিনা। নিয়তির বিধানেই হয়ত স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে নিজেদের নূতন জীবনের কথা তাদের কাছে কিছু দিনের জন্য অজ্ঞাত রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করলো। অনামিকা মায়ের কাছে মাঝে মাঝে যে চিঠি দিতো তাতে গতানুগতিক খবরাখবরেই স্থান পেতো।

"মা তোমার চিঠি পেয়েছি অথবা মা তোমার চিঠি অনেকদিন ধরে না পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি। আমরা সকলে ভাল আছি। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করছে। অনিলা পড়াশুনায় গানে খুব ভাল হয়েছে। মাসিমারা কেমন আছেন? শুভ্রা ও সুমনের খবর কি? ওদের আমার ভালবাসা জানাবে। মাসিমা, মেসোমহাশয়কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবে, তুমিও জানবে। তোমার জামাই বাইরের কাজে এবং আমি ঘরের কাজে খুবই ব্যস্ত থাকি। কোথাও একদিনের জন্য যে যাবো তার সম্ভাবনা দেখছি না। আমার চিঠি পেতে দেরী হলে তুমি চিন্তা কোরো না ইত্যাদি ইত্যাদি"—এ ধরণের চিঠি অনামিকা মায়ের কাছে ইদানীং পাঠাতো। চিঠিতে বীরগঞ্জের ঠিকানাই দেওয়া হোতো। কোন সন্দেহের কারণ না থাকাতে চিঠির স্ট্যাম্পে যে পোষ্টাফিসের দিল থাকতো বিমলাসুন্দরী তা কখনও দেখার ও বোঝার চেষ্টা করেনি। বিমলার চিঠি বীরগঞ্জের পোষ্টমাষ্টার তিনকড়ির নির্দেশ মত তার নূতন ঠিকানায় রি-ডাইরেক্ট করে পাঠিয়ে দিতো। এভাবে কয়েক মাস নির্বিঘ্নেই কেটে গিয়েছিল।

পাঁচ মাস পরের কথা। অনিলা প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে। খবরের কাগজে পরীক্ষার ফল বের হওয়ার দিন স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এসে অনিলাকে আশীর্বাদ করেন ও তার মা বাবাকে অভিনন্দন জানান। তিনকড়ি বিনীতভাবে বলে "অনিলার কৃতিত্বের পেছনে যার ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল তিনি হলেন ওর মা"। অনিলা আগন্তুকদের একে একে প্রণাম করে এবং তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। মিষ্টি খাবার দিয়ে এদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করেছিলেন অনামিকা। ঐদিন রাত্রে ঠাকুর ঘরে প্রার্থনা ও ভক্তিমূলক গানের ব্যবস্থা করেছিলেন অনামিকা। ঐ আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে পাড়া প্রতিবেশীদের অনেকে এসে যোগদান করেন।

॥ বার ॥

এদিকে ইতিমধ্যে সমরেশ মিত্র জজের তৃতীয় পুত্র সজীব প্রথম শ্রেণীতে ইকনমিক্সে এম-এ পাশ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সদর কলেক্টরীর অধীনে সার্কেল অফিসার নিযুক্ত হয়েছিল। বছর খানেক পরেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হওয়াটাও একরকম স্থির হয়েছিল। সরকারী কাজ উপলক্ষে সজীব বারাসতে আসে তিন দিনের ট্যুরে। সরকারী ডাক বাংলায় তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সজীবের থাকার দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় পাবলিক হলে ছাত্রছাত্রী ও যুবসংঘের একটা বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছিলো। ছাত্রনেতারা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়ে সজীবকে ঐ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদের জন্য অনুরোধ জানালে সে সানন্দে তাতে রাজী হয়। হরিপ্রিয় অর্থাৎ তিনকড়িও ঐ ফাংশনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণলিপি পায়। আমন্ত্রণলিপিতে অন্যান্য কথার মধ্যে সজীবের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ ছিল কলকাতার অবসরপ্রাপ্ত জজ সমরেশ মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র সার্কেল অফিসার সজীব মিত্র অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করবেন। আমন্ত্রণলিপি পড়ে হরিপ্রিয় সহজেই সজীবকে চিনতে পারে। হরিপ্রিয় ফাংশনে যোগদান থেকে বিরত হয়। শেষকালে দশজনের সামনে সজীবের কথাবার্ত্তায় তার পূর্ব্বপরিচয় ফাঁস হয়ে পড়বে এ ছিল হরিপ্রিয়ের আশঙ্কা। তার আত্মগোপনের বেশ প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করতো। কিন্তু এই আত্মগোপনের

ফলে তার যে একটা কঠিন পরিস্থিতির হিল্লে সংগ্রাম করে একটি পরমকাম্যবস্তু লাভ হবে এ জানতেন শুধু বিধাতাপুরুষ।

সন্ধ্যাবেলা যথাসময় ফাংশন আরম্ভ হয়। বিরাট পাবলিক হলটি ছাত্র ছাত্রী তরুণ তরুণী এবং স্থানীয় গণ্য মান্য শিক্ষিত লোকদ্বারা ভর্তি হয়ে যায় ফাংশন আরম্ভ হওয়ার বেশ অনেকক্ষণ আগেই। ডায়াসের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন সভাপতি হিসাবে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীঅমিতাভ ব্যানার্জি, প্রধান অতিথি হিসেবে সজীব, এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোক। ডায়াসের কিছুটা পেছনে ছিল সুসজ্জিত ষ্টেজ। স্থানীয় যুবসংস্থার জনৈক প্রধান কর্মী ভবতোষ ঘটক অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন। অনুষ্ঠানে গান আবৃত্তি নৃত্য, একাঙ্ক নাটিকা যন্ত্র সঙ্গীত ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। সমগ্রভাবে অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটী উপস্থাপনাই উপস্থিত জনগণকে খুশী করেছিলো। অনিলা গান ও আবৃত্তিতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পায় এবং প্রথম হয়ে ২টী পদক পায়। অনিলার গান ও আবৃত্তির সময় সজীব অপলক দৃষ্টিতে অনিলার দিকে চেয়ে থাকে। অনুষ্ঠান চলার কালে সজীব তার পার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্রলোকদের কাছে অনিলার খবর জেনে নেয়। সুশিক্ষিতা সুরুচী নানা গুণে গুণময়ী সুন্দরী অনিলার প্রতি তার জন্মে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ। আসরে অনিলার প্রতি সজীবের বিশেষ মনোযোগ অনিলার দৃষ্টিও এড়ায় নি। দ্বিতীয়বার গান ও আবৃত্তির সময় অনিলার মুখ অজ্ঞাতসারে আরক্ত হয় এবং কষ্টের সংযমে নিজের বিচলিত মনকে আয়ত্তে রাখে।

পরদিন সকাল আটটায় ট্যাক্সিতে কোন জায়গায় যাওয়ার পথে সজীব হরিপ্রিয়বাবুর বাড়ী দেখতে পেয়ে ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলে। অনিলা গাড়ী থামার শব্দ শুনে বারান্দায় গেটের কাছে এসে দাঁড়ায়। সজীব ট্যাক্সি থেকে নেমে অনিলার দিকে চেয়ে মুখে একটা স্নিগ্ধ মিষ্ট হাসি রচনা করে অভিবাদন জানায়। অনিলাও নম্র সলাজ হাসিতে সজীবের হাসির প্রত্যুত্তর দেয়। অনিলা গেটের দিকে আর একটু এগিয়ে প্রশ্নের প্রতীক্ষায় দাঁড়ায়।

সজীব প্রশ্ন করে—আমাকে চিনতে পারছো?

অনিলা—বেশ, এর মধ্যে ভুলে যাবো। কালকের ফাংশনে আপনি তো চিফ্ গেষ্ট ছিলেন। আপনার বক্তৃতা সবাইর খুব ভাল লেগেছিলো।

সজীব—কি আর বক্তৃতা দিয়েছি, ও কিছু নয়। এই বলে গেটের পাশে নামাঙ্কিত প্লেটের দিকে চেয়ে সজীব বললে—এটা হরিপ্রিয়বাবুর বাড়ী দেখছি।

অনিলা—হ্যাঁ, হরিপ্রিয়বাবু আমার বাবা: আপনি চান তাঁকে? উনি তো এখন বাড়ী নেই।

সজীব—সহাস্যে, না ওকে দরকার নেই।

অনিলা—তবে কাকে চান?

সজীব—কাকে চাই.....বলে ক্ষণকাল মৌন থেকে তোমাকে আর একবার দেখতে এলাম। কেন বুঝতে পেরেছো? বলে তৃপ্তির হাসি হাসল।

অনিলা—না তো, মানে—হ্যাঁ বুঝেছি। তা হলে সেকথা আমাকে না বলে মা বাবাকে বলাই ভালো। এই বলে মাথা নীচু করে থাকল।

সজীব—তোমার মতটা তো আগে জানা দরকার।

সরল স্নিগ্ধ সলাজ মিষ্টি হাসিতে অনিলা একথার জবাব দিল।

"আচ্ছা চলি এবার" বলে সজীব ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই ড্রাইভার ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

ঠিক পরা অবস্থায় অনিলা একবার সজীবদের বাড়ীতে যখন গিয়েছিল তখন অনিলা ও সজীবকে কেন্দ্র করে সজীবের বৌদি সাবিত্রী সজীবকে লক্ষ্য করে একটা টিপ্পনী কেটেছিল। কিন্তু অনিলা ও সজীব কারোরই মনে তার ক্ষীণতম স্মৃতি বর্ত্তমানে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু অনিলার বাবা হরিপ্রিয় রায় অর্থাৎ তিনকড়ি দাস যে ঘটনাচক্রে ঐ দিন বাড়ীতে ছিলনা এবং কাজে কাজেই সজীবের মুখোমুখী হওয়ার বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছিল এটা নিয়তির অমোঘ ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

অনিলা সজীবের আগমন ও কথাবার্ত্তার বিষয় মাকে

বলার ইচ্ছা বা প্রয়োজন বোধ করলো না। নিজের মনেও কোন ভাবান্তর ঘটতে দিলো না। অনিলার মা তাই ধোনেরা দোতলায় ছিল। কেউই সঞ্জীবের আসার কথা জানতে পারেনি। যুক্তির প্রাধান্যের কাছে ভাবপ্রবণতা শিথিল হয়ে যাবে সে সব যুবক যুবতীর কাছে যারা নিজেকে গড়ে তুলতে চায় সকল রকমে, যারা অন্যের ভালবাসার কাঙাল নয় এবং যারা জানে ভালবাসা আর মোহ এক নয়। সঞ্জীব কৃতী উচ্চশিক্ষিত ধীর স্থির প্রতিষ্ঠিত প্রিয়দর্শন যুবক; তার মনের আন্তরিক আবেদন অনিলা সহজভাবে গ্রহণ করেছিল। তবুও যুক্তির অগোচরে অনেক সময় ভাবপ্রবণতার প্রাধান্য মনকে অধিকার করে বসতে দেখা যায়। তাই অনিলার ঐ দিন নিয়মিত গানের সময় একখানি রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভেতর দিয়া তার দোলায়িত মনের অভিব্যক্তি খানিকটা প্রকাশ পায়।

॥ তের ॥

একটা সংকল্প নিয়ে সঞ্জীব বারাসত থেকে কলকাতা ফিরে আসে। কিছুদিন আগে সঞ্জীবের বিবাহ সম্পর্কে মা বৌদিদের মাঝে আলোচনা শুরু হয়েছিল। সঞ্জীবও পড়াশুনার সমাপ্তি এবং ভাল চাকুরী প্রাপ্তির জন্য বিয়েতে আপত্তি করার কোন প্রয়োজন দেখছিলো না। অনিলাকে বিয়ে করার একটা প্রবল আগ্রহের প্রভাব সে মনে প্রাণে অনুভব করতে আরম্ভ করলো। কিন্তু সে আগ্রহের কথা বাবাকে বলা কখনই তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু মায়ের কাছে মনের কথা প্রকাশ করতেও সংকোচ আসে। কিন্তু আকস্মিকভাবেই পরোক্ষ ভাবে একটা সুযোগ এসে যায় দিন দুই পরে।

ঐ দিন অজ সমরেশ মিত্র সকালবেলা ড্রইং রুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। পিয়ন এসে একখানি চিঠি দিয়ে যায়। খাম ছিঁড়ে দুখানা চিঠির খবর পাঠ করেন সমরেশবাবু। ঠিক ঐ সময় স্ত্রী বিভাবতী ড্রইং রুমে এসে পড়েন এবং চিঠি কোত্থেকে এসেছে জানতে চান।

সমরেশবাবু বলেন বড় বউ, সঞ্জুর ভাল একটা সম্বন্ধের প্রস্তাব এসেছে একখানা চিঠিতে। সরকার থেকে প্রেরিত আর একখানা চিঠির খবর হোলো সঞ্জু চাকুরীতে কনফার্মড্ হয়েছে এবং কয়েকমাস পরেই ওর পদোন্নতির অর্ডারও হয়ে আছে। এখন ওর বিয়ের কথা ভাবা যেতে পারে। নীলুও কিছুদিন ধরে ওর বিয়ের কথা আমাকে বলছিলো।

বিভাবতী—সঞ্জুর এখনই বিয়েতে মত আছে কিনা জানা দরকার। চাকুরীর সম্পর্কে নূতন খবর জানলে নিশ্চয়ই অমত করবে না।

সমরেশ—ঠিকই বলেছো, বড় বউ। আর একটা কথা ভাবছি। সঞ্জুর তো অনেক মেয়ের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে। ওর পছন্দমত কোন মেয়ে আছে কিনা জানা দরকার।

বিভাবতী—ওর আবার পছন্দ অপছন্দ কি? আমরা ভাল ঘর ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে ঠিক করলে ও অমত করবে না।

সমরেশ—সে কথা ঠিক, বড় বউ। তবুও সঞ্জুর ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা আগে জানা উচিত।

এই সময় বড় মেয়ে নীলিমা একখানা সোয়েভনার হাতে করে ড্রইং রুমে প্রবেশ করে বলে বাবা-মা, ভাখো এ মেয়েটি কি সুন্দর, পড়াশুনা গানে ও আবৃত্তিতে খুব ভাল।

সমরেশ—ও সোয়েভনার কোথায় পেলি, নীলু?

নীলিমা—সঞ্জু কদিন আগে যখন বারাসত গিয়েছিল তখন স্থানীয় একটা যুবকাংশনের সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়। ঐ সভায় একটা সোয়েভনার বিলি করা হয়, তারই একখানা সঞ্জু পেয়েছিল। সোয়েভনারে অন্য কয়েকটি ছবি ছাড়া তিনটি মেয়েরও ছবি দেওয়া হয়েছে। প্রথম ছবিটী নাকি ওখানকার স্কুলের সব দিক থেকে সেরা মেয়ের।

সমরেশ ও বিভাবতী ছবিটী দেখে তারিফ করেন।

সমরেশ—হ্যাঁরে নীলু, মেয়েটি সম্পর্কে সঞ্জু তোকে কিছু বলেছে?

নীলিমা—হ্যাঁ, বাবা, মেয়েটিকে নাকি ওর খুবই ভাল

লেগেছে: মেয়েটিকে বউ করে আনলে কেমন হয় জিজ্ঞেস করাতে ও বলে, ভালই হয়, তবে বাবা মার মতো মত থাকা চাই।

সমরেশ—খুব ভাল কথা। এই মেয়ের বাবার কাছেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো যাক। কি বলো বড় বউ?

বিভাবতী—তুমি যেমন বলবে তেমন হবে। আমার মনে হয় সঞ্জয় যখন এত আগ্রহ তখন এ মেয়েকেই বউ করে আনতে হবে।

ঘটক নীলমণি মহাপাত্র হরিপ্রিয় রায়ের বাড়ীতে একদিন বেলা ৩টার সময় এসে উপস্থিত হলেন। হরিপ্রিয় স্বাগত জানিয়ে মহাপাত্র মহাশয়কে বৈঠকখানা ঘরে এনে বসালেন।

মহাপাত্র বলেন, আপনিই হরিপ্রিয়বাবু?

হরিপ্রিয়—হ্যাঁ, আপনার পরিচয় ও আসার উদ্দেশ্য বলুন।

মহাপাত্র—হ্যাঁ স্যার, বলছি। এই বলে সমরেশবাবুর লিখিত একখানা ক্ষুদ্র চিঠি হরিপ্রিয়বাবুর হাতে দেয়। হরিপ্রিয়বাবু চিঠিখানি পড়ে মহাপাত্রের পরিচয় ও তার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পারে। চিঠিতে আর কোন কথা ছিল না।

হরিপ্রিয়—এইবারে আপনার বক্তব্য বলুন।

মহাপাত্র—কলকাতার রিটায়ার্ড জজ সমরেশ মিত্র তার তৃতীয় ছেলে সঞ্জীবের সাথে আপনার মেয়ে অনিলা দেবীর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে আমাকে পাঠিয়েছেন। সঞ্জীববাবু আপনার মেয়েকে দেখে পছন্দ করেছেন। এ বিয়েতে আপনার ও আপনার স্ত্রীর মত থাকলে জজবাবু ও তার স্ত্রী মেয়েকে পাকা দেখা দেখতে আসবেন এবং একই সময় মেয়েকে আশীর্বাদ করে যাবেন, এ তাদের ইচ্ছা।

হরিপ্রিয়—সঞ্জীব আমার মেয়েকে কোথায় দেখেছে তো বললেন না।

মহাপাত্র—কিছুদিন আগে সঞ্জীববাবু আপনার মেয়েকে দেখে এবং তার গান, আবৃত্তি শোনে আপনাদের স্থানীয় কোন যুব ক্লাবের সভায়। সঞ্জীববাবু কার্য্য উপলক্ষে তখন এখানে আসেন এবং ঐ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থাকেন।

হরিপ্রিয়—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন আমার সব মনে পড়েছে। আর বলতে হবে না। আমি ঐ সভায় যেতে পারিনি।

হরিপ্রিয় নূতন জীবনের শুরুর পরে পোষাকে আষাকে সবসময়ে ফিটফাট থাকতেন। সম্প্রতি পাওয়ারলেস একটা গোগলসের চশমা পরা আরম্ভ করেছিলেন। বাহ্যতঃ হরিপ্রিয়ের মধ্যে তিনকড়িকে আবিষ্কার করা তখন কঠিন ছিল। যা হোক ঘটকের মুখে জজ সমরেশ মিত্রের নাম শুনে হরিপ্রিয়ের চোখে মুখে একটা দুশ্চিন্তার কালো ছায়া নেমে এলো। সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লো। যে কোন মেয়ের জন্য এমন বর ও এমন ঘর পাওয়া দুর্লভ। এ রকম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা কি সমীচিন হবে? অথচ এর অন্তরায়ের প্রাচীর সে নিজেই তিনকড়ি দাশ হিসাবে। হরিপ্রিয় মহাপাত্র মহাশয়কে বললো "আচ্ছা, আমি একটু ভেতরে গিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলে আসি।" এই বলে হরিপ্রিয় অন্দর মহলে যায় এবং স্ত্রী অনামিকার কাছে ঘটকের প্রস্তাবের কথা পেশ করে। সব শুনে অনামিকা বললো, একটা ভীষণ দোটানার মধ্যে পড়া গেলো। শোনো, এখনকার মত ঘটকের প্রস্তাবে মত দিয়ে ফেলো, তারপরে দুজনে বিচার বিবেচনা করে যখন যেমন দরকার তাই করা যাবে।

হরিপ্রিয় এর পর বাইরের ঘরে ঘটকের কাছে এসে বলে "দেখুন মহাপাত্র মশায়, আমরা দুজনেই আপনাদের প্রস্তাবে রাজী হলাম"। শুনে ঘটক মহাশয় খুব খুশী হন এবং বলেন যদি মনে কিছু না করেন একটা নিবেদন করবো। একটু আমতা আমতা করে আবার বলেন দিদিমণিকে একবারটী দেখাবেন।

হরিপ্রিয় "তাতে এমন আর কি আছে।" এই বলে অনিলাকে ডাকেন। অনিলা তখন যেমন ভাবে ছিল ছিল ঠিক সেই ভাবে এসে তার বাবার পাশে দাঁড়ালো।

হরিপ্রিয়—এই আমার মেয়ে।

মহাপাত্র—না, সঞ্জীববাবুর পছন্দ আছে বলতে হবে।

আপনার মেয়ের রংয়ে চেহারায় তুলনা হয় না। এর পরে অনিলা নমস্কার জানিয়ে ভিতরে চলে যায়। তারপরে খাওয়া দাওয়া আদর আপ্যায়নের পালা শেষ হলে মহাপাত্র মহাশয় চলে যান।

দিন দুই পরেই সমরেশবাবুর কাছ থেকে চিঠি আসে হরিপ্রিয়ের নামে। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন তিনি সস্ত্রীক মেয়েকে পাকা দেখা ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের জন্য চিঠি প্রাপ্তির দুদিন পরে আসবেন। চিঠি পড়ে হরিপ্রিয় আবার ভাবনায় পড়লো। বাবা মা যে এ বিয়েতে মত দিয়েছেন তাতে অনিলা যুগপৎ চিন্তিত ও আনন্দিত হয়েছিলো। তার আলোড়িত মনে আরও আলোড়ন জাগলো। অনামিকা জানে এ বিবাহে তার স্বামীকে দিয়ে একটা বিরাট বাঁধা আছে। কিন্তু বিধির বিধানেই এ বিবাহ ঘটতে চলছে, এবং যে বিরাট অন্তরায় তাদের চিন্তাকুল করে তুলছে, তাও নিজেদের বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনাদ্বারা অতিক্রম করা যাবে এ ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে সে মনে বল সঞ্চয় করে। স্বামীকে উদ্বিগ্ন দেখে অনামিকা বললো, কিছু ভেবো না, ছেলে বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র—সে যখন নিজেই মেয়েকে খুব পছন্দ করেছে তখন চিন্তার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। তবে—প্রথম ধাক্কাটা……

হরিপ্রিয়—অর্থাৎ আমাকে ওরা দেখলেই ওদের মন বিগড়ে যাবে—এই তো?

অনামিকা—হ্যাঁ, তাই। ক্ষণকাল ভেবে অনামিকা আবার বলে আমি ভাবছি, এক কাজ করা যাক, ওরা যখন মেয়ে দেখতে আসবে, তুমি তখন বরং কাঠের আড়তে গিয়ে থাকবে, আমি এদিকে সব চালিয়ে নেবো।

ক্ষণেকের জন্য হরিপ্রিয় উৎসাহিত হয়, পরক্ষণেই সংশয়াকুল দৃষ্টি নিয়ে বলে, কিন্তু ভেবে দেখো অনু, তিনকড়ি বেয়ারা মেয়ের বাবা, একথা কোন প্রকারে জানলে তারা কি খুশী মনে এগোবে? হঠাৎ কি করে মনিব তার চাকরকে মর্য্যাদার সম্পর্ক দেবে?

অনামিকা—অবস্থার পড়ে মানুষের অনেক কিছু করতে হয়। তবে হ্যাঁ, গোড়াতে তোমার পরিচয়টা চট্ করে পেয়ে গেলে সব কিছু ভেস্তে যেতে পারে। তাই তোমার অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন হবে বেশ কিছুদিনের জন্য এ ব্যাপারে।

হরিপ্রিয়—না হে, তার চেয়ে শুরুতেই জানিয়ে দেই আমার পরিচয়। সত্য গোপন করে বিয়ে দেওয়ার ফল খারাপও হতে পারে। সত্য তো একদিন ফাঁস হয়ে যাবেই।

অনামিকা—ভাখো, ছেলে যখন এতটা উৎসুক, তখন কোন বাধাকেই সে আমল দেবে না। আজকাল যখনো শুনি তো, ভদ্র বড় ঘরের অনেক উচ্চশিক্ষিত ছেলে নিজ পছন্দমত মেয়েকে, সে যে জাতেরই হউক তাকে বিয়ে করতে দ্বিধাবোধ করছে না, অনেকক্ষেত্রে বাপ মায়ের অমতেও। অজের ছেলে অবশ্য সে ধাতের ছেলে নয়, তবুও এখনই তোমার পরিচয় পেলে ভারি বিশ্রী ব্যাপার হয়ে উঠবে। অজের পরিবারের সাথে তোমার পরিচয়টা না থাকলে তেমন কোন অসুবিধা হতো না।

হরিপ্রিয়—বেশ, তোমার কথামতই সব হবে। কিন্তু যখন যা ব্যবস্থা দরকার, তোমাকে একাই সব করতে হবে। কি ভীষণ হাঙ্গামায় তুমি পড়বে ভেবে ভাখো অনু।

অনামিকা—তুমি কিছু ভেবো না। যার বিধান তিনিই সব করিয়ে দেবেন বলে অনামিকা উপরের দিকে তাকায়।

হরিপ্রিয়—ঠাকুর দেবতায় তোমার যা ভক্তি বিশ্বাস তাতে তুমি ঠিকই চালিয়ে নিতে পারবে, আমি জানি।

[ক্রমশঃ]

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৮১)

২৭-২-৫৭—পরাপেক্ষা ভাল নয়—বৈকল্প হইয়া সেবা করে পরাপেক্ষা, কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা...। যতটা পার নিজের কাজ নিজে করবে, অন্যের অপেক্ষা রাখবে না—এ যেমন বাইরের কাজে, তেমনি অন্তরের মধ্যেও একটা অন্য-নিরপেক্ষ ভাব রাখতে হবে—সকলকে নিজ জীবনে রাখবে—আবার সকলের থেকে আলাদা হয়েও নিজের মধ্যে নিজে আনন্দিত থাকবে।..... ছোটখাট কর্মগুলি নিজেই করবে ...সতীশ গুহ আজও থালা ধুতে চান—অথচ তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনি বয়স্কও।.. হজরত মহম্মদের জামায় ১০০টা তালি—সুঁচসুতা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকত...। অন্যের অপেক্ষা করা কমাও...। নিত্যগোপাল বলেছেন, কখন কোন্ অংশ আসে তা তো ঠিক নেই, দুঃখের অভ্যাস রাখা ভাল। একটু কঠিন হলেই, একটু কষ্ট হলেই সেটা করা থেকে বিরত হয়ো না—কঠিনের সাধনা কর—সহজকে পেতে হলে কঠিনের মধ্য দিয়ে আসতে হয়.....। আজকালকার দিনে কেউ কষ্ট করতে চায় না, কেমন করে কষ্টটা এড়াবে, তারই চেষ্টা কেবল।..... অথচ ব্রহ্মচারীর জীবন মানে সব রকম কষ্টের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করান.....দেহ মনকে প্রস্তুত রাখা যে কোন অবস্থার জন্য—যাতে কষ্টে পড়লে দিশেহারা না হতে হয়, হায় হায় করতে না হয়—সংকল্প থেকে চ্যুত হতে না হয়। জুতোটা ছিঁড়ে গেছে—তবু তাবি ঘষি না করলে চলে...। গরম জল ব্যবহার করতে হয় স্নানের সময়—লজ্জা পাই, দেহ তো লজ্জা করতে পারে না ঠাণ্ডা জল—চুপ করে নিতে হয়।...কিসের দাবী পিতার পুত্রের ওপরে?... সেবা করতে এসেছি—সেবা করে যাব। যে সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হয়েছ—দৃঢ় পদক্ষেপে, সব মান অভিমান হিংসা বিদ্বেষ ভুলে সেই পথে চল।.....অনন্ত সুযোগ নিত্যগোপাল এনে দেবেন...তিনি যে সকল পথহারার পথ-প্রদর্শক.....। নিত্যগোপাল, তুমি আমায় উদ্ধার করেছ—তোমার সেই বাণী—শরৎ, যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি—সেই বাণী আমায় ঘিরে রেখেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে।.....আমি যেন কারো টানে, কিছুর টানে সংকল্পচ্যুত না হই—প্রয়োজনে আর সব যেন ছেড়ে দিতে পারি।...বাইরেকে অভিযোগ করো না—তোমার ব্যর্থতার কারণ বাইরে নেই...তোমার জীবনে নিশ্চয় এমন কোন ছিদ্র আছে যার মধ্য দিয়ে এই ব্যর্থতা ঘটতে পারছে...যার মধ্য দিয়ে সব আশীর্বাদ গলিয়ে যাচ্ছে—কিছুই ধরে রাখতে পারছ না।...নিত্যগোপাল অছিদ্র...নিত্যগোপাল, আমার জীবনের ছিদ্র তুমি বুজিয়ে দাও.....। ছিদ্রকুম্ভে যাযাবরী জল এনেছেন...আমি পারব তো জল আনতে? তোমায় বুকে করে তোমার ছন্দে বিশ্বকে গড়ে তুলব এই সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তোমার চরণস্পর্শে সে সংকল্প পূর্ণ হোক.....।

১০৩৫৭। ঐ—ঐ। আজ Psychoanalysis-এর বই 'An outline of Psychoanalysis'—by Teslaar—Page 157-তে দেখছিলাম—'Our relation to the world...is from the outset such that we cannot endure it without a break. Therefore we withdraw from time to time into the primodial state—that state which is characteristic of our intra-uterine existence. At least we create for ourselves an enviroument very close to it : warmth, darkness and absence of stimuli....'

—আমি তোমাদের সবাইকে এই warmth, darkness ও absence of stimuli-র মধ্যেই রাখতে চেয়েছিলাম।..... নিত্যগোপালের কোলের মধ্যে, গুরুর কোলের মধ্যে না থাকলে সংসার করা তো চলবে না··· শুধু আমি নিয়ে তো কথা নয়—পরিবার সমাজ বিশ্ব রয়েছে প্রতি স্বামী স্ত্রীর মাঝে, প্রতি দুইটী মানুষের মাঝে।·· যদি মানুষ হতে চাও তাহলে withdraw কর ঐ গুরুর প্রাণের মধ্যে যেখানে ঐ তিনটী আছে।··· সেই তাপে ভিম ফুটে ছানা বেরোবে...। নিত্যগোপাল ছাড়া আমার সাধ্য ছিল না যে এই সংসারে আমি চলি।.....অনাদের অন্তরে আমার সমস্ত শরীর বিষাক্ত .. নীলকণ্ঠের আশীর্বাদে সে বিষ আমার মৃত্যুর কারণ হয়নি। আমি তাঁর বাহন মাত্র—আমি তাঁকে বুকে করে রাখি...। বৈষ্ণব বা সাধক শরণাগত হলে ঐ জায়গায় যায়—যেখানে warmth, darkness, absence of stimuli।...একদিন বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেইনি বলে পিতা আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন—বেরিয়ে গিয়েছিলাম—কিন্তু সেদিন যেমন তেমনি অন্য কোন ঘটনায়ও · উত্তেজিত হইনি—কত লাঞ্ছনা পেয়েছি তবু অপমান করিনি কাউকে ...যাদের সংসারে কেউ নেই, তাদের শ্রীনিত্যগোপাল তাক দিয়েছেন।...ঐ সাইকোএনালিসিসের বইটিতে আছে যে, ঘুম অতীতের সঙ্গে যুক্ততা, ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ততা।... গুরুর সঙ্গে যোগে যে নিদ্রা তাই-ই যোগনিদ্রা।..... আজ শেষ হয়েছে আমার খেলা...। ভেবেছিলাম তোমাদের আমি পথ দেখাব, কিন্তু, কয়জন আর পথ চিনে নিলে? কিছুই তো করতে পারলাম না।··· মা, আমি আলো চাই না, আমি অন্ধকারের ভিতর ঘুমোব...নিত্যগোপাল, আমি তোমার গর্ভে ঘুমোব...। বিশ্বকল্যাণ ব্রত নিয়ে বেরিয়েছিলাম.....বাইরের অনাদরে স্থির হয়ে যাইনি সে শুধু তোমার warmth-এর মধ্যে স্থান পেয়েছিলাম বলে। নিত্যগোপাল, তোমার কোলেই যেন থাকতে পারি···তোমরা যারা এসেছ···তাবুকতা, স্বপ্ন পরিত্যাগ কর...বিশ্বের মধ্যে যে ব্যবহার চালাতে পার, সেই ব্যবহারে প্রত্যেকের সঙ্গে চল।...জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করো না।...বিশ্বকে না পেয়ে কেউ কাউকে শুধু ব্যক্তিগতভাবে পাবে না—সেখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে টক্কর লাগবেই।···বিশ্বজনীন জীবন যাপন না করে স্বামী স্ত্রীকে পাবে না, স্ত্রী স্বামীকে পাবে না, পিতা পুত্রকে পাবে না, পুত্র পিতাকে না, ভাই ভাইকে নয়, গুরু শিষ্যকে নয়, শিষ্য গুরুকে নয়।...যোগনিদ্রায় যে যতখানি নিদ্রিত, জীবনে সে ততখানি সার্থক ···আমার জীবন দিয়ে তোমাদের সমস্ত তাপ আমি হরণ করতে চেয়েছিলাম—তোমরা যদি গ্রহণ করবার জন্য উৎসুক হয়ে এগিয়ে না আস, ধারণ করবার প্রাণ-সাধনা না নেও, তাহাকে কিছুই তো দেওয়া যায় না··। তোমরা যারা আমার কাছে এসেছ, তাদের প্রত্যেকের আত্মীয় বন্ধুরা তো আর আমার কথা বোঝে না—তারা আমার উপর লাঞ্ছনা করেছে—কিন্তু কেমন করে বোঝাব যে শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-দর্শনের ব্যাপক গভীর কথা বোঝাবার জন্যই তাদের আমি নিয়েছি—কোন ক্ষুদ্র আদর্শ বা ক্ষুদ্র অভিসন্ধি নিয়ে আমি কাউকে ডাকি নি।···নিত্যগোপাল, তোমায় নিয়েই আমি চলেছি···যে অপরাধ আমি করি নি, সেই অপরাধের জন্যও মানুষ আমায় দোষী করেছে... নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল...। আমার এ চোখের জল তোমার পা ধুয়ে দিক...।

২. ৩. ৫৭...An outline of Psychoanalysis গ্রন্থকার (পৃঃ ৩২১) বলছেন·· দেহের রোগ মানসিক রোগ থেকে হয়...। অধিকাংশ রোগই মনের থেকে হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের জানবার অনেক কথা আছে ...রোগী রোগকে আঁকড়ে রাখতে চায়—ডাক্তারকে জব্দ করতে চায় ...রোগী থেকে গিয়ে মানুষের সহানুভূতি পেতে চায়···। শাস্ত্র বলে বিশ্ব থেকে আমির বিচ্ছিন্নতা রোগের কারণ। ·· মানুষের মধ্যে অন্যের কাছে নিজেকে প্রচার করবার এমন একটা প্রবণতা আছে যেটার extreme একটা রূপ হচ্ছে মন্দ কাজ করেও অপরের আলোচনার বিষয়ীভূত হতে মানুষ চায়—নিজের আমির প্রতিষ্ঠা···।

(ক্রমশঃ)

তপস্বিনী

।। শ্রীপাঞ্চজন্য ।।

ওগো, ও নামে আর ডেকো না আমায়, আমি বিষ্ণুপ্রিয়া নই, আমি—আমি গৌরাঙ্গ-প্রিয়া!—পরম প্রশান্তিতে কেঁপে উঠেছে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সুষমামণ্ডিত অধরযুগল। স্বর্গীয় আনন্দে মনপ্রাণ কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। পরম আহ্লাদে কমনীয় কিশোর-শোভিত মস্তক এলিয়ে দিয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গের সুপ্রশস্ত বক্ষদেশে। অন্তরে অন্তরে গুঞ্জরিত হয়েছে—ওগো দেবতা, তুমিতো শুধু জগন্নাথন নও, তুমি যে অফুরন্ত আনন্দের আধার। তোমার পরশে তৃপ্ত না পরিতৃপ্তি।

আনন্দঘনীর পরশে শ্রীগৌরাঙ্গেরও আজ কত না আনন্দ! আনন্দ উৎফুল্ল শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে আরও কাছে টেনে নেন। অন্তরে অন্তরে মিলন ঘটাতে চান তিনি। বলেন—তোমার মিলনে আমি পূর্ণ। তুমি বিনা আমি অপূর্ণ।

এমন পরম মুহূর্তেও মানব সমাজের করুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হয় শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে। জগন্নাথন শ্রীগৌরাঙ্গকে পাগল করে তোলে সে আর্তনাদ। সত্যভ্রষ্ট দারিদ্র্যপীড়িত মৃতপ্রায় ভারতবাসীর মুক্তির তরে শ্রীগৌরাঙ্গের কী আকুলতা! সে উদ্দেশ্যেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর আজ মিলন। তিনি আজ অনুমতি-প্রার্থী।

এতক্ষণ চাইতে পারেননি সে অনুমতি। শক্তি-রূপিণীর পরশে শক্তির জোয়ার এসেছে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে। অনুমতি চেয়েছেন এখন। আকুল কণ্ঠে বলেছেন—আমি সন্ন্যাস নেব। আমায় অনুমতি দাও, প্রিয়ে। মানব-সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখ একবার। কী করুণ তাদের অবস্থা, আমাকে যে কাঁদিয়ে তোলে ওরা!

বিনামেঘে বজ্রপাত হয়। আকুল ক্রন্দনে ভেঙে পড়েন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। আকাশ বাতাসে প্রতিধ্বনি জাগায় সে ক্রন্দন! শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দনে সমস্ত প্রকৃতিও যেন কেঁদে ওঠে। শ্রীগৌরাঙ্গও অস্থির হয়ে ওঠেন। পরশের প্রেম পূর্ণ হয়ে যায়।

পরমুহূর্তে মোহমুক্তি হয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার। শক্তিস্বরূপিনী শক্তি ফিরে পান। কান্না থেমে যায়। মুছে ফেলেন অশ্রু। দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানব সমাজের করুণ দৃশ্য ভেসে আসে চোখের সম্মুখে। মাতৃ-হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠে। বিশ্বগামী সন্তানকুলের মুক্তির উদ্দেশ্যে মনপ্রাণ তেজস্বীতায় ভরে যায়। আত্ম-সুখের কল্পনাও আসে না মনে। মানব জাতির মুক্তিসুখের মূল্য আজ অনেক বেশী। সেই মুক্তির উদ্দেশ্যে স্বামীকে অনুমতি দেন তিনি। জগৎ-কল্যাণে শ্রীগৌরাঙ্গকে উৎসর্গ করেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

মানবজাতির কল্যাণে আত্মসুখ-বঞ্চিতা এমন মহিয়সী নারীর আবির্ভাব ঘটেছিল এই বাংলাদেশের জ্ঞানপীঠ নবদ্বীপধামে। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক তমসাচ্ছন্ন অধ্যায় তখন। অধর্মের অভ্যুত্থানে ধর্ম তখন মৃতপ্রায়। ধর্ম রক্ষাকল্পে আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। তার পরেই এলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সনাতন মিশ্রের ঘর আলো করে, চৌদ্দশ পনর শকাব্দে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। জ্ঞানদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী রূপে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে জগৎ করলেন আলোকিত, কিন্তু নিজে রইলেন অন্ধকারে। গৌরাঙ্গ-জীবন নিয়ে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের এক নব জাগরণের যুগ তখন। গৌরাঙ্গ সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তার। ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গ-কীর্তন। কিন্তু শক্তিস্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া রয়ে গেলেন অন্ধকারে। সাহিত্যে হলেন তিনি উপেক্ষিতা।

এতটা উপেক্ষার মাঝেও স্বপ্রকাশিতা তিনি। কী মধুর জীবন তাঁর। বাল্যের হাস্যময়ী, করুণারূপিনী, সুমিষ্টভাষিনী বিষ্ণুপ্রিয়া কৈশোরে গৌরাঙ্গ-গৃহিণী। সেখানেও তাঁর যশোরশ্মি দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। গৌরাঙ্গ-গৃহ আলোয় আলোময়। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর কঠোর জীবনের শুরু। স্বামী-আজ্ঞা পালনে একনিষ্ঠ। শচীদেবীর পরিচর্যায় ক্লান্তিহীনা তিনি। তারপরেই শুরু হয় সন্ন্যাসিনী জীবন। গৌরাঙ্গ-আরাধনায় অতিবাহিত হয় পরবর্তী জীবন। গৌরাঙ্গ-তিরোধানে গৌরাঙ্গ ধর্মের প্রদীপ হাতে তিনি।

ভারতেতিহাসের যুগ-সন্ধি

॥ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ॥

এক

৬২১ খৃষ্টাব্দে ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা প্রস্থান এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ সন থেকেই হিজরী সালের প্রবর্তন। এ ঘটনার মাত্র নব্বই বছরের ব্যবধানে চীন সীমান্ত হতে অটলান্তিকের উপকূল অবধি এক বিরাট ঐশ্বরিক সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করেছিল। এক নব ধর্মীয় উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ আরবগণ দুর্বার বেগে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এক প্রবল বন্যার মত তারা আফ্রিকার উত্তরভাগ দলিত মথিত করে স্পেন-বিজয় সম্পন্ন করল, এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সের বুকের উপর। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর সব চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে ইসলামের অব্যাহত বিজয়াভিযান। তদানীন্তন পৃথিবীর অর্ধভাগই খোদাদের খলিফার প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ দুনিবার অভিযান প্রথম ব্যর্থ হল পইটিয়ার্সের (Poitiers) রণাঙ্গনে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে। ফরাসী বীর চার্লস মার্টেল (শার্লামেনের পিতা) ইউরোপখণ্ড থেকে বিতাড়িত করলেন আরব বাহিনীকে, ইসলামের সর্বগ্রাসী আক্রমণ থেকে চিরতরে রক্ষা পেল পাশ্চাত্ত্য জগৎ ও সভ্যতা।

ইসলামের বিজয়বাহিনী কেবল যে পশ্চিমদিকে অভিযান চালিয়েই ক্ষান্ত ছিল তা নয়, পূর্বদিকেও তাদের অগ্রগতি ছিল অব্যাহত।

ভারতবর্ষের ধনসম্পদের খ্যাতি যেমন প্রলুব্ধ করেছিল অভিযানকারীদের, তেমনি 'পৌত্তলিক' হিন্দু তথা কাফেরদের 'পবিত্র' ইসলামে দীক্ষিতকরণও সমভাবে উদ্বুদ্ধপ্রায় করে তুলেছিল এদের। এ নবোন্মাদনার প্লাবনের মুখে সব প্রতিরোধ-প্রচেষ্টাই খড়কুটোর মত ভেসে যেতে লাগল। আরব সেনাপতি মহম্মদ বিন্ কাসিম সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত করে মকরান সিন্ধু-দেশের অঞ্চলবিশেষের উপর খলিফার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। তারপর শুরু হল দিকে দিকে ক্ষমতা বিস্তারের পালা। সমকালে হল স্পেন, গুজরাট, মালব ইত্যাদি অঞ্চল। এ সকল সংঘটনের সময়ও অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ। ফরাসী বীর চার্লস মার্টেলের ন্যায় গুর্জররাজ নাগভট্টও তখনকারমত প্রতিহত করেছিলেন ইসলামের বিজয়াভিযান, পরবর্তী তিনশ' বছরকাল ভারতবর্ষ রইল মোটামুটি নিরাপদ। আরবদের সিন্ধুবিজয় সমাপ্ত হয়েছিল আরও দীর্ঘদিন পরে। কিন্তু ভারতের প্রকৃত বিপদ সে-দিক থেকে আসেনি, এসেছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। ঝড় উঠেছিল বাহুকোণে।

খৃষ্টীয় দশম শতকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ছবিটি খুব স্পষ্ট নয়।

কোন এক সময়ে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরাক্রমশালী শাহীরাজবংশ। তাঁদের রাজ্যসীমানা ছিল বহুদূর বিস্তৃত। উত্তরে সিন্ধুনদ পেরিয়ে কাশ্মীরের পাহাড়, পূবে চারিয়ে যাওয়া হক্রানদী, দক্ষিণে সিন্ধুদেশের উত্তর-ভাগ আর পশ্চিমে সোলেমান এবং আফ্‌গানিস্থানের অনেকটা জায়গা জুড়ে। শাহীদের রাজধানী ছিল বর্তমান পাতিয়ালা রাজ্যে ভাটিন্ডা নামক স্থানে। শাহীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ, মতান্তরে জাঠ। এ সময়কার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নক্সাটা ছিল দেখতে অনেকটা দাবার ছকের মতন। হর্ষবর্ধনই ভারতের শেষ স্বাধীন ও সার্বভৌম হিন্দু সম্রাট। ভারতেতিহাসের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, যখনই শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব ঘটেছে, তখনই সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়েছে স্বাধিকার প্রমত্ত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে। সপ্তম শতকের হর্ষবর্ধনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক অবধি দীর্ঘ চার-পাঁচ'শ বছরের মধ্যে ভারতে আর কোন অখণ্ড সার্বভৌম রাজশক্তির উত্থান ঘটেনি। পরাক্রমশালী রাজ্য ও রাজবংশের অভ্যু

অবশ্য ছিল না। কিন্তু তাঁরা কেউই সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব স্থায়ী করতে পারেন নি। এখানে সর্বভারত বা সাম্রাজ্য বলতে উত্তর ভারতকেই বুঝায়।

যা হোক, এ সময়কার ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির একটা মোটামুটি রূপরেখা হচ্ছে অগণিত ছোট বড় মাঝারি স্বাধীন রাজ্যের সমাবেশ। সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ ও পরস্পর বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত। রাজনৈতিক ঐক্যের একান্ত অভাব। পশ্চিমাঞ্চলে তুর্কি-প্রতিহারদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তুর্কি-প্রতিহারগণ আসলে বহিরাগত কিন্তু ক্রমক্রমে ভারতীয় ক্ষত্রিয় তথা রাজপুতে পরিণতি হয়েছে। এক সময় এঁরা হয়ে উঠেছিলেন প্রবল শক্তিধর। এঁদেরই একজন—নাগভট্ট—প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সিন্ধু-অধিকারী আরবদের রাহুগ্রাস, এবং সম্ভবত আর এক নাগভট্ট লাভ করেছিলেন কনৌজের সিংহাসন। তুর্কি প্রতিহারগণের চেষ্টাতেই দীর্ঘদিন ভারতে ইসলামের অগ্রগতি প্রতিহত হয়েছিল। উত্তর ভারতের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাংলার পালরাজবংশ। ত্রিকৌটি বা বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল রাজাদের নামও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান হয়ে আছে প্রধানতঃ তাঁদের শিল্প-প্রীতির জন্য। খাজুরাহোর নর্মর মন্দিরশ্রেণী চন্দেল রাজগণের স্থাপত্যশিল্পের পুষ্পোদ্গমকতার নিদর্শন। মালবের রাজা ভোজ, সৌরাষ্ট্রের শোলাঙ্কী বংশও এ-যুগের স্মরণীয় রাজশক্তি।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ অবধি ভারতবর্ষের হিন্দু-রাজারা একদিকে যেমন মুক্ত ছিলেন সর্বভারতীয় কোন সম্রাটের শাসন-কর্তৃত্ব হতে, আর অন্যদিকে তেমনি নিরাপদ ছিলেন কোন বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা থেকে। হুন হানাদার তোরামান ও মিহিরকুলের দুষ্কৃতকারী নাম তখন বিস্মৃতপ্রায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে হুন-দমনকারী যশোধর্মন এবং মগধরাজ বালাদিত্য নামান্তরে নরসিংহের বীরত্বকাহিনী কিংবদন্তীতে পর্যবসিত। সুদীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর কাল—খৃষ্টীয় সপ্তম শতক হতে একাদশ শতক অবধি একটানা নিরাপত্তায় সেদিনের ভারতবর্ষ যেন ভুলেই গিয়েছিল কোন প্রকার বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনার কথা। মরুময় দুর্গম সিন্ধুদেশের অকল বিদেশের উপর যোগাযোগী খলিফাদের অধিকার ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কুত্রাপিও কোন বিদেশী হানাদারের অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। পার্থিয়ান, শুঙ্গ, কুষাণ, শক, হুন প্রভৃতি যারাই পূর্বে পূর্বে এসেছিল তারাই সবাই এরি মধ্যে ভারতের বিশাল জনসমুদ্রে বেমালুম মিশে গেছে। এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগের ফলে ভারতবর্ষের মানুষ এতদূর নির্ভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, এ-দেশ কখনো আক্রান্ত হতে পারে না।

ঐতিহাসিক পানিক্করের ভাষায়:

"Eternal vigilence which is the price of freedom had weakened to a vanishing point, and the Hindus of the Seventh to the Eleventh centuries had as a result lost completly the sense of patriotism and national honour which grow up only under the stimulus of danger from outside."

আধুনিক আফ্‌গানিস্থানের পূর্বাংশে অবস্থিত হিন্দু শাহী রাজ্যের অস্তিত্বেই গজনী ছিল যতদিন খলিফাদের প্রভাবাধীন। খলিফার ক্রমক্ষীয়মান প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করলেন আলপ্তগীন এবং তৎপুত্র উচ্চাভিলাষী সবুক্তিগীন। সবুক্তিগীন গজনীর সিংহাসনে বসেই সমগ্র আফগানিস্থানের উপর তার কর্তৃত্বস্থাপনে সচেষ্ট হলেন। সুতরাং প্রতিবেশী শাহী রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। প্রথম সংঘর্ষ ঘটেছিল ৯৬৬ খৃঃ অব্দে। তার দুই বৎসর পরে শাহীরাজ জয়পাল প্রতিশোধাত্মক আক্রমণ চালালেন আমীর সবুক্তিগীনের বাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে, কিন্তু পরাভূত হলেন। বাধ্য হলেন এক অপমানজনক সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতে। সিন্ধুনদের পশ্চিমে চারটি দুর্গ হস্তচ্যুত হল, এবং অনেকগুলি যুদ্ধের হাতি ও ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর ধনরত্ন সবুক্তিগীনের হাতে তুলে দিয়ে সে যাত্রা নিস্তার পেলেন জয়পাল।

কিন্তু এ চুক্তি জয়পাল বেশীদিন মানেন নি। সোকেরা সংঘর্ষেও তাঁর হার হল। তাঁর ভারতীয় রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত চারঘার সরে গিয়ে শত্রুবাহিনী। সপ্তম আলোলাবাদ জেলাটাই তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। এত সত্ত্বেও জয়পাল নিরুদ্যম হলেন না। ভারতের এই বিষম বিপদের গুরুত্ব তিনি কালক্রমেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু যাকী ভারতবর্ষ সেদিন এ দুর্যোগের আভাস পেয়েছিল কিনা কে জানে, আর পেলেও তার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল কিনা সন্দেহ। জয়পালের আহ্বানে এবার এক সম্মিলিত ভারতীয় বাহিনী গঠিত হল। এগিয়ে এলেন আজমীরের চৌহান রাজা আর প্রতিহাররাজ রাজ্যপাল। সক্রিয় সাহায্য দিলেন চন্দেলরাজ বাজা এবং আরও অনেকে। কিন্তু ব্যর্থ হল তাঁদের এ প্রচেষ্টাও। দুবার ঘটিকায় বিপর্যস্ত হল তাঁদের বাহিনী। পুরুষপুর অর্থাৎ পেশোয়ার চলে গেল শত্রুর হাতে। ভারত সীমান্তের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির পতন বহিরাক্রমণের পথ প্রশস্ততর করে দিল। শাহী রাজারা কিন্তু নিবৃত্ত হলেন না। সংগ্রাম চালিয়েই যেতে লাগলেন। ইতোমধ্যে গজনীর রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যান্তর ঘটেছে। সবুক্তিগীনের পুত্র বিখ্যাত সুলতান মামুদ হয়েছেন গজনীর অধিপতি। মামুদের চরিত্র বিচিত্র ও বিপরীতধর্মী গুণগুণের এক অদ্ভুত সমন্বয়। তিনি একাধারে জ্ঞানগ্রাহী, সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিল্পকলার অনুরাগী, ধনলোভী লুণ্ঠনকারী, সুকৌশলী সেনানায়ক, পবিত্র ইসলামের অত্যুগ্র প্রচারবাহী, আর ঘোরতর পরধর্মবিদ্বেষী। কাফের বা পৌত্তলিক মাত্রেই তাঁর চক্ষে ঘৃণ্য, হেয় এবং নিধনযোগ্য। ভারতের ধনৈশ্বর্যের কাহিনী তাঁকে করে তুলেছিল দুর্বার প্রলুব্ধ। সতেরোবার অভিযান চালিয়ে ছিলেন তিনি ভারতের বড় বড় শহর আর তীর্থস্থানগুলির বিরুদ্ধে। যে অঞ্চল দিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী ঝড় করে গেছে সে সে অঞ্চলকেই আগুনে পুড়িয়ে একেবারে খাক্ করে দিয়েছে তারা।

শাহীরাজ জয়পাল এবার সম্মুখীন হলেন সুলতান মামুদের। আবার সেই পেশোয়ারেরই অনতিদূরে ভূমুল যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত এবং সপরিবারে বন্দী হলেন মামুদের হাতে। অপমানজনক সর্তে ছাড়া পেলেন বটে জয়পাল, কিন্তু উপর্যুপরি পরাজয়ের গ্লানি আর বহন করতে না পেরে পুত্র আনন্দপালের হাতে রাজ্যভার সঁপে দিয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দিলেন ক্ষুব্ধ, মর্মাহত জয়পাল। পিতার যোগ্যপুত্র আনন্দপাল ক্ষান্ত হন নি। সংগ্রাম চালিয়েই যেতে লাগলেন। চৌহানরাজ বিশালদেবের নেতৃত্বে আবার গঠিত হল এক বিরাট হিন্দু বাহিনী। উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কনৌজ ও দিল্লীর নৃপতিবৃন্দ এসে হাত মেলালেন। আবার সেই পেশোয়ার। মুক্ত প্রান্তরে চল্লিশ দিন ধরে দুই বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখী শিবির পেতে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। হিন্দুবাহিনীর শক্তি লক্ষ্য করে সুলতান মামুদ নিজ শিবিরের তিন দিক পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করতে বাধ্য হলেন। তারপর একদিন হিন্দুবাহিনী ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুলতানের শিবিরের উপর। দুর্দমনীয় আক্রমণের বেগে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলমান বাহিনীর হাজার চারেক সৈন্য প্রাণ হারাল। বিজয়-লক্ষ্মী যখন হিন্দুবাহিনীর করতলগত প্রায় ঠিক সে মুহূর্তেই ঘটল এক অঘটন—যেরূপ অঘটন রণক্ষেত্রেই সনাতন যুদ্ধপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হিন্দুবাহিনীর ললাটে লেপে দিয়েছে পরাজয়ের কালিমা। বৃহদাকার মন্থরগতি রণহস্তির রণক্ষেত্রেই হিন্দুবাহিনীর পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতর্কিতে একটা তীরের আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে আনন্দপাল, মতান্তরে পুত্র ব্রহ্মপালের হাতি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। তাকে আর খোঁজা গেল না। অন্যতম প্রধান সেনাপতির পলায়নে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল হিন্দুবাহিনী। অশ্বারোহী যবনসৈন্যেরা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল। ক্রমান্বয়ে দু'দিন পলায়মান হিন্দু-বাহিনীর পিছু পিছু ধাওয়া করল মামুদের অশ্বারোহী সৈন্যদল। প্রায় আট হাজার হিন্দুসৈন্যকে কোতল করে আর প্রচুর রসদসম্ভার ইত্যাদি লুঠ করে তখনকার মত নিবৃত্ত হলেন মামুদ। সংখ্যায় বৃহৎ এবং শৌর্য বীর্যে

ন্যূন না হয়েও বারবারই হিন্দুবাহিনী পরাজয় বরণ করেছে তুর্ক-আফগান আক্রমণকারীর হাতে। সম্মিলিত হিন্দু-বাহিনীর দুর্বল, শিথিল-সংগঠন ও স্বয়ং স্বাধীন রাজন্যবর্গের ঐক্যহীন নেতৃত্ব সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বাধীন মুসলমানবাহিনীর কাছে হিন্দুদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। আরও কারণ হিন্দুবাহিনীর মাতাতার আমলের পুরনো যুদ্ধ-পদ্ধতি ও মন্থরগতি হস্তিবাহিনী। কেউ কেউ হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথাকেও সামরিক পরাজয়ের কারণস্বরূপ গণ্য করেন। যুদ্ধবিগ্রহেও ভিন্নজাতের জন্য ভিন্ন ইন্সেলের ব্যবস্থা থাকত। পক্ষান্তরে ধর্মোন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ, এক-জাতি, একপ্রাণ ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী মুসলমান বাহিনীর নূতন যুদ্ধপদ্ধতিই হয়েছিল তাদের জয়লাভের প্রধান কারণ। মুসলমান বাবর বলেছেন 'হিন্দুরা মরতেই জানে, যুদ্ধ করতে জানে না'। বারবার পরাজিত হলেও একথা অতি সত্য যে, শৌর্যবীর্যে, সাহসিকতায় ও দেশপ্রেমে এবং ধর্মপ্রাণতায় হিন্দুরা এতটুকু হীন ছিলেন না তাদের বিধর্মী বিজেতাদের চাইতে।

আনন্দ পাল ও হিন্দুবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে মামুদের অগ্রগতি ও অভিযান যে ব্যাহত হবে তাতে আর সন্দেহ কি! ভীমনগর বা কাংগড়া দুর্গ এবং দুর্গস্থিত মন্দিরের বহুদিনের সঞ্চিত অতুল ধনরাশি মামুদের হস্তগত হল। মামুদের সামরিক যোগ্যতা যতই থাকুক না কেন, আসলে তিনি ছিলেন ধনলোভী মন্দির-লুণ্ঠেরা ও বিগ্রহ-বিধ্বংসী। তাঁর লুব্ধ দৃষ্টি এবার প্রধাবিত হল ভারতের বহুদিনের সঞ্চিত ধনরত্ন-মণিমাণিক্য-সমৃদ্ধ দেবস্থানগুলির উপর—মথুরা, কনৌজ, বৃন্দাবন এবং পরিশেষে সৌরাষ্ট্রের প্রভাসতীর্থে অবস্থিত সুবিখ্যাত সোমনাথ মন্দির। ইতিহাসের পাঠ্যবইমাত্রেই এই সব লুণ্ঠনকাহিনীর অল্প-বিস্তর বিবরণ দেওয়া আছে। তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ফলকথা, মামুদের সতেরবার অভিযানে ভারতের বহু তীর্থস্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, বহু শহর ও জনপদ ছারেখারে গেল, অগণিত মানুষ প্রাণ হারাল, বহুলোক বন্দী ক্রীতদাসরূপে গজনীতে চালান গেল। অনেক পণ্ডিত, শিল্পী ও গুণীব্যক্তিও সঙ্গে গেলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী বসল গজনীতে। গজনী শহরকে নূতন ঝাপতো তথা সুদৃশ্য দালানকোঠায় সুসজ্জিত করে তুলতে লাগলেন মামুদ। যেমন হয়েছিল নেপোলিয়নের বিজয়াভিযানের ফলে প্যারী নগরীর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন। হাজার হাজার হিন্দু ধর্মান্তরিত হল। বৃন্দাবনের রাজা হরদত্ত ও তাঁর ষল হাজার অনুচর বিনাযুদ্ধে মামুদের বশ্যতা স্বীকার এবং ধর্ম ত্যাগ করলেন। কিন্তু সব চাইতে সুদূর-প্রসারী ফল হল হিন্দু শাহী বংশের বিলুপ্তি এবং মামুদের পঞ্জাব অধিকার।

এদিকে আনন্দ পালের পরাজয়ের পরেও আরও কিছুদিন শাহী বংশীয় রাজারা প্রাণপণ যুদ্ধে ছিলেন আগ্রাসী মামুদের সঙ্গে। প্রায় দু'শ বৎসর কাল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দ্বারপালের গুরুদায়িত্ব বহন করে নিয়েছিলেন এঁরা। ব্যর্থ হয়েছিল তাঁদের সব প্রচেষ্টা। এঁদের বীরত্ব ও আত্মবিসর্জনের কাহিনী আজ বিস্মৃতির অতলে অবলুপ্তপ্রায়। শাহীবংশের পতন এবং পঞ্জাব-অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বিপদ আসন্ন হয়ে এল। সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমভারতের পথ উন্মুক্ত ও অবারিত হল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আর একটি ঘটনা। সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন নির্বাধায় হয়নি। প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল মামুদকে। গজনীর ঐতিহাসিকেরা মামুদের কীর্তিকলাপের প্রশস্তি রচনা করে গেছেন বহু, কিন্তু তাঁর বিপত্তি-বিপর্যয় সম্বন্ধে বেশীর ভাগই রয়ে গেছেন নীরব। তবে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, সোমনাথ ধ্বংসের পর প্রত্যাবর্তনের সময় মামুদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন বয়ের পরমারবংশীয় বীরবর ভোজ। বাধ্য হয়েছিলেন মামুদ তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করে নির্জলা মরুভূমির মধ্য দিয়ে পালিয়ে যেতে।

এ ঘটনা সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা নীরব থাকলেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে উদয়পুরের নবাবিষ্কৃত প্রশস্তিতে যে ভোজরাজের হাতে ঘটেছিল মামুদের বিষম বিপর্যয়। কোন প্রকারে চূড়ান্ত পরাজয়ের গ্লানি হতে অব্যাহতি লাভ করে মামুদ তাঁর লুণ্ঠের মালপত্র নিয়ে

গজনী ফিরে গেলেন। একমাত্র পঞ্জাব গজনী সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়া ছিন্ন মামুদের লুণ্ঠনাভিযান ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় কোন বড় পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। ভারতের ভাগ্যাকাশের উপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল। কিন্তু চরম ভাগ্য-বিপর্যয়ের দিন তখনও অনাগত। আরও একশো ষাট বছর কাল নিরুপদ্রবেই কাটল। মামুদকে বিধাতার অমোঘ অভিশাপ বলেই মেনে নিয়েছিল ভাগ্য-নির্ভর ভারতবাসী।

ঝড় থেমে গেলে দেখা গেল সেই প্রাচীন সনাতন ভারতবর্ষ চিরঅভ্যাসবশে নিষ্ক্রিয়তায় ঝিমিয়ে পড়েছে। কবি ম্যাথু আর্ণল্ডের ভাষায় :

'The East bowed low before the blast
In patient deep disdain,
She let the legion's thunder pass
And plunged in thought again.'

মামুদ চলে যাওয়ার পর বহুদিন আর বড় রকমের কোন রাজনৈতিক ওলট-পালট ঘটেনি। প্রায় ১৫০/১৬০ বৎসর কাল পঞ্জাব গজনীর শাসনাধীন হয়ে রইল। ওদিকে সিন্ধুদেশেও আরবদের প্রতিপত্তি রইল অক্ষুণ্ণ। একহাতে কোরাণ আর অন্য হাতে তরবারী নিয়েই তুর্ক আফগান অভিযানকারী দিগ্বিজয়ে বেরুত। এর উপর পশ্চিম উপকূলের অপরিণামদর্শী হিন্দু রাজারা স্বল্প রাজ্যে অবাধে ধর্ম প্রচারের সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন আরবদের। খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চার-পাঁচ শো বছরে ভারতের পশ্চিমে এবং উত্তরে নবাগত মুসলমান আর ধর্মান্তরিত হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রচুর। এরাই দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে মহম্মদ ঘোরীর অভিযানকে স্বাগত জানাবে, আর পঞ্চম-বাহিনীরূপে সাহায্য করবে শত্রুকে।

সিন্ধুদেশ বিদেশীর করতলগত আর পঞ্চনদবিধৌত সমগ্র অঞ্চলে মুসলমান-প্রভাব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শতাব্দীর ভারতের সঙ্কট ক্রমশই ঘনীভূত হয়ে এল। ভারতের হিন্দু নৃপতিগণ এই ঘোর সঙ্কটেও হয়ে রইলেন আত্ম-কলহে নিমগ্ন। তদানীন্তন ভারতের দুই প্রধান শক্তি আজমীরের চৌহানরাজ রায় পিথুরা বা পৃথ্বীরাজ এবং কনৌজপতি জয়চন্দ্র। দু'জনের মধ্যে সম্প্রীতি দূরে থাক্, ছিল বিষম শত্রুতা। মুসলমান ইতিবৃত্তকারদের মতে বারাণসীর অধিপতি রাজা জয়চন্দ্রই ছিলেন তৎকালীন হিন্দু রাজাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সাগর ও আজমীরাধিপতি চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজের বীরত্বকাহিনী বর্ণিত হয়েছে সমসাময়িক কাব্য, গাথা ও কিংবদন্তীতে। পৃথ্বীরাজের রাজ্যসীমানা দিল্লী ও পঞ্জাব সীমান্ত অবধি বিস্তার লাভ করেছিল। দক্ষিণের চন্দেল্লরা পরাজিত ও প্রণমিত হয়েছিল পৃথ্বীরাজের হাতে। প্রতিদ্বন্দ্বী কনৌজরাজ জয়চন্দ্রের রূপবতী স্বয়ংবরা কন্যাকে অপহরণ করেছিলেন অনামন্ত্রিত ও অপমানিত পৃথ্বীরাজ। এমন আরও বহু কাহিনী বিবৃত হয়েছে সভাকবি চাঁদ-বরদাইয়ের গাথায়। 'চাঁদ রাইসা' কাব্য অচলিত পুরণো হিন্দীভাষায় রচিত। পরবর্তী কালে বহু কিছু প্রক্ষিপ্ত জিনিসও এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে, এবং তারই ফলে এর কলেবর হয়েছে বিশাল।

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর ১১৮৬ সনে অরণ্য ও পর্বতময় ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি মহম্মদ সিহাবুদ্দীন পাঠান্তরে মুইজুদ্দীন সদ্য নগরী গজনী অধিকার করে নেন। তারপরের চার বৎসর কাল কাফের-অধ্যুষিত হিন্দুস্থান জয় মানসে চলেছিল প্রস্তুতির পালা।

সুলতান মামুদের ন্যায় কেবল ধনসম্পদ লুণ্ঠন আর হিন্দুর দেবমন্দির ধ্বংস করাই মহম্মদ ঘোরীর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর অভিলাষ ছিল আরও কিছু জয় করে নূতন ইসলামী রাজ্য স্থাপন। ১১৯১ সনে তরাইনের প্রান্তরে মহম্মদ ঘোরীর সুশিক্ষিত ধর্মোন্মত্ত মুসলমান বাহিনী এবং পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে সম্মিলিত ভারতীয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখী হল। কনৌজরাজ জয়চাঁদ ছাড়া উত্তর ও মধ্য-ভারতের বহু রাজাই পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে মিলিত হয়েছিল দেশের এই ঘোর দুর্দিনে। পৃথ্বীরাজ ছিলেন বীর ও অসম সাহসিক কিন্তু অশান্ত, দুর্বার ও চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ। বহুধাবিভক্ত বিশাল হিন্দুবাহিনীর নেতৃত্ব করবার পক্ষে পৃথ্বীরাজের যোগ্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা একমত

নহেন। তা ছাড়া হিন্দুবাহিনীর সংগঠনে ও পরিচালনায় ছিল নানা সামরিক ত্রুটি ও দুর্বলতা। হিন্দুরা ছিল অতীত অভিজ্ঞতার শিক্ষা গ্রহণে পরাঙ্মুখ। সেই মন্থর গতি রথ-হস্তী বাহিনী, সুসংহত একনায়কত্বের অভাব ও নানা ভাষাভাষী ও নানা জাত-উপজাতে বিভক্ত হিন্দু-বাহিনীর মূল অনৈক্যই দায়ী হয়েছিল তার শোচনীয় বিপর্যয়ের জন্য।

তরাইন প্রান্তর অর্থাৎ উত্তর ভারতের পশ্চিম ভাগ—পঞ্জাব ও দিল্লীপ্রদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলেই যুগে যুগে নির্ণীত হয়েছে ভারতের রাষ্ট্রভাগ্য। পৌরাণিক কুরুক্ষেত্র হতে শুরু। তারপর তরাইন, পানিপথ হয়ে একেবারে অতি সাম্প্রতিক পাকিস্থানী যুদ্ধের অন্যতম ফ্রন্ট ইছোগেলখাল ও শিয়ালকোটের পথ জুড়েই এই অঞ্চল।

প্রথমবারের যুদ্ধে মহম্মদ সিহাবুদ্দীন ঘোরীর বাহিনী পরাজিত হল সম্মিলিত ভারতীয় বাহিনীর হাতে। ঘোরী স্বয়ং পৃথ্বীরাজের ভ্রাতার সঙ্গে অশ্বিযুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হয়ে মার্জনা চাইলেন পৃথ্বিরাজের কাছে এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আর ভারত আক্রমণ তিনি করবেন না। কিন্তু দলিত ভুজঙ্গের মত তীব্র আক্রোশ বুকে নিয়ে ঘোরী ফিরে গেলেন গজনীতে এবং পরবৎসরই প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠলেন।

আরও অধিক শক্তি সংগ্রহ করে সেই তরাইনেই আবার হাজির হলেন তিনি। ১১৯২ সন—ভারতের রাষ্ট্রভাগ্যরবি ঘন কৃষ্ণ মেঘে আবৃত হয়ে গেল আগামী সাড়ে সাতশ বৎসরের জন্য। দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে হিন্দুবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়, পৃথ্বীরাজের বন্দীত্ব এবং নিধন ইতিহাসের সুপরিচিত কাহিনী। দিল্লী ও আজমীর সহজেই ঘোরীর করায়ত্ত হল। আজমীরের রাজ্যপাট আপাততঃ পৃথ্বীরাজেরই কোন বংশধর পুত্রের হাতে অর্পণ করলেন মহম্মদ ঘোরী। দিল্লী অধিকৃত হল এবং শাসন-ভার ন্যস্ত হল পূর্ব-ক্রীতদাস কুতুবুদ্দীন আইনকের উপর।

এ ঘটনার দু'বৎসর বাদে চান্দোয়ারের যুদ্ধে মহম্মদ আক্রমণ করলেন কনৌজরাজ জয়চন্দ্রকে। যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হলেন। মীরাট থেকে বারাণসী এই বিস্তীর্ণ ও সমৃদ্ধ ভূখণ্ডও বিজেতা মুসলমানদের হাতে এসে গেল। হিন্দুস্থানের ঠিক কেন্দ্র স্থলেই মুসলমান-শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করল। ভারতের ইতিহাসে তুর্ক-আফগান-যুগের সূত্রপাতের এই হল সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

"গীতার প্রয়োজন ধরার ধূলিতে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকর্ম-লোক, পুরুষোত্তম-লোক প্রতিষ্ঠা। কর্ম্মক্ষেত্র এই মাটির বুকেই হইবে জড়-অজড় দ্বন্দ্বের চরম অবসান। কর্ম্মের বুকে নৈষ্কর্ম্মের আস্বাদনই গীতার কর্ম্মযোগ।"—

গীতা, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

পারিবারিক জীবন-আলোচনা

॥ ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আর এক দিন

[কল্পনার বসবার ঘর। সবই আগের দিনের মতো সাজানো। সবাই যাঁরা আগের দিনে মিটিংএর শেষে উপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত আছেন, শুধু কল্পনা বাচ্চাদের নিয়ে অন্য ঘরে গেছে]

১—আজ কিন্তু প্রথমেই আমাদের দ্বিতীয় ঘটনাটির সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আপনাকে বলতে হবে—তারপর আমরা আমাদের সব মতামত বলবো ; কারণ আমরা তো সেটা পড়েই নিয়েছি সবাই।

অপরাজিতা—আচ্ছা তাই হোক অশোকা। আপনার নাম তো অশোকা-ই বলেছিলেন, তাই না ? কিন্তু আমরা এখানে সবার নাম ধরেই ডাকবো—আর তুমি বলবো, কেমন ?

১৬ ও ১৭—হ্যাঁ—সেই ভালো।

অপ—তোমাদের নাম তো উষা আর উষা—তাই না ?

১৬ ও ১৭—হ্যাঁ—ঠিক মনে আছে আপনার।

অপ—আচ্ছা, এবার এই পত্রিকাটীতেই যা সমাধান দেওয়া হোয়েছে—আর তোমরা সবাই পড়েই নিয়েছ, সেটাই পড়া যাক্। 'বই পড়ে আবাবেগ (feeling) সম্বন্ধে বোঝা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। সেজন্য আমি বলি, আপনি একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। এর মানে এই নয় যে আপনি মানসিক রোগাক্রান্ত হোয়েছেন, তবে কি না নিজের আবাবেগ সম্বন্ধে কিছু বিশেষ কোরে বুঝতে হোলে এ বিষয়ে বিশেষভাবে যাঁরা পড়াশুনা কোরেছেন এবং অভিজ্ঞতা লাভ কোরেছেন তাঁদের কারো সঙ্গে কথা বলে জিনিষটা বোঝা সহজ হয়। অবশ্য আপনার স্বামীকে নিশ্চয় আপনি সব কিছুতেই বিশ্বাস করেন এবং সব বলে থাকেন। আপনার এই আবাবেগ সম্বন্ধেও তাঁকে বুঝিয়ে বোলবেন। এই রকম অবস্থা আপনার যখন হয় তখন যেমন কোরেই হোক তাঁকে প্রাণপণ চেষ্টা কোরেও জানাবেন যে আমি এরকম না কোরে পারছি না, কিসে যেন জোর কোরে আমাকে এরকম মনে করায় যে আমার কেউ নেই কেউ আমায় চায় না—এতে আমার ভয় করে। এর ফলে আপনার স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য হবার সম্ভাবনা থাকবে না। এতটা দুঃখের বা হতাশ হবার কিছু হয়নি আপনার যে এ বিষয়ে জানবার ইচ্ছা হোয়েছে সেটা তো আপনার অর্দ্ধেক জানার মতো। এবার বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিলেই সব ঠিক হবে মনে হয়।'

অশোকা—(দ্বিতীয়াকে)—শুনলে তো অপরা ? এবার বলো তোমার বক্তব্য।

অপরা—তুমিই বলনা শুনি।

অশোকা—না না, তুমিই বলো।

অ—আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই বলছি—মানে, তোমাদের বিষাদ করার দরকার নেই। সকলেই তো কিছু কি বলবে—আমি না হয় গোড়াতেই বলাম যা একটু আমার মনে হয়। আমার মতে আমাদের দেশে ও রকমটী ঠিক চলবে না। এদেশে স্বামীদের অত ধৈর্য্য বা সময় নেই তাঁদের উপর বহু লোকের দায়িত্ব রয়েছে, তাছাড়া স্ত্রী কাছে এরকম কথা তাঁরা আদৌ আশা করেন না বরং কোন স্বামী যদি এ রকম ভাবে দুঃখবোধ করে তখন তাঁর স্ত্রী-ই তাঁকে সান্ত্বনা ও সাহস দেবে বলে আশা করে থাকেন। তাঁর স্ত্রীরও যে এরকম প্রয়োজন এটা

হোতে পারে এটা তাঁদের কল্পনাতীত। সবাই তো ধরেই নিয়েছে যে মেয়েরা সব সহ্য কোরতে পারে। তারপর যদিই বা কোন অসুবিধা তারা বিশেষভাবে বোধ করেও, তখন তারা নিজেরাই বাপ মা বন্ধু প্রতিবেশী এদের কাছ থেকে বা যা হোক কোরে তার মীমাংসা নিজেরাই করে নেবে; স্বামীকে যে এসব ব্যাপারে অবহিত হোতে হবে স্ত্রীর জন্য, বা বিশেষ ব্যবস্থা কোরতে হবে এটা তাঁরা বুঝতেই পারবেন না। অন্ততঃ যতক্ষণ না এটা নিয়ে সংসারের ও সহরের আর সবাই তাঁকে উত্যক্ত কোরছে! তাঁদের ধারণা যে স্ত্রীর সুখের জন্য সব ব্যবস্থাই তো করা আছে।

অপ—হ্যাঁ ভাই আপনার নাম তো অরুণা, তাই না?

—হ্যাঁ।

অরুণা—ঠিক বোলেছ অরুণা, তাছাড়া যে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবার কথা বোলছে—তাতে স্বামী বোলবে—তোমার তাহোলে মাথা খারাপ হোয়েছে—তুমি মানছো তো? বিশেষজ্ঞরা তো জানি পাগলদেরই চিকিৎসা করেন। আমি তো তোমাকে পাগল বলে মনে করি না। ও সব নিয়ে না ভেবে কাজকর্ম কর, ভালো করে সংসারের, ছেলেপুলেদের কথা ভাবো—তাহোলেই দেখবে ওসব বাজে চিন্তা আর হবে না।

অপ—সত্যি, আমাদের দেশে শারীরিক রোগ বা অসুস্থতি যেমন লোকে বোঝে, মেনে নেয়, সহানুভূতি প্রকাশ করে, মানসিক অসুস্থতির বেলায় মোটেই তা করে না। সেটা হয় একটা হাসাহাসি, নয় ভয়ের ব্যাপার হোয়েই আছে এখনও। ধরা যাক, একজনের চর্মরোগ হোয়েছে। সে তো কত কারণেই হোতে পারে! সেজন্য কি কারণে হোল জানতে পারলে আর যাতে না হয় সে চেষ্টা করা যায়! অন্ততঃ যাতে কমে যায় রোগটা না বেড়ে গিয়ে তার ব্যবস্থা করা যায়! মানসিক বিকার বা রোগেরও কারণ থাকে; নিশ্চয় প্রথম দিকে সেটা বুঝলে আর ব্যবস্থা করলে কোনদিনই রোগটা 'বিকার' অবস্থায় যেতে পারে না। এমন একটা অসুস্থতির অবস্থা (তা সে যত তুচ্ছ বোলেই অন্যের মনে হোক না কেন) থেকে মুক্তি পাবার জন্য কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে আপত্তিই বা কি কারণ থাকতে পারে?

অরুণা—প্রথম কারণ হোচ্ছে যে খানিকটা সময় ও মনোযোগ দিতে হবে, আর সেটা দিতে হবে অন্য বিষয়ে যাতে সবটা সময় ও মনোযোগ নিবিষ্ট আছে—তার থেকে যেন 'ছিঁড়ে নিয়ে'। দ্বিতীয় কারণ হোল এই যে 'লোকে' ভাববে সত্যি 'পাগোল' হোয়েছে।

৪। হ্যাঁ, আর তৃতীয় কারণ হোচ্ছে—সাধারণতঃ এ রকম মন খারাপ তো আমাদের অনেকেরই হয়ে থাকে, আবার কারোর কাছে না গিয়েও আপনিই আমরা ঠিক হোয়েও যাই, তাই না কি? কাজেই এসব আপনিই ক'দিন পরে সেরে যাবে এ ভেবেও অনেকে আর এটা নিয়ে মাথা ঘামান না।

অপ—আপনি তো 'অতসী'—তাই না?

৪। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যে বল্লেন সবাইকে তুমি বলা হবে—তা কই হোচ্ছে না তো।

অপ—(লজ্জিতভাবে) হ্যাঁ—এবার থেকে তুমি-ই বলবো।

৫। আমি চতুর্থ কারণটা বলতে পারি—সেটা হোচ্ছে এই যে, যদি বিশেষজ্ঞ দেখে শুনে বলেন যে স্বামীর (বা তাঁর সংসারের আর কারোর) দোষেই এটা হোয়েছে। সংসারে কেউই তো অন্য কারো খারাপ কোরেছে এ দোষ নিতে রাজী নয়—সেটাই তাদের ভয়ের এবং আপত্তির কারণ হোতে পারে।

অপ—তোমার নাম তো অলকা, কেমন?

৫। হ্যাঁ।

৬। কিন্তু দেখুন, দোষ যদি থাকেই তবে সেটা তো তখনি নিলেই সমস্যা মিটে যায় আর সংসারের সকলেরই মঙ্গল হয়।

অপ—তোমার নামটী ভাই বড়ই করুণ—অঙ্ক, না?

৬। হ্যাঁ, আমার নাম অঙ্ক, তোমার ঠিকই মনে আছে।

৭। আমার মনে হয় আমরা, মানে এ দেশে স্ত্রীরা স্বভাবতঃই ঐ কেসটীর যে রকম মনোভাবের কথা

লিখেছে, সে রকম মনোভাবাপন্ন। সত্যি বল তোমরা, আমরা সবাই কি ভাবি যে আমাদের নিজেদের একটা দাম আছে সংসারের সকলের কাছে! স্বামীকে যদি একবার এ রকম অযুক্তির কথা বলি, আর তিনি ভালো করে না শোনেন, অন্যমনস্ক থাকেন বা 'ও কিছু নয়' বলেন, তবে যেন আমরাও আমাদের নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাই, ঠিক যেমন ওখানে লেখা হোয়েছে; আমরা কি বার বার সেটা বলতে পারি স্বামীকে? হয়তো পাঁচ সাতবার শুনলে তিনিও এর গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু আমরা দু'একবার বলেই ধরে নিই যে উনি গ্রাহ্য করেন না যখন, যা হয় হবে, সারবার কী আর বলবো', আর সত্যেও তো শুনবেনই না। আমরা ধরেই নিই যে কোনদিনই তিনি এর কিছুই গুরুত্ব দেবেন না।

অপ—কথাটা ঠিকই বোলেছ 'আশা' তুমি।

৮—তাছাড়া স্বামী পাছে 'মাথা খারাপ' হোয়েছে ভাবেন, সেজন্যও অনেক স্ত্রী-ই ওঁকে বলতে চাইতে না পারেন। ক'জন স্ত্রী-ই বা স্বামীকে ঠিকমতো ওঁর শুভাকাঙ্ক্ষী বলে ভাবতে পারেন বলো!

অপ—কথাটা যদি সত্যি হয় তবে বড়ই দুঃখের কথা 'আলো'।

৯—আরে ভাই, আমাদের দেশের কথা আর বোলোনা; এমন সংসারও আমি দেখানে সংসারের আর সবাই তো বটেই, স্বামী পর্যন্ত স্ত্রীকে কষ্ট দিয়েই আনন্দ পান; স্ত্রী মারা গেলে বা পাগল হোলেও ওঁদের কোন দুঃখ তো নেই-ই, বরং নতুন 'প্রাপ্তিযোগে'র সম্ভাবনায় তৃপ্তিবোধ-ই করে থাকেন!

অপ—এতো আরোই দুঃখের কথা ভাই 'আত্মা'! বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না যে!

আত্মা—আমি তোমাকে সব নজীর দিতে পারি—দেখাতেও পারি।

১০—যাই বল তোমরা, এখানে এসব পরামর্শ চাইবার মতো বিশেষজ্ঞ-ই বা ক'জন আছে? আর কয়টি মেয়েই বা জানে যে এসব পরামর্শ চাওয়া দরকার এরকম হোলে? জীবনে কত যে অযুক্তি আমাদের মেনেমনে রাখতে হয় তার তো ঠিক ঠিকানা-ই নেই? তার প্রত্যেকটা যখন নতুন আসে তখনই যদি প্রত্যেক বার বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হোত তবে আর সংসার কারোরই চলতো না।

অপ—কোন দেশেই তাই বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বেশী নেই 'আত্মা' যে একটু অযুক্তি হোলেই পরামর্শ নেওয়া সহজ হয়। অনেক দুঃখ অসুবিধা নিয়েই আমাদের মতো সব দেশেরই মেয়েদের চলতে হয়, তবে দুঃখ অসুবিধা সহ্য করার শক্তিরও একটা সীমা আছে, আর সকলের সহ্য শক্তি সমান নয়। সেই সীমার বাইরে গেলে যা ক্ষতির সম্ভাবনা সেটা বন্ধ রাখার জন্যই এসব চেষ্টা। এই যে একজনকে মুখ ফুটে সব বলতে পারা বা অন্তরভাবে জানানো, তারও একটা দাম আছে। কারো কাছ থেকে শোনা যে কিছু ভয়ের কারণ নেই এটাও অনেকখানি সহ্যশক্তি বাড়াতে পারে যদিও সেরকম বাড়ারও সীমা আছে নিশ্চয়! সেই জন্যই বিশেষজ্ঞের কথা বলা হোচ্ছে কারণ তিনি সেসব বুঝেই ভরসা দেবেন অথবা ব্যবস্থা করে দেবেন।

১১—আচ্ছা যদি বিশেষজ্ঞ না-ই পাওয়া যায়, মানে যদি ঠিকমতো প্রতিকারের ব্যবস্থা না হয় তবে শুধু-শুধু মুখ ফুটে বলে আর কি লাভ আছে? তাতে নিজের ক্ষতিই করা হয় না কি নিজের দুর্বলতার কথা অন্যকে জানিয়ে?

অপ—যে লোক এরকম দুর্বলতার অপব্যবহার করবে তেমন লোককে কেন বলা হবে 'ইন্সিরা'? যাদের সত্যি শুভাকাঙ্ক্ষী বলে জানা আছে তাদেরই তো বলতে হবে! আর তাতে কতকটা ভালো ফল হবারও আশা থাকবে। ধর যেন একহাঁড়ি ভাত রান্না করেছো। তাতে কি কি দরকার হোচ্ছে? প্রথমত হাঁড়ির মাপ অনুযায়ী তাতে চাল দিয়েছ আর সেই মতো জলও দিয়েছ তারপর আগুনের জ্বালটা এমন করে রাখতে হোয়েছে যে জল ফুটে ফুটে উথলে না পড়ে যায়। তারপর যদি ঢাকা দিয়ে থাক, তবে তো জ্বালটা আরও কমিয়ে রেখেছো—নয় কি? এখন ধরো তাতেও অল্প আ উথলাচ্ছে, ভাত পড়ো পড়ো, তখন তুমি কি কোরবে?

ইন্দিরা—কেন, ঢাকাটা খুলে দেব, তাতে তাড়াতাড়ি ফুটবে আর, কিন্তু উথলিয়ে পড়বে না।

অপ—আমাদের এসব ব্যাপারেও তাই, ঘরে যেমন লঘুশক্তি সে তখনিই সংসারের সুখদুঃখের আগুনে উত্তপ্ত হোলেও তার সব কর্ত্তব্য পালন করে যেতে পারে—তারই মধ্যে বড় হয়, বুড়োও হয়। কিন্তু ততক্ষণই নির্ব্বাক থাকা চলে যতক্ষণ অসহ্য কিছু না হয়। অসহ্য হোলে অর্থাৎ উত্তাপ বেশী হোলেই উথলাতে হবে, তখন ঐ ঢাকনাটার মতোই আমাদের চক্ষুলজ্জাটা সরিয়ে মুখ ফুটে যে কষ্টের কথাটা জানাব তাতে ঐ ভাতের ঢাকনাটা খুলে দেবার মতই কাজটি হবে।

১২—কেন, ঢাকনা না সরিয়ে জ্বালটাও তো কমিয়ে দেওয়া যায়।

অপ—ঠিক বলেছ 'ইরা'। মানে অসহ্য হবার কারণগুলি সরাতে পারলে তো খুবই ভালো, তবে সেটা সংসারে ততটা সহজ হয় না। সবচেয়ে ভালো হয় এ দুটী ব্যবস্থারই যোগাযোগ করতে পারলে কারণ তাতে সংসারের উত্তাপও কিছুটা কমে, চক্ষুলজ্জাটাও খানিকটা রাখা চলে।

১৩—উথলিয়ে পড়ে যাওয়াটা বোধহয় পাগল হোয়ে যাবার সঙ্গে তুলনা করছো?

অপ—ঠিক তা নয়, তবে নষ্ট হওয়াটা তো বটেই। এই মন খারাপ হবার ফলে মেয়েটীর কাজকর্ম্ম ভালো হওয়া তো সম্ভব নয়ই, যতটা না করলে নয়—ততটাও হয়তো সম্ভব হোচ্ছে না। তাছাড়া মানুষের সময়, শক্তি, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুরই তো দাম আছে! অন্যায় ও অনর্থক অপচয় কেন কোরব বল 'ইরা'।

১৪—এমন তো কতই আমাদের দেশে মেয়েদের অনর্থক অপচয় হোচ্ছে। সংসারেরও কত ক্ষতি হোচ্ছে—ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎও নষ্ট হোচ্ছে।

১৫—দেখো ভাই ইন্দু, সেই কিন্তু একই কথা। আমরা নিজেরাও আমাদের ঠিক দাম দিই না।

১৮—বেশী কোরে দাম দিতে গেলে আবার "স্বার্থপরতা"র নিন্দা কাঁধে কোরে বেড়াতে হবে, তাতেও বুঝি আছে ইন্দু।

অপ—সে তো ঠিকই 'এরা'—কোন কিছুরই বেশী বাড়াবাড়ি চলে না। সবই ঠিক মাপসই হওয়া চাই। ঠিক যেন পোলাও রাঁধছি আমরা—জল, চাল, আঁচ, ঘন ঘি সবই ঠিকমতো পরিমাণে ও ঠিক ঠিক সময়ে দিতে হবে—তবেই জিনিষটা সুখরোচক হবে সকলের। মানে সবই ঠিকমতো বিচার করে করতে হবে।

অরুণা—বেশ শক্ত কিন্তু এই বিচার করে চলাটা। পোলাও রাঁধার চেয়ে ঢের বেশী শক্ত।

অশোকা—আমার মনে হয় অভ্যাসের ফল ওটা, যে কেউ তোমার মত অত ভালো পোলাও রাঁধতে পারবে না।

অরুণা—আর তুমি যেমন রসোগোল্লাটা তৈরী কর—আমরা কেউ-ই কিছুতেই আর ওরকমটি পারলাম না। আজ মনে হচ্ছে কিছু যেন তৈরী করে এনেছ এখানে?

অশোকা—হ্যাঁ, সবাই মিলে চা-এর সঙ্গে খাবো।

অরুণা—তাই অপরাজিতা, তোমার ঐ রান্নার উপমাটা আমাদের জীবনের সঙ্গে আরও একটু বিশদ কোরে মিলিয়ে মিশিয়ে বলো।

অলকা—তাই ভালো; বেশ মজার ব্যাপারটা, না? আমরা ঠিক এমন ভাবে তো দেখিনা জিনিষটাকে? অথচ জীবন যাপনও করছি আর রান্না বাড়াও তো করে যাচ্ছি সারাজীবন।

অতসী—সময় কই ভাই আমাদের এসব ভাববার?

অপ—সময় কোরে নিতে হয়। অর্থাৎ এতো বেশী কাজের লোক না হওয়াই ভালো যাতে কোরে কী যে করছি, তাতে উপকার না অপকার হোচ্ছে বুঝে বা ভেবে দেখারও সময় ও শক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। কোনমতে যেন প্রাণে বেঁচে আছি। এতে বাঁচাও যায় না বেশীদিন। অথচ পরিমিত ও পর্য্যাপ্ত কাজ কোরে গেলে কাজও অনেক ভালো হয় আর অনেক বেশীদিন পর্য্যন্ত কাজ করা যায়, তাতে দেখা যাবে যে শেষ পর্য্যন্ত এভাবেই বেশী পরিমাণে কাজ করা যায় জীবনে।

অঞ্জু—তবেই হোয়েছে, এবেই তো সংসারের কাজ আর বাকেলা কিছুতেই যাবোক কোরেও চুকিয়ে উঠতে

পারি না, তারপর আমার কিছুতে ভালো হোচ্ছে বা মন্দ হোচ্ছে কিনা ভাবতে বসাটা যেন বোকার উপর শাকের আটি হয়ে পড়বে! তার চেয়ে কোনমতে 'দিনগত পাপ-ক্ষয়' করে যেতে পারলেই বাঁচি আমরা।

এষা—তাছাড়া মন্দ হোচ্ছে বুঝেই বা 'আমরা' তার কী প্রতিকার করতে পারি? কীসে ভালো হবে বুঝলেই কি সেটা সব সময় করা যায় নাকি? কত সময় যে এরকম করতে চাই, আর আর এরকম করতে বাধ্য হই তার আর শেষ নেই। কি বলো তোমরা?

অপ—আমি বলি, তোমরা দু'জনে দুটী চমৎকার প্রশ্ন তুলেছ; এবিষয়ে আমার যা বক্তব্য বলি। প্রথম, সময় কোরে নেবার কথা ও দ্বিতীয়টি হোল বুঝেও তো যা করা দরকার তা করা সহজ নয়। প্রথমে সময় করে নেবার কথাই বলি। দেখো, ২৪ ঘণ্টা সময় যে একটী কোরে দিনে দেওয়া আছে সেটা আমাদের জন্য ভগবানের মস্তো বড় দান! দেখো, কেউ এ সম্পদটি সহজে কেড়ে নিতে পারে না এমন কি ধার নেওয়া দেওয়াও সহজ নয়! প্রতিদিন ভোরে উঠে আমরা জানিই যে আজ ২৪ ঘণ্টা আমার জন্য খরচ করার আছে! এক সপ্তাহ বা একমাস চাকরী করলে মাইনে পাই যেমন আমরা এবং যাতে সংসারের সব প্রয়োজন মিটানো যায় তার ব্যবস্থা করি—আর যে যত খোঁজখবর নিয়ে ভেবে চিন্তে প্ল্যান করে খরচ কর্ত্তে পারে সে একই আয়ের মধ্যে তত বেশী ভালো থাকতে পারে—ঠিক তেমনি আমাদের প্রতিদিনের পাওয়া ২৪টী ঘণ্টা যদি আমরা ঠিকভাবে প্ল্যান করে খরচ কোর্ত্তে পারি তবে নিতান্ত আবশ্যকীয় কাজগুলোর জন্য নিশ্চয় সময় কর্ত্তে পারবো। এর সঙ্গে দু'টী ইংরাজী কথা মনে পড়ছে যার মানে হোচ্ছে "নষ্ট কোরো না অভাবেও পড়ো না" (Waste not Want not), আর "তাড়াহুড়া করারও দরকার নেই আর বসে বসে আরাম করারও দরকার নেই" (No hurry no leisure)

অপ্র—কেমন কোরে প্ল্যান করি বলো তো? সারাক্ষণ তো ব্যস্ত রয়েছি. রাতে যখন ঘুমতে যাই তখন আর ভাববার মতো কিছুই মাথায় থাকেই না।

অপ—আমারও তাই হোত। তারপর একদিন অসুখ হোয়ে পড়লাম, বিছানা নিতে হোল। তখন শুয়ে শুয়ে এক সময় মনে হোল কোন্ কাজগুলি কমানো যায়—কারণ একেবারেই কিছু না কোরতে পারার চেয়ে দু'চারটী বাদ দিয়ে বাকীগুলো করতে পারলে কিছুটা কাজ তো হয়? ভেবে দেখতে চেষ্টা কোরলাম—কোন্ কাজটী আমার সব চেয়ে আগে করা, সব চেয়ে বেশী করে করা দরকার, এবং তারপর কোনটী এবং তারপরই বা কোনটী। এমনি কোরে কাজের 'জরুরী' হিসাবে একটী লিষ্ট (Priority list) কোরে ফেল্লাম।

খনা—সব চেয়ে জরুরী কোন্‌টী কি কোরে ঠিক কোরলে?

অপ—আমি সংসারের কথা দিয়েই বলছি,—যেমন টাকা খরচ করার একটী বাজেট করে নিলে ভালো হয়—খাবার জন্য এতো, ঘর ভাড়া এতো, ছেলেদের পড়ার জন্য এতো—ইত্যাদি, এমনি কোরে লিখতে লিখতে শেষের দিকে সিনেমা দেখা বা একটু চেয়ে যাওয়া—এগুলির জন্য কিছু জমানো—এসবও থাকে—

খনা—কিন্তু যদি কারো আগে অসুখ করে তার হয়তো চিকিৎসা ও চেয়ে যাওয়াটাই তখন সব চেয়ে জরুরী হোয়ে পড়তে পারে এবং নিজের একেবারে উপর দিকে রাখতে হতে পারে।

অপ—নিশ্চয়! তার অসুখ তো একটা অসাধারণ অবস্থাই হোল। এজন্যও বাজেটে কিছু ধরা হওয়া দরকারই তো; তাছাড়া জীবন-বীমার কথাও তো রয়েছে! তবে সাধারণতঃ সংসারের প্রতিদিনের প্রয়োজন বুঝে একটী প্ল্যান করেই বাজেট ধরা হয়। যাই হোক্—সময়ের কথাই তো বলছিলাম—সময় জিনিষটা টাকার চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান। টাকা ধার পাওয়া যায় এবং এক চাকরী ছেড়ে অন্য চাকরী নিয়ে বা উপরি খেটেও দু'পয়সা আয় বাড়ানো যায়। কিন্তু ভাই, দিনে যে ২৪টী ঘণ্টা আছে, তাতো আর বাড়ানো যায় না কিছুতেই। কাজেই টাকার সদ্ব্যবহার তো নিশ্চয়

দরকার; সময়ের সদ্ব্যবহার আরও বেশী দরকার। তাই সময়েরও একটা বাজেট করে নিতে হয়।

[কল্পনার প্রবেশ] ক। এযাকে—তোমার ছেলেটী তো কিছুতেই থাকছে না—একটীবার আসবে? অঞ্জ, তুমিও এস, কেমন?

এবা—যেতেই হবে—কী আর করবো?

অঞ্জ—চল যাচ্ছি।

[ঐ তিনজনের প্রস্থান]

ইন্দু—আপনাদের এই ব্যবস্থাটী বড় ভালো, এই যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা যায়, আর তারাও খেলাধূলার মধ্যে আনন্দেই থাকে, তারাও জানে 'মা' কাছেই আছে—মায়েদের মনটাও শান্ত থাকে। আমাদের হাসপাতালেও যদি এমন ব্যবস্থা থাকতো, খুব ভালো হোত। আমার মেয়ের অসুখ, হাসপাতালে রয়েছে, কিন্তু ছোট ছেলেটীকে নিয়ে তার কাছে যাওয়াও মুস্কিল। অথচ তাকে কোথায় কার কাছেই বা রেখে যাবো—এতে আমার যাওয়াই হোচ্ছে না মেয়েটাকে দেখতে। কী যে করি!

অপ—কল্পনা'কে বলে দেখ্‌তে পারো। ও হয়তো কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতেও পারে।

গায়ত্রী—আমরা এ পাড়ার মেয়েদের জন্ত একটী ছোট এমনই জায়গা ঠিক করতে চাইছিলাম যেখানে মায়েরাই পালা করে কাজ কোরবেন এবং খরচ বেশী হবে না চালাতে।

ইন্দু—তাই নাকি? তবে তো খুব ভালো হয়, আমি তো এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁদের 'পরিবার-পরিকল্পনা' ও 'মাতৃমঙ্গল শিশু-কল্যাণ কেন্দ্রে'ও যেতে পারেন না—ঠিক এই একই অসুবিধার জন্ত।

অপ—তবে তোমরাও তো এদের মতো নিজেদের পাড়ার মধ্যে কোথাও এমন একটী জায়গা ঠিক করতে পারো—আর কয়েকটী বাচ্চাদের মায়েদের নিয়েই কাজ আরম্ভ কোরতে পারো যেখানে মায়েরাই একে অন্তদের বাচ্চার দেখাশোনার ভার কিছুক্ষণের জন্ত নিতে পারে—তাতে বাচ্চারাও চেনা জানা লোকের কাছে আনন্দেই থাকতে পারে আর মায়েরাও নিশ্চিন্ত মনে বাইরের দরকারী কাজগুলো সেরে ফেলতে পারে। কারো বাড়ীর দু'টী ঘর কিছুক্ষণের জন্ত পাওয়া গেলেই ভালো হয়।

ছবি—আচ্ছা—দুটী প্রশ্নের একটী অর্থাৎ সময় করে নেওয়ার সম্বন্ধে তো অনেক কথা হোল, কিন্তু আর একটী প্রশ্ন যে, বুঝে, জেনেও যে সেই মতো করে ওঠা যায় না—তার কি হোল?

অপ—তাই তো ভাব্‌ছি, প্রশ্নটী তো ছিলো এবার, তাকে তো ধরে নিয়ে গেলো তার ছেলের কাছে, যদি এখন আলোচনাটী না করে পরের দিনে করি তবে কেমন হয়?

জয়া—এখন তবে কি করা হবে?

চপলা—আজ যে রসগোল্লা এনেছে 'অশোকাদি'—ওটারই সদ্ব্যবহার করা যাক্ না সবাই মিলে চা সহযোগে—সময়ও তো হয়ে গেলো।

[সকলেরই খুসীভাব ও হাসি দেখা গেলো]

অপ—মনে হোচ্ছে এতে সবারই মত রয়েছে। তবে বাচ্চাদেরও ডাকো; অঞ্জ, এবা কল্পনা-ও আসুক।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৭৩)

জগন্নাথ নিত্যগোপাল আমার, জগৎ তোমাকে যাচ্ঞা করে; তুমিও জগৎকে যাচ্ঞা কর; কেননা জগৎ ছাড়া কে তোমার চরম প্রতিষ্ঠা দিবে? তুমি আমার প্রাণনাথ, জগন্নাথ। তোমাকে বুকে করিয়া চলিয়াছি একা, একেবারে একা। তোমার ভাব, তোমার জীবন-কথা দ্বারা কাহাকেও উদ্বুদ্ধ করিতে পারি নাই। তোমার মঠে প্রতিষ্ঠা ব্যাপার লইয়া যে ঝগড়া, ইহার মধ্যে কি করিয়া কাজ করিব? এমন শক্তি, এমন যোগ্যতা, এমন সুযোগ তো হইল না যাহা দ্বারা ইহাদিগকে মানাইতে পারি? তোমাকে কেন্দ্র করিয়া এই ঝগড়া এই বিশৃঙ্খলা আর কতদিন চলিবে? ওখানে একটা কাড়াকাড়ি চলিতেছে। কি একটা ভক্তের স্বাদ ইহারা পাইয়াছে, যাহার জন্য এই ঝগড়া অহরহ চলিতে পারিতেছে। তুমি কি একেবারে চুপ করিয়া এই সব দেখিবে? তুমি প্রকাশিত হও ইহাদের জীবনে। বায়ু বিশুদ্ধ হউক। আসন (৮০) করি। রেণু সকালের জলখাবার খাইয়া বাহির হয়, ফেরে ১২টায়। আবার খাইয়া বাহির হয়, ফেরে ৪টায়। বৃষ্টি নামার জন্য আজ আর মঠে যাওয়া হয় নাই। প্রভিডা বিরজার বাসায় যায়। বিরজার ওখান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪ খণ্ড আনে। একটা সেলাইর কল কেনার কথা বলি। উপরের কলে ইহাদের অসুবিধা প্রকাশ করিতেছে। মিনু একান্ত অনুগত থাকিলে, নিজের খেয়াল সুখ দুঃখ সব আমার কাছে নিবেদন করিলে তাহার অনেক কিছু করা এতদিনেই হয়তো হইত। অনুগত না থাকিলে কাহারও জন্য কিছু করা যায় না। আমি যখন তাঁহার সঙ্গে 'অনহং', তখনই সব কিছুর নিকটে গিয়া পড়ি। গতকল্যকার মহাভারত পাঠে কুন্তীর কথা বেশ ভাল লাগিল যাহা তিনি শ্রীকৃষ্ণের মারফত পাণ্ডবদের বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বিদুলার উপাখ্যান তিনি বলিয়াছেন। 'ধরী-বাৎসল্য' শব্দটী নূতন। তাঁহার এই 'ধরী-বাৎসল্য' পাণ্ডবদের জন্য নাই। বিদুর নিজের বাড়ীতে পাণ্ডবদের স্থান দিয়াছিলেন—ইহা কম দুঃসাহসের পরিচয় নয়। বিদুর নির্ভীক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সময় কুরু সভায় একবার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, আর একবার কুরুক্ষেত্রে, আর একবার কোথায় ঠিক মনে নাই। আশুবাবুর ম্যানেজার সন্ধ্যার পর আসেন। আশুবাবুর বিজ্ঞাপনটা দিয়া যান। সেবা ২ টাকা আমার সেবার জন্য দিয়াছে। সন্ধ্যার পর গোলাম মহম্মদের চাক পরিমলের সঙ্গে আনা লাউ, কুমড়া, চালকুমড়া, লাউশাক দিয়া যায়।

১৩ই সেপ্টেম্বর

নিত্যগোপাল, তুমি আমার মহানির্বাণ, আমার জীবন তোমার মাঝে নির্বাণ লাভ করিয়া তাহা তোমার জীবনে শিবত্বে গড়িয়া উঠুক। আমি তোমার মাঝে আমাকে খুঁজিব, খুঁজিয়া পাইব। তোমার বাহিরে যুগ যুগ ধরিয়া আমাকে খুঁজিয়াছি, পাই নাই; কত কান্না কাঁদিয়াছি। আজ বুঝিয়াছি তোমার মাঝেই আমি আছি, আমি সত্য চৈতন্য আনন্দ। তোমার বাহিরে আমি অসৎ, অচৈতন্য, নিরানন্দ। তুমিই আমার সচ্চিদানন্দ। শ্রীরাধা সচ্চিদানন্দময়ী, কৃষ্ণময়ী। আমি নিত্যগোপালময়ী হইব। তোমাকে বুকে লইয়া বিশ্বের মাঝে ছুটিয়া চলিব। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। তুমি আমার সর্ব। ৯০ বার শোয়া আসনে পা উঁচাই আর নামাই। সাময়িকী—'বিশেষ বিবাহ বিল' আজ সকালে লিখি। রেণু খাওয়ার পর বাহির হয়। ফেরে ৪টার পর। বেশ বৃষ্টি হয় যায় যায়। ৪টার পর মঠে

যাই। টিনের চালার বল্টুগুলি সব উল্টা লাগানো হইয়াছে। টিনগুলিকে আবার নামাইয়া ঠিক করিতে হইবে। হরেন মিস্ত্রী আসিয়াছিল। সে কাল তাহা করিয়া সব ঠিক করিবে। মজুরী ১০৲ টাকা। কোনও বাড়ীতে কি এইরূপ হয়? এখানে 'বহুনায়ক', সকলেই কর্তা। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ত্রুটি ধরিবার জন্য তৎপাতিয়া বসিয়া আছে। যে যাহার সুবিধা আদায় করিবার জন্য ব্যস্ত। ঠাকুর চুপচাপ সব দেখিতেছেন। প্রাণকে আঘাত করিয়া কাহারও রেহাই নাই। নিজের ফাঁদে নিজে পড়িয়াছে। ওখানে শৃঙ্খলা আসুক ইহা ওখানের কেহ চায় না। এই অবস্থায় কেমন করিয়া মঠ টিকিবে? কে ইহার সংস্কার করিবে? ৮।৷ টার পর ফিরি। আসিয়া দেখি পাণিহাটি হইতে সুশীলা এখানে আসিয়াছে। পাণিহাটির রাধারাণীর কথা এবং এখানে তাহার প্রতি……প্রভৃতির ব্যবহারের কথা শুনি। আমি অধীরের কথা বলি। অনন্ত সহ্য করিয়া আগাইয়া যাইতে পারিলে ভবিষ্যৎ মীমাংসা হইবে। কোনও অপমান গায়ে না মাখিয়া প্রাণের পথে অগ্রসর হইলে ইহারা সরিয়া যাইবে। একটা নাড়াচাড়া পড়িয়াছে, সবলেরই তাই টনক নড়িয়াছে—ইহা শুভ লক্ষণ। এতদিন তো কোন আলোচনাই ছিল না। যে যাহা করিয়াছে, তাহার কোন বিচারই হয় নাই। বিচার সুরু হইয়াছে। আলোচনা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম ভাগ) পড়া সুরু হয়।

১৯ই সেপ্টেম্বর

নিত্যগোপাল, সমপ্রাণ সখা আমার, তুমি মহাপ্রাণ, বিশ্বপ্রাণ। তোমার প্রাণ-স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া, তোমার প্রাণের মাঝে ডুবিয়া তুমি আমি সমপ্রাণ। তুমি জাগিতেছ শয়নে স্বপনে জাগরণে, জীবনে মরণে। বিশ্ব তোমার মাঝে জনম নিতেছে, ভাসিতেছে, ডুবিতেছে। তুমি সর্বশুচি প্রাণ, সর্বাত্ম, সর্বসময়। আমার প্রাণে তোমার প্রাণ সঞ্চারিত হউক, আমি প্রাণময় হইব। তোমাকে বুকে লইয়া এই বিশ্বের মাঝে তোমার আসন রচনা করিবার জন্য ঝড়ের মত ছুটিবার বল দেও, বুদ্ধি দেও, সুযোগ দেও। তোমার সম্প্রদায়, তোমার মঠ এমনভাবে বিষাক্ত যে উহার ভিতর শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলাও খুব কঠিন কাজ। রক্ষা কর, রক্ষা কর। ইহাদের সঙ্গে লইয়া কেমন করিয়া আগাইব? যে প্রাণ লইয়া তুমি আসিয়াছিলে, সেই প্রাণই ইহারা ত্যাগ করিয়াছে। আজ বুদ্ধির কোন্দল চলিতেছে ইহাদের মধ্যে। তোমার জয় কি হইবে না? আসন কবি। প্রার্থনার পর সুশীলা মঠে যায়। রেণু খাওয়ার পর বাহির হয়—২টার মধ্যে একবার আসে। আবার বাহির হয়, ৪টার পর ফেরে।…৪।৷০টার পর আমি মঠে যাই। 'স্বরী বাৎসল্য' কেমন করিয়া তারিণীবাবুকে কার্যের পক্ষে অন্তরায় জন্মাইতেছে, তাহা আলোচনা করি। পাছে ঠাকুরের শিশুরা দুঃখ পান, এই ভয়ে তাঁহাদের দুর্বলতাও তিনি প্রকারান্তরে সহ্য করিয়া যান, যাহার ফলে ঠাকুরেরই মিশনের ক্ষতি জন্মাইতেছেন। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ, অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণেরই ভক্ত ভীষ্ম। কোন্ পক্ষে যাইব? যিনি নিজ হাতে নিজ বংশ ধ্বংস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার দেবকে এই দৌর্বল্য সাজে না। মঠের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সব কিছু ঠাকুর ঠিক করিয়া দিবেনই। ওখানের অনাচার বন্ধ হইবেই।—তাঁহার আত্মীয় শ্যামসুন্দরানন্দ ও হরিশ্চরণানন্দ সম্বন্ধে অনেক কিছু রেণুর কাছে বলেন।—এর কলিকাতার বাসার বর্ণনাও করেন।—নাকি খুব বড় লোক হইয়াছেন। তারিণীবাবু কেমন করিয়া এই সংসর্গ বরদাস্ত করেন, আমি বুঝি না। রান্নার মানুষ না রাখার কথা হইতেছে; সেলাইয়ের কল কেনা একরকম ঠিক। দাম ২২৫ টাকা। পূজার পর দেখিয়া শুনিয়া কেনার কথা।…

১৩ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তোমার যে যোগ্যতা ছিল, যে সম্পদ—অর্থ বিদ্যা—তুমি রাখিয়া গিয়াছ, তাহা লইয়া আমরা বিশ্ব জয় করিতে পারিতাম। কিন্তু ভিতরকার অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে আমরা অধম হইতে অধম হইয়া পড়িয়া আছি। তোমার নাম কেহ জানে না? জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধানের জন্য কেহ তো তোমার দুয়ারে আসিল না ছুটিয়া? শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে 'সাধু সাবধান' বলিয়াছিলেন,

সেখানেই তো তোমার শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে বৈশিষ্ট্য? তিনি কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে ভীত, আর তুমি নির্ভিক। তোমার এই নির্ভিকতা ছাড়া বর্তমান মানুষের নরনারী সমস্যার সমাধান কেমন করিয়া হইবে? যে ভাবে নরনারী সংমিশ্রণ হইতেছে, তাহাতে কি করে ঘুরে দাঁড়াইবার আদর্শের কোনও স্থান আছে? ঠাকুর, তোমার স্থানে তুমি বিশ্বজয়ী রূপে দাঁড়াও। তোমাকে নমস্কার। একশবার আসন করি। খাওয়ার পর বেণু বাহির হয়, ফেরে ৫টার পর। নীলু ৫৲ টাকা মণি অর্ডার করিয়া পাঠায়। আমার ছাটের কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন আছে। দাদুর এখনও ১১ জ্বর হয়। ভাত খায়। ৫টায় আমি মঠে যাই। কিতীশবাবু ও তারিণীবাবু মধ্যগ্রাম গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর ফেরেন। Statue-র অর্ডার আর দেরী না করিয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করি। আগামী বুধবার সন্ধ্যার পর মঠের এক কার্যকরী সমিতি দ্বারা ঠিক করাইয়া নিবার জন্য সভার বিজ্ঞাপন দিতে অনুরোধ করি। ইহারা এমন শিথিল-প্রকৃতি! কেবল আলোচনা, আলোচনা! রবিবার হরিস্মরণ, তারিণী, খগেনবাবু, রমাপতি-নীলরতনবাবু এন্, সি, পালের ওখানে যাইবেন এইরূপ কথা হয়। অর্থ-আদায়ের জন্য খাতা করিবে—তাহার জন্যও নাকি 'ভাল দিন' দরকার—তারিণীবাবু বলেন। ভাল যদি তাঁর, মন্দ তবে কাহার? মায়া-ব্রহ্ম সমন্বয় মানে কি? অদ্বৈত-বৈদ্রিক সাধনায় 'ভালদিন' 'মন্দদিন' 'শুভগতি' 'কুফলতি'। ভগবান যখন কেন্দ্রে, তখন ভালোতেও তিনি, মন্দতেও তিনি। সব-কিছুতেই তাঁহারই প্রকাশ। ৯টায় ফিরি। ট্রাম পর্যন্ত রমাপতি-নীলরতনবাবু আসেন। সেবানন্দ বাহির হইলেই কিছু না কিছু সংগ্রহ করিয়া আনে শতবার্ষিকীর জন্য। বাহির হইলে সবলেই পারে। বসিয়া বসিয়া খাওয়া ও পরচর্চা করাই ওখানের—প্রকৃতির কার্য। বড় বেদনা পাই ঠাকুর। তোমার এত সম্পদ লইয়াও আমরা দীনহীন রহিলাম মানুষ হইতে পারিলাম না। তোমার সেবা করিবার মত, সকলকে কথা শুনাইবার মত শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও, সুযোগ দাও। ওখানে কে কাহার কথা শুনিবে? আজ বৈকালে বইয়ের আলমারী আসিল। দাম পড়িল ১০০৲ টাকার উপর।.....

১৮ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি মনোমোহন বেশে অযাচিত করুণায় আমার মনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলে। মনের অন্তর প্রদেশে তুমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। তুমি যে এমন সহজ ও মধুর তাহা তো কখনও ভাবি নাই। মনোসমীক্ষকদের সকল বিশ্লেষণের চরম সার্থক প্রকট করিয়া তুমি এলে। তোমার আশীর্বাদে এমন একটী আস্বাদন আমি জীবনে পাইয়াছি যাহা মনোসমীক্ষকদের কাছে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা। আমি বাস্তব সমাধান পাইয়াছি তোমার স্পর্শে। কামের গূঢ়তম অর্থ আমার জীবনে প্রকাশিত হইয়াছে তোমার প্রসাদে। আমি ধন্য। তুমিই আমার গর্ব, আমার সার্থকতা। তুমি না হইলে আমার কি মূল্য ছিল? আমার যাহা কিছু সব তুমি। ১০০ বার উঠা বসা করি। সকালে বেণু প্রুফ দেখে, খাওয়ার পর বাহির হয়। বাটা, মজুমদার কোং, রাইটার্স বিল্ডিং, সোপিকা-বস্ত্রক, এম বি সরকার প্রভৃতি স্থান হইয়া আসে। সন্ধ্যার পর খাইয়া প্রতিভাদহ মাইশোর লোপের ওখানে যায়। রাত ৯টায় ফেরে। একটা কৌড়া চোখের পাতার উপর লইয়া এই দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। হুহুম তিসা পাইয়াছে, পূজার পূর্বে আসিতে পারে পত্র দিয়াছে। মঠে যাই না। ৮টায় বি, কে, পাল আসেন, ১৲ টাকা রাখিয়া যান। সকালে বিমল ১৷৷ সের দুধ দিয়াছে। আজ পক রওয়ানা হইয়া বোলপুর যাইবে। তাহার পায়স হয়। বি, কে, পালকে তাহা দেওয়া হয়। একখানা 'নিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' দিয়া দেই। উহার মধ্যে প্রাণদর্শন, প্রাণপথ প্রাণধারা, প্রাণসাধনা আছে। প্রাণ সম্বন্ধেই প্রশ্ন পাওয়ার পর সাধনা। প্রশ্নের অন্তের মধ্যে astract ও concrete-এর সমন্বয়, sentence method কেমন করিয়া বর্তমান যুগের সাধনার প্রয়োজন, অথও হইতে খণ্ডে আসা, বৈদ্যুতের নরহরি-রাম-কৃষ্ণ এই তিন স্তরের ভিতর দিয়া মাটিকে স্পর্শ করার, কোনও মানুষের মধ্যে

সকল abstract-এর মূর্ত্ত আস্বাদন বাস্তব, একজনের পাওয়ার মাধ্যমে অপরের পাওয়া—এত বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণির সঙ্গে কোনও সংসারী মানুষ অনুসরণ করিতে পারে না। উহাদ্বারা সৃষ্টির কোনও সার্থক আস্বাদন সিদ্ধ হয় না। বিশ্বের বুক চিরিয়া অমৃতের উদ্ভব—এই ছাঁচেই এই সৃষ্টিটা গড়া। যেখানে কাম, সেখানেই অকাম। Eventই সত্য, time, space matter সবই relative। Abstract ও Concrete একই relation-এর দুইটী দৃষ্টিকোণ মাত্র, transcendental ও immanent দুই-ই দৃষ্টিকোণ, মাত্র Relation হইবে জীবন-বস্তু। প্রাণ ও প্রাণময় কোষ এক বস্তু নয়।

১৭ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমার জীবনের সকল বৃত্তির কারণ, পরম আশ্রয়। আমার সর্ববর্মের আশ্রয় তুমি, সর্ববুদ্ধির আশ্রয় তুমি, সর্ব আসক্তির আশ্রয়। তোমার চরণতলে আমার সৎ-বিদ্ধু সৎ-বিদ্ধু থাকিয়াই সার্থক, সকল ব্রহ্মরূপ। সর্ব্ব কর্ম্ম তোমার ভিতর হারাইয়া দিব্য লীলা কর্ম, জ্ঞান তোমার মাঝে হারাইয়া দিব্য জ্ঞান, সকল আসক্তি তোমার মাঝে হারাইয়া দিব্য আসক্তি, দিব্য প্রেম। এ বিশ্বের কোনও বৃত্তিই তো দুঃসিৎ নয়। তোমার সঙ্গে যাহা যুক্ত নয়, তাহা সর্বাত্মিকা নয়। তাই তাহা error of omission দোষে দুষ্ট। কামই তো জীবনের dynamism। উহা না থাকিলে তো অগ্রগমনই বন্ধ হইত। তোমার চরণ-তলে কাম অকাম, সর্ব্বকাম, মোক্ষকাম, কৃষ্ণকাম। আমার জীবন রূপান্তরিত হইয়া তোমার হউক। ১০০ বার আসন করি। ১০টা মত নারায়ণপুর হইতে গোবিন্দ, তাহার স্ত্রী ও কন্যাদ্বয় আসে।...৫টার পর রেণু প্রেসে যায়। আর কোথাও যায় নাই। কোঁড়াটার জন্য অসুস্থ। ৪৷৷০ টার পর উঠে যাই। আলমারীতে বইগুলি সকালে সাজানো হয়। নগেনবাবুর statue-তে আপত্তি আছে। রমাপতিবাবু প্রশ্ন করেন, বৃন্দাবন হইতে কেন মথুরায় বা দ্বারকায় গেলেন শ্রীকৃষ্ণ? বৃন্দাবনে যে একটী পোষণময় ideal village স্থাপন করিয়াছিলেন—পিতামাতা, সখাসাথী, পশুপক্ষী, ব্রজগোপীদের লইয়া তাহাকে বিশ্বের বুকে translate into action করিতে। বৃন্দাবনকে বুকে লইয়াই মথুরার যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। শোষণকে শোষণ করিয়া শোষণকে স্থাপন করার জন্যই তাঁহার রাজনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি। তিনি ব্রহ্মাদির দর্প চূর্ণ করেন, ব্রজে শোষণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মথুরা দ্বারকার পিছনে রহিয়াছে ভিত্তি হিসাবে ব্রজলীলা। 'মামেকং শরণং ব্রজ' -এর দৃষ্টান্ত ব্রজধাম। নিজেও সেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিশ্বের বুকে যাবতীয় লীলা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, 'দেহি মে পদপল্লবমুদারম্'-এর মূর্ত্তিমান উদাহরণ সর্ব্বক্ষেত্রে। ভাগবত ধর্ম রাজবিদ্যা, রাজাদের শাসনের জন্য ধর্ম। নিমিরাজার সভায় ভাগবত ধর্ম্মের প্রসঙ্গ বলি। ৮৷৷০ টায় পর আসি। আনন্দবাজারে আজ রাধাষ্টমীর সভায় বিবরণ বাহির হয়। যুগান্তরে বাহির হইয়াছে সোমবার। জয়দেব রায় ও মাখনবাবু আসে। মজুমদার কোম্পানীর মালিক 'উজ্জ্বলভারত' পড়িয়া খুশী হইয়াছে বলিয়া হাফ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন দিয়াছে। কাল সে বিজ্ঞাপন আনে। চারু আসে। এক ঠিকা ঝি ঠিক করা হয়। কাল সকাল হইতে আসিবে। অনিল সেন মিঠুকে রেখে ১১৷৷০ টায় পর। সপ্তাহে ৪৲ টাকা মত ওষুধ লাগিবে। কাল ওষুধ দিবে।

১৮ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, জীবনের সকল সম্বন্ধ দিয়া তোমাকে জড়াইয়া রহিব, সকল আসক্তি দিয়া সকল টান দিয়া তোমার সঙ্গে যুক্ত থাকিব। আমার পিতামাতা স্ত্রীপুত্র ধনজন বল ভরসা সকল তুমি। সবাই যখন দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, তখন তুমিই সঙ্গে সঙ্গে আছ। কিন্তু তুমি তো একাকী পথ কাটিয়া চলিয়াছ। তোমার সর্ব্বসম্বন্ধের ভস্ম নিয়া একাকী আসিয়াছিলে, একাকী চলিয়া গেলে। কেউ তোমার সঙ্গে নাই। তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিব এই লালসা ছিল। তোমার একাকী জীবনে দ্বিতীয় হইব—এক দুইয়ে মিলিয়া আবার এক হইব—ইহাই আমার সারা জীবনের ধ্যান। বন্ধু, প্রেম-বন্ধনে তুমি আমি বদ্ধ। বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ! আসন করি ১০০।...মন্দিরের

বারান্দায় জলচৌকি দেওয়া হইয়াছে, আসন দেওয়া হয় নাই। ওরা বলে,…মন্দিরে চৌকি দেওয়া অনেকের অমত। অনেক তর্কবিতর্কের পর আসন দেওয়া হইল। নরেনবাবু বলেন বেণুকে, 'কোন জিনিষ স্পর্শ করিবার order নাই, এত শুচিবাই'। এই তো মঠের অবস্থা। কোনও কিছু হবার যো নাই। পূর্ণেন্দুবাবু ভাগবতধর্ম্ম পাঠ করেন। বর্ণাশ্রম হইতে ভাগবত ধর্ম্মের পার্থক্য কোথায় সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। 'যে যই ভগবতা-প্রোক্তা', যান্ আস্থতা ইত্যাদির কোন ব্যাখ্যা হয় নাই। আত্মসমর্পণের ব্যাখ্যা হয় নাই। ইহাই কলিকাতা'র চলে। ভাগবত ধর্ম্ম বিপ্লবের ধর্ম্ম, mass religion—ইহা কি মানুষকে বুঝাইবে না? সকালে…জি, পালের ওখানে গিয়াছিলেন। সাত হাজার টাকায় দুইটী statue-র কথা এরূপ ঠিক হয়। আগামী সভায় মঠের এক্জিকিউটিভের সভায় উহা পাকা হইবে। ঠাকুর, আমাকে পথ দেও, শক্তি দেও ঝাঁপাইয়া পড়িবার মত। এখানের সকলে মিলিয়া কি মঠকে ডুবাইবে? বড় ভয় করে। তুমি আছ প্রত্যক্ষ। যাহা হয় কর। প্রায় সব লোকেই কি এখানে অভিসন্ধি লইয়া আসে? কে তোমার দর্শন ও জীবনের খোঁজ রাখে? কে বুঝিতে চায়? শ্রীনিতাগোপালে কার কি প্রয়োজন? থাকার জায়গা আছে, খাবার মিলে, জগড়া কোন্দলের রস আছে। বেশ আছে। ঠাকুর জাগো।

১৯শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তোমার সত্যমূর্ত্তি, বিশ্বরূপ পাইবার পথে কিরূপ বাধা তোমার মঠ হইতে তোমার সম্প্রদায় হইতে পাইতেছি, তুমি তাহা দেখিতেছ। তোমার মঠে একটু পাঠও নিরাপদে করার যো নাই। তুমি কাহাদের মধ্যে আছ? কত বড় একা তুমি? তোমার তো কেউ নাই। প্রাণ ঢালিয়া কাজ করিতে আমি চাহিয়াছি। কি করিব ঠাকুর, তুমি বল। কে তোমার দর্শন, তোমার জীবন-কথা শুনাইবে? আমাকে এমন যোগ্যতা দিলে না যাহাতে ইহাদের মধ্যে থাকিয়া, ইহাদের সঙ্গে নিয়া কাজ করা যায়। মঠ তো ভাঙ্গিয়া চৌচির। কাহারও সঙ্গে তো কাহারও মিল নাই। ওগো প্রাণ, বিশ্বপ্রাণ, তুমি জাগো। বেণু বাহির হয়—এম বি সরকার, কোলের ব্লক আনে; এ মুখার্জী, কাজল কালিতে বিজ্ঞাপনের প্রুফ দেখাইতে যায়। ফেরে আমার মঠে যাইবার পর। কোঠাটা আজ ভাঙ্গিবার মত হইয়াছে।…মন্দিরে পাঠ না হওয়ার জন্য বিশেষভাবে বলি। সন্ধ্যার পর যোগেন মহারাজের সঙ্গে বেশ তর্ক হয়। টাকা হাতে না আসিলে তিনি কিছুর চালায় কিছু করিতে প্রস্তুত নন। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা না দেখিয়া বা না বুঝিয়া যাহারা টাকা ব্যয় করিতে পারে না, তাহারা কি কোনও নূতন কাজ করিতে পারে? সাহস আদর্শ-নিষ্ঠা লইয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িলে টাকা আপনি আসে—ইহাই তো সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। গত উৎসবে যে এত টাকা আসিবে, তাহা কি কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? আমি জানিতাম যে টাকা আসিবে। ঠাকুরের যখন বিশ্বের ঠাকুর হইবার জন্য যোগ্যতা আছে, তখন তাঁহার নাম করিয়া দুর্জ্জয় সাহস লইয়া কাজে নামিলে মানুষ টাকা দিয়া ধন্য হইবে—ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। টাকা হাতে লইয়া estimate বিষয়ীরা করে। এই নূতন পথে আগে প্রচুর প্রোপাগাণ্ডা করিলে তবে না টাকা আসিবে! প্রোপাগাণ্ডার টাকা তো ভবিষ্যৎ চাহিয়া আগেই খরচ করিতে হইবে? ইহাদের নিয়া কি করিয়া যে চলিব, কি করিয়া কাজ হইবে ঠিক বুঝিতেছি না। টাকা থাকিলে নিজেরা খরচ করিতাম। টাকাও তো দেন নাই। টাকাও ইহাদের হাতে থাকিবে, প্রোপাগাণ্ডার ধারাও ইহারা regulate করিবে তবে আমার প্রয়োজনীয়তা কি? সব সুবিধা ইহাদের, আর যত কিছু দুর্যোগ সব আমার—এ ব্যবস্থা মন্দ নয়। ৯টার পূর্বে ফিরি।

২০শে সেপ্টেম্বর

শ্রীবেণু মিত্র কর্ত্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

1. Place of Publication	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
2. Periodicity of its publication	...	Bi-monthly.
3. Printer's Name	...	RENU MITRA M. A.
Nationality	...	Indian.
Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
4. Publisher's Name	...	RENU MITRA M. A.
Nationality	...	Indian.
Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
5. Editor's Name	...	RENU MITRA M. A.
Nationality	...	Indian.
Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	...	RENU MITRA M. A. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwinlnagar, 24 Parganas, West Bengal.

I, RENU MITRA, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 16th February, 1970.

Sd. RENU MITRA,
Signature of the Publisher.

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি, নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন ধরার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেশেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেশের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্ণের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। † † †"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

কৃষাকে কৃষির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, কৃষিহীন কৃষার উপ
তেমনি অর্থহীন। দুইকে এক করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলি
On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and s
his world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there
rors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to rem
e greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrish

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের ে
করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ২·০০
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত) ৮·০০
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত) ৬·০০
ঈশোপনিষৎ ২·০০
কেনোপনিষৎ ১·৫০
কঠোপনিষৎ ৩·০০
প্রশ্নোপনিষৎ ১·০০
ঐতরেয়োপনিষৎ ১·৭৫
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২·৭৫
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩·৫০
মুণ্ডকোপনিষৎ
শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে ৩·০০
স্বরাজের স্বরূপ ·৫০
গীতাজয়ন্তী ·০৬
উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা) ·৫০
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৩·০০
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২·০০

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উ
৩। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

সূচীপত্র, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৬, ১৯৭০

আমাদের কথা
নাকল-লাঞ্ছিত গৈরিক-পতাকা
ও নমো গীতাজয়ন্তী
শ্রীসুনীতি সান্যাল
মুক্তি-লগ্ন (৩)
অনাথী
প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৮১)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
তপস্বিনী—শ্রীপাকজন্ত
ভারতেতিহাসের যুগসন্ধি
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়
পারিবারিক জীবন আলোচনা (৩)
ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়
পুরুষোত্তমাব্দের দিন-পঞ্জিকা (১৯৫৪) (১০)

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহা

চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৭৬-৭৭, ১৯৭০ সম্পাদিকা- রেণু মিত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

যুগের আদর্শ ও কর্মতালিকা

"...আজ চাই সর্ব্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ (ideology) প্রচার এবং তাহার অনুবর্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন। আমরা তাহারই দিগদর্শন করিতেছি—

(১) উজ্জ্বল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে"—মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারদ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নর-নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন। নর হইতেছে সর্বজীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

(২) উজ্জ্বল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-গঠনদ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

(৩) উজ্জ্বল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

(৪) উজ্জ্বল ভারতের নর-নারীর সম্বন্ধ দুই-এর সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, একান্ত পুরুষতন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(৫) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal & direct relation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্মকৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

গরমে চলুন হালকা পায়ে

বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া খেলতে পারে, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আমেজ। সুশ্রী ছিপছিপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৈরি। পরলেই ভালো লাগে যাবে চমৎকার নমনীয় আরাম। সুঠাম তালি চলার ছন্দ হালকা ও সাবলীল ক'রে দেবে। আপনার প্রিয় বাটার দোকানে এ-রকম ছিমছাম স্যান্ডাল ও চপ্পলের যেন মেলা ব'সে গেছে—এখানে তার মধ্য কয়েকটি নকশাই দেখছেন। আসুন না, একবার প'রে দেখুন।

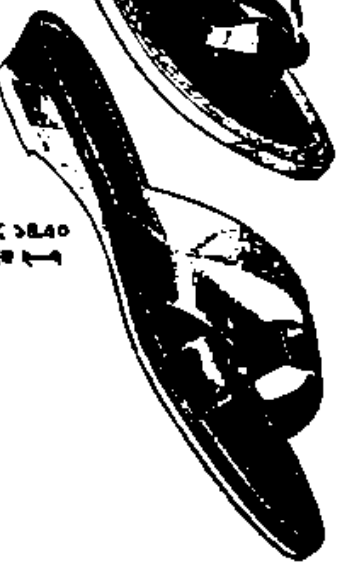

Bata

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ	
শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০	ব্যায়ামে বাঙালী	৩·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০	বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
কর্মযোগী	১·৫০	বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	বাংলার ঋষি	৩·৫০
ভারত আত্মার বাণী	৬·০০	বাংলার বিদুষী	৩·০০
Soul of India Speaks	৬·০০	বাংলার মনীষী	১·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	জীবন গড়া	১·০০
পকেট গীতা	৩·৫০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি টি		আচার্য জগদীশ	২·৫০
		আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫	রবীন্দ্রনাথ	১·৫০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

উত্তরভারত

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৬-৭৭ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭০ ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

যুগদেবতা বিপ্লবী শ্রীনিত্যগোপাল

॥ রেণু মিত্র ॥

বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে—৩১শে চৈত্র, ১৩৭৬—সমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের ১১৫তম জন্মতিথি। তাঁহাকে আমরা সমস্ত সত্তা দিয়া স্মরণ করি, তাঁহাতে আমরা প্রণত হই। তিনি ভগবান বলিয়া তাঁহাকে স্মরণ করি না, তিনি ভগবান হইয়াও মানুষ, মানুষ-আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন, আমাদের সুখদুঃখের অংশীদার হইয়াছেন এবং সর্বোপরি আমরা সর্বসাধারণ কি করিয়া সত্যবদ্ধভাবে সুন্দর কল্যাণঘন মহত্ত জীবন, সমাজ জীবন যাপন করিতে পারি, সেই পথ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে স্মরণ করি, সকলকে স্মরণ করিতে আহ্বান জানাই। ভারতবর্ষের সনাতন স্থিতিধর্মী ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা যে ভাঙিয়া পড়িবে, মানুষকে যে সত্যবদ্ধভাবে সর্বাঙ্গীণ মানুষ হিসাবে বাঁচিতে হইবে এই কথা তিনি আজ হইতে সত্তর আশি বৎসর আগেই বুঝিয়া লইয়া নূতন জীবন-চেতনার কথা লিখিয়া গিয়াছেন, আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাকে স্মরণ করি, সকলকে স্মরণ করিতে আহ্বান জানাই। ব্যক্তিগত সর্বাঙ্গীণ জীবনচেতনার কথা যেমন তিনি বলিয়াছেন, তেমনি সমষ্টিগত সর্বাঙ্গীণ জীবনচেতনার কথাও বলিয়াছেন।

মানুষের জীবনটা watertight compartment নয়, কোন এক রকমের মতবাদে যেমন সমস্ত মানুষকে ঘরের মত বানিয়ে তোলা যায় না, তেমনি একক মানুষও কোন এক রকমের বস্তু নয়। সে কি শুধু রাজনীতিক? কিংবা সে কি শুধু ঘরের? কোন মানুষের পরিচয়ই এমন এক রকমের নয়। শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-অনুধ্যান করিলে এই কথাটাই ব্যক্ত হইবে যে প্রতি মানুষ একই সঙ্গে একই সময়ে ব্যক্তি ও সমাজ, ঘরের ও বাহিরের, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক। মানুষকে ভাগ করিয়া ফেলিয়া তাহার সমাজ জীবন, রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক জীবন একদিকে, আর তাহার ধর্ম-জীবন আধ্যাত্মিক জীবন আর একদিকে—তাহার আধ্যাত্মিক জীবন তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমাজ-জীবনের সঙ্গে সে জীবনের কোন সম্পর্ক নাই—এই কথাগুলি আগে ভুলিতে হইবে। মানুষ সমগ্র বস্তু—তাহার একদিকের সঙ্গে আর একদিকের বিরোধ বাধিয়া বা অসামঞ্জস্য রাখিয়া তাহার সমগ্র সত্তার সমস্যা মিটিবে না—একই নীতিধারা তাহার সমগ্র জীবন চালাইতে হইবে। তাহার ধর্মজীবন যদি চলে এক নিয়মে, আর তাহার রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক জীবন যদি চলে অন্য নীতিতে—তাহা হইলে তাহা সত্যিকারের সমাধান নয়। এখন পর্যন্ত বহু মানুষ মনে করিয়া থাকেন ধর্ম বলিয়া কিছু, নীতি বলিয়া কিছু মানিবার প্রয়োজন নাই, আর একদল মনে করেন ধর্ম বলিয়া যাহা তাহা তোমার ব্যক্তিগত, সেখানে তুমি যাহা খুশী কর না কর আমাদের বলিবার কিছু নাই, কিন্তু সমাজের সকল লোকের অর্থ নৈতিক কাঠামো রাষ্ট্রীয় কাঠামো কেমন হইবে—সমস্যাটা সেইখানে। কথাটা ঠিক নয়—ভারতবর্ষের ধর্মের যে রূপটা তাহার অর্থ নৈতিক রাষ্ট্রীয় জীবনধারার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাহার যে সে বাঁচিয়া থাকার ন্যায়ত অধিকার নাই এবং আবেষ্টনগত সম্ভাবনাও নাই—এ কথা যত শীঘ্র মানুষ বোঝে ততই মঙ্গল। ভারতবর্ষে গত কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া ধর্মের যে রূপ প্রচলিত ছিল, তাহা

মানুষের অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সে সকল সমস্যা হইতে সর্বতোভাবে নিজেকে সরাইয়া রাখিয়াছে। তাই ধর্ম লইয়া বাড়াবাড়িও যেমন আমাদের মধ্যে চলিয়াছে, তেমনি আবার ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়িবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। কিন্তু এমন আলাদা আলাদা করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আজ আর উন্নততর চিন্তা নয়। শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-জীবন অনুধাবন করিয়া নূতন জগতে নূতন ধর্মের রূপ সম্বন্ধে শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রের চতুঃসূত্রীতে লিখিতেছেন, '... ধর্ম বলিতে হিন্দু-খৃষ্টান এসব কিছুই বোঝায় না। যাহাকে 'ধরিয়া' ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত সত্তা-চৈতন্য-আনন্দ যথাযথ সঙ্গতিভাবে সার্থক হইতে পারে, তাহাই ধর্ম। যে পিতাকে ধরিয়া পুত্রগণ সঙ্গতিভাবে সত্তা-চৈতন্য-আনন্দ আস্বাদন করিতে পারে, সেই পিতাই ধর্ম; দেশকে ধরিয়া যদি দেশের সকলের সঙ্গতিপূর্ণ সচ্চিদানন্দত্ব আস্বাদিত হয়, সেদেশই ধর্ম, বিশ্বকে ধরিয়া হইলে বিশ্বই ধর্ম, সমাজকে ধরিয়া যদি বিশ্ববাসী সর্বক্ষেত্রে ঐক্য আনয়ন করিতে পারে, সমাজই ধর্ম। যাহা দুনিয়ার সকলকে একসূত্রে গাঁথিতে পারিবে, তাহাই পরম ধর্ম। ধর্মের নামে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবন্ধন ও তাহা লইয়া রক্তারক্তি বর্তমান পুরুষোত্তম-যুগে চলিবে না। অনন্ত জগতে অনন্ত ধর্ম প্রচলিত; চাই সব ধর্মের সঙ্গতিপূর্ণতা, নচেৎ তাহা অপধর্ম, অধর্ম।' তিনি আরও লিখিতেছেন, 'যাহারা ধর্ম চান, রাষ্ট্র চান না, বিশ্ব-পরিচর্যা চান না, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেও পশু; যাহারা রাষ্ট্রই চান, ধর্ম-অর্থ-সেবা চান না, তাঁহারাও পশু, যাহারা অর্থনীতির উপর বিশ্বব্যবস্থা চান, তাঁহারাও পশু।...' মানুষের জীবনকে অংশে অংশে ভাগ করিয়া দেখিতে গেলে আজ কূল কিনারা পাওয়া যাইবে না, সমাধানও নয়,—তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিয়া একই সামগ্রিক নীতিধারা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্বক্ষেত্রকে চালাইতে হইবে। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিতেছেন, 'ভারতবর্ষ চায় ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের যুগপৎ সমাবেশে বিশ্বগঠন'। তাই শ্রীশ্রীনিতাগোপাল লিখিতেছেন, 'পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান, সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান'। এই সার্বিক সমাধান-প্রচেষ্টা আজ অপরিহার্য। বাস্তব মাটির ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বাস্তব আবেষ্টনকে যেমন আনিতে দেখিতে বুঝিতে হইবে, বাস্তবের ক্ষেত্রে অন্তঃক্ষেত্রকে মুক্ত করিতে হইবে, তেমনই ব্যক্তিগত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আসক্তি বিদ্বেষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া মানুষের সর্বাঙ্গীণ সত্তার উত্তরণ তথা উন্নয়নও করিতে হইবে। মানুষ যদি ব্যক্তিগতভাবে কেবল নিজের স্বার্থই দেখে, সমষ্টি স্বার্থকে ভুলিয়া কেবল ব্যক্তিগত, পরিবারগত বা দলগত স্বার্থেই কাজ করিয়া যায়, যদি এটা না বোঝে যে ব্যক্তি যেমন সত্য, সমষ্টিও ততখানিই সত্য, একটা পরিপূর্ণ সমগ্রের মধ্যে বিধৃত প্রতি অপরিহার্য অনন্য ব্যক্তি বা দলের একত্ব, যদি না মানিতে শেখে যে প্রত্যেক ব্যক্তি বা দল যেমন স্বতন্ত্র স্বাধীন, তেমনি প্রত্যেকে একই সঙ্গে পরতন্ত্র পরাধীন, যদি না মানুষের মধ্যে অপরের সুখে সুখী হইবার, অপরের দুঃখে দুঃখী হইবার প্রবৃত্তি জাগে, তাহা হইলে একটা উৎকৃষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেও মানুষকে রাখিয়া দিলে সে উহাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে নিজের অন্তরের বিষদ্বারা। তাই দুমুখী প্রচেষ্টা ছাড়া মানুষের সমস্যার সমাধান হইবে না। একদিকে আবেষ্টন গত কাঠামোকে বদলাইয়া সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের নূতন কাঠামো গড়িতে হইবে, আর একদিকে মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে অপরকে স্বীকার করিবার, মর্যাদা দিবার, ভালবাসিবার, সুখ দুঃখের অংশীদার হইবার মনোবৃত্তিও তাহার মধ্যে জাগ্রত করিতে হইবে। এইজন্যই শ্রীনিতাগোপাল লিখিলেন আমি বিশ্ব-নাগরিক, আমার তিনিই মুহুর্মুহুঃ সমস্ত বস্তুজগতের ওপারে যাইয়া সমাধিস্থ হইতেছেন। শ্রীনিতাগোপাল-জীবনে যাহা সমাধি, সামাজিক সাধারণ মানুষের কাছে উহা আসক্তি বিদ্বেষের উর্ধ্বে উঠিয়া সেবাবৃদ্ধিপূর্ণ মনোবৃত্তি।

এই অপরূপ তত্ত্ব-জীবন লইয়া আসিয়া সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল আজও মানুষের কাছে অপরিচিত—খুবই অপরিচিত। সমস্ত তত্ত্বই কালের অপেক্ষা রাখে—

আবেষ্টন অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত মানুষের মনোছোঁয়ার নাগালের বাহিরেই থাকিয়া যায়। শ্রীনিত্যগোপালকে আজ বোঝা যতটুকু বা সম্ভব হইয়াছে, তাঁহার জীবিতকালে ইহাও সম্ভব ছিল না। একজন সমাধিমগ্ন পুরুষ যখন বলিতেছেন, 'আমি বিশ্বনাগরিক,' 'এই বিশ্বই আমার মহামঠ,' তখন আজও তাহা বোঝা যাইতেছে না; আর আশি বৎসর আগে তাহা তো একেবারে কল্পনাতীত ছিল, তাই শ্রীনিত্যগোপাল স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'বিলে, আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁথা মুড়ি দিয়ে যাব'।

কোন ক্ষেত্রেই শ্রীনিত্যগোপাল কোন কৌলীন্য স্বীকার করেন নাই। সত্ত্ব রজো তমোগুণের মধ্যে একগুণ অপর হইতে শ্রেষ্ঠ কিংবা একে অন্যকে অভিভব করিয়া অপরে বাঁচিয়া থাকিবে এই কথা শ্রীনিত্যগোপাল তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার কথা হইল মানুষের জীবন ধারণের জন্য, ব্যক্তিগত ও সমাজগত সুস্থ আনন্দোজ্জ্বল জীবন যাপনের জন্য প্রতিটী গুণ অপরিহার্য ও তাহাদের যথাস্থানে যথামানে স্বতন্ত্র ও অনন্য; উহারা একে অপরকে অভিভব করিয়া বাঁচিয়া থাকে না—অপরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র পরতন্ত্রের যুগল অবস্থাকে মানিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ মানুষের বাঁচিয়া থাকার পক্ষে যেমন প্রয়োজন, রজোগুণ তমোগুণও তেমনই—তাহার যথাস্থানে তাহার অনন্য স্থান রহিয়াছে। কেবল তাহাই নয় —একে অভিভব করিয়া অপরে বাঁচিবে—ইহাই ভুলিতে হইবে। যাহাকেই অভিভব পরাভব করিতে চাহিব, সে সাময়িক ভাবে দলিত হইলেও আমাকে দলিত করিবার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে যাইতে একদিন সে আমাকে নীচে ফেলিবেই—এইভাবে অনন্তকাল শ্রেণীসংঘর্ষ চালাইয়া যাইবার পথ মনুষ্যোচিত নয়, উহা জঙ্গলের অধিবাসীদের। মানুষ কি সে স্তর পার হইয়া আসে নাই? আসিয়াছে—আসিতে হইবে। প্রতিগুণের অধিকারী হিসাবেই শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে উচ্চাবচের সংঘর্ষ-মূলক ভেদ সৃষ্টির জন্য বর্ণ বিভাগ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ করেন নাই। সমাজে সত্ত্বগুণের অধিকারী ব্রাহ্মণ, রজোর ক্ষত্রিয়, তমোর বৈশ্য শূদ্র মোটামুটি। গুণে গুণে যদি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট উচ্চ নীচ ভেদ কাটাইয়া দিতে পারি—তাহা হইলে সেই সেই অধিকারীদের মধ্যেও উচ্চ নীচ ভেদ বিলুপ্ত হইবে। শ্রীনিত্যগোপাল গুণে গুণে সংঘর্ষ ও উচ্চাবচভেদ লোপ করিয়া মানুষে মানুষে ভেদও লোপ করিয়াছেন। এই সংঘর্ষমূলক মনোবৃত্তি ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার গোড়া হইতে তুলিয়া দিয়া অর্থনীতি বা রাজনীতি ক্ষেত্রেও যে চিরন্তন শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পথ সমাধানের পথ নয়, শ্রীনিত্যগোপাল তাহারই ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। প্রতি শ্রেণী বা প্রতি মতবাদ অপরের সঙ্গে বিযুক্ত হইয়া টিকিয়া থাকিবে, অপরের সঙ্গে গলাগলি হইয়া জীবন-চক্র পূর্ণ করিবে—কেহই কাহারো অভিভব বা পরাভবের চিন্তা করিবে না—এই পথেই ভবিষ্যৎ সমাজনীতি অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতিকে চলিতে হইবে—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, আবার প্রত্যেকেই পরতন্ত্র এই পথেই ভবিষ্যৎ সভ্যতার অগ্রগতি। শ্রীনিত্যগোপাল এই একই নীতির পথে সভ্যতার ইতিহাসকে টানিয়া আনিবেন—তাঁহার এ তত্ত্ব-জীবন মানুষকে পথ দেখাইবে—সেই আকাঙ্ক্ষাতেই মানুষের কাছে তাঁহাকে উপস্থিত করিতেছি। নানা দ্বন্দ্বসমাকীর্ণ মানুষের জীবনে অপরকে মর্যাদা দিয়া, নিজের মর্যাদা রক্ষা করিয়া কি করিয়া সমাজবদ্ধ লক্ষ্যবদ্ধ জীবনে শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায় তাহারই পথ দেখাইয়া নিত্যগোপাল যুগদেবতা, বিপ্লবের দেবতা। তাঁহাকে নমস্কার, পুনঃপুনঃ নমস্কার।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—
(৮২)

২. ৩. ৫৭...জৈব আমি চায় আমির প্রতিষ্ঠা—ভালো-ভাবেই হোক, মন্দভাবেই হোক। মনস্তত্ত্বে বলে—বেশ দশজনকে ঠেকিয়ে রেখেছি এই অবস্থাটা মানুষের মন চায়। —দশজনকে সেবা করেও দশজনকে ঠেকান যায়, দশজনকে উৎপাত করেও ঠেকান যায়। মানুষের আমি অন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা খুঁজবেই—এখন সেটা যাতে উৎপাতে না যায় তার উপায় কি? .....উপায় হচ্ছে যে-আমিকে নিয়ে সমস্যা তাকে অন্যের মধ্যে transfer করা। ...আমায় ভালতে আমার জন্য নয়, আমার গুরুর জন্য, নিতাগোপালের জন্য।...আমার আমি যতক্ষণ আমার আমি, ততক্ষণ তাকে নিয়ে বিপদ হবেই—আমার আমি যখন পিতামাতার আমি, সমাজের আমি, গুরুর আমি, বিশ্বের আমি—তখন সে আমির মুক্তি...। প্রতি মুহূর্তে জীব বড়তে, গুরুতে,ঈশ্বরকে বাধা দিয়ে চলেছে...। একথা বলতে কয়টা মন পারে—তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো আমার জয়? ...এ কথা বলতে পারে প্রেমে—বড়তে গুরুকে, ভগবানকে ভালবাসলেই শুধু নিজেকে হারান যায়।...তিনি প্রেম স্বরূপম্—God is love—আমার আমির transference into God—তাই-ই হল মানুষের মুক্তি—to fall in love with God, with Guru।...যাকে বাধা দেওয়ার সহজ বুদ্ধি রয়েছে, তার প্রতি প্রীতি সঞ্চার হলেই সুস্থতা।...তাই সহজ জীবন যার তেমনই শ্রীনিতাগোপালের জপ করলে, নিতা-গোপালোঽহম্ বললে সুস্থতা আসে। গুরু তাই সরোজগোপাল অধিকারী বলেছিলেন আমাকে, তুমি যখন বিদ্যোসফিক্যালে সোসাইটীতে বক্তৃতার সময় নিতা-গোপালকে সম্বোধন করে 'ওগো আমার আমি' বলে কাঁদছিলে তখন রোমাঞ্চ হচ্ছিল।.....সোঽহমস্মি প্রভৃতি মহাবাক্যের তাৎপর্য 'ওগো আমার আমি' বলা.....। সূর্যের নিজের আলো আছে, চাঁদের নিজের আলো নাই.....তাঁর আমির সামনে যখন আমার আমি দাঁড়ায়, তখন তা উজ্জ্বল—তাঁর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়লে আমি কত কালো—সে আমার বিকৃত রূপ।...'আমি' নাম ভগবানের নাম—অহং ভগবানের সবচেয়ে প্রিয়তম নাম...। তাঁর আমি দিয়ে রওয়ানা না হলে উপায় নেই...। ডাক্তারকে ভালবাসতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে, না হলে সুস্থতা আসবে না!... স্বাধীন স্বরাট ভারতবর্ষে ডাক্তার উকীল মাস্টার টাকা নেবে না... টাকা নিয়ে যে ডাক্তার উকীল তারা রোগ মোকদ্দমা আটকে রাখে।...স্বাধীন দেশে ব্যবসাদার মাস্টার, ব্যবসাদার ডাক্তার, ব্যবসাদার উকীল চলবে না—মানুষের বিপদের উপর কোন বৃত্তি চালান নিতান্ত পাপ .....রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ—সে বিশ্বাস যদি না থাকল তাহলে কি নিজের বুদ্ধিতেই শুধু রক্ষা পাবে?... রোগী নিজের ভাল নিজে চায় না।...দিনরাত্রি ভাব কি ভাবে ভালবাসা পেতে পারি।.....ভবরোগ সারাবার চিকিৎসা—নিতাগোপালে অহম্ দেওয়া...। নিতাগোপাল neurotic রোগীদের চিকিৎসা করতে এসেছেন ...আমির নির্বাণ—এর নাম শিব হওয়া শব হওয়া...। মায়ের পেটের মধ্যে অন্ধকারে চোখ বুজে পড়ে থাকব...নিত্যগোপালময় হব—তারপরে একদিন বাইরে বেরিয়ে আসব।...

৪।২।৫৭। ওঁ নমো ভগবতে...। শ্রীনিত্যগোপাল প্রত্যেক মানুষের সামনে আজ বিশ্বক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন —প্রমাণ তাঁর I am a cosmopolitan বাণী।... নিজেকে ভিন্নাতে হবে—একবার স্বরূপের ক্ষেত্রে, আরও একবার বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে। কৃষ্ণ অর্জুনের আমিকে,

অর্জুনের মনকে পুরুষোত্তম স্তরে টেনে তুলতে চাইছেন। অহংকারের ক্ষেত্রে ধর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে, অর্থ অনর্থ হয়েছে, কাম মানুষকে পশু বানিয়েছে, মোক্ষসাধনা রকমফের vasted interest হয়ে দাঁড়িয়েছে। অহংকারের ক্ষেত্র শোষণের ক্ষেত্র; সেখানে যে কোন বিষয়ে যে কোন রূপ —যে কোন শক্তিতে শক্তিমান—সে ছোটকে শোষণ করবে ··· শরণাগতির ক্ষেত্রে কারো সঙ্গে কারো গায়ে ঠেকে না—সেখানে চিরদিন সমান্তরাল ভাবে দুইজনে চলতে পারে ...অহংকারের ক্ষেত্রে দুইজন থাকতে পারবে না—হয় স্বামী থাকবে, রাজা থাকবে, ধনিক থাকবে, আকাশ থাকবে, নর স্ত্রী থাকবে, প্রজা থাকবে, শ্রমিক থাকবে, মাটি থাকবে। সেখানে একজনকে মুছে ফেলতে হবেই ..... টো সংঘর্ষের ক্ষেত্র, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র... সেখানে complementarity, পরস্পরপরিপূরকতা —নাই.....। অহংকারের স্তরে কেউ কারো ভাল চায় না, অন্যকে বড় হতে দিতে চায় না...।...কিন্তু মহাসাগরে মহামৎস্যের মত যারা বিরাজ করে তারা 'ভেসে যদি যাও যাবে একসাথে সকলের সাথে রহি'।...এখানে স্বাধীনে স্বাধীনে প্রীতি—দুইকে দুই রাখিয়া তাঁহায় এক—ইহাই বৃন্দাবনের পরকীয় তত্ত্ব..। অহংকারের ওপারে পরম ধর্মে পরম অর্থে পরম কামে...কারো সাথে কারো বিরোধ নেই।...এখানে—যেখানে অহং-এ অহং-এ টক্কর লাগে না, প্রত্যেকেই তার বিচ্ছিন্ন অহং-এর ওপরে উঠতে পারে, সেখানে—যে কোন পথ দিয়ে যে কেউ এগিয়ে যেতে পারে। ..নিত্যগোপাল ডাকছেন, ওরে সাগরে আয়—অহংকারের ক্ষেত্রে সব আয়গায় ব্যর্থ ওরে তোরা আয় আমার কোলে... অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, যারা না মারার সামর্থ্য আছে আমার কোলে—যত নাহংকৃত ভাবঃ বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥...অহংকারের ক্ষেত্রে হনন করা আর হনন না করা বিপরীত ··পুরুষোত্তম জানালেন কোন্ কৌশলে ভীষ্মকে মেরেও অপরাধ হয় না, রাজ্য ভোগ করেও কি করে ভোগ হয় না...। অহংকারের ক্ষেত্রে সংস্করের কথা—কা তব কান্তা কস্তে পুত্র, দিনকা মোহিনী রাতকা যামিনী ইত্যাদি সব সত্য, খুব সত্য।... সব উল্টোগুলি মিলবে নিত্যগোপালের ক্ষেত্রে।...বর্ণাশ্রম স্থাপন করতে গিয়ে তুমি একের সঙ্গে আর একের বিরোধ সৃষ্টি করে সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ করে ফেলেছ...এই রকম পারস্পরিক বিরোধের পথ পরিত্যাগ করে সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। চতুর্বর্ণের একের অপরের সঙ্গে বিরোধের সম্পর্ক নেই, প্রত্যেক বর্ণ যার যার যোগ্যতা দিয়ে সমগ্র সমাজের সেবা করবে—এক এক গুণের অধিকারী প্রতি বর্ণেরই এক একটী যোগ্যতা আছে—তাই দিয়ে সকলেই পরস্পরের অর্থাৎ সমগ্র সমাজের সেবা করবে—এই ভাবে চললে সংঘর্ষ থাকবে না—সংঘর্ষের পথে আজকের দিনে কল্যাণ আনা যাবে না।...বিশ্বরূপের শরণাগতির ক্ষেত্রে সব lost property মজুত থাকে তাঁর কাছে—'তোমার মহাবিশ্বে হারায় না তো কিছু...'। সংস্করাচার্যের মোহমুদ্গর অহংকারের ক্ষেত্রে সত্য—নিত্যগোপালের ক্ষেত্রে টাকে টাকা আর সমাধি মেলে। ...অহংকারের ক্ষেত্রে ধর্ম চাইলে স্ত্রীপুত্র বাড়ী ঘর ছাড়তেই হবে···। কৃষ্ণের ধর্ম সমাস কথাটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য— উভয় পদার্থপ্রধান—কেউই একক প্রধান নয়—সকলেই প্রধান—কেউ কারো উপরে অত্যাচার করতে পারবে না, কেউ কাউকে অপমান করতে পারবে না, সকলেই অপর সকলের সেবা করবে। অহংকারের ক্ষেত্রে ভাগে ভোগে দ্বন্দ্ব, বিশ্বজীবনে ব্যক্তিগত জীবনে দ্বন্দ্ব। নরনারায়ণ একত্র হলে এই দ্বন্দ্বের নিরসন হয়।...দ্বন্দ্ব সমাসের ধর্ম প্রচারিত হলেই ধরায় ধূলি হবে ব্রহ্মধূলি, ধরায় মানুষ হবে ব্রহ্মমানুষ। ...নিত্যগোপাল, আমার মন তুমি লও, আমি তখনা হব, তুমি সারথি···। In a calm sea every body is a pilot—কিন্তু সমাজসংসার যখন ক্ষেপে গেছে তখন এই প্রাবনে পুরুষোত্তমকেই সারথি করতে হবে—আমাদের সেই কথাই তিনি বলছেন—সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ...।

ক্রমশঃ

কর্ম্মযজ্ঞ

॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥

গীতা মুখে ভগবান বলিয়াছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্। ৩।১০

সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির কানে কানে বলিয়াছেন এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, এই যজ্ঞ তোমাদের ইষ্টকাম দোহন করুক। প্রজাপতি নিজের মধ্যে সর্ব্বভূতকে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে নিজকে হোম করিয়া, জীবনের ছন্দে ছন্দে সৃষ্টি প্রেরণা দান করিয়া বলিয়াছেন—তোমরা উৎপত্তি বৃদ্ধি করিয়া চল, সৃষ্ট হইয়া ওঠো, বাড়িয়া চল। তিনি অন্তরে পুরুষ-রূপে এবং বাহিরে কালরূপে থাকিয়া প্রতি ক্ষণ এবং খণ্ডের মধ্যে থাকিয়া অনন্ত ক্ষণ এবং খণ্ড সমূহকে সংহত করিয়া ক্ষণাতীত এবং খণ্ডাতীত থাকিয়া প্রতি ক্ষণ ও খণ্ডের সহিত সুহৃদ্ভাবে যুক্ত হইয়া অতীত হইতে বর্ত্তমানে এবং বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে এই বিশ্বকে সুশৃঙ্খল এবং সুব্যবস্থিত ভাবে পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার এই কর্ম্মযজ্ঞে জীব তাঁহার নিত্য সহচর। নর ও নারায়ণের যুক্ত কর্ম্মযজ্ঞেই এই বিশ্বকর্ম্মচক্র অনাদি অনন্ত কাল চলিতেছে। বিশ্ব-পিতার সহিত কর্ম্মযোগে যুক্ত হইয়া ঋষি কবি গাহিয়াছেন, "বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহার

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও
নয়কো বনে নয় বিজনে—" রবীন্দ্রনাথ

অমর পুরুষোত্তম বিশ্বের পরতে পরতে জীবের সাথে বিশ্বসৃষ্টির সাথে যুক্ত থাকিয়া "পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ" এই জ্ঞানে অনন্ত অনাদি কাল বিশ্বকর্ম্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দিব্য বিশ্ব গড়িয়া তুলিয়া অতীত হইতে বর্ত্তমানে, বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে অনিত্যের বুকে নিত্য নাচন নাচিয়া চলিয়াছেন।

"অনিত্য তারা তব ইতিহাসে নিত্য নাচন নাচে"
রবীন্দ্রনাথ

এই বিশ্বের চলার প্রবাহে যাহার যাহা সহজ অবস্থা সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া পুরুষোত্তম-জীবনে জীবন মিলাইয়া সহজ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, জীব বিশ্ব-পিতার কর্ম্মসহচর। পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতি নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া যখন অখণ্ড মানব সত্তা সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজের ইন্দ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন—কর্ম্মদ্বারাই জন্ম জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মদ্বারাই তাহাদের প্রলয় ঘটে। "সুখ দুঃখ, ভয় এবং কাম শুধু কর্ম্মদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। কর্ম্মের বাহিরে কর্ম্মফলদাতা কোন ঈশ্বর যদি থাকেন তিনি ও কর্ত্তার কর্ম্মেরই ভজনা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম না করিলে তাহাকে যেমন তিনি ফল দান করিতে পারেন না, কর্ম্ম করিলেও তেমনি তাহার ফল তিনি আটকাইতে পারেন না।"

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া বলিয়াছেন, যে বৃত্তি দ্বারা মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহাই তাহার দেবতা। সকল কর্ম্মই বিনিময় প্রথার পরস্পরের আত্মাহুতিরূপ মানুষী মণ্ডিত আদান প্রদানের মাধ্যমে যজ্ঞে পরিণত হইয়া পরস্পরকে দিব্যভাবে গড়িয়া তোলে। পল্লী ব্রজে সহজ গোপালন এবং কৃষি কার্য্য বৃত্তি দেবতার মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই দেবতার অঙ্গস্বরূপ কৃষি এবং গোপালন কর্ম্ম যজ্ঞ। সহজ অবস্থায় মানুষের প্রজ্ঞা এবং প্রাণ সমন্বিত থাকে। এই সহজ ব্রজভূমিতে প্রাণের আধিক্যবশতঃ জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা নাই এবং সেই উচ্ছৃঙ্খলতা বশতঃ তাঁহারা উন্মার্গগামী নয়, পক্ষান্তরে প্রজ্ঞার আতিশয্যে তাঁহারা বিভেদমূলক বিশ্লেষণের পথে যাইয়া ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হন নাই। এখানে সহজ প্রাণ এবং সহজ প্রজ্ঞা সমন্বিত হইয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রজ্ঞাপ্রাণ সমন্বিত সহজ কৃষি এবং গোপালন কর্ম্ম সত্য বাস্তব যজ্ঞ কর্ম্মে পরিণত হইয়া স্বরূপ ও বিশ্বরূপের সমন্বয়ের

মাধ্যমে পরস্পরকে গড়িয়া তুলিয়া সার্থক কর্মযজ্ঞে বিশ্ব কর্ম যজ্ঞের সহিত যুক্ত। গোপগণ যত্নপূর্বক গোগণকে আহার্যাদি দান করিয়া তাহাদের প্রতি সেবোপহার হওয়ায় গোপাল সম্বন্ধিত হইয়া প্রীতিপূর্বক পয়ঃধারা বর্ষণ করিতেছে। এই দুগ্ধের দ্বারা গোপগণ প্রীতি লাভ করিয়া সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ গোপালন বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করিয়া, সৃষ্টির আদিতে যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি যে কর্ম-প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন সেই সত্য বাস্তব যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা প্রজাপতি পুরুষোত্তমের সহিত অভিন্ন হইয়া তাঁহার বিশ্বকর্মযজ্ঞের নিত্য সহচর এবং ধরার বুকে অর্থাৎ ব্রহ্মপল্লী পুরুষোত্তম ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে।

অনুরূপ ভাবে কৃষি ক্ষেত্রে যজ্ঞরূপে কৃষি কর্মের অনুশীলন করিয়া কৃষি কর্ষণ জল সেচন বীজ বপন এবং ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ করায় ধরিত্রী কৃষকের সেবায় প্রীতি লাভ করিয়া প্রতিদানে শস্য সম্ভার কৃষকদিগকে অর্পণ করিতেছে, যাহাতে কৃষকের স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। এই যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠিত কৃষিকর্মটি প্রদান করিতেছে সর্বফল। এই সহজ কৃষি কাজই তাহার দেবতা।

এই যজ্ঞরূপ কৃষিকর্ম এবং গোপালন বৃত্তি প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া যে সম্পদ উৎপন্ন হইবে তাহা বিশ্ব-সম্পদ।

গীতামুখে ভগবান বলিয়াছেন—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞ কর্মসমুদ্ভবঃ॥ ৩।১৪

প্রাণি মাত্রেরই উৎপত্তি অন্ন হইতে, অন্নের উৎপত্তি পর্জন্য হইতে, পর্জন্য যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন এবং যজ্ঞ কর্ম হইতে উৎপন্ন। অন্ন সর্বদা জীবন্তন্য হইলেও কেন তা প্রাপ্ত হয় না? পুরুষ যজ্ঞদ্বারা অক্ষয় অন্ন উৎপাদন করেন, সেই অন্ন হইতেই ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়। অন্ন সৃষ্টি করে ভূতকে এবং ভূত সৃষ্টি করে অন্নকে। অন্ন ও ভূত পরস্পরের স্রষ্টা হইয়াই সৃষ্টি-চক্র বিবর্তিত হইতেছে। বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি এবং যজ্ঞে আহুত অন্নই বৃষ্টি সৃষ্টি করে। এই বৃষ্টি এবং অন্ন পরস্পরকে উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি-চক্র প্রবর্তিত রাখিয়াছে। কর্ম ছাড়া কোন যজ্ঞ হয়না এবং এবং যজ্ঞার্থে করা না হইলে কোন কর্মই সার্থক হয় না। পুরুষ যে ভোগ কামনা করে তাহা বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম না হইয়া বিচ্ছিন্ন না হইয়া বিশ্ব সম্পদ রূপে বিশ্বকে বিলাইয়া না দিয়া সে পাইবে না। যজ্ঞদ্বারা সর্বস্ব সর্বদেবময় পুরুষোত্তমে সমর্পণ করিলে পুরুষোত্তম-যজ্ঞেশ্বর নিজে যজ্ঞের কিতব দিয়া নিজকে লুট বিলাইয়া দিয়া নিজকে এবং জীবের ইষ্ট ভোগকে দিব্যরূপে গড়িয়া তোলেন। বিশ্ব-সম্পদরূপ প্রদত্ত ভোগ জীবগণ বিশ্ব-দেবগণকে না দিয়া, আত্ম-ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য ভোগ করিলে তাহা হয় চৌর্য। যিনি অন্নের অক্ষয়ত্ব জানেন তিনি ভক্ষণীয় দ্রব্যের সহিত নিজকে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়া থাকেন। প্রজাপতির সৃষ্ট এই অন্ন সর্বসাধারণের জীবন ধারণের জন্য, এই অন্নের প্রতিটি বিন্দুসম্পদ। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র-যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে যজ্ঞার্থে আহৃত দ্রব্যসম্ভার গোগণকে গোবর্দ্ধন গিরিকে, ব্রাহ্মণগণকে চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির লোকদের মধ্যে সমর্পণ করিবার নির্দেশ দিয়া বিশ্ব-সম্পদ বিশ্ব যজ্ঞে আহুতি দান করিয়া সত্য বাস্তব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কর্মের মাধ্যমে এই ধরার ধূলিতে পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই ধরাকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারে তাহার নিদর্শন ৫০০০ বৎসর পূর্বে পল্লী ব্রজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার ব্রজলীলায় দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিয়াছেন মাটিতে যেমন আলু পটল উচ্ছে উৎপন্ন হয় তেমনই এই ধরার ধূলিতে পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। স্ব স্ব স্থানোচিত সহজ অথচ করণীয় কর্ম সম্যক-ভাবে পুরুষোত্তম-সুরে দাঁড়াইয়া করা হইলে বৃক্ষের সবটুকু চুষিয়া ফল যেমন নিজের মধ্যে বৃক্ষ সৃষ্টির যোগ্যতা অর্জন করে এবং সেই ফল পরিপক্ক হইয়া বৃক্ষ হইতে মুক্ত হয়, সেইরূপ পুরুষোত্তম-উপাদক সারা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মালিককে পরাগতি যোগে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া দ্বিতীয় জগৎ বা জগন্নাথকে সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য যুক্ত হয়।

ভগবান গীতামুখে বলিয়াছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥

তুমি যাহা কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তাহা সমস্তই আমাকে অর্পণ কর। গীতা দোষযুক্ত সহজ কর্মকেও ত্যাগ করিতে বলেন নাই। সকল কর্মকেই যজ্ঞ-সূত্রে গ্রথিত করিয়া প্রতিকর্মকে বিশ্বকর্মের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। ভাগবত বলিয়াছেন—'কায়, মন, বাক্, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি বা অহংকার কিংবা স্বভাবের তাড়নায় যাহা যাহা পুরুষ করে সকলই পর পুরুষের চরণতলে নারায়ণায় বলিয়া অর্পণ করিবে'। এই শরণাগতির আগুনে জারিত হইয়া সহজ সংস্কার কর্মও নির্দোষ হইয়া যায়। যে যাহার সহজ স্থান হইতে রওনা হইয়া কর্মের প্রেরণাকে বুকে লইয়া প্রজ্ঞা প্রাপ্ত সমন্বিত কর্মানুষ্ঠান করিয়া বিশ্ব-পিতার সহিত অভিন্ন একাত্ম হইয়া বিশ্বকর্মচক্রে উহার সংহর হইতে সমর্থ। এই বাস্তব সত্য কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াই গড়িয়া উঠিবে দিব্য জগৎ, যাহার দিগ্‌দর্শন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজলীলায় রাখিয়া গিয়াছেন এবং পাঞ্চজন্যের মধুর নিনাদে গীতায় প্রচার করিয়াছেন।

মুক্তিলগ্ন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ অনামী ॥

চৌদ্দ

নির্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে সমরেশবাবু স্ত্রী ও এক কন্যাসহ নিজের মোটরে হরিপ্রিয়ের বাড়ী আসেন। হরিপ্রিয়ের দূরসম্পর্কীয় এক ভগ্নীপতি পুরুষের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনামিকা অতিথিদের খাওয়ানোর জন্য আগেই খাবার তৈরী ও বিভিন্ন রকম মিষ্টির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বিশেষ জরুরী কাজে বাইরে যাওয়ায় ওর স্বামী হরিপ্রিয়ের উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি একথা একটু আক্ষেপের সুরে অনামিকা অতিথিদের জানায়। অনামিকার কৈফিয়ৎ মেনে নিলেও মনে মনে অজ ও তাঁর স্ত্রী একটু বিস্মিত হন। ছেলের পছন্দকরা মেয়ে তাঁরা কেবল পাকা দেখার জন্যই এসেছেন, কাজেই অন্য কিছুতে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবেননি। অনিলাকে দেখে ও তার সাথে কথাবার্তা বলে অজ ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই যারপরনাই মুগ্ধ ও প্রীত হন। এর পরে আনুষ্ঠানিক ভাবে পাকা দেখার কাজ সম্পন্ন করে মিষ্টি ও খাবার খেয়ে কিছু সময় পরে চলে যান। এ সময় বিবাহের দিনক্ষণও স্থির হয়ে যায়। পাকা দেখা উপলক্ষ করে অজবাবু অনিলাকে একটী মূল্যবান নেকলেস্ উপহার দিয়েছিলেন।

অজ সমরেশ মিত্রের মেয়েকে আশীর্বাদ করে যাওয়ার দুদিন পরেই অনামিকা হরিপ্রিয়ের ভগ্নিপতিকে চরণদার করে অজের বাড়ী যান, ছেলেকে দেখে খুশী হন ও আশীর্বাদ করেন। আশীর্বাদ উপলক্ষ করে অনামিকা পাত্র সজীবকে একটী মূল্যবান আংটি উপহার দেন। হরিপ্রিয়কে না দেখে গোড়াতেই অজ পত্নী বিভাবতী বিস্ময় দৃষ্টিতে বলেন "হরি-প্রিয়বাবু এলেন না যে"? অনামিকা কোন দ্বিধা না করে বলেন, "উনি বললেন, এ সব মেয়েলি ব্যাপার, তোমার যাওয়াতেই যথেষ্ট। আর এখানে কাজ হলে আমার কত সুযোগই তো হবে"। অনামিকার কথায় বিভাবতী কোন কপটতার আভাষ না পেয়ে আশ্বস্ত হন। অজের বাড়ীতে

আদর আপ্যায়ন ও খাওয়া দাওয়ার পরে অনামিকা বাড়ী চলে যায় এবং হরিপ্রিয়কে সব কথা বলে।

চিন্তা ও আনন্দের যুগ্ম আলোড়নে আলোড়িত মন নিয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনে বিবাহের প্রস্তুতির কাজে মন দিল। বিয়ের দশদিন আগেই কেনাকাটার ও বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর অর্ডার দেওয়ার কাজ হরিপ্রিয় সম্পন্ন করলো। পাড়ার কয়েকজন তরুণ কর্মী এ ব্যাপারে হরিপ্রিয়ের সাহায্যে লেগে গিয়েছিল। বীরগঞ্জের কাউকে এরা বিয়েতে নিমন্ত্রণলিপি পাঠানো যুক্তিযুক্ত মনে করলো না। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারেই তিনকড়ির আত্মগোপনের প্রয়োজন ছিল। মা বিমলাসুন্দরী ও মাসিমা মীরাদেবীর পরিবারস্থ সকলকে এ বিয়েতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা ছিল অনামিকার প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এ কর্তব্যও পালন করা অনামিকার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়, পাছে অতীত কাহিনী জানাজানি হয়ে যায়। অনামিকা সব দিক বিচার করে মাকে একখানা চিঠি পাঠালো বীরগঞ্জের ঠিকানা দিয়ে। চিঠির মর্ম ছিল এরূপ—"মা আমরা দুজনে ভীষণ অগ্নি পরীক্ষায় পড়েছি। মা কালীর কৃপায় সে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবো এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কিছুদিন আমাদের চিঠি পত্র বা খবর না পেলে উদ্বিগ্ন হোয়ো না। যথাসময় তোমাদের সকলকে আমাদের নূতন জায়গায় নূতন বাড়ীতে আনবো এবং সব খবর বলবো। আমার প্রণাম জেনো ও মাসীমাকে জানিও। ইতি—

প্রণতা অনামিকা

বিবাহের রাত্রে আবার একটা বিপদের সম্মুখীন হতে হবে হরিপ্রিয়কে। কল্যাণপ্রদ মিথ্যাচরণকে হাতিয়ার করে তার স্ত্রী অনামিকা নেমে পড়েছেন এই জটিল বিয়ের ব্যাপারে। সে ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা দেখালে চলবে কেন? যাহোক, তিনকড়ির এক জ্ঞাতি ভাই লক্ষণদাস বহুদিন থেকে কাজ করতো বনগ্রামে একটি মিষ্টির দোকানে। লক্ষণদাস ভাবাবোবা সরল প্রকৃতির লোক ছিল। অবিবাহিত লক্ষণদাসের দুনিয়ায় আত্মীয় স্বজন বলতে কেউ ছিল না। লক্ষণদাস বয়সে তিনকড়ির চেয়ে দু-বছরের বড় ছিল। ঘটনাচক্রে তিনকড়ির সাথে লক্ষণের কয়েকমাস আগে দেখা হয় এবং যথাবার্তার ফলে জ্ঞাতি সম্পর্ক প্রকাশ হয়ে পড়ে। লক্ষণ তিনকড়ির বাড়ীঘর চালচলন দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়। তিনকড়ির নাম বদলের কথা শুনে লক্ষণদাস তেমন কোন কৌতূহলের ভাব দেখায় না। কিন্তু তিনকড়ি কি করে ঐশ্বর্যের অধিকারী হোলো এটা জানার একটা আগ্রহ লক্ষণদাস দেখায়। তিনকড়ি তাকে শ'খানেক টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে এবং বলে লক্ষণদা, তুমি যথাসময়ে সব জানতে পারবে, এখন আমার ব্যাপারে কয়েকমাস চুপচাপ থাকো। লক্ষণ টাকা পেয়ে খুশী হয় এবং তিনকড়ির কথামত চলতে রাজী হয়।

এই লক্ষণদাস কন্যা-সম্প্রদান করবে বলে আগেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খবর পেয়ে বিবাহের আগের দিন লক্ষণদাস এক দিনের ছুটী নিয়ে তিনকড়ির বাড়ীতে এলে তিনকড়ি ও অনামিকা তাকে সাদরে গ্রহণ করে। লক্ষণদাসের কি করতে হবে কি না করতে হবে এসব দুজনেই খুব ভাল করে তাকে বুঝিয়ে দেয়। সরল সাদাসিধে লক্ষণদাস কোন কিছুর মধ্যে রহস্যের গন্ধ পায় না বা পাওয়ার চেষ্টা করে না। ওদের লক্ষ্য করে লক্ষণদাস বলে "শোনো, তোমাদের আমাকে নিয়ে কোন ভয় নেই। বোবার শত্রু নেই। আমাকে কেউ কিছু বললে হয় আমি জানিনা বলবো অথবা চুপ করে থাকবো। একদিনের তো ব্যাপার"। একটা বড় সমস্যার সমাধান হওয়ায় তিনকড়ি ও অনামিকা দুজনেই নিশ্চিন্ত হয়। ছাদের উপর চিলাকোঠায় লক্ষণদাসের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

সম্প্রদান করার লোক তো হোলো, বিবাহবাসরে কন্যার পিতার অনুপস্থিতি তো লোকজনের দৃষ্টি এড়ানোর নয়। অনামিকা হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। বিয়ের আগের দিন নিরিবিলিতে সে স্বামীকে বলে "কোন চিন্তা কোরো না, যখন পরিবর্তনে আমরা রাঁপ দিয়েছি, তখন কোন বাধাকেই বড় করে দেখলে চলবে না।"

তিনকড়ি—কি করবে শুনি?

অনামিকা—এতদিন এ ব্যাপারে যা করেছি—একটু

মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে।

ভিনকড়ি—মিথ্যার আশ্রয় কথাটা ভাবতেই ভয় লাগে।

অনামিকা—ভাখো প্রথমে বলেছি, আবারও বলছি, যে মিথ্যের কারোর ক্ষতি নেই, বরং সবারই মঙ্গল সে মিথ্যেতে কোন দোষ বা বিবেকের দংশন নেই। (ক্ষণকাল ভেবে) এবার কাজের কথায় আসি। তুমি বিয়ের দিন ও তার পরের দিন কাঠের আড়তে গিয়ে থাকবে। তোমার অনুপস্থিতির একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ সবাইকে বলা যাবে। আমার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে কেউ পারবে না।

হরিপ্রিয়—বেশ, আসছে কাল বিয়ে। আমি আজ বিকেলেই আড়তে যাচ্ছি। এদিকে দেখছি, সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হয়েছে। কাজের লোকও অনেক পেয়েছো। শিউকে সব বিশ্বিয়ে বুঝিয়ে রাখবে সে যেন কাউকে না জানিয়ে সাইকেলে গিয়ে আমাকে এদিকের খবর দেয়। (ক্ষণকাল ভেবে "হ্যাঁ, ভালকথা, তোমার ছেলে মেয়েদের সতর্ক করে রেখেছো তো?"

অনামিকা—ওদের দিয়ে তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই।

এরপর হরিপ্রিয় আড়তে যাওয়ার জন্য যথাসময় প্রস্তুত হয়। অনিলা পিতার যাত্রার সময় বিষাদমাখা মুখে এসে বললে "বাবা, তুমি কেন এসব কাজ নিলে? আমার ভাল লাগছে না"।

হরিপ্রিয়—কাজ আমি আর কোথায় নিচ্ছি মা—কাজ সবটাই তো তোমার মায়ের। কে যে তাকে মনের বল ও বুদ্ধি যোগাচ্ছে!

অনামিকা কাছেই দাঁড়ানো ছিল। অনিলা প্রথমে মাকে—তার পর মাকে প্রণাম করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। হরিপ্রিয় অনিলার মাথায় হাত রেখে বললো মা, তুই তো সবই জানিস, বুঝিস, গোলাপ তুলতে গেলে ওর কাঁটার আঁচড়কে ভয় পেলে তো চলে না।

এরপর হরিপ্রিয় আড়তের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

পরদিন বিয়ে। একটু বেলা হতেই হরিপ্রিয়ের বাড়ীখানি কর্মব্যস্ত লোকজনের কথাবার্তায় মুখর হয়ে উঠেছে। পাড়া প্রতিবেশী পুরুষ ও মহিলাদের আনাগোনা চলছে। বন্ধুস্থানীয়া একজন মহিলা কোন এক সময় বলে "হ্যাঁ দিদি, মেয়ের বিয়ে তোমার কর্তাবাবুকে তো একবারও দেখলাম না"। অপর একজন মহিলা বলে ওঠেন—হ্যাঁ, আমিও তা একটু আগে ভাবছিলাম। প্রথম মহিলাকে লক্ষ্য করে অনামিকা সহজ সাবলীলকণ্ঠে উত্তর দেয় "আর বলেন দিদি, মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক! কালকে ট্রেনে উনি গেলেন উত্তরপাড়া আমার এক বান্ধবীকে আনতে, আজ ভোরে আসার কথা ছিল। কিন্তু কি দুর্ভিবিত্য—ওখান থেকে লোক এসে জানিয়ে গেছে, উনি গতকাল ট্রেন থেকে উত্তরপাড়া ষ্টেশনে পিছলিয়ে পড়ে যান এবং পায়ে গুরুতর আঘাত পান। তাই দিন ওখানে থেকে সুস্থ হয়ে আসবেন, ভয়ের বা চিন্তার কোন কারণ নেই"। মহিলাটি সরল বিশ্বাসে অনামিকার কথাগুলি গ্রহণ করে এবং সমবেদনার সুরে বলে—তবু ভালো দিদি, বেশী কিছু তো হোতে পারতো। যাক্, দিদি আমরা পাঁচজনে আছি, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বিয়ের কাজ ভাখো, ভাল লাগবে না ঠিকই। উপস্থিত আরও অনেকে এ কথায় সায় দিলেন। অনামিকা সত্যই নিশ্চিন্ত হোলো। তার প্রথম কৌশল ব্যর্থ হয়নি। মহিলাটির কাছ থেকে এর ওর মুখ থেকে চালান পেয়ে কথাটি পুরুষদের কাছেও পৌঁছায়। হরিপ্রিয়ের অনুপস্থিতির কারণ জেনে অনেকেই দুঃখপ্রকাশ করলেন, কিন্তু ঘটনাটা যে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয় এ মন্তব্য পরস্পরের আলাপ আলোচনায় শোনা গেল।

যথাসময় বরযাত্রীর দলের সাথে বর সজীব এসে ভিনকড়ির বাস ভবনে পৌঁছায়। ব্যাণ্ডের বাজনা ও শঙ্খের আওয়াজ সমন্বিত এবং উজ্জ্বল তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত পরিবেশে বর এবং অন্যান্য সকলকে সাদর ও সশ্রদ্ধ স্বাগত জানিয়ে অভ্যর্থনা করে বাড়ীর সদরে এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে এনে বসানো হয়। সমরেশবাবু

শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি। বরের সাথে তার অগ্রজ দুই ভাই, ছোট ভাই ও আরও জনকুড়ি আত্মীয়, বন্ধু এসেছিল। বরের ভ্রাতৃদ্বয় ও স্বপক্ষীয় সকলে হরিপ্রিয়ের অনুপস্থিতির কথা ও কারণ শুনে সহানুভূতিসূচক কথাই বললো। বর সজীব বিবাহের ব্যাপারে অন্যমনস্ক ছিল।

অনিবার্য্য কারণে শ্বশুর মহাশয় বিয়েতে অনুপস্থিত জেনে বর সজীব একটু দুঃখিত হোলো।

যথাসময় বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোলো। কনেকে সম্প্রদান করলেন হরিপ্রিয়ের জ্ঞাতিভাই লক্ষ্মণদাস। সজীব আধুনিক যুবক। মনের দিকে তার তেমন পেছুটান ছিল না। সে বন্ধুর মত আনুষ্ঠানিক কাজগুলি পুরোহিতের নির্দেশমত করে যাচ্ছিলো।

বিয়ের হৈ চৈ খাওয়া দাওয়া যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে অধিক রাত্রে এক সময় সুসজ্জিত বাসর ঘরে সন্তু বধূর বেশে অনিলাকে প্রতীক্ষমান অবস্থায় দেখা গেল। সজীব অনিলার জন্যই অপেক্ষা করছিলো। অনিলা সজীবকে প্রণাম করে সজীবের পাশে বিছানায় বসে হাসি খুশী মনে বললে আমার একটা অনুরোধ রাখবে? সজীব, তোমার অনুরোধ নয়, প্রথম অনুরোধ; আমি নিশ্চয়ই তা রাখবো। বল কি অনুরোধ।

অনিলা, শুনেছো, আজ আমাদের বিয়েতে বাবার অনুপস্থিতির কারণ নিশ্চয়ই শুনেছো। আর কারণটা সামগ্রিক ভাবেও শুনেছো। কিন্তু আসল কথা, বাবা একটা ভীষণ জটিল ব্যাপারে কিছু দিনের জন্য জড়িয়ে পড়েছেন। তাই আমার একান্ত অনুরোধ আমার বাবার সম্পর্কে কোন খবর জানার চেষ্টা কিছুদিন পর্য্যন্ত করো না। তোমাদের বাড়ীর সবাইকেও এবিষয় সতর্ক করে দিয়ো। এতে আমার ও তোমার তো বটেই, দুটা পরিবারেরও মঙ্গল হবেই। গোপন রহস্যের আঁচ পেয়েও, অনিলার সরল কথায় মুগ্ধ হয়ে সজীব বললো, ঠিক আছে, তুমি কিছু ভেবো না, তোমার ইচ্ছে মতই সব হবে। আমি বাড়ী গিয়ে মা বাবাকে এবিষয় সতর্ক করে দেবো।

বিবাহের পরদিন অনিলা শ্বশুরবাড়ী এসেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মন জয় করে এবং তাদের প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠে সজীব ঐ দিনই মা বাবাকে অনুরোধ করে তাঁরা এ বাড়ীর অন্য কেউ যেন শ্বশুর মহাশয় সম্পর্কে কিছুদিন কোন কৌতূহল না দেখান। মা বিভাবতী পরে একা নিরালা জায়গায় ডেকে সজীবকে বলেন, হ্যাঁরে না তোর শ্বশুরকে নিয়ে কোন খারাপ কোন ব্যাপার নেতো? সজীব—না মা, সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। অনিলার কথার মধ্যে নিশ্চিন্ত থাকার সূত্র পেয়েছি। বিভাবতী, ঠিক আছে, তোর ইচ্ছামত হবে।

বিবাহের পর দশদিনের ছুটির একদিন সজী অনিলাকে নিয়ে হরিপ্রিয়ের বাড়ীতে আসে। এ যাত্রা সজীব অনাধিকার চর্চা করে জানতে পারে যে শ্বশুর মহাশয় ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তাঁর দিনের জন্য বাইরে গেছেন-না গেলে ২।৩ হাজার টাকার লোকসান হোতো। সজী একথা বিশ্বাস না করার কারণ খুঁজে পেলো না। এ নিয়ে স্বাভাবীর সাথে বিশদ আলোচনা করার অসুবিধা ছিল অনিলার কাছে প্রথম মিলনরাত্রের প্রথম প্রতিশ্রুতি এক সময় একাকী দোতলার পেছনের বারান্দায় দাঁড়াবার সময় সজীব স্বগতোক্তি করলো, হায় ভগবান, স্নেহ, মায়া মমতার কাছে টাকা বড়! ব্যবসায়ের ব্যবস্থামত, সজীবের আসার খবর আগে জেনেই হরিপ্রিয় আড়তে চলে গিয়েছিল। সজীব যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বগতোক্তি করছিলো, ঠিক সেই সময় আড়তে হরিপ্রিয়ের সাথে তার সহকারী গঙ্গাপদর কথাবার্ত্তা চলছিলো। সহকারী বলে, এভাবে বসে থাকলে অনেক টাকার ক্ষতি হবে আপনি চুপচাপ কি ভাবছেন বুঝতে পারছি না।

হরিপ্রিয়—কিছু বুঝতে হবে না গঙ্গাপদ, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।

গঙ্গাপদ "যে আজ্ঞে" বলে চলে গেলে হরিপ্রিয় স্বগতোক্তি বললো, হায়, ভগবান, এরা কি বুঝবে, স্নেহ মায়া মমতার কাছে টাকা কত তুচ্ছ!

যাহোক, সেবারে সঞ্জীব শ্বশুরালয়ে তিনদিন কাটিয়ে কলকাতা ফিরে আসে এবং কর্মস্থলে যোগ দেয়।

পনর

অনিলাকে বিয়ে করে সঞ্জীব নিজেকে পরম ভাগ্যবান ও সুখী মনে করে। শ্বশুর মহাশয়ের অস্ত্রোপচারের ব্যাপারটা মাঝে মাঝে তার মনকে পীড়া দেয়। কিন্তু অনিলার কাছে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে অনিলার কাছে তার বাবার কোন প্রসঙ্গ তুলে তাকে বিব্রত করা অসমীচীন বলে মনে করে। একদিন দেখে সঞ্জীবের দেখা হয় তার বন্ধু এডভোকেট প্রদ্যুম্নের সাথে। সঞ্জীবের বিয়েতে প্রদ্যুম্ন বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল। প্রদ্যুম্নকে দেখা মাত্রই সঞ্জীব বলে ওঠে, কিরে? সেই বরে বিয়েতে গিয়েছিলি, তারপর আর তোর পাত্তাই নেই।

প্রদ্যুম্ন—বন্ধুর বিয়ের পরে বন্ধুর বাড়ী ঘন ঘন যাওয়া ঠিক নয়। সে যাকগে, বউ কিন্তু চমৎকার পেয়েছিস্।

সঞ্জীব—তাই প্রদ্যুম্ন, আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করি। সব দিক থেকেই অনিলা অনন্যা।

প্রদ্যুম্ন—সে কথা একশবার খাঁটি। তবে……

সঞ্জীব—তবে কিরে? কিছু বলার থাকলে বল।

প্রদ্যুম্ন—তাই তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, উত্তর দিবি?

সঞ্জীব—উত্তর দেবার থাকলে ঠিকই দেবো। (কিছুক্ষণ ভেবে) তবে তাখ্ আর যা খুশী জিজ্ঞেস কর্তে পারিস্, কিন্তু অনিলার বাবার বিষয় নিয়ে নয়।

প্রদ্যুম্ন—তুই কি করে ধরে নিলি, তোর শ্বশুর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবো।

সঞ্জীব—কিছুই আশ্চর্যের নয়। আমরা সাধারণ মানুষ; সাধারণ মানুষ যে ব্যাপারের চিন্তা বা কথা এড়াতে চায় তাই-ই তার সমস্ত মনটা জুড়ে বসে থাকে। আমার পক্ষে সেটা অবশ্য ক্ষতির কারণ হবে না সেটাই বিশ্বাস আছে।

প্রদ্যুম্ন—তোর শ্বশুর সম্পর্কে একটা কথা ঘটনাচক্রে শুনতে পেয়েছিলাম কয়েক দিন আগে। কোথায় ঠিক মনে নেই। তাই ভেবেছিলাম তোকে জিজ্ঞেস করে খবরটা ভেরিফাই করে নেবো।

সঞ্জীব—কিছু প্রয়োজন নেই ভাই, যথাসময় সব জানতে পারবো।

প্রদ্যুম্ন—ঠিক আছে, আর কখনও তোর কাছে এ প্রসঙ্গ তুলবো না।

সঞ্জীব—অন্য কারোর কাছেও তুই এ নিয়ে আলোচনা করবিনে। আমার এ অনুরোধটা তুই অবশ্যই রক্ষা করবি। (ক্ষণকাল ভেবে) হ্যাঁ, একটা কথা প্রদ্যুম্ন, তোকে আমি মিসআনডারষ্টাণ্ড করছি না, তুইও আমায় করিসনে। শ্বশুর মহাশয় আর যাই হোন, অসৎ বা দুশ্চরিত্র হতে পারেন না কিছুতেই।

প্রদ্যুম্ন—কেন? অনিলার বাবা বলে?

সঞ্জীব—হ্যাঁ, অনিলার বাবা এবং অনিলার মা অনামিকা দেবীর স্বামী বলে।

প্রদ্যুম্ন—স্যাখ্, যা আমি শুনেছি তা মোটেই নিন্দা বা অপবাদের কিছু নয়। তুই যখন চাসনা, তখন সে কথাও তোকে আর বলছি না। তোর অনুরোধ আমি অক্ষরে অক্ষরে মানবো, তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।

সঞ্জীব—অসংখ্য ধন্যবাদ। (ক্ষণকাল থেমে) ভাল কথা প্রদ্যুম্ন। অনিলার জন্য একজন ভাল টিউটর ঠিক করে দে। ইংরেজী, বাংলা, সিভিকস্, অঙ্ক ও লজিক নিয়ে প্রাইভেট আই-এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ও এবং আমরা সবাই আগ্রহী।

প্রদ্যুম্ন—বেশ তো, অধ্যাপক দত্ত রিটায়ার্ড্ ম্যান্। সব সাবজেক্টই উনি ভাল করে পড়াতে পারবেন। দত্তের বাড়ী তোদের বাড়ী থেকে খুব দূরেও নয়।

সঞ্জীব—ঠিক আছে, অধ্যাপক দত্তকে একদিন আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আয়। ওর সঙ্গে কথা বলে সব পাকা ব্যবস্থা করা যাবে। মাসে ২০০ টাকা করে দত্ত সাহেবকে দেওয়া যাবে বলিস্।

এর পরে এরা নিজ নিজ মোটরে উঠে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

অনামিকার শেষ চিঠি পাওয়ার পরে প্রায় মাস দেড়েক কেটে গেছে। মাতা বিমলাসুন্দরী অনামিকার জন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যে অনামিকার আর কোন চিঠি না পেয়ে। অনামিকার শেষ চিঠিতে লেখা "অগ্নিপরীক্ষা", "নূতনবাড়ী" প্রভৃতি কথাগুলি তাঁর কাছে রহস্যময় বলে মনে হোলো। বিমলা একদিন অধ্যাপক পত্নী মীরাদেবীকে বললো, দিদি, আমি তো আর নিশ্চিন্তি থাকতে পারছি না। মেয়ে কামাখ্যের একটা খোঁজ খবর নেওয়া তো দরকার। আপনারা ছাড়া আমার আর কে আছে যে খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করবে। মীরাদেবী বিমলাকে আশ্বাসের কথা বলে এবং দেবাশীষের কাছে গিয়ে বিমলার চিন্তার কথা তোলে। দেবাশীষ বলে, দেখি এ ব্যাপারে কি করা যায়।

দেবাশীষ তার এক পুরানো বন্ধু পুলিশ ইনস্পেকটর সুরজিত ভাদুড়ীকে আসার জন্ত খবর দেয় চিঠির মারফতে। ইনস্পেকটর ভাদুড়ী চিঠি পাওয়ার পরের দিনই দেবাশীষের বাড়ীতে এসে হাজির হয়। দেবাশীষের কাছে অনামিকা সম্পর্কে সব কথা শুনে সুরজিত বলে অনুসন্ধানের কাজটা পুলিশের হাতে দেওয়া ঠিক হবে না। তাতে অনামিকা দেবীর ক্ষতি হতে পারে।

দেবাশীষ—তাহলে কি করে খোঁজ পাওয়া যাবে?

সুরজিত—একটা উপায় বের করতে হবে। আমার এক বন্ধু মলয় মজুমদার প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাজ করে। সরকারী লাইসেন্স্ ওর আছে। মলয় অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। ডিটেকটিভের কাজে ওর খুব নাম। ও কাজ চায়, যত জটিল তত ভাল। টাকার লোভ তেমন নেই, ঘোরাফেরার খরচ বাদে অল্প টাকাই ও কাজ হাতে নেয়।

দেবাশীষ—বেশ তো, ওকেই তাহলে তুমি এন্গেজ করো।

সুরজিত—তিনকড়ির আদি বাসস্থানের ঠিকানা, ওর বর্তমান অনুমানিক বয়স আর অনামিকার আগেকার ও সাম্প্রতিক লেখা কয়েকখানা চিঠি আমাকে দাও। ওগুলোর উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করতে হবে।

বিমলা তার বাক্স খুলে চিঠিগুলি বের করে এনে দেবাশীষের হাতে দেয়। দেবাশীষ তিনকড়ির নাম ঠিকানা ও বয়স লেখা এক টুকরো কাগজ ও চিঠিগুলি একটা খামে পুরে সুরজিতের হাতে দেয়। সুরজিত খামখানি নিজের কলিঙ্গ ব্যাগের মধ্যে রেখে দেয়।

দেবাশীষ—কদিনের মধ্যে খবর পাওয়া যেতে পারে, মনে করো।

সুরজিত—কিছু বলা যায় না, মাসখানেকের কমও হতে পারে, বেশীও হতে পারে। মুস্কিলের কথা হচ্ছে, ব্যাপারটা আত্মগোপন নিয়ে। অনুসন্ধান কার্য এমন ভাবে চালাতে হবে যাতে অনামিকা দেবীর কোন ক্ষতি না হয়।

দেবাশীষ—ঠিক আছে ভাই, যা ভাল বোঝো তাই করবে।

এরপরে চা ও খাবার খেয়ে সুরজিত নিজের ফ্লাটারে চড়ে কর্মস্থলের দিকে চলে যায়।

ষোল

কয়েকদিন পরের কথা। সন্তোষ সরকারী কাজে বারাসতে আসে এবং সরকারী ডাক বাংলোয় ওঠে। ঐ দিনই তার কর্মকেন্দ্র কলকাতা ফিরে যেতে হবে। ঘণ্টাখানেকের জন্ত সে শ্বশুরবাড়ীতে একটা আকস্মিক দর্শন দিয়ে আসার মতলব করে। হয়তো ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তখন বেলা ৩টা। হরিপ্রিয় ঐ সময় লুঙ্গি পড়া অবস্থায় ছিলেন। দাঁড়ি গোঁফ কামানো হয় নাই দুদিন ধরে কোন কারণে। দেখতে বেশভূষায় হরিপ্রিয় তখন তিনকড়ির মতই হয়ে ছিলেন। সন্তোষের গাড়ী যেমন হরিপ্রিয়ের বাড়ীর সদর গেটে এসে থামল, হরিপ্রিয় সেই অন্তত মুহূর্তে গামছা কাঁধে করে নিকটস্থ কোন পুকুরে স্নানের উদ্দেশ্যে গেট অতিক্রম করে যেতে উদ্যত ছিল। সন্তোষ সবিস্ময়ে বলে

উঠল, তিনকড়িদা না! হরিপ্রিয় একটা ঘাবড়ানোর ভাব দেখিয়ে "যে আজ্ঞে, হ্যাঁ" এই বলে দ্রুত পদক্ষেপে চলে যায়। তিনকড়ির এরূপ আচরণ সজীবের কাছে খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হোলো। কিন্তু তিনকড়ি এ বাড়ীতে কেন এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই তার মনে জাগলো। সজীব উপরে দোতলায় উঠতেই "এসো বাবা, এসো বাবা," সম্বোধন করে অনামিকা এগিয়ে এসে জামাইকে অভ্যর্থনা জানায়। সজীব শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে। ছেলে মেয়েরা তখন স্কুলে। ঘণ্টা দুই আগে শ্বশুর মহাশয় কোথায়ও গিয়েছেন এবার অনামিকার কাছ থেকে সজীব এসেই জানতে পায়। অনামিকা দোতলা থেকে বাড়ীর গেটের সামনে স্বামী ও জামাতার মুখোমুখি দর্শন, কথাবার্ত্তা সবই লক্ষ্য করেছিল। কাজেই সহজ সরলভাবে স্বামীর অনুপস্থিতির কারণ দেখানোর প্লান অনামিকা আগেই ঠিক করে রেখেছিলো। সজীব খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে কয়েকটা কথার পর জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা মা, তিনকড়ি নামে এ বাড়ীতে কেউ থাকে বা আসে?

অনামিকা—কি জানি বাবা, ওঁর তো কাঠের কারবার, কতলোক আসে কতলোক যায়; কেউ কেউ বাইরে কোথায়ও খেয়ে দেয়ে বারান্দায় শুয়ে বসে চলে যায়। উনি আপত্তি করেন না।

সজীব এ কথায় কৃত্রিমতার বিন্দুমাত্র আভাষ পায় না। সব কিছু স্বাভাবিক বলেই প্রতীয়মান হয়। এর পরে সজীব চা ও টিফিন খাওয়া শেষ করে শাশুড়ীর কাছে বিদায় নিয়ে মোটরে উঠে কলকাতার দিকে চলে যায়। তিনকড়ি ইতিমধ্যে স্নানপর্ব সেরে একতলার একটা এটাচডবাথে ঢুকে বিশ্রাম করছিলো। অনামিকা ঐদিন বৃষ্টির জোরে একটা মস্ত ফাঁড়া কাটাতে সমর্থ হোলো। যে মিথ্যাচরণের ফল শুভ ও কল্যাণকর, সে মিথ্যাচরণ তার মনকে এতটুকু দুর্বল করতে পারেনি। সজীব কলকাতার বড়ৌতে এসে মাকে তিনকড়ির কথা বললো। অনিলার ঘরে গিয়ে যখন তার সারপ্রাইজ ভিজিটের কথা তাকে বললো, তখন অনিলা একটু কোড় দেখিয়ে বল্লো, আমার প্রথম অনুরোধ রাখলে না তো? আমাদের বাড়ীতে সারপ্রাইজ ভিজিট দেওয়াটা সেদিক থেকে তোমার ঠিক হয়েছে কি?

সজীব, ভেরি সরি, ভেরি সরি অনিলা, আর এরূপ কখখনো করবোনা। এবারের মত আমায় ক্ষমা করো। অনিলার মুখ আবার খুশীতে উদ্ভাসিত হোলো!

লাইসেন্স্ প্রাপ্ত প্রাইভেট গোয়েন্দা তার অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। মজুমদার বুঝেছিল এ অনুসন্ধানের কাজটী আপাতঃ দৃষ্টিতে সহজ হলেও আসলে সহজ ছিল না। অনুসন্ধান করতে গিয়ে যাদের তিনি সন্ধান চান তাদের কোন ক্ষতি করে না বসেন। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষের অনেক সময় আত্মগোপনের প্রয়োজন ঘটে। তিনকড়ির পৈতৃক নিবাস বীরগঞ্জে গিয়ে মজুমদার তিনকড়ির খোঁজ খবরে লেগে যান। বিভিন্ন লোকের সাথে আলাপ করে জানতে পারেন তিনকড়ি বহুকাল পূর্বে গ্রামের পৈতৃক বাড়ী ঘর জোত জমি ছেড়ে চলে গেছেন সপরিবারে। কোথায় চলে গেছেন তা কেউ বলতে পারে না। স্থানীয় পোষ্ট আফিসের পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করে মলয় মজুমদার তিনকড়ি সম্পর্কে কোন তথ্যই আদায় করতে পারেন নাই। গ্রামবাসী ২।৪ জন লোক মজুমদারকে জানালো তিনকড়ি নাম বদলে নূতন নাম নিয়েছে। নূতন নাম তাদের মনে পড়ছিল না। তিনকড়ি সম্পর্কে এ খবরটুকু নিয়ে মলয় মজুমদার তার কর্মস্থলে চলে যান এবং পরবর্ত্তী কার্য্যপন্থা নিয়ে ভাবতে থাকেন। বিমলা প্রদত্ত অনামিকার চিঠিগুলির কাগজের উপর ইংকের দিল পরীক্ষা করে বিরাটি, বনগ্রাম, রায়নগর, কলিকাতা, প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গার নাম আবিষ্কার করে বিশেষ কোন সূত্র খুঁজে পেলেন না। রায়াসতের পোষ্টাল সিল কোন চিঠিতেই না থাকায় একটা ক্ষীণ সন্দেহের অবকাশ উপস্থিত হোল এবং পরবর্ত্তী সন্ধান কার্য্যের সহায়ক হিসাবে অনুমিত হোলো।

দিন পনের বাদে। সেদিন ছিল রবিবার। ১টার সময় খাওয়া দাওয়ার পরে যথারীতি কথাবার্ত্তার মজলিস বসেছে অজ সমরেশ মিত্রের একতলার হল ঘরে। মাকু

খানে কয়াস ঢাকা শতরঞ্চের উপর সমরেশবাবু উপবিষ্ট আছেন একটা তাকিয়া বালিশ ঠেশ দিয়ে। চারদিকে ছেলেমেয়ে বউয়ের অনেকেই বসে আছেন। নূতন বউ অনিমার নিজের হাতে রান্না বহুরকমের জিনিস, বিশেষ মাংস নামধেয় একটী জিনিস খেয়ে সবাই ওর রান্নার তারিফ করছিলো।

অনিমা শ্বশুর মহাশয়কে জিজ্ঞেস করে—বাবা কিসের মাংস ওটা বলুন তো?

সমরেশ—কি জানি মা, খেতে তো চমৎকার লাগলো।

অনিমা—বাবা, বান মাছের মাংস, মাছ বলেও কেউ মাংসের মত করে রান্না করা চলে, কেউ ঠিক পাবে না।

প্রদীপ বলে ওঠে—ভাবু ভাল, লাপ বলোনি যে বৌদি, তাহলে বমি টমি করে ভরে মারাই যেতাম।

অনিমা বলে, আচ্ছা বাবা, তা হয় কেন? অনেক কিছু না জেনে খাওয়াতে খারাপ কিছু হয় না। আর খাওয়ার পরে তা জানলে যত বিভ্রাট।

সমরেশ—মা, ওটা মনের অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার।

অনিমা অজ্ঞাতসারেই প্রশ্নটা শ্বশুর মহাশয়ের কাছে তুলেছিল। কিন্তু সহসা মনে পড়লো তার নিজের বিয়েটাও এখন পর্যন্ত একটা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় জড়িয়ে আছে। আর সে জটিলতার ফাঁস কাটাতে হবে তার মা, বাবা ও নিজের ধীর স্থির দীর্ঘ প্রচেষ্টায়। অনিমার স্বল্পক্ষণ অন্যমনস্কতার মাঝে সমরেশবাবুর কথাবার্ত্তা চলছিলো অন্য সবার সাথে। সমরেশ বাবু বিবাহিতা বড় মেয়ে নীলিমাকে লক্ষ্য করে বললেন—মা নীলু, সীতেশ যে অমিয় বলে একটি ছেলের কথা জানিয়েছে, সে কেমন হবে আমাদের কেতকীর সাথে? সীতেশ সমরেশবাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা ও কেতকী জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথমা কন্যা। নীলিমা পিতার প্রশ্নের উত্তরে বলে—বাবা, সে অনেক কথা; অমিয়বাবু সেল্ফ মেড ম্যান। সামান্য লেখা পড়া করে অর্থাৎ আই-এ ফেল করে বয়সের সীমা পার হওয়ার ভয়ে সামান্য পিওনের কাজ নিয়ে পোষ্টাফিসের চাকুরীতে ঢোকে। তারপর নিজের চেষ্টা ও যোগ্যতার জোরে এখন পোষ্টাল সুপার হয়ে বসেছে। বাড়ীর অবস্থা ভোল চাল বদলে অভিজাত শ্রেণীর পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তবে কায়েত ঘরের খুবই নীচু বংশের ছেলে এই যা।

সমরেশ বাবু "লিফ্‌ট থেকে শুরু - আবার নীচু বংশের" স্বগত বললেন এবং তারপর প্রকাশ্যে, তা ছোক, ছেলেটি সুপ্রতিষ্ঠিত, সুন্দর ও সুপাত্র।

বংশ টংশের আর দিন নেই মন্তব্য করে প্রদীপ

কমিউনিজমের দিন, সব একাকার হোক এই তোরা চাস্ মুখ টিপে হেসে বলেন সমরেশ বাবু। তারপরে নীলিমাকে লক্ষ্য করে বলেন—মা নীলু, সম্বন্ধটা তাহলে তোমাকেই বলতে হবে, দেখিস হাত ছাড়া না হয়। স্ত্রী বিদুষীর স্বামীর কথায় সায় দেন।

প্রদীপ বলে ওঠে, তা হলে কমিউনিজমেরই জিত বাবা।

অনিমার মুখ চোখ চাপা আনন্দে ভরে ওঠে। তার বাবা মায়ের অগ্নিপরীক্ষায় সফলতার ইঙ্গিত পায় এবং কথাবার্ত্তায় ছেদ দিয়ে। সমরেশ বাবু প্রদীপকে লক্ষ্য করে বলেন, তাখ প্রদু, কমিউনিজম আনে বিপদ, বিশৃঙ্খলা। মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সমান, সবাইর খেয়ে পরে বেঁচে থাকার সমান অধিকার থাকবে এবথা বলাও বলার জন্য ঐ ইজম্ লাগেনা বাবা। এরপর ঐ দিনের মত মজলিস ভেঙ্গে যায়।

সতের

বিপদ ও বিশৃঙ্খলা সত্যই উপস্থিত হোলো জজ পরিবারে, দিন সাতেক পরে। জজের বাড়ীর সবাই বিষন্ন ও চিন্তাগ্রস্ত। বছর বছর আগে স্থানীয় চরবাজারের কাছে ডাকাতির ব্যাপারে যে আসামীরা খালাস পেতে সমর্থ হয় তাদের অন্যতম নেতাকে পুলিশ সম্প্রতি গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে। সংগৃহীত নানা ধরনের সূত্র ধরে গোয়েন্দা পুলিশ সন্ধান কার্য্য চালায় বহুদিন ধরে। শেষটায় কাশী ধামে মনিকর্ণিকা ঘাটে সাধুর ছদ্মবেশে আসামীকে আবিষ্কার ও গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত আসামীর থলি উদ্ধার করা তাইরীতে অন্যান্য নামের সাথে প্রদীপ মিত্র

নামে এক যুবকের নাম পাওয়া যায়। প্রদীপের নামের সাথে থাকে জজ সমরেশ মিত্রের ঠিকানা। কোন দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে প্রদীপের নাম ডাকাতির সাথে সম্ভবত জড়িত করা হয় কোন সক্রিয় অংশে দেখা না গেলেও সমরেশ বাবুর ছেলে প্রদীপের নাম কমিউনিষ্ট পার্টির তালিকায় যুবকর্মী হিসাবে হয়ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। যত আসামীকে আরও তেরজন সাপক্ষে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে চালান দেয় এবং প্রদীপকে ডাকাতির ব্যাপারে গৌণভাবে জড়িত করে তার উপর সমন জারি করা হয়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ডাকাতীর সময় ডাকাতদের ট্যাক্সিতে বিশেষ দুইটি বালকও ছিল। যাহা হউক সমন জারিতে জজের বাড়ীর সবলে ত বটেই—প্রদীপ নিজেও আশ্চর্য্য ও হতবাক হয়ে যায়। নিজের নিরপরাধত্ব ও ডাকাতিতে যে সে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট নয় তা প্রতিপন্ন করার জন্য প্রমাণসহ তাকে কোর্টে বিবৃতি দিতে হবে। সমন জারির তারিখের ১০ দিন পরে বেলা ১১টায় কোন এক নির্দিষ্ট তারিখে তার হাজিরার দিন ধার্য হয়েছিল।

এখন ডাকাতির তারিখের পরের দিন ছিল প্রদীপের জন্মদিনের উৎসব। ডাকাতির দিন তিনকড়ি প্রদীপকে নিয়ে আংটি কেনার জন্য বের হয় সূর্য্যাস্তের একটু আগে একথা সমরেশ বসুর বেশ মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অকলে কোন্ দোকানে আংটি কেনা হয়েছিল কেউ জানে না, প্রদীপও কিছু স্মরণে আনতে পারে না। এদিকে ডাকাতি হয় আংটি কেনার কাছাকাছি সময়। সমরেশ বসু দেখলেন, এ বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে তার তিনকড়িকে একান্ত প্রয়োজন। তিনি কাল বিলম্ব না করে বাংলা বিভিন্ন খবরের কাগজে ব্যক্তিগত স্তরে প্রকাশ করার জন্য একটা বিবৃতি পাঠান। বিবৃতিটি এইরূপ—"তিনকড়ি দাস, যেখানেই থাকো আমার সাথে দেখা করো। আজ সোমবার, আসছে শুক্রবার আমার এখানে বেলা দশটার ভেতরে আসা চাইই। পুরানো অভিমান তোমার এখানে আসার যেন অন্তরায় না হয়। আমার বিপদ গুরুতর। ইতি রিটায়ার্ড জজ সমরেশ মিত্র, বালীগঞ্জ গার্ডেন কলিকাতা ... সতীশ বারাসত গিয়ে তিনকড়ির সন্ধান পাওয়ার জন্য কয়েক দিন ঘুরে ফিরে ছিল। এ ব্যাপারে সতীশ আগে থেকে হরিপ্রিয়কে খবর দিয়ে তবে বারাসতে আসতো। কাজেই তিনকড়ির ধরা পড়ার কোন আশংকা ছিল না।

অনিলা তখন শ্বশুর বাড়ীতে ছিল। সে সমস্ত ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝে সব কথা জানিয়ে বাবাকে চিঠিগুলি নিকটবর্ত্তী পোষ্ট বক্সে নিজেই ফেলতো, অন্য কাউকে দিয়ে এ কাজ করতো না। শ্বশুরমহাশয়ের বাড়ীতে বাবার তিনকড়ি হিসাবে যাওয়াটা অনিলার একটুও প্রীতিপ্রদ ব্যাপার না হলেও, বাবাকে আসার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লেখা ছাড়া তার কোন গত্যন্তর ছিল না। সতীশ তখন ২ দিনের ট্যুরে কলকাতার বাইরে ছিল।

সমরেশ বসুর ব্যক্তিগত বিজ্ঞপ্তি পরদিনই প্রধান প্রধান বাংলা খবরের কাগজগুলিতে বেরোয়। ভোর বেলা খবরের কাগজ খুলে এদিক ওদিক চোখ বুলোতেই নোটিশটি হরিপ্রিয়ের চোখে পড়ে। ঘন্টা খানেক পরে অনিলার লেখা চিঠিও সিওন এসে দিয়ে যায়। স্ত্রী অনামিকাকে জজের বিজ্ঞাপন ও অনিলার চিঠি দেখায়। বিজ্ঞাপন দেখে ও অনিলার চিঠি পড়ে অনামিকা বিশেষ বিচলিত হওয়ার ভাব দেখায় না। হরিপ্রিয় কিন্তু ভীষণ বিষন্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং অনামিকাকে বলে ওঠে "এবার আমার চরম বিপদ উপস্থিত"। অনামিকা বলে, বিপদ মোটেই নয়, বিপদ কাটার পূর্বলক্ষণ, এবার তোমার মুক্তিলগ্ন উপস্থিত।

হরিপ্রিয়—অনিলা আবার শ্বশুর বাড়ীতে আছে, কি মুস্কিলে যে আমায় পড়তে হবে। আর অনিলার কি বিশ্রী অবস্থাটা হবে তাও ভাবছি।

অনামিকা—তুমি নিজেকে সামলে ঠিক ভাবে চলো, অনিলা তোমাকে কোন অসুবিধায় ফেলবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৭৩)

নিত্যগোপাল, আমার প্রাণের দেবতা, বিপ্লবের ঠাকুর, তুমি আসিয়াছ সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বস্তরের বিপ্লব লইয়া, নূতন করিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যে। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ববিধ বিপ্লবের মূল আধার তুমি, কেন্দ্র তুমি। তোমাকে ঘিরিয়া বিশ্বের সব বিপ্লব আন্দোলন বিকশিত হইতেছে। ধর্ম্ম দর্শন পরিবার সমাজ রাষ্ট্র যত রকম সম্বন্ধের উপর দাঁড়াইয়া আছে, তুমি সেখানে পরশীর রসের প্রবর্ত্তন করিয়া এক নূতন বৈপ্লবিক সামগ্রিক বিশ্ব রচনা করিবার জন্য প্রকট। মুঠা মুঠা প্রাণ ছড়াইয়া তুমি গেলে—অথচ তোমার ভাব, তোমার সম্প্রদায়ের ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত, তাহারা অনড় অচল, একেবারে কাঠ পাথর। ইহারা এমনই প্রতিক্রিয়াশীল যে, যে কোন প্রগতিমূলক আন্দোলনকে ইহারা বাধা দিয়া আসিয়াছে। ইহারা গোঁড়া বর্ণাশ্রমী, অথচ তুমি মূর্ত্তিমান ভাগবত ধর্ম্ম, বিপ্লবন ধর্ম্ম। আমি যে আর পারিয়া উঠিতেছি না। ইহাদের 'আপন' বলিয়া কিছু নাই, দামনের বলিয়া কিছু নাই। তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই।...রেণুর কোঁড়াটা কাটাইবার জন্য সুবোধের ওখানে যায়। তাহাকে পায় না।... বৈকালে কাটিয়া গিয়া অনেক পুঁজ রক্ত পড়ে।...ঘণ্টার পর রেণু প্রেসে যায়। কভার ছাপানো কাল হইবে ঠিক করিয়া আসে। যি কে পালের দেওয়া বই 'পঞ্চপত্র' ...পড়ি। লাগিল মন্দ না। রেণু দীর্ঘদিন আমার কাছে আছে। তাহার শরীরে রোগ লাগিয়াই আছে। আমি তো কিছু করিতে পারিলাম না। কাহারও কিছু আমার দ্বারা হইল না। বড় দুঃখ। 'সকল রকমে কাঙাল করেই গর্ব্ব করিতে চুর'। আমার কি এতই গর্ব্ব যে তাহা চূর্ণ করিতে আমাকে সকল রকমে কাঙাল করিবার প্রয়োজন ছিল? কিসের আমার জীবনের অগ্রগতির জন্য? এত প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া সারা জীবন চলিলাম। তোমার সেবা কিছু করিতে পারিলাম না। তোমার জীবন ছিল, দর্শন ছিল। মানুষেরও তোমার দর্শন ও জীবন দিয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তোমার সঙ্গে বিশ্বের যোগ বিধান করিতে আমার যে শক্তি-সামর্থ্য থাকা দরকার ছিল, তাহা কোথায়? আমার বল দেও তোমাকে বিশ্বদরবারে পৌঁছাইব। জীবনে আর কোনও আকুতি নাই।...

২১শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি মুক্তির মহামন্ত্র লইয়া এলে, তুমি মুক্তির ঘন-বিগ্রহ—এ মুক্তি—আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, বিশ্বজনীন। এ মুক্তি ভোক্তার শোষণ হইতে ভোগ্যের মুক্তি, ভোগের বিষয়ের আকর্ষণ হইতে ভোক্তার মুক্তি, নরের শোষণ হইতে নারীর মুক্তি, নারীর প্রলোভন হইতে নরের মুক্তি—এ যে অন্নমুক্তি, প্রাণমুক্তি, মনমুক্তি, বিজ্ঞানমুক্তি, আনন্দমুক্তি। যেখানে যত কামের বন্ধন থাকিতে পারে, সব-কিছু হইতে মুক্তির দর্শন ও জীবন লইয়া তুমি এলে। তোমাকে তো বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছাইতে পারিলাম না। বড় বেদনায় ব্যথায় আমি জর্জ্জরিত। বলিয়াছ, 'শরৎ, যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি'। আমার বল ভরসা ইহাই। 'সঙ্গে সঙ্গে আছি'—তাহাই থাকিও। বড় একা আমি।...ধীরেন ডাক্তার সকালে আসে, অটোক্যাকসিনের জন্য রেণুর কোঁড়া হইতে vaccine নেয়।...রেণু ১১টার পর বাহির হয়।... গুরুভ্রাতা জনরঞ্জন রায় গত রবিবার বৈকালে নিত্যধামে গত হইয়াছেন। তিনি আমার কাছে শতবার্ষিকীর

বার্তা লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি তো প্রায়ই এখানে থাকিতেন না। সেজন্য তাঁহাকে সরাইবার জন্য —-এর কি আগ্রহ ছিল! সব শেষ! একা কি করিয়া কাজ করিব? আমার সঙ্গে তো কাহারও মেলে না? কাহারও বুকের ভিতর তো বিপ্লবের আলো নাই। গতানুগতিকতার ঠাকুর তো নিত্যগোপাল নন। গতানুগতিকতার পথ ছাড়িয়া তিনি যে এক নূতন পথের খোঁজ দিয়াছেন। সেই বলে তিনি লিখিয়াছিলেন যে বর্ণবিভাগ-কৌলীন্য এ দেশের প্রচুর অপকার করিয়াছে। আজ জহরলাল তাহা বলিতেছেন। মঠে কার্যকরী সমিতির সভা হয়। নবদ্বীপ মঠের ওঙ্কারানন্দ আসে। উৎসবের পূর্বেই মূর্তি প্রস্তুত করানো স্থির হয় কি, পাল এণ্ড সন্স-এর ওখানে ১০০০৲ টাকায় দুইটী! রমাপতিবাবু ১০০০৲, নীলরতনবাবু ২০১৲, তারিণীবাবু ২০১৲, খগেনবাবু ৫১৲, আমি ২৫৲, আশুবাবু ২৫৲ টাকার প্রতিশ্রুতি দেন।... জি পি আই হইতে রেণুর কাছে পত্র আসিয়াছে ক্লাস VI এর র‍্যাপিড রীডার পরীক্ষা করিবার জন্য।...

২২শে সেপ্টেম্বর

নিত্যগোপাল, জগন্নাথ আমার, তুমি প্রাণের স্তরে বিশ্ব-সংঘ রচনার জন্য প্রকাশিত হইবে। সকল ভেদ বৈষম্য, সকল হানাহানি, শক্তি লইয়া সকল কাড়াকাড়ি, সকল শোষণের দর্প চূর্ণ করিয়া তুমি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দিব্য আদর্শ স্থাপন করিবে। মানুষ মানুষকে কোলে লইয়া ধন্য হইবে। বিশ্বের অন্তরাত্মা তোমার চরণে শরণাগত, কবে তাহার বাহির তোমার প্রেমে গলিয়া যাইবে, মিলিয়া ঘন হইবে? সেই দিনের অপেক্ষায় আছি। সেই দিনকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য আমাকে প্রাণপণ ছুটিতে দেও, কড় আনিবার মত বুকে বল দেও, আবেষ্টনকে সৃষ্টি করিবার মত সুযোগ দেও। ইহাই আমার মুক্তি। আর তুমি আমার জীবনে মুক্তির ঘন বিগ্রহ, নিরঞ্জন, নিষ্কলঙ্ক, শুভ্র, জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।...রেণু বাহির হয়।... আমি ৪টার পর মঠে যাই। ৭টার পর ফিরি। রমাপতিবাবুর কাছে টিনের চালাটার ভিত্তি তৈয়ার করাইবার জন্য খগেনবাবুকে বলিতে বলি। এমন করিয়া কি কাজ করা যায়?...হৃদয় বলিয়া বর্তমান মানুষের কিছু নাই। বুদ্ধি ও অর্থ এই দুই স্তরের। প্রাণদানের টাকা হয় না। বুদ্ধির পথ short-cut-এর পথ, diplomat-এর পথ; আর প্রাণ চলে সমগ্রতার পথ ধরিয়া সেখানে সাময়িক অর্থ-সঙ্কটের পথ পরিষ্কার হয় মাত্র। বাহির জোগ প্রাণের স্তরে হয় না। বুদ্ধি কখনও প্রগতিবাদী নয়, সে calculating...। প্রাণ প্রগতিবাদী, ভবিষ্যতের দিকে তাহার দৃষ্টি।

২৩শে সেপ্টেম্বর

নিত্যগোপাল, বিশ্বাত্মন্, সঙ্গী আমার, তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ জীবনে মরণে প্রতি পার্শ্বে, প্রতি বুদ্ধি-স্পন্দনে, প্রতি প্রাণ-স্পন্দনে। তোমার কোলে বিশ্ব জন্মিতেছে, ভাসিতেছে, ডুবিতেছে। তুমি অনাদি অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন অপরিমেয়। তুমিই বিশ্বের শরণ, বিশ্বের হৃদয়। সকল হৃদয় দিয়া আমি তোমাকে জড়াইয়া রহিব। তুমি আমি এক অদ্বৈত-তনু, অদ্বৈত-প্রাণ, অদ্বৈত-মন, অদ্বৈত-বিজ্ঞান, অদ্বৈতানন্দ, একাত্মা। তোমার জয় হউক আমার আদিতে, আমার সর্বেতে। আমি তোমারই প্রকাশরূপে তোমার ভিতরে থাকিব, আমার ভিন্ন সত্তা মুছিয়া যাউক। তুমি আমি এক অবিচ্ছিন্ন। তোমার আমার বিচ্ছেদের আশা ঘুচিয়া যাক। কার-বিচ্ছেদকে অবিচ্ছেদে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশ্বে তুমি স্পন্দিত। তুমিই সেই অকাম-কাম মদনমোহন। আসন করি। রেণু খাওয়ার পর বাহির হয়।...বিজ্ঞাপন মোট ৪০৯ পৃষ্ঠা হইল। এইবারই সব চেয়ে বেশী। বিষয়বস্তু ৬৮ ফর্মা।... ৮টার পূর্বে বি, কে, পাল আসেন। 'নিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে' একবার দেখিয়াছেন। তাহার নিকট রেণু ভাষ্য-প্রদীপের প্রথমটা পড়িয়া শুনাই। ধীরেনও আসে, তাহার পর তাহার স্ত্রী ও কন্যাও আসে। প্রাণধারার কার্য কারণ সম্বন্ধ, উচ্চ নীচ বিভাগ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। Effect কেমন করিয়া cause এর-ও cause হয় তাহা আলোচনা করি। Organism কত স্থান re-build করে, পাপকে পুণ্যে গড়িয়া তুলিতে পারে, অন্যায়ের

উপাখ্যানদ্বারা তাহা বুঝাইয়া দেই। Machine-এ যাহা ভাঙ্গে, তাহা আর সঙ্গে না, তালি দেওয়া যায় নাত্র। Organism-এ তাহা সত্য নয়। কর্ম নরক কল্পনা mechanical philosophy-র দান। অংশও end, whole অংশের সেবক—Both are reciprocally means and end। ৪টার পর বিজয়বাবু যান। অন্না আসে বৈকালে। মিষ্টি নিয়া আসে।…

২৪শে সেপ্টেম্বর

নিত্যগোপাল, সখা আমার, আমার প্রাণে তোমার প্রাণ স্পন্দিত হউক। তুমি আমি সমপ্রাণ হইব। তোমার প্রাণ-সাগরে আমি ডুবিব, মরিয়া বাঁচিব, তোময় হইব।…কেউ আমার জীবনে আমায় দেখিবে না, শুনিবে না। আমার জীবনের প্রতি রন্ধ্রে ফুটিয়া উঠিবে তোমার রূপগুণ; বিশ্ব আমার জীবনে তোমায় দেখিয়া ধন্য হইবে। আমার নাম রূপ ছাপাইয়া ফুটিয়া উঠিবে তোমার নাম রূপ, তোমার আমার বিভেদ বিচ্ছেদ চিরতরে দূর হউক। তোমার কর্ম আমার হউক। তোমার কর্ম আমার জীবনে জয়যুক্ত হউক। 'নারম্ নারম্, তুহুঁ তুহুঁ'। আসন করি। অনেকদিন হইতে হরিতকি খাই—কভু হরিতকি। এখন খাই গরম জল ও হরিতকি গত ১৬ই ভাদ্র হইতে। রেণু ১০টার পর স্কুলে যায়। প্রেক দিয়া আসে। আমার যায় ১১টার পর, ফেরে ৪টার পর।…শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ উল্টাইয়া দেখি। সেখানে আছে—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে 'পাকা আমি'-র স্তরে, বিদ্যামায়ার স্তর পর্যন্ত নামিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি কাম ক্রোধ লোভাদির স্তর, এই অবিদ্যা মায়ার স্তর পর্যন্ত নামেন নাই বা জগদম্বা নামিতে দেন নাই। আমার যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি। এইখানেই শ্রীনিত্যগোপালের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথক। শ্রীনিত্যগোপাল অবিদ্যার স্তর পর্যন্ত নামিয়াছিলেন, তাই তিনি অবিদ্বান লোকদের স্পর্শে কাতর হন নাই। আর শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধিয়া বেদনা পা স্পর্শ করিলে। তিনি প্রাণের অন্ন খাইতে পারিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ সরল অনাড়ম্বর ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্তি, আর শ্রীনিত্যগোপাল জটিল কুটিল জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই নিজের দুই চোখ হইতে বলিলেও বলিতে পারেন—'সাধু সাবধান!', 'সেখানে বেশী যাস্‌নি' ইত্যাদি বাক্য। তিনি কামিনী কাঞ্চন হইতে ভীত ছিলেন। শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন 'নির্ভিক'। ইহাই শ্রীনিত্যগোপাল বৈশিষ্ট্য। মিনুর মানসিক অবস্থা ভাল নয়। আমার এখান ও সংসারে নাকি কোনও পার্থক্য নাই ইত্যাদি সে বলে। হায় ভগবান! সংসারের কোনও চালচলনই কি আমার আছে?

২৫ শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি আপনার হতেও হও আপনার। আমি আমার কাছে যত না নিজ, যত না আপনার, তাহা হইতেও তুমি আমার বেশী নিজ, বেশী আপনার। তুমিই সমূল—আমি নিত্যগোপাল-মূল হইব। মূল যেমন মাটী হইতে রস আহরণ করে, আমি তুমি মূল-হইতে বিশ্বের, বিশ্বেশ্বরের রস আহরণ করিব। তুমিই আমার মূল সত্তা, মূল চৈতন্য, মূল আনন্দ। আমি-প্রাণের প্রাণ তুমি, চক্ষুর চক্ষু তুমি, দেহের দেহ তুমি, সত্তার সত্তা, চৈতন্যের চৈতন্য, আনন্দের আনন্দ তুমি। আমার আমির মূল তুমিই। তোমার আমি আমার আমির ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমার চৈতন্য আনন্দ আমার চৈতন্য আনন্দের মাঝে মিশিয়া উঠুক। আমার আমি তোমার আমির দেহ। তুমি দেহী আমি দেহ। দেহ-দেহী ভেদ আমার জীবনে বিলুপ্ত হউক।…৪টার পর আমি ও প্রতিভা মঠে যাই। পাঠ আরম্ভ হইলে রেণু ও গোপা যায়।…বিদুর তার সমস্ত শক্তি যুধিষ্ঠিরকে দিয়া বৃক্ষের সঙ্গে লয় থাকিয়া, দেহ ত্যাগ করেন। দেহ তাঁহার দাহ করা হইল না, কেন না দৈববাণী ঐরূপ। …রমাপতিবাবু ও নীলুরতনবাবু আমাকে ট্রাষ্টী হওয়ার কথা বলেন। আমি রাজি নহি। সুরেশ দেব আসেন ৪টার পর। মঠের ঝগড়ার কথা তিনি জানেন। আমি ছাড়া মঠের আর কেহ দ্বিতীয় মুখপাত্র নাই ইহা তিনি বলেন। ৮টায় আমি ও প্রতিভা আসি। সুধাংশু বাবু খুব অসুস্থ।

২৬ শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমিই আমার আমি, তুমিই আমার আমার—তোমাকে দিয়াই আমার 'আমি' ও 'আমার' ভাব সার্থক করিব। তোমাকে আমি 'আমি' বলিয়া ভাবিব—ওগো আমার 'আমি', তোমাকেই আমার যাবতীয় সম্বন্ধের বিষয়ীকৃত করিব। তুমি আমার পিতামাতা, আমার স্ত্রীপুত্রকন্যা, তুমি আমার ধন-জন, মান-প্রতিষ্ঠা। আমার এই ভাব যাহা-যাহাকে আশ্রয় করিয়া স্ফুরিত হয়, সেই সব-কিছুই তুমি। তোমার শ্রীচরণে আমি সার্থক হইব, তোমাকে জীবনে সার্থক করিব। তোমাকে যদি চিনিতে বুঝিতে আস্বাদন করিতে এবং আস্বাদন করাইতে না পারিলাম, আমার জীবনই ব্যর্থ। পাইয়াও পাইলাম না—ইহার চেয়ে বেদনার আর কি হইতে পারে? কিছুতেই আমি ব্যর্থ হইব না, তাহাতে যে তুমিই ব্যর্থ হইবে। তোমার জয় হউক আমার সকল জীবনে।...রেণু ১২টার পর বাহির হয়। কিরণ ল্যান্স, বাটা, আনন্দবাজার, যুগান্তর...আসে। আসিয়া আবার এন. সি. গুহ ও প্রেসে যায়...।...রমাপতিবাবু নীলরতনবাবুর সঙ্গে কথা হয় ঠাকুরের বিষয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার স্তর পর্যন্ত আর শ্রীনিত্যগোপাল অবিদ্যার স্তর পর্যন্ত নামিলেন। তাই পণ্ডিতদের নিয়াই তাঁহার যতকিছু মেলামেশা। পরমহংসদেব ভক্তদের আগমনের জন্য মায়ের কাছে বলিতেন। শ্রীনিত্যগোপাল বুঝি বা অভক্তদের জন্য আসিয়াছিলেন। আমরা একদল অপদার্থ তাঁহার আশ্রয় পাইয়া তাঁহার কিছুই বুঝি নাই। নীলরতনবাবু বলেন, বেত মারিলে হয় বুঝিতাম, নয় সরিয়া পড়িতাম। কালোর মায়ের মত মেয়ে নিয়াও তিনি ছিলেন। কি অসীম শক্তি। ব্রহ্মের পরিপূর্ণ প্রকাশ। তাদের নিয়াই তো ছিলেন। তবুও মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেন। পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষকে বর্ণাশ্রম ও ভাগবতধর্মের পার্থক্য মানুষের কাছে উপস্থিত করিবার জন্য বলি। হরিস্মরণানন্দ পূর্ণেন্দুবাবুকে বলিয়াছেন (ক্ষিতীশ বলিল), আপনার কথা কেমন বুঝি, পুরুষোত্তমানন্দের কথা বুঝি না। আমার কথায় তো বর্ণাশ্রমের প্রশংসা নাই, ব্রাহ্মণ-কৌলীন্য বা সন্ন্যাস-কৌলীন্য নাই। কেন উহারা বোঝেন না তাহা আমি বুঝি। উহারা অনড়, তাই বিভ্রম বোঝেন না।...৮টার পর আসি। রমাপতিবাবুর সঙ্গে বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়।...শৈলেশ সেনের পিতা ঈশান সেন গত রাত্রিতে মারা যান। তাঁহাকে শ্মশানে আনা হয় ২টায়। খবর পাইয়া শ্মশানে যাই।

২৭শে সেপ্টেম্বর

সে-মানুষ খুঁজে ফিরি

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

মানুষ পাইনে খুঁজে, সে-মানুষ, কোথাও, কোথাও;
যে বলে, আনন্দে আছি, আমার অভাব কিছু নেই,
আমি খুশী যা পেয়েছি সুখ দুঃখ, ভাল-মন্দ নিয়ে,
অভিযোগ নেই কোনো—সহজ জীবন ঘরে চলি।
'নেই' 'নেই' চারিদিকে—কী অতৃপ্ত মানুষ সবাই!
সঙ্কীর্ণ জীবনবোধে যাঁরা পড়ে কেঁদে কেঁদে মরে,
সীমার বাইরে আছে কত আলো, কত না বিস্তার,
রুদ্ধ কক্ষে বসে বসে হা-হুতাশ করে আর কাঁদে।
এতটুকু পেলে হাসে, এতটুকু হারালে বেদনা—
হায় তবু, কিছু দিতে ব্যথা বাজে ছোট সে-হৃদয়ে;
এত ছোট সে-হৃদয়, অসীমের ছায়া পড়ে না যে
সে-হৃদয়ে—কী অসীম ব্যথাভার, কে নামাবে তাকে।
সে-মানুষ কোথা পাই খুশি মন যার পানে চেয়ে,
প্রসন্ন প্রশান্ত মূর্তি, কথা বলে ভাল করে, খুশি
পেয়ে কিংবা না পেয়েও; ছোট ছোট লাভ-ক্ষতি নিয়ে
করে না সে অভিযোগ, আনন্দের চির অধিকারী।
এ মানুষ ছিল, আছে হয়তো বা এখনো কোথাও,
তবু আমি তার দেখা পাই নে কো, ভাবি বুঝি নেই।
তাই খুঁজে খুঁজে ফিরি, দেখা তার পেতেই যে হবে,
তা না হলে এ আঁধারে থাকবো কেমন করে আমি।

পারিবারিক জীবন-আলোচনা

॥ ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আর একদিন

[স্থান : কল্পনার বসবার ঘর। সবই আগের দিনের মত—তবে আজ কল্পনা এ ঘরেই আছে। ঘনা নেই, এষাও আসেনি]

অপ—আজ কল্পনা দেখছি এ ঘরেই আছো। ব্যাপার কি ?

কল্পনা—আজ 'ঘনা' বল্লো যে বাচ্চাদের নিয়ে সে-ই আজ ওঘরে থাকবে।

[এষার প্রবেশ]

ছবি—এই যে এষা এসে গিয়েছ, খুব ভালো হোয়েছে। আজকে তোমার বক্তব্য বিষয়টী নিয়েই তাহোলে আলোচনা সুরু করা যাবে।

এষা—ও, সেই যে আমি বলেছিলাম যে, বুঝে জেনেও অনেক সময়ই তো আমরা সেই মত কাজ করে উঠ্‌তে পারি না—সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়নি তো সেদিন !

অপ—হ্যাঁ, আজ প্রথমেই আমরা ঐটী নিয়েই সুরু করব আলোচনা ; আর মনে হয় সারাটী সময়ই লেগে যাবে এতে। প্রথমতঃ বোঝা দরকার যে ঠিক মতো জেনে বুঝেও যদি আমরা সেই মত কাজ করে না উঠ্‌তে পারি তাহোলে নিশ্চয় কোথাও কোনরকম বাধা আছে বলেই সেটা করা সম্ভব হোচ্ছে না। এখন দেখা যাক্, এই বাধা কোথায় এবং কীভাবে থাকতে পারে ! এসব জানতে পারলে তবেই তো সে বাধা দূর করা বা অন্ততঃ দূর করতে চেষ্টা করা সম্ভব হবে !

অঙ্ক—প্রথম বাধা, যেটায় আমি ভুক্তভোগী, সেটী হোচ্ছে শরীরের ক্লান্তি। যতই পরিশ্রম করি না কেন, শরীরটা যদি কোন রকমেই ক্লান্ত হোয়ে না পড়ে, তবে আমার মনে হয়—আমি যা কিছু করতে চাই, সবই করে ফেলতে পারি।

এষা—আমার বাধা কিন্তু তাই আমি বেশ বুঝতে পারি যে আমার মনেই রয়েছে—অবশ্য বাইরের কারণ থেকেই তার উৎপত্তি হয়েছে।

ছবি—কি রকম ?

এষা—ঐ যে বলেছিলাম আগের বার আলোচনার সময় ! সংসারে মেয়েরা,—বিশেষ কোরে আমার বয়সী মেয়েরা—নিজের সম্বন্ধে তো বটেই—এমন কি নিজের স্বামী সন্তানের জন্যও যদি বিশেষ কোরে কিছু করতে চাই, সেটা যেন খুবই একটা স্বার্থপরতা ও নিন্দার কথা হোয়ে পড়ে। মনে সব সময়ই একটা বাধা তো থাকেই যে "কী জানি কেউ কিছু মনে কোরবেন না তো" ! এই ভেবে অনেক সময়ই "থাক্, সুখের চেয়ে শান্তি ভালো" ভেবেই অনেক সময় আমি অনেক কিছুই করি না যেখানে সত্যি বুঝিও যে করা খুবই দরকার।

অপ—আচ্ছা, প্রথমে শারীরিক কারণে যে সব বাধা থাকতে পারে সেই আলোচনাই হোক। দেখো ভাই অঙ্ক, পৃথিবীতে কিছুই তো অসীম নয় ! সব কিছুরই একটী শেষ সীমা আছে। শরীরেরও কাজ করার ক্ষমতার একটী সীমা তো থাকবেই ! তার আগে শরীর তো তাই জানিয়ে দেবেই যে ক্ষমতা কমে আসছে—এবার বিশ্রাম করে সেই ক্ষমতা আবার ফিরিয়ে আনা দরকার ! এটা না কোরলে তো আমরা সুস্থই নয় বলতে হবে, তাই না ? কাজেই ক্লান্তিবোধ করলে বিশ্রাম করাই তো ভালো। অবশ্য কাজ না কোরেও যদি ক্লান্তি-বোধ হয়—তবে অন্য কথা। সাধারণতঃ বেশী কাজের ফলে যে

ক্লান্তি-বোধের জন্য কাজ করা বন্ধ করতে হয়—সেটা আমি ঠিক শারীরিক বাধা বলতে চাই না। অন্য অনেক শারীরিক বাধার কথা ভাবতে পারা যায়। যেমন কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল অথবা 'কম জোর' থাকলে হতে পারে।

ধর যেন এক অষ্টাশীপর বৃদ্ধ বাসে উঠে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে এক ২১ বছরের ছেলের মনে হল যে তার উচিত উঠে দাঁড়িয়ে ঐ বৃদ্ধকে তার বসার জায়গাটী ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু তার হয়তো দারুণ দুর্ঘটনায় পা দু'টী এমনই অকর্মণ্য যে দু'টী লাঠির সাহায্যে সে কোন রকমে দাঁড়াতে বা অতিকষ্টে চলাফেরা করতে পারে। অতএব দাঁড়িয়ে চলমান বাসে সে সকলের অসুবিধারই সৃষ্টি করবে—এজন্য সে যে সব জেনে বুঝেও ঐ বৃদ্ধ সম্বন্ধে তার কর্তব্য করতে পারলো না এটা আমরা তার শারীরিক বাধার জন্যই বলতে পারি।

অঞ্জ—কিন্তু ক্লাস্ত হোয়ে পড়াটা ঠিক শারীরিক কারণে বলতে পারি না কেন?

অপ—তবে শোন; সেই যে সময়ের সদ্ব্যবহারের কথায় বলেছিলাম যে একটি জরুরী কাজের তালিকা করে নিতে হয়, তেমনই শারীরিক শক্তি সম্বন্ধেও ওই একই ভাবে চলতে পারলে ভালো। তবে দিন রাত্রির ২৪ ঘণ্টার যেমন একটি স্থিরতা আছে, মানুষের শক্তির তেমন কোন স্থিরতা নেই। তারপর সকলের শারীরিক গঠন বা শক্তি একরকম হয় না। তাই প্রত্যেককে নিজ নিজ শক্তি সম্বন্ধে আগে বুঝতে হয়; তারপর কোন্ কাজটী কোরতে কতটা সময় তার লাগে বুঝে নিয়ে কোন্ কাজটী সবচেয়ে জরুরী সেই মত নিজ বা তালিকা হিসাবে দেখতে হবে কতটা কাজ সে করতে পারবে। অনেক সময় দেখা যায় যে একজন হয়তো সকালের দিকেই বেশী কাজ কম সময়ে বা কম শক্তি খরচ কোরে করতে বা ভালো কোরে করতে পারে; আবার অনেকে হয়তো রাতে সব নিখুঁত হোলেই ঐ রকম পারে। কেউ বা একসঙ্গে ৮।১০ ঘণ্টা কাজ করে তারপর পুরোটা সময় বিশ্রাম চায়—কেউ বা মাঝখানে ১।০ ঘণ্টা বিশ্রাম করে নিলেই আবার বেশীক্ষণ বা বেশী পরিমাণে বা বেশী ভালো করে কাজ করতে পারে। এসব ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধাগুলিও মনে রেখে তবেই পুরো কাজের লিষ্ট্ কোরে নিতে পারলেই ভালো হয়।—তাহোলে আর অত্যধিক কাজের পর ক্লান্তিকর কষ্টও পড়তে হয় না, আর কাজ সব শেষ করা গেলো না বোলেও আক্ষেপ থাকে না।

অরুণা—তাহোলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা টাকা পয়সাটী যেমন সাবধানে ভেবে চিন্তে খরচ করে থাকি, সময় সম্বন্ধেও ঠিক সেই রকমই সাবধান হোতে হবে, এবং নিজের শক্তি সম্বন্ধেও। এবার ভেবে দেখো অঞ্জ, সত্যি কোন্ কোন্ কাজগুলি তোমার না কোরলেই নয় এবং কোন্ কাজগুলি না করতে পারলেও তেমন ক্ষতি হবে না।

অঞ্জ—হ্যাঁ, শুধু আমি ভেবে দেখে এটা বুঝলেই হবে যেন, বাড়ীর বড়দেরই আগে এসব বোঝা দরকার।

অরুণা—সত্যি, আমরা বড়রা এবং বড়োদেরও বড়রা আমাদের ছেলেমেয়েদের ওপর অনেক সময় তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে শাসন করতে গিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের উপর কিছু কিছু অন্যায়ও কোরে ফেলি। তবে আমাদের ছেলেমেয়েরা তো বড় হোয়েই গেছে—এখন বুঝেই বা আর তাদের কী সুবিধা করতে পারি? যখন এসব অন্যায় কোরে ফেলেছি তখন তো আর বুঝে করিনি—বুঝতে পারিনি বোলেই তো করে ফেলেছি।

ছবি—ছেলেমেয়েদের একেবারেই শাসন না থাকলে যা ক্ষতি হয়, তার চেয়ে শাসন করলে কম ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে বলেই তো আমার বিশ্বাস। তবে তাদের দিকটাও মনে রাখতে পারলে আরো ভালো। তাছাড়া স্নেহের প্রকাশও থাকতে হবে বৈকী। যাই হোক—আমার মতে it is never too late। এখনও আমরা তাদের এটা বলতে পারলে তারাও আমাদের আর একটু ভালোভাবে বুঝতে এবং ভালোবাসতে পারবে—তাই না?

অভয়া—তবে, অঞ্জ তো ছোট শিশু নয়, সে-ও তো বড়দের একটু তার নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা, ক্ষমতা অক্ষমতার কথা বলে বুঝাতে চেষ্টা কোরতে পারে!

এষা—আমার মনে হয়—ওরও আমার মতই অবস্থা, অর্থাৎ ওর মনে হয় যে, কেউ হয়তো পছন্দ কোরবেন না এরকম বলাটা—ভাববেন যে 'কাজ করতে ইচ্ছা নেই বোলেই ওসব বলছে'—তাই না অঞ্জ!

অঞ্জ—এখন তো তাই মনে হোচ্ছে দেখছি। তবে শুধু মায়েদেরই নয়, বাড়ীর পুরুষদের কথাও এখানে খুবই প্রযোজ্য।

অপ—হাঁ, এসব নিয়েও আমাদের পরে অনেক আলোচনাই হবে, তবে আপাততঃ আমরা যেসব বাধা মনেই রয়েছে বলে এখানে বলেছি অন্ততঃ এষা বলেছে—সেইটী নিয়েই আলোচনা করব। প্রথমতঃ এ বাধাটীর যখন বাইরের অর্থাৎ সংসারের আবহাওয়া থেকেই উৎপত্তি হোয়েছে তখন এটাকে কেন বাইরের বাধা না বোলে মনের বাধা বোলেই এষার মনে হোয়েছে সেটাই দেখা যাক।

যদি এ রকমভাবে দেখি যে আমরা সবাই সর্বক্ষণই তিনটী জগতের মধ্যে রয়েছি তবেই জিনিষটা বুঝতে সহজ হবে মনে হোচ্ছে। প্রথমে দেখো, আমরা যা কিছু বুঝি সবই আমাদের চেতনা দিয়েই তো বুঝি! এই চেতনা-বোধটি মনোজগতেই ঘটছে। অন্তর্জগতে অন্তর্দ্বন্দ্বে যে আমরা সকলেই কোন না কোন সময় কষ্ট পেয়ে থাকি, সেটা ভাবলেই মনোজগৎটী বোঝা খুবই সহজ হবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের শরীরের মধ্যেই অবস্থিত চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ ও ত্বক্—এ সবের মাধ্যমে আমরা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ উপভোগ করতে পারি। আমাদের চেতনাবোধই এই উপভোগ করতে আমাদের সাহায্য করে—তাই তো? তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বাইরের জগৎ থেকে আমরা আমাদের শরীরের সাহায্যেই মনোজগতে কতকগুলি চেতনাবোধ জাগাতে পারি ও সেগুলি উপভোগ করতে সমর্থ হই। অর্থাৎ এরই সময়ে আমরা তিনটী ক্ষেত্রে চেতনা দিয়ে যুক্ত থাকছি।

ছবি—দেখা যাচ্ছে যে তুমি অন্তরজগৎ আর বহির্জগতের মাঝখানে শরীরকেও একটী জগৎ বোলেই বোঝাতে চাইছো!

এষা—তাতো হবেই; কারণ শরীরের সুস্থতা-বোধও তো আমরা আমাদের চেতনা দিয়েই অনুভব করে থাকি, অন্তর জগৎ আর বহির্জগতে যা কিছু ঘটছে সে সব ছাড়াও!

অপ—হাঁ। এখন দেখ কতকগুলি বাধা শুধু বহির্জগতেই থাকতে পারে, কতকগুলি বাধা শুধু মনোজগতেই থাকতে পারে! আবার কতকগুলি বাধা এই দুয়েরই এক এক রকম সংমিশ্রিত প্রভাবের জন্যই ঘটতে পারে।

এষা—এবার বুঝলাম আমাদের বাধাগুলি হোচ্ছে ঐ সংমিশ্রিত প্রভাবের ফল!

অপ—তা বোলতে পারো। তবে মনো জগতে এর উৎপত্তির সময় ও কারণও বার করা দরকার।

অঞ্জ—তবে মনোজগতেও তো বাধার উৎপত্তি হোতে পারে!

ছবি—এবং বহির্জগতেও!

গায়ত্রী—তাহোলে মনোজগতের সঙ্গে শরীর জগতের এবং শরীর জগতের সঙ্গে বহির্জগতের সংমিশ্রিত প্রভাবের ফলেও তো আরও দুইধরণের বাধার সৃষ্টি হোতে পারে।

চপলা—আরে বাবা, এ যে একেবারে অঙ্কশাস্ত্র এসে গেলো দেখ্‌ছি।

উষা—হাঁ, তাই তো, এবার এই তিনজগতের সংমিশ্রিত প্রভাবের ফলে কোন রকম বাধা সৃষ্টি হোলো আমাদের অঙ্কশাস্ত্রটী সম্পূর্ণ হয়।

অপ—সে তো মিলেই আছে! কারণ মনই তো এই তিনজগৎকে উপভোগ করছে।

অশোকা—(অভয়াকে) কি গো, সব বুঝতে পারছো?

অভয়া—(অশোকাকে)—তুমিই কি সব বুঝতে পারছো না কি?

ইন্দিরা—সত্যি, আমরা ব্যাপারটাকে যতটা জটিল ভেবে ভাবছি—এটা ঠিক ততটা জটিল মোটেই নয়। সোজা কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে বাধার যদিও তিন জায়গা থেকেই উৎপত্তি হোতে পারে তবু আমাদের মনেই আমরা এই বাধাটী অন্তত করতে পারি এবং সেই মত কাজ করে থাকি।

আশা—আচ্ছা, 'বাধা' নিয়ে আর বিতর্কে না গিয়ে এবার এসব বাধা দূর করার উপায় কি হোতে পারে—সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলে কেমন হয়?

অনঙ্গ—আমরা একটু বেশী অসহিষ্ণু হোয়ে পড়ছি নাকি? যদি এবিষয়টী ভালো কোরে বোঝা না গিয়ে থাকে—তবে এ সম্বন্ধেই তো আরও কিছুক্ষণ ধোরে আলোচনা হওয়া দরকার!

করুণা—অসহিষ্ণু হবার অবস্থায় এসে পড়লে অসহিষ্ণু হওয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে বলো? আমার মতে এবিষয়ে তো অনেক আলোচনা হোল; সকলেই আমরা যথেষ্ট চিন্তা করার বিষয় পেলাম, সুবিধা মত চিন্তা করে আর একদিন এ নিয়ে বসলেই ভালো হয়। আপাততঃ "এষা"র প্রশ্নটীর উত্তর যাতে দেওয়া যায়, সেটা করাই দরকার।

অপ—সেই ভালো।—দেখ, সংসারে বহু রকম আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, বাধা বিপত্তি, সহযোগিতা অসহযোগিতা···ইত্যাদির মধ্য দিয়েই আমাদের পথ করে করে চলতে হয়। আমরা অনেক জিনিষ করা ঠিক বলে মনে কোরেও যখন সেসব কোরে উঠতে পারি না—তার নিশ্চয়ই খুবই যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে।—এইটি মনে রাখতে পারলেই—কারণটী খুঁজে বের করার ইচ্ছা আসে—এবং তাহোলে সেজন্য ঠিকই সময়ও করে নেওয়া যায়—যাতে এবিষয়টী ভেবে ভেবে দেখে দরকার হোলে অন্যের সঙ্গে আলোচনা কোরে কোরে ঠিক কারণটী বুঝে নিয়ে বিচার করে দেখা সম্ভব হয়—কোথায়, এই বাধার সৃষ্টি হোচ্ছে এবং এই বাধার ফলে কোথায়, কতখানি আর কত জনের উপকার বা অপকার হোচ্ছে। ঠিক ভাবে বিচার করে চলতে পারলে বাধা কমই থাকবে—আর যতটুকু থাকবে, তাতে ততটা ক্ষতিও হবে না!

আশা—কিছুই পরিষ্কার হোচ্ছে না ভাই অপরাজিতাদি! বাধা থাকলে অপকারই তো হবার কথা—উপকার হবার সম্ভাবনাও যে আছে তাতো আগে বলোনি?

অপ—ও, আমি ভেবেছি তোমরা এমনিতেই বুঝবে। যাই হোক, ছোটছেলে বার-বার একই দোষ করতে থাকলে আমাদের কী তাকে ধরে দু-চড়ক দিতে ইচ্ছা করে না?

আশা—করেই তো—দিতেও থাকি দু চড়ক—নইলে তারা তো এমনিই বরে না ভালো করে বারণ করলে!

অপ—তবে দেখ, প্রথমেই আমরা তাদের দু চড়ক দিই না তো! সেটা তো আমাদের মনে "ছোট ছেলে কিছু কিছু দোষ ত্রুটী করবেই তার জন্য তাদের মারাটা উচিত নয়" এই রকম একটী বাধা মনে আছে বলেই তো তাদের কিছুটা উপদ্রব সহ্য করে থাকতে পারি আমরা—তাই না? এটা আমাদের সহিষ্ণুতা দেয়।

আশা—তা ঠিক। আর এতে বাচ্চাদেরও হয়তো কিছুটা উপকার হয়।

অতসী—আরে এরকম লক্ষটা উদাহরণ আমি দিতে পারি। মনে যদি কোনরকমই বাধা না থাকতো তবে কি আর আমরা কোন ভালো কাজের জন্য কোনরকম কষ্ট স্বীকার কর্তে পারতাম? ঐ যে প্রথম কেসটীর কথা বলেছিলে অপরাজিতা তার স্বামীর অবহেলায় তার তো মেয়েকে দু'চোখ যায় চলে যেতেই ইচ্ছা হোয়েছিল—কিন্তু সন্তানদের ফেলে যেতে নেই এই 'বাধা' বোধটীর জন্যই তো সে ঐ অন্যায় কাজটী করেনি। কোথাও কোন 'বাধা' বোধ না থাকলে আমরা তো পশুর মতো জীবন যাপন করতাম!

ছবি—তাই তো বলেছিলাম যে একেবারেই শাসন না থাকার চেয়ে শাসন থাকাটা বরং ভালো—কারণ এটাতেই ভালো মন্দ বিবেচনা এনে দেয়। তাতে ভালোই হয় সকলেরই।

ছবি—আর শাসনটী বেশী মাত্রায় হোয়ে গেলে কিন্তু

মনে অত্যধিক বাধা সৃষ্টির ফলে তার কার্যকারিতা কমিয়ে দিয়ে তার কিছুটা ক্ষতি হবার সম্ভাবনাও এনে দেয়! তবে অত্যধিক শাসনের কথা তো আমরা এখানে বলছি না।

অপ—আমি অল্প কথায় এইটুকুই বলতে চেয়েছি যে সাধারণতঃ আমরা যা করা সহজ ও দরকার মনে করি সেটাই করে চলি। কোনও অসুবিধা বা বাধার সম্মুখীন হোলে সে কাজটা এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করে থাকি। তবে কখনও কখনও এমনও হয় যে ঐ বাধাটা খুব বড় বলে মনে হয় যে আমরা যেন এড়িয়ে না যেতে পেরে ডুবেই যাই ঐ বাধাটার মধ্যে। এ দু'য়ের কোনটাই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয় না। তার চেয়ে ঐ বাধাটার বিষয় নিয়ে একটু বিস্তৃতভাবে, সমগ্রভাবে যদি দেখতে চেষ্টা করি তবেই তার সমাধানের উপায়টা বার করা সহজ হয়।

উষা—আমার মনে হয় 'এষা' যে প্রশ্নটা তুলেছে সেই বিষয়টা নিয়েই যদি আমরা সমগ্রভাবে দেখতে চেষ্টা করি তবে সকলেরই বুঝতে সুবিধা হবে।

আলো—হ্যাঁ, সেই ভালো; কথাটা উঠেছিলো এই নিয়ে যে আমরা আমাদের অসুবিধার কথা বাড়ীর লোকদের বার বার বলতে চাই না—আমরা মনে করি তাতে তাঁরা হয়তো আমাদের স্বার্থপর বলে মনে কোরেছেন।

অপ—আচ্ছা, তাহোলে বল, এতে আমরা কি এটাই বোঝাতে চাই যে আমাদের কোন অসুবিধা নেই? না, আমরা আমাদের অসুবিধা হোলেও স্পষ্ট কোরে সেটা মেনে নিই তবু অন্যকে সে কথা না জানিয়ে তাদের অসুবিধায় ফেলতে বা কষ্ট দিতে চাই না—এটাই বোঝাতে চাই। অথবা এটাই বোঝাতে চাই যে আমার বাড়ীর লোকেরা এমনই স্বার্থপর যে তারা আমার অসুবিধার কথা গ্রাহ্য কোরবে না জেনেই আমি আর তাদের কিছু বলি না—এটাই বোঝাতে চাই?

এষা—অসুবিধা নেই, এটা তো নিশ্চয় বোঝাতে চাই না।

ইরা—তাহোলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা নিজের কাছে (এবং অন্তর কাছেও) হয় এটাই জাহির করতে চাইছি যে আমি অসাধারণ ভালো—অথবা আমার বাড়ীর লোকেরা অসাধারণ খারাপ।

এষা—তাই বা কি কোরে বলি।

ইরা—তাহোলে দেখা যাচ্ছে যে এ দু'য়ের কোনটাকেই আমি বাদ দিয়ে—মানে অমনি বলে উড়িয়ে দিতেও পারছি না অথচ ঠিক বলে মেনে নিতেও পারছি না!

আলো—তার মানে বোধহয় যে দুটোই কিছু কিছু সত্য—অথচ কোনটাকেই সম্পূর্ণ একটাতে আনা যাচ্ছে না!

অপ—এইরকম একটা 'দোমনা' ভাবই আমাদের জীবনকে বেশী বাধাগ্রস্ত করে থাকে।

ইরা—তা এটা থেকে কি করে মুক্তি পাওয়া যায়?

ছবি—সম্পূর্ণ মুক্ত হোতে কেউই পারে না, কি বলো অপরাজিতা?

অপ—হ্যাঁ—তবে এসম্বন্ধে সচেতন থাকলে কতকটা সুবিধা হয় বৈকী, যাতে একটাকেই বেশী দাম দিয়ে সেইমত ব্যবস্থা করা যায়।

ছবি—হ্যাঁ—তা বটে; তবে অসাধারণ ভালো হবার ইচ্ছা ও চেষ্টাই বা কেন থাকলো—সেটাও তো বোঝা দরকার। সেটা বুঝতে গেলে শিশুর মানসিক বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য কিভাবে গর্ভাবস্থা থেকে শৈশবে ও কৈশোরে হোতে থাকে সে সম্বন্ধেও আলোচনা হওয়া দরকার।

অপা—সে আর একদিন হবে। আপাততঃ এই বোঝা গেলো যে 'অতিভালো ভালো নয়'। সবকিছুই সাধারণ মত হওয়াই ভালো।

ছবি—তুমি যে 'অতিভালো ভালো নয়' বোলছো—তার কিন্তু একটা চলতি অর্থও আছে।

ইরা—হ্যাঁ জানি—যেমন "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ"। তা, সেখানে তো ইচ্ছে কোরেই অন্যকে ঠকিয়ে নেবার জন্যেই লোকে নিজেকে ভীষণ ভালো লোক বলে দেখিয়ে থাকে!

ছবি—হ্যাঁ। তাছাড়া সেখানে আমরা সাধারণ

বিষয়বস্তু যেমন টাকা পয়সা বা জিনিষ পত্রের ব্যাপারে ঠকিয়ে বা ভুলিয়ে নেবার কথাই ধরে থাকি।

গায়ত্রী—অপরাজিতা হয় তো বলে বসবে যে এসব বিষয়বস্তুর মত অন্যের কাছ থেকে স্নেহ-মমতা, বা প্রশংসা প্রভৃতি পাবার ইচ্ছা, ও সেজন্য যা হোলে সেসব পাওয়া যেতে পারে সেই মত কাজ করে—সে সব পাবার ইচ্ছার একটা মিল আছে।

অপ—(হাসিয়া) তা বলতে পারি অবশ্য। আর সেটা সত্যি কথাই বলা হবে। তবে কী জানো আগেরটা হোচ্ছে সজ্ঞানে অর্থাৎ ইচ্ছা করে করা হোচ্ছে—আর পরেরটা যে ঘটছে তার উপর অতটা সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা যেন থাকছে না! কতকটা যেন মনের অবচেতন অংশ থেকেই এরকম করার উদ্যমটা এসে পড়ছে!

জয়া—নাঃ, আজ আলোচনাটা যেন জটিল থেকে জটিলতর হোয়েই চলেছে। অনেক সময় লাগবে আজ আলোচনা শেষ হোতে।

কল্পনা—আচ্ছা, আচ্ছা, এসব নিয়ে আর একদিন আমরা আলোচনা করব। 'এষা'র প্রশ্নের উত্তর হিসাবে 'এষা' যদি এই পর্য্যন্ত আলোচনায় কিছু বুঝে থাকে তাহোলে আমরা আজ এখানেই শেষ কোরতে পারি।

এষা—আমার উত্তর আমি পেয়ে গেছি। আমার হোয়ত ভাবের কথা তো আমি ভালোভাবেই বুঝি কিনা। সেবার মায়ের অসুখের সময়ে ঠিক এইভাবে আমি আমার নিজের সংসারটা রেখে মাকে দেখতে যাবো কি না ভাবতে ভাবতে যাওয়াই আর হোল না। তবে মা অবশ্য তার মধ্যে ভালোই হোয়ে গেলেন।

জয়া—তবে আর কি? আনো চা। খেয়ে পালাই। আমার রান্নার কাজ রয়েছে বাড়ীতে।

চপলা—আচ্ছা, বোসই ওর অত তাড়া থাকে কেন বলতে পারো? কল্পনাদি?

কল্পনা—(হাসিয়া) ওর গল্প একদিন বলবো, শোনবার মত গল্প সেটা।

জয়া—সবার সামনেই বলবে নাকি?

কল্পনা—ততদিনে সবাইকে তোমার এত আপন বোলে মনে হবে যে আর কোনও আপত্তি থাকবে না তোমার। (কল্পনার চা-এর ট্রেতে চা আর বাচ্চাদের নিয়ে প্রবেশ) এই নাও চা। খেয়ে পালাও এখন। আমরা ধীরে সুস্থে চা খাবো।

ক্রমশঃ

শক্তির কার্যই হইতেছে 'জমাট বাঁধা', এবং সেই জমাট বাঁধা বস্তুর প্রয়োগে অন্যকে লুঠ করা। এই শক্তি-ক্ষেত্রকে ভক্তি-ক্ষেত্রে গড়িয়া তোলাই পুরুষোত্তমের প্রয়োজন। ধন যখন শক্তি, শ্রম যখন শক্তি, তখন অবাধ লুঠ অনিবার্য; কিন্তু এই ধন ও শ্রম যদি ভক্তিতে পরিণত হয়, তখন উহারাই করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেবা। ভক্তির মধ্যে রহিয়াছে ভজ্ ধাতু। ভজ্ ধাতুর অর্থ 'সেবা করা' ও 'ভাগ করা'। ভক্তির ক্ষেত্রে আদর্শও ভক্ত, ধনও ভক্ত, শ্রমও ভক্ত। জমাট-বাঁধা (crystalised) বা-কিছুকে বিভক্ত (divided) রাখাই ভক্তিবাদ। তখনই হয় ভজনের পূর্ণ সার্থকতা। ভক্তি নিজের সব কিছুকে লুঠ করিয়া দিবারই মনোবৃত্তি; ইহাই 'হরির লুঠ'।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

পুস্তক পরিচয়

বিপ্লবীর জীবন-স্বপ্ন সমবায় সমাজ" লেখক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত এবং যাদবপুর উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী কর্তৃক ১৭ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ৩২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২০০ টাকা।

গ্রন্থের পরিচয় দেওয়ার পূর্বে লেখক সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা আবশ্যক। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত সেই সময়ের মূক-সাক্ষী যে সময়ে তাঁর জন্মভূমি বরিশালে অশ্বিনী কুমার দত্ত, প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, পুলিন দাস সহ কুমার ঘোষ (পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত) এবং আরও অনেক মহা মনীষীর আবির্ভাবে সমগ্র বরিশাল প্রাণ চাঞ্চল্যে উদ্বেলিত। এই শুভ লগ্নে জন্ম গ্রহণ ক'রে শিশুকাল হ'তেই শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মুক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময়ে বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনে প্রথম সারির যে কয়জন নেতা ছিলেন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি এখন ৮০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন। তাঁর এই কর্মবহুল জীবনের মধ্যে অনধিক ২৫ বৎসর কাল স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনের যোদ্ধা হিসাবে কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছেন। দেশের স্বাধীনতা ও দেশ-গঠন কর্মে একজন সক্রিয় নেতারূপে তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত তাঁর স্বপ্ন তাঁর রচিত "বিপ্লবীর জীবন স্বপ্ন —সমবায় সমাজ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৭৭ পৃষ্ঠার এই বইখানিতে লেখক শুধু তাঁর স্বপ্নের কথাই আলোচনা করেন নি, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী দেশের বহু কর্মীর নাম সন্নিবেশ করেছেন এবং সামন্ত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সামাজিক বিবর্তনের ধারা, মহামতি কার্ল মার্কস ও তাঁর মতবাদ, মহাত্মা গান্ধীর অবদান ও তাঁর চিন্তাধারা, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিক মানবেন্দ্র নাথের নব মানবতাবাদ, শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারা, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ভারতের পররাষ্ট্র নীতি পঞ্চশীল প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অল্প কথায় এবং অতি সহজ ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন। এত সব ঐতিহাসিক বিরাট বিষয়-বস্তুর মূলকথা প্রকাশ ক'রেছেন এমন নিপুণতার সঙ্গে, যাকে এক কথায় বলা চলে চমৎকার। যে সব বিষয়-বস্তু এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তাদের প্রতিটি ব্যাপকতা ও গভীরতার বিশাল সেগুলি সবিস্তারে অধ্যয়ন করা ও তাদের সারবত্ত অনুধাবন করা সাধারণের পক্ষে দুরূহ। অথচ আমা বিবর্তনের ধারা বয়ে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছে যখন পৃথিবীর সকল ভাবধারার অন্ততঃ মূল কথার সং পরিচয় না রাখলেও আর আমাদের চলে না। সে বিচারে মনোরঞ্জন বাবুর এই অবদান সাধারণ পাঠক গণে নিকট একটি অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত হবে।

সমবায় কথাটি ভারতবর্ষে নতুন নয়। ভারতবর্ষে ব্রহ্মসূত্রে বহু প্রাচীন কাল থেকেই এর অস্তিত্ব পাওয়া যাবে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন নিয়ে মানুষের সমগ্র জীবন একান্ত ব্যষ্টি জীবনও অর্দ্ধেক মানুষ, একান্ত সমষ্টি জীবনও অর্দ্ধেক মানুষ। এই দুই-এর সমন্বয়েই পূর্ণ মানুষ। এ মানুষই সর্বোত্তম সৃষ্টি। এই মানুষই সবার উপরে সত্য, মানুষ বিজ্ঞান। এর অন্যথাই অসত্য, অবিজ্ঞান এবং অসত্য অবিজ্ঞান বলেই প্রকৃতির মধ্যে এত ক্ষোভ এত শ্রেণী-সংঘর্ষ। সমন্বয়ের স্তরে কোন শ্রেণী সংঘর্ষে অবকাশ নাই।

আজ বেশ কয়েক বৎসর হল আমাদের দেশে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজ চলছে এবং তার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। আমাদের দেশে, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস একেবারেই আশাব্যঞ্জক নয়। এর কারণ যতটা আইন

গত বা কাঠামোগত, তার চাইতে অধিক ভাবগত। "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" সমবায়ের এই গোড়ার ভাবধারা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য একটা বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলা উচিৎ বলে আমরা মনে করি। সমবায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত কঠিন ও পৃথিবীতে নতুনও বটে। যাঁরা সমবায় আন্দোলনে উদ্যোগী হবেন তাঁরা সমবায়ের বিপদের দিক সম্বন্ধে সজাগ থেকে, আচার এবং প্রচারের মাধ্যমে যে পরিমাণে এই ভাবধারাকে জনপ্রিয় ক'রতে পারবেন সেই পরিমাণে সমবায় প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি সম্ভব হবে। জিজ্ঞাসু পাঠক মহলে আমরা এই বইখানা পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই।

শ্রীপার্বতী নাথ বিশ্বাস

আজি হতে শতবর্ষ আগে

শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী

(মহাজাতি সদনে গান্ধী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পঠিত)

আজি হতে শতবর্ষ আগে
মলিন ধরণীধূলি ধূসরিত পথে
তোমার চরণধ্বনি জাগে
আজি হতে শতবর্ষ আগে।
হিংসাদগ্ধ পৃথিবীর দিগন্ত ঘিরিয়া
নিদারুণ পশুত্বের আস্ফালন হবে
অসত্যের রাজপথে লুপ্ত মানবতা
ঘরে ঘরে হিংস্র মারণাস্ত্র ঝন্ ঝন্ রবে
হিংস্রতার প্রতিরোধে অহিংসার পথে
মুক্তির মুধা তব চিত্তে জাগে।
আজি হতে শতবর্ষ আগে
নবযুগের আলোকবর্তিকা জ্বালি
তুমি দেখা নেমে এলে ওগো মহাপ্রাণ!
অন্ধকারে নিয়ে এলে আলো সমুজ্জ্বল
মানবের সত্যতার নব অবদান।
আনিলে করুণা ধারা নব-ভগীরথ
শুষ্ক মৃত মোহাচ্ছন্ন জনতার আগে।
আজি হতে শত বর্ষ আগে—
(তব) অভ্যুদয় সত্য প্রেম মহিমা প্রোজ্জ্বল।
চূর্ণিল বন্ধন তব—অভয় মন্ত্র শিখা
দিলে তুমি ভারতের মোহমুগ্ধ প্রাণে
দুর্বলের ভিক্ষা নহে—সবলের দীক্ষা।
সত্যের গ্রহণ লাগি লাঞ্ছনা-বরণ—
সত্যপথ-সত্যাগ্রহ মিথ্যাচার ত্যাগে।
আজি হতে শত বর্ষ আগে—
তুমি এসেছিলে কবি অহিংসা মন্ত্রের
নিয়ে এলে বর্মে বর্মে অভেদের বাণী
গ্লানিমুক্ত করিবারে মানব সমাজে
পরিহরি ঘৃণা-দ্বেষ হিংস্র হানাহানি
মানুষের অন্তরের কলুষ নাশিতে
মানবে বিশ্বাস প্রেম-মৈত্রী-অনুরাগে।
আজি হতে শত বর্ষ আগে—
(তব) অভ্যুদয় ভারতের নব সূর্যোদয়
তমো হতে জ্যোতির্লোকে মহাউত্তরণ
মহামানবতাতরে তব আত্মদান
ধর্ম তব সত্য লাগি মরণ বরণ।
(তব) আবির্ভাব যুগান্তের মোহ অন্ধ তরে
প্রাচ্যের দিগন্তে-দেব! নবারুণ রাগে
আজি হতে শত বর্ষ আগে।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিতাগোপাল ॥

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় ভক্তই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচারসকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আলোচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ড উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ত্রয়ীতি বহুধা শ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ড উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ড উভয়ই 'এক-তত্ত্ব', সেইজন্য উভয়ই 'অদ্বৈত-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

জনককে নির্ব্বিকারাত্মা বিবেচনায় যদ্যপি 'মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা' বলা হইয়া থাকে, তাহাও আমাদের বিবেচনায় বলা সঙ্গত হয় নাই; কারণ বন্ধেরই মুক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইজন্য সতত-মুক্ত কেহই নহেন। নির্ব্বিকারাত্মাও সতত-মুক্ত নহেন। নির্ব্বিকারাত্মা মুক্তই নহেন। তাঁহার মুক্তির প্রয়োজনই হয় না, কারণ তাঁহার বন্ধন কখন হয় নাই। সুবর্ণনির্ম্মিত প্রস্তর-পাত্র বলার ন্যায় সর্ব্বদা-মুক্ত বা সতত-মুক্ত, এই বাক্য প্রয়োগ হইতে পারে। সুবর্ণদ্বারা যেমন প্রস্তর-পাত্র নির্ম্মিত হইতে পারে না, তদ্রূপ কাহাকেও সর্ব্বকালের জন্য 'মুক্ত' বলা যাইতে পারে না। কোন ব্যক্তি 'মুক্ত' এই কথা শ্রবণ করিলে, তাঁহার কোনদিন বন্ধন ছিল, অবশ্যই বোধ করা যাইতে পারে। সতত মুক্ত, সর্ব্বদা-মুক্ত বা সর্ব্বকালে-মুক্ত বলিলেও, সেই মুক্তের বন্ধন হয় নাই বুঝিবার কোন কারণ নাই। কারণ বন্ধন ব্যতীত মুক্তি হইতেই পারে না। বন্ধনই মুক্তির কারণ। সেইজন্য মুক্তির নিত্যতা স্বীকার করা যায় না। অদ্বৈতমতের সর্ব্ব-শাস্ত্রানুসারেই বন্ধন প্রাকৃত। সেই বন্ধন মুক্তির কারণ বলিয়া, সেই বন্ধনবশতঃ মুক্তির প্রয়োজন হয় বলিয়া, মুক্তিও অনিত্য স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য মুক্তিও 'প্রাকৃত'—সেইজন্য মুক্তিও 'অনাত্ম' স্বীকার করিতে হয়।

নবম সিদ্ধান্ত

প্রথম প্রকরণের সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"একো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরম্॥"

উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকে জনককে 'মুক্ত' বলা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শ্লোকানুসারে জনক মুক্তপ্রায়। মুক্তপ্রায় এবং মুক্ত একই প্রকার নহে, উভয়ে বিশেষ তারতম্য আছে। মুমুক্ষুকেও মুক্তপ্রায় বলা যাইতে পারে। মুমুক্ষু যাহা, মুক্ত তাহা নহে। জনককে 'দ্রষ্টা' বলা হইয়াছে। যিনি দ্রষ্টা, অবশ্যই তাঁহার দৃষ্টি আছে। দৃষ্টি নয়নে থাকে। নয়ন যে আত্মার আছে, তিনি অবশ্যই আকারবিশিষ্ট বা সাকার। দৃষ্টির ক্রিয়াও আছে। জনক দ্রষ্টা ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার দৃষ্টি-

শক্তিও ছিল; সেইজন্য তাঁহার সেই দৃষ্টিশক্তির ক্রিয়াও ছিল। তাঁহার দৃষ্টি-শক্তি ছিল বলিয়া তাঁহার নয়নও ছিল। তাঁহার নয়ন ছিল বলিয়া, তাঁহার আকারও ছিল; কারণ নয়ন আকারেই থাকে। দ্রষ্টার্থে 'সাক্ষী' বলিলেও, দ্রষ্টার দৃষ্টি-শক্তি, নয়ন এবং দেহ স্বীকার করিতে হয়; কারণ সাক্ষীরও ঐ সমস্ত আছে। পূর্বোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকে যে জনককে সর্বদা-মুক্ত বলা হইয়াছে, পর শ্লোকে তাঁহাকেই—

"একো দ্রষ্টাসি সর্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরম্॥"

বলা সঙ্গত হয় নাই। সর্ব-সাক্ষী মুক্তাত্মার আপনাকে অসর্ব-সাক্ষী বোধ করিবার কোন কারণ নাই। সেইজন্য অষ্টাবক্র-বর্ণিত সর্ব-সাক্ষী-মুক্ত জনকাত্মারও আপনাকে বদ্ধ দ্রষ্টা বোধ করা উচিত ছিল না। সর্ব-সাক্ষী মুক্তাত্মার কোন ক্রমে আপনাকে অসর্ব-সাক্ষী-অমুক্তাত্মা বোধ হইলে, বন্ধন এবং মুক্তির সমতা লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে বন্ধন এবং মুক্তি একই বস্তু বলিতে হয়। বন্ধন এবং মুক্তি, উভয়ই প্রকৃতির দুই প্রকার বিকাশ, তাহা পূর্বেই নির্দেশিত হইয়াছে।

দশম সিদ্ধান্ত

অষ্টম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"অহং কর্তেত্যহংমানমহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে 'আমি কর্তা' এই বোধ,—অহঙ্কার এবং অভিমানবশত হইয়া থাকে। উক্ত শ্লোকে অহঙ্কারাভিমানকে 'মহাকৃষ্ণাহি'র সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কোন মহাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে অবগত হওয়া যায়, উক্ত অহঙ্কারাভিমান নামক 'মহাকৃষ্ণাহি' নামের কারণ, নিরহঙ্কার-নিরভিমান নামক 'অস্ত্রধাত্র'। কিন্তু স্বয়ং অষ্টাবক্র, অহঙ্কারাভিমান নামের জন্য, উক্ত 'কথিতাস্ত্র' নির্দেশ করেন নাই। তিনি উক্ত শ্লোকে 'মহাকৃষ্ণাহি' নামের জন্য কোন উপায়ই অবধারণ করেন নাই। তিনি জনককে 'নাহং কর্তেতি'—বিশ্বাসামৃতপান করিয়া সুখী হইতে বলিয়াছেন। অষ্টাবক্র 'নাহং কর্তেতি'-কে যেমন 'বিশ্বাসামৃত' বলিয়াছেন, তদ্রূপ 'অহং কর্তেত্যহংমান'-কে 'মহাকৃষ্ণাহি' না বলিয়া, অবিশ্বাসবিষ, অজ্ঞান-বিষ বা অহঙ্কারাভিমান-বিষ বলিতে পারিতেন। অমৃত দ্বারা বিষ নষ্ট হইতে পারে সত্য,—কিন্তু 'অহং কর্তেত্যহংমান'-কে বিষ বলা হয় নাই। মহাত্মা অষ্টাবক্রের মতে, তাহা 'মহাকৃষ্ণাহি' বা 'মহাকৃষ্ণসর্প'; অতএব তাহার নামে, তৎকর্তৃক দংশিত স্থানের বিষ নাশের সম্ভাবনা ছিল না। ঐ প্রকার সর্পের বিষ যে কি, তাহাও উক্ত মহাত্মা বলেন নাই। সেই বিষ-নাশের কোন উপায়ও তিনি বলেন নাই। সর্প দংশিত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে সর্পের অবস্থান স্বাভাবিক নহে। সেইজন্য কেহ কেহ বলেন, দেহাকাঙ্ক্ষিক 'অহংমান'-কে 'মহাকৃষ্ণাহি' বলা সঙ্গত হয় নাই।

একাদশ সিদ্ধান্ত

নবম শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্য জ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব॥"

উক্ত শ্লোকে 'একো বিশুদ্ধবোধোঽহং,'—এইরূপ নিশ্চয়কেই 'বহ্নি' বলা হইয়াছে। অজ্ঞানকে 'গহন' বলা হইয়াছে। ঐ প্রকার বহ্নিদ্বারা অজ্ঞান-গহন দাহ করিয়া, বীতশোক এবং সুখী হইতে বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে অজ্ঞান-গহনের স্থান নির্দেশ করা হয় নাই। কেবল মাত্র একটি কিম্বা দুইটি বৃক্ষকে গহন বলা যাইতে পারে না। উক্ত শ্লোকানুসারে দুই প্রকার দুইটী বৃক্ষই প্রাপ্ত হইয়া যায়। একটি শোক-বৃক্ষ এবং অপরটী দুঃখ-বৃক্ষ। উক্ত শ্লোকানুসারে ঐ দুই বৃক্ষকেই অজ্ঞান-গহনের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। ঐ দুই বৃক্ষ দগ্ধ হইলে, ঐ দুই বৃক্ষের অবস্থিতি যে ভূমিতে, সে ভূমি ঐ দুই বৃক্ষবিহীন হইতে পারে। ঐ দুই বৃক্ষের মধ্যে যেটীর নাম শোক, সেটীর দাহে, সেটীর অবস্থানের ভূমি বীতশোক হয়। ঐ দুই বৃক্ষের মধ্যে যেটীর নাম দুঃখ, সেটীর দাহে, সেটীর অবস্থানের ভূমি দুঃখহীন বা সুখী হয়। ঐ দুই বৃক্ষের ভূমি জনককেও বলিতে পার না। কারণ উক্ত নবম শ্লোকানুসারে জনককেই

অহমোপাধিক 'একো বিশুদ্ধবোধ',—এই প্রকার 'নিশ্চয় বুদ্ধি' বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত দুই বৃক্ষের তুমি, জনককে কি প্রকারে বলা যাইবে।

দ্বাদশ সিদ্ধান্ত

দশম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দঃ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে ভ্রমবশতঃ রজ্জুকে যেমন সর্প বোধ হয়, তদ্রূপ ভ্রমবশতই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে বিশ্ব-বোধ ও বিশ্ব-দর্শন হয়। উক্ত শ্লোকে, যে আত্মাতে এই বিশ্ব কল্পিত হয়, তাঁহাকে 'আনন্দ' ও 'পরমানন্দ' বলা হইয়াছে। 'আনন্দ' অনেকেই সম্ভোগ করিয়া থাকেন। যাহারা 'আনন্দ' সম্ভোগ করেন, তাঁহারা, এবং তাঁহারা যে 'আনন্দ' সম্ভোগ করিয়া থাকেন তাহা,—পরস্পর যে অভেদ নহে, এ কথা কে না জানে? অষ্টাবক্রের মতে যাঁহাতে বিশ্ব কল্পিত, অষ্টাবক্রের মতেই তাঁহাকে 'আনন্দ' বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহাকে প্রাকৃতই বলিতে হয়। কারণ অদ্বৈতমতে আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই অপ্রাকৃত নহে। আত্মাকে আনন্দ এবং জ্ঞান কহিলে, আত্মার এক প্রকারতা রহে না। আত্মা, একই প্রকার। সেইজন্য আত্মা, আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন, অবশ্যই বলিতে হয়। উক্ত দশম শ্লোকানুসারে বিশ্ব কল্পিত। কল্পিত যাহা, তাহাই মিথ্যা। কিন্তু আমরা স্পষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমরা কি প্রকারেই বা আমাদের অবস্থিতির স্থান এই 'বিশ্ব'-কে কল্পিত বা মিথ্যা বলি? আমাদের এই 'প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব'কে সত্যই বলিতে হইতেছে। এই 'বিশ্ব' দর্শন, স্পর্শন এবং বোধ দ্বারা অবধারিত হইতেছে। এই বিশ্বের সত্যতা-সম্বন্ধে, এই সিদ্ধান্ত দর্শনের তৃতীয় ভাগে বিস্তৃতরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে।

ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত

একাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমাত্যপি।
কিং বদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥"

অষ্টাবক্রের মতে 'মুক্তাভিমানী মুক্ত'। তাঁহারই মতে 'বদ্ধো বদ্ধাভিমাত্যপি'। অনেক অধ্যাত্ম ব্যক্তিও অভিমান-গ্রস্ত আপনাদিগকে স্বস্থ বিবেচনা করেন। অভিমান-গ্রস্ত কত লোক আপনাদিগকে ধার্ম্মিক ও সাধু বোধ করেন, অথচ তাঁহারা ধার্ম্মিকও নহেন, সাধুও নহেন। যিনি অভিমান-গ্রস্ত আপনাকে 'মুক্ত' বিবেচনা করেন, তিনি 'প্রকৃত মুক্ত' নহেন—তিনিও 'বদ্ধ'। 'মুক্ত' হইলে নিরভিমানী হইতে হয়। সেইজন্য 'প্রকৃত মুক্তে'র মুক্তাভিমান নাই। অষ্টাবক্রেরই পূর্ব্বোক্ত অষ্টম শ্লোকানুসারে অভিমান কোন উত্তম সামগ্রী নহে। সে মতেও অভিমান হেয়। সে মতে অভিমান বা মানকে 'মহাকুকাণ্ডি' বলা হইয়াছে। 'বদ্ধ' আপনাকে 'বদ্ধবোধ' করিলে, তাহার সেই 'বোধ'কে, তাহার অভিমান না বলাই উচিত। তাহা, সে প্রকৃত যাহা, তাহার সেই ধারণা। সেইজন্য সেইপ্রকার 'বোধ' দোষনীয় নহে, বরঞ্চ তদ্দ্বারা সেই 'বদ্ধের' উপকার হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ সিদ্ধান্ত

দ্বাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব॥"

উক্ত শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে,—"আত্মা সাক্ষী, বিভু, পূর্ণ, এক, মুক্ত, চিৎ, অক্রিয়, অসঙ্গ, নিস্পৃহ এবং শান্ত। ভ্রম-প্রযুক্তই তিনি সংসারবান্।" আত্মাকে 'সাক্ষী' বলা হইয়াছে। সেইজন্য তিনি 'সগুণ-সক্রিয়-সাকার।' 'সাক্ষী আত্মা' যেন যে 'সগুণ-সক্রিয়-সাকার' তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আত্মাকে 'বিভু' বলা হইয়াছে বলিয়া আত্মা 'সক্রিয়'। কারণ যাঁহার বিভূতি আছে, তিনিই 'বিভু'। বিভূতি যাঁহার আছে, তাঁহার বিভূতি প্রকাশ হইয়া থাকে। 'বিভু' হইতে বিভূতির প্রকাশ ক্রিয়াদ্বারা হইয়া থাকে। সেইজন্যই যে আত্মাকে 'বিভু' বলা হইয়াছে, সে আত্মা অবশ্যই 'সক্রিয়'। শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক নানা শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণাত্মা—'বিভু'। তাঁহার কথিত শ্রীমদ্

গবদ্গীতোক্ত বিভূতি-যোগাধ্যায়নে তাঁহাকে 'সগুণ-সক্রিয়'ই বলিতে হয়। আত্মাকে 'পূর্ণ' বলা হইয়াছে। সেইজন্য তিনি কোন বিষয়ে 'অপূর্ণ নহেন্। সেইজন্য তাঁহাকে 'অসগুণ-অসক্রিয়' বলিলে, তিনিও 'অপূর্ণ' স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাকে 'পূর্ণ' বলা হইয়াছে বলিয়া, তিনি সগুণ-সক্রিয়ও বটেন। যাঁহাতে 'সমস্ত' আছে, তিনিই 'পূর্ণ'। আত্মাতে 'সমস্ত' আছে, সেইজন্য আত্মাও 'পূর্ণ'। আত্মা ব্যতীত 'সমস্ত' বলিয়া আত্মা এবং 'সমস্ত' অভেদ বলা যায় না। কারণ আত্মা এবং 'সমস্ত' অভেদ হইলে, আত্মা 'পূর্ণ' শব্দদ্বারা বিশেষিত হইতেন না। 'পূর্ণ' শব্দ অদ্বৈত-বাচক নহে। আত্মাকে 'পূর্ণ' বলিলে আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নাই, বুঝিবার কোন কারণ নাই। যেমন পূর্ণ-কুম্ভ বলিলে কেবলমাত্র কুম্ভ বুঝিবার কোন কারণ নাই,—পূর্ণ-কুম্ভ বলিলে সেই কুম্ভ কোন বস্তুদ্বারা পূরিত বুঝিতে হয়, তদ্রূপ 'পূর্ণাত্মা' বলিলে আত্মা, কোন বস্তু বা বহু-বস্তুদ্বারা পূরিত বুঝিতে হয়। আত্মাকে 'এক' বলা হইয়াছে। অনেকে ঐ 'এক' শব্দের অর্থ, অদ্বিতীয় বলিয়া থাকেন, কিন্তু অদ্বিতীয় শব্দে কেবল 'এক' এই অর্থ হয় না। অদ্বিতীয় শব্দের দ্বিতীয়াদিরও অর্থ হইতে পারে; সেইজন্য অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ 'বহু'ও হইতে পারে। কোন মহাত্মা বলেন, আত্মার মতন দ্বিতীয় বস্তু নাই বলিয়া আত্মা 'এক্'। অপর পক্ষ বলেন, আত্মার বহুতা নাই বলিয়া আত্মাকে 'এক্' বলা হইয়াছে। আত্মাকে 'মুক্ত' বলা হইয়াছে। অষ্টাবক্রের মতে আত্মা 'মুক্ত' স্বীকার করিলে, কোন সময়ে সেই আত্মার নিশ্চয়ই বন্ধন ছিল স্বীকার করা হয়। আত্মাকে কেবল 'অমুক্ত' বলিলে, তিনি 'বদ্ধ' ইহাই স্বীকার করা হয়। সেইজন্য আত্মাকে কেবলমাত্র 'অবদ্ধ' বলিতে হয়। বেদান্ত প্রভৃতি অদ্বৈতমতের গ্রন্থাবলীমতে আত্মাকে 'নির্ব্বিকার' বলিতে হইলে তাঁহাকে 'মুক্ত' বলা যায় না। কারণ 'নির্ব্বিকার' যিনি, তাঁহার কখন বন্ধন হইয়াছিল, স্বীকার করা যায় না। আত্মাকে 'চিৎ' বলা হইয়াছে। অনেক শাস্ত্রমতেই 'চিৎ' জ্ঞান-শক্তি। অনেক শক্তি-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক গ্রন্থমতে 'চিৎ' কালী। সেইজন্য আত্মা ও চিৎ অভেদ বলা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ পাতঞ্জলদর্শন মতে, 'আত্মা' দৃক্‌শক্তি। বেদান্ত-দর্শনমতে ও অদ্বৈতবাদীদিগের অন্যান্য গ্রন্থমতে 'আত্মা'ই ব্রহ্ম পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। 'আত্মা'ই কালী। অতএব সেইজন্য কালী ও ব্রহ্ম অভেদ। কালী-মাহাত্ম্য প্রতিপাদক অনেক গ্রন্থমতেই 'কালী' সগুণা, সাকারা এবং ক্রিয়াবতী। ঐ প্রকার কালীর সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে বলিয়া, ব্রহ্মকেও 'সগুণ-সক্রিয়-সাকার' বলা যায়। আত্মাকে 'অক্রিয়' বলা হইয়াছে। কিন্তু আত্মাকে 'চিৎ' বলায়, তাঁহাকে সগুণ, সক্রিয় এবং সাকার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ 'চিদাত্মা'কে কালী প্রমাণ করিয়া, তাঁহাকে সগুণ-সক্রিয় ও সাকার প্রমাণ করা হইয়াছে। সেই আত্মা যে সময় কোন কার্য্য করেন না, সে সময়ে তাঁহাকে 'অক্রিয়' বলিতে পার। বেদান্ত প্রভৃতি অদ্বৈত গ্রন্থাবলী মতে আত্মার সর্ব্ব-দেহেই অবস্থান। প্রায় সর্ব্ব-দেহেই তিনি সক্রিয়, ইহাও বুঝা যায়। বেদান্ত প্রভৃতি মতে আমিও 'আত্মা'। আমি-আত্মা যে 'সক্রিয়', তাহা নিজেই বুঝিতেছি; ঐ দেহস্থ তুমি-আত্মা যে 'সক্রিয়', তাহা তুমিও বুঝিতেছ, তবে আত্মাকে কেবলমাত্র 'অক্রিয়' কি প্রকারে বলা যায়। আত্মাকে 'সক্রিয়' এবং 'অক্রিয়' উভয়ই বলিতে হইলে, এই প্রকারে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; আত্মা যখন কার্য্য করেন, তখন তিনি সক্রিয়, আত্মা যখন কার্য্য করেন না, তখন তিনি 'অক্রিয়'—তখনি তিনি 'অসঙ্গ' 'নিস্পৃহ' এবং 'শান্ত'। 'সক্রিয়াত্মা' ও 'সগুণাত্মা' অসংসারযান নহেন।

পঞ্চদশ সিদ্ধান্ত

ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽহং ভ্রমং মুক্তা ভাবমদ্বৈতমাশ্রয়॥"

উক্ত শ্লোকে আত্মাকে 'কূটস্থ' 'বোধ' এবং 'অদ্বৈত' ভাবনা করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু আত্মাকে 'কূটস্থ' ভাবনা করিলেই আত্মাকে 'কূটস্থ' বোধ হয় না। আত্মাকে

'বোধ' ভাবনা করিলেও, আত্মাকে 'বোধ' বলিয়া নির্দেশ করা হয় না। আত্মাকে 'অদ্বৈত' ভাবনা করিলেও আত্মাকে 'অদ্বৈত' বোধ হয় না। তাহা যদ্যপি হইত, তাহা হইলে তুমি আপনাকে 'রাজা' ভাবনা করিলেও 'রাজা' হইতে। তাহা হইলে তোমার ক্ষুধার উদয়ে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াছে, এই প্রকার ভাবনা করিলেও তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারিত। তাহা হইলে প্রত্যেক বদ্ধ জীবই আপনাকে 'মুক্ত' ভাবিয়া 'মুক্ত' হইতে পারিত। অদ্বৈত-মতানুসারে 'পরিভাবনা'ও অপ্রাকৃত নহে। তবে 'পরিভাবনা' দ্বারা আত্মাকে কূটস্থ, বোধ এবং অদ্বৈত-ধারণ করাও সত্য নহে। 'অসত্য-প্রাকৃত-পরিভাবনা' দ্বারা যাহা নিশ্চয় করা হয়, তাহা কখনই বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। সেইজন্য 'পরিভাবনা' দ্বারা আত্মাকে কূটস্থ, বোধ এবং অদ্বৈত বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। আত্মা কূটস্থ, বোধ এবং অদ্বৈত স্বীকার করিলে, আত্মার ত্রৈবিধ্য স্বীকার করা হয়। সেইজন্য আত্মাকে অপরিবর্ত্তনীয় এবং এক-প্রকারও বলা যাইতে পারে না। আত্মার এক-প্রকারতা স্বীকার না করিলে, আত্মাকে প্রাকৃত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কারণ প্রকৃতিরই বহু-প্রকারতা আছে। 'বোধ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। আত্মাকে 'বোধ' বলিলে অবশ্য আত্মাকে 'জ্ঞান' বলিয়াই স্বীকার করা যায়। জ্ঞানকে 'আত্মা' বলিয়া স্বীকার করিলে আত্মাকে 'জ্ঞাতা' বলা যায় না। 'আমি' এবং 'আমার জ্ঞান' অভেদ, ইহা আমার বোধ হয় না। 'আমি' এবং 'আমার জ্ঞান' যে স্বতন্ত্র, তাহা আমি নিজেই বুঝিতেছি। কোন মহাত্মার বিবেচনায় 'আমি' এবং 'আমার জ্ঞান' অস্বতন্ত্র হইলে 'আমি' এবং 'আমার ক্ষুধা'ও অস্বতন্ত্র বলিয়া তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় না কেন? তাহা হইলে মন, বুদ্ধি, সর্ব্বেন্দ্রিয় ও অহঙ্কার প্রভৃতি এবং আমি অভেদ, ইহাই বা তৎকর্ত্তৃক অবধারিত হয় না কেন? 'আমি' এবং 'আমার জ্ঞান' যেমন অভেদ নহে, উভয়ে যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, তদ্রূপ 'আত্মা' এবং 'আত্মজ্ঞান' অভেদ নহে, উভয়ে স্বাতন্ত্র্য আছে। সেইজন্য আত্মাকে বোধ বলা সঙ্গত নহে। 'বোধ' যাহা তাহাই বোধ-কর্ত্তা নহে। 'কর্ম্ম' যাহা, তাহাই কর্ম্ম-কর্ত্তা নহে। 'ভক্তি' যাহা তাহাই ভক্ত নহেন। 'প্রেম' যাহা তাহা প্রেমিক নহেন। আত্মাকে অষ্টাবক্র সংহিতার প্রথম প্রকরণানুসারে 'অদ্বৈত' বলিতে হইলে, আত্মাকে 'কূটস্থ' এবং 'বোধ'ও বলা যায় না। তাহা হইলে আত্মার অদ্বৈততা রক্ষা হয় না, সেইজন্য আত্মা 'বোধ' এবং 'কূটস্থ' নহেনই স্বীকার করিতে হয়। উক্ত শ্লোকে অষ্টাবক্র এবং জনকের সহিত আত্মার অভেদত্ব প্রদর্শিত হয় নাই সেইজন্য উক্ত শ্লোকটীও সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক।

ষোড়শ সিদ্ধান্ত

চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব।"

উক্ত শ্লোকও দ্বৈততত্ত্বের পরিচায়ক। উক্ত শ্লোকে মহাত্মা অষ্টাবক্র জনককে 'পুত্রক' সম্বোধন করিয়াছেন। সেইজন্য উক্ত শ্লোককেও দ্বৈতসূচক বলিতে হয়। বাৎসল্য ভাববশতঃ 'পুত্রক' সম্বোধন করা যাইতে পারে। গুরুও শিষ্যকে 'পুত্রক' সম্বোধন করিতে পারেন। অষ্টাবক্র-সংহিতানুসারে জনকের গুরু অষ্টাবক্র, সেইজন্য অষ্টাবক্র জনককে 'পুত্রক' করিয়াছেন। নানাশাস্ত্রানুসারে অবগত হওয়া যায়, শিষ্যের প্রতি গুরুর বাৎসল্য-ভাবও হইয়া থাকে। জনক অষ্টাবক্রের শিষ্য ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার প্রতি অষ্টাবক্রের বাৎসল্য-ভাব থাকা অসঙ্গত হয় নাই। অষ্টাবক্রও ভাবুক ছিলেন বলিতে হইবে। সেইজন্যই তাঁহার জনকের প্রতি বাৎসল্য-ভাব ছিল। জনকের অষ্টাবক্রের প্রতি দাস্য-ভাব ছিল। সেইজন্যই তিনি অষ্টাবক্র-সংহিতোক্ত প্রথম প্রকরণের প্রথম শ্লোকানুসারে 'প্রভো' শব্দদ্বারা অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়াছিলেন। অতএব সেইজন্য জনকও অভাবুক ছিলেন না, স্বীকার করিতে হয়। ক্রিয়ার সহিত সংস্রব থাকিতে কেহই অভাবুক হইতে পারেন না। অবগত হওয়া যায়, অষ্টাবক্র ও জনকের ক্রিয়ার সহিত সংস্রব ছিল।

ক্রমশঃ

একটি অমৃত ক্ষণ

॥ শ্রীবিভা সরকার ॥

জীবনের অনিত্য বুদবুদ
তুচ্ছ করি জেগে ওঠে
একটি অমিয় দিন
তারই লাগি আমার প্রণাম।

সে মহেন্দ্র ক্ষণে তাই
সুখ দুঃখ ভুলে যাই
ভুলে যাই জীবনের
ভাঙাগড়া তুচ্ছ পরিণাম।

দূর সে নিকটে আসে
মানস মধুপ হাসে
শতদলে বিকশিয়া
হৃদিপদ্ম জাগে স্পর্শে যার—

মৃত্যুহীন জানি তাঁরে
অমর্ত্যের অমিয় সম্ভারে
পূর্ণ তিনি চিরদিন
শুভময় জন্মক্ষণ তাঁর।

নাশি যত অন্ধকার
তিমির রাত্রির পার
তুঙ্গ হিমশীর্ষে হেরি'
চিরন্তন ভাস্কর উদয়।

মূর্ত্ত অমৃতের ছবি
মোহা পিপাসার্ত্ত রবি
হেরিতে উদয় ভালে
সুন্দরের রূপ পূর্ণময়।

তুমি কাছে নেমে এলে
একান্ত ঘরের ছেলে
গগনের ঐ রবি
দেবতা সে—সে যে বড় দূর!

ধরণী মায়ের ছেলে
চলে এলে সব ফেলে
মার চিত্ত চিরঋণে
ধূলি মেখে করিতে বিধুর।

তাই ত' আপন তুমি
শ্যামল এ বনভূমি
পৃথিবীর ফুল ফল নদী
করিল তোমার গানে গানে।

এপার ওপার ডাকি
বাঁধিল মিলন রাখি
মৃত্যুহীন বাণী তব
সকারিল এ বিশ্বের প্রাণে।

তাই ত' বিহঙ্গ তান
মধুপ গুঞ্জন গান
এক হল মহামন্ত্রে
সম হল নিকট ও দূর।

অমৃত পিপাসা জাগে
কি নিবিড় অনুরাগে
তোমার সে রাজহংস
কাছে আনে মানস সুদূর।

উড়ে যায় দূরে যায়
বলাকার পাঁতি প্রায়
নীড়ের বন্ধন তবু
বার বার ডেকে ডেকে আনে।

আজ তুমি তবু নাই
তোমার আভাস পাই
দেখা, তবু দেখা নয়
'অন্ত কোথা অন্ত কোনখানে॥'

দিব্য জীবন গড়ার আগে দারিদ্র্য দূর করতে হবে

॥ শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস ॥

নরনারায়ণ আশ্রমের আদর্শ যে এক দিব্য সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল মানুষকে দিব্য জীবন লাভ করার সাধনা ও অনুশীলনের পথ দেখান ও সাহায্য করা সেটা সম্ভব করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা। যখন সকল মানুষ জীবনধর্ম পালনের ক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভ করবে, তখনই শুরু হবে মানব-ধর্ম পালনের সাধনা; যখন সকলে অন্নবস্ত্র গৃহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা-সমস্যা থেকে মুক্ত হবে, তখনই মানুষ স্বীয় দেহ-যন্ত্রের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে স্বয়ংক্রিয় হয়েই মানবিক গুণ-সমূহের অনুশীলনী শুরু করবে; তখনই তারা আধ্যাত্মিক জগতের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু সর্বাগ্রে চাই দারিদ্র্যের অবসান। সেটা সম্ভব করতে পারে একমাত্র সমবায় অর্থনীতি।

মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন মানুষের উৎপাদনী ক্ষমতার বৃদ্ধি। তারপর সেই উৎপাদনের বণ্টন-ব্যবস্থা এমন করতে হবে, যাতে উৎপাদকই যেন তার উৎপাদনের সম্যক ফল-ভোগী হতে পারে, তা থেকে কিছু মাত্র বঞ্চিত না হয়। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে কৃষি-শিল্পের উৎপাদনী ক্ষমতা এমন বিপুল ভাবে বেড়ে গেছে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কোনো অভাব অনটন থাকার কথা নয়। তথাপি যে থাকছে তার কারণ বণ্টন-ব্যবস্থার দোষে। বর্তমান পৃথিবীতে হয় ব্যক্তিগত মালিকানায় বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রচলিত। এই দুই ব্যবস্থাতেই মানুষ দিন-মজুর মাত্র। উৎপাদনের উপায় ও ব্যবস্থা সমূহে উৎপাদক মানুষের মালিকানা নেই, ফলে উৎপাদনসমূহের সম্পূর্ণ ফল-ভোগ তারা করে না, মজুরিটি মাত্র পায়। এই ব্যবস্থার পরিবর্তে আর্থিক ব্যবস্থায় যদি সমবায় নীতি প্রয়োগ করা যায় তবেই ব্যক্তি মানুষের ওপর শোষণ বন্ধ হয়ে এক শোষণ হীন অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু সমবায় অর্থনীতি বলতে ভারতের সমবায় আন্দোলনে যে অর্থনীতি চলেছে ঠিক সেই অর্থনীতি বোঝায় না। ভারতের সমবায় আন্দোলন সমবায় নীতির আংশিক প্রকাশ মাত্র। এটা একটা বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা মাত্র উত্তমাঙ্গের সঙ্গে এর যোগ নেই, হৃৎপিণ্ড খণ্ডিত, পরিশোষণ প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। সেই জন্য ভারতের সমবায় আন্দোলনকে সরকারের হাত ধরে খাড়া থাকতে হয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুষ্টি ভিক্ষা থেকে পরিপুষ্টি সংগ্রহ করে খুঁটি খুঁটি হাঁটতে হয়। সমবায় আন্দোলনের নীতি থেকে এটা বিচ্যুতি। এই কর্মসূচী দিয়ে ভারতের কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। নিজের পায়ে যে দাঁড়াতে পারে না সে অপরকে চালাবে কী করে? আমি এই অর্থনীতির কথা বলছি না। আমি বলছি প্রকৃত সমবায় অর্থনীতির কথা।

সমবায়ের অর্থ হল দুই বা ততোধিক সাবালক সাবধৌত ব্যক্তির মধ্যে সজ্ঞান সহযোগিতা। অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার উদ্বেগ বা শোষক শোষিতের মনোভাব নেই।—আছে পরস্পরের সাহায্যে ও সহযোগিতায় উভয়েই লাভবান হওয়া, উভয়ের সাহায্যে উভয়েই শক্তিশালী হওয়া, আরো বেশী উৎপাদন-ক্ষম হওয়া।

সমবায় অর্থনীতি কেবল অর্থনীতির মধ্যেই আবদ্ধ নয়। এর একটি নৈতিক দিক—moral side—ও আছে। সমবায় অর্থনীতির মূলভিত্তি সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসন সমূহ। সেই হেতু সমবায় অর্থনীতিতে শোষক-শোষিতের স্থান নেই। Live and let live—All for one one for all—নিজে বাঁচ—অপরকেও বাঁচতে দাও, প্রত্যেকের জন্য সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে নীতি

দিয়েই সমবায়ীদের আচরণ বিধি নির্ধারিত হয়।

যে অর্থনীতিতে অনুরূপ নৈতিক আদর্শ থাকে সে অর্থনীতির উৎপাদনের উদ্দেশ্য কেবল বাজারে বিক্রী করে লাভ করার উদ্দেশ্য হতে পারে না। সে অর্থনীতির উৎপাদনের উদ্দেশ্য হয় সকল মানুষের প্রয়োজন মেটান; এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্য যখন লাভের উদ্দেশ্যে না হয়ে সকল মানুষের প্রয়োজন মেটান হয় তখনই সকল মানুষকে উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়, তখনই full employment সম্ভব হয়। মনুষ্যকে যদি লাভের উদ্দেশ্যে না লাগিয়ে, মানুষের শ্রম লাভের জন্য লাগান হয়, তা হলে বেকার সংখ্যা না বেড়ে মানুষের কষ্ট কমে, তাদের সময় কমলেও উৎপাদন কমে না বরং সকলেরই জীবন ধারণের মান বাড়ে।

অর্থনীতির যে তিনটি দিক আছে—উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়—সেই তিনটি দিকেই যদি এই নীতি প্রযুক্ত হয়, তবেই তাকে সমবায় অর্থনীতি বলা যায়। একমাত্র এই অর্থনীতিই পারে ভারতের দারিদ্র্যের সমস্যা দূর করতে।

ভারতের দারিদ্র্য দূর করার জন্য আরো দু'প্রকার অর্থনীতির কথা বলা হয়ে থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি।

নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ দিয়েই ধনতন্ত্রের নৈতিক মান নির্ধারিত হয়ে থাকে। সব মানুষই যখন স্বাধীন, তখন পারস্পরিক স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির মাধ্যমেই কাজ কারবার চলে। এই চুক্তিতে সবল পক্ষ লাভবান হয়, দুর্বল পক্ষ হারে। এই ভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আসে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অনুশাসনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ লাভ লোকসান দিয়ে নৈতিক মান নির্ধারিত হয়। ফলে সমগ্র সমাজের সেবা করা অপেক্ষা নিজ নিজ লাভের উদ্দেশ্যে ধনতন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থা চলতে থাকে। সমাজে চলতে থাকে নির্মম প্রতিযোগিতা। জন্তু-জগতের যে নীতি, জোর যার মুলুক তার—might is right survival of the fittest—যোগ্যতমই জিতবে—অযোগ্য মরবে, সেই নীতিই চলতে থাকে। এই নীতি যে মনুষ্য সমাজে চলে না, মনুষ্য সমাজের শাশ্বত নীতি যে সহযোগিতা, দুর্বলকে রক্ষা করাই যে সবলের শক্তির সার্থকতা, সে কথা ধনতন্ত্রে স্বীকৃত হয় না। এই সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করেই যে বন্য মানুষ সভ্য মানুষ হতে পেরেছে, মানুষের survival value—বাঁচার যোগ্যতা যে জোর যার মুলুক তার নীতি নয়, এ কথা ধনতন্ত্র মানে না। দুর্বলকে শোষণ করাই ধনতন্ত্রের নীতি। ফলে ধনতন্ত্রে এক শ্রেণীর মানুষ শোষিত হয়েই চলে।

সমাজতন্ত্রের নৈতিক বাধ্যবাধকতাও সমগ্র সমাজের সকল মানুষের প্রতি নয়। সমাজতন্ত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠেরই সকল অধিকার, সংখ্যা লঘিষ্ঠ শ্রেণীর কোন অধিকারই নেই। সুতরাং এই ব্যবস্থাতেও জোর যার মুলুক তার নীতির দ্বারাই এদের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং এই ব্যবস্থাতেও সকল মানুষের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা থাকে না।

গত ১৮ বছর ধরে ভারতে এই দুই প্রকার অর্থনীতির সাহায্যে ভারতের দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা হয়ে আসছে। সেই জন্য ভারতীয় অর্থনীতিকে মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়। শিল্প বাণিজ্যের মালিকানা ব্যক্তির হাতে থেকে রাষ্ট্রের হাতে গেলেই গুণগত পার্থক্য হয় না। উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনের উদ্দেশ্য থাকে বাজারে বিক্রী করে লাভ করার জন্য। ধনতন্ত্রের অপরিহার্য ফলস্বরূপ এতেও বেকার সমস্যা বেড়ে চলে। স্বাধীনতার পর ধনীরা আরো বড় বড় কল কারখানা খুলছেন বটে এবং সরকারের প্রচুর বৈদেশিক ঋণ করা টাকা ভারতে আসছে বটে, কিন্তু তাতে জন সাধারণের দারিদ্র্যের বোঝা কমছে না, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য জীবন ধারণের মান বাড়ছে না। বাজারে যে পরিমাণ পণ্য লাভজনক দরে বিক্রী হয়, তারা মাত্র সেই টুকুই উৎপাদন করে। ফলে বেকার সমস্যা ঘোচে না। বরং বেড়েই চলে। অতএব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি দিয়ে ভারতের দারিদ্র্যের সমস্যা ঘুচতে পারে না।

সমাজতন্ত্রের অর্থ রাষ্ট্রাধীন অর্থনীতি। দেশের জমি কলকারখানা প্রভৃতি সকল উৎপাদনের উপায়ই সরকারের মালিকানার অধীনে থাকে, আর সমগ্র সমাজের মানুষরা

হয় রাষ্ট্রের দিন-মজুর, wage slave। এ ব্যবস্থাতেও উৎপাদন বাড়ে না—মানুষ বিশেষ উৎপাদনক্ষম হয় না। তার প্রমাণ আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন শিল্প বাণিজ্য সমূহ। এ সবের প্রায় সবগুলিতেই লোকসান চলেছে। ফলে জাতীয় সম্পদের বিপুল ক্ষয় ক্ষতি হচ্ছে। ব্যক্তিগত মালিকের অধীনে একজন মানুষ যতখানি উৎপাদনক্ষম হয়, সরকারী প্রতিষ্ঠানে ঠিক ততখানি উৎপাদনক্ষম হয় না। কারণ গণতান্ত্রিক সরকারের শাসন পীড়নের ক্ষমতা কম থাকায় মানুষ তাকে কম ভয় করে, এবং ফাঁকি দেয়, পরিশ্রম কম করে।

রুশিয়া প্রমুখ ইউরোপীয় কমিউনিস্ট ডিক্টেটরী রাষ্ট্র সমূহ দমনপীড়নের সাহায্যে শ্রমিকদের সন্ত্রস্ত করে খাটিয়ে নেয় বটে, কিন্তু তাতেও উৎপাদন বাড়েনি। সেই জন্য সম্প্রতি তারা ধনতান্ত্রিক দেশের, "লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদন নীতি" গ্রহণ করে পূর্বাপেক্ষা বেশী ফল পেতে সুরু করেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রেখে সর্বপ্রকার সন্ত্রাস-মুক্ত হয়ে আধিক ব্যবস্থাকে যদি বিশেষ উৎপাদনক্ষম করে তুলতে হয়, তবে তা ধনতন্ত্রেও হয় না, সমাজতন্ত্রেও হয় না। তা একমাত্র সমবায় অর্থনীতির দ্বারাই সম্ভব।

আজ প্রয়োজন বৃহৎ শিল্প বাণিজ্যে এই সমবায় নীতি প্রয়োগ করে শুধু লাভের উদ্দেশে উৎপাদন না করে মানুষের অভাব নিবারণের উদ্দেশ্যে করতে হবে এবং সেই সঙ্গে যে সব শ্রমিকের সমবেত প্রচেষ্টায় শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান চলছে, ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের পরিবর্তে সেই সব শ্রমিকদের সমবেত ভাবে মালিকানা দিতে হবে। তার ফলে এক দিকে যেমন মানুষ ব্যক্তিগত ধনী বা রাষ্ট্রের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের কারখানায় নিজেরাই উৎপাদন করছে এই বোধ আসায় সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বেড়ে যাবে।

ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষিতে সাধারণতঃ উৎপাদনের উপাদানসমূহ যথা জমি হাতিয়ার কলকব্জা প্রভৃতির মালিকানা কৃষক ও শিল্পীর হয়ে থাকে। স্থানীয় এলাকায় ক্ষুদ্র কৃষক ও শিল্পীদের উৎপাদনে ও বিপণনে সাহায্য দেবার জন্য সমবায়ের মধ্যে তাদের সমিতিবদ্ধ করতে হবে।

যে অর্থনীতির নৈতিক ভিত্তি হল, 'প্রত্যেকের জন্য সবলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে,' যা উৎপাদনের উদ্দেশ্য হল, মানুষের অভাব দূর করা, বণ্টনে উদ্দেশ্য হল, উৎপাদকদেরই উৎপাদনের মালিক করা, এক মাত্র সেই অর্থনীতিই পারে আজ ভারতের দারিদ্র্য সমস্যা দূর করতে এবং সে অর্থনীতির নাম সমবায় অর্থনীতি।

কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়, কিন্তু যিনি নিজ জীবনে সবকেই পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়া আস্বাদন করিতেছেন, তিনি কাহারও একচেটিয়া নন; তিনি প্রত্যেকের মাঝে পরিপূর্ণ থাকিয়াও প্রত্যেকেরই অধিক। কেহই কাহারও কাছে ধরা পড়িলেন না, সকলকেই সমভাবে জীবনে হজম করিতেছেন, তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধিক। 'They complete, by excluding each other' —De Broglie. পূর্ণযোগের এক একটি দৃষ্টিকোণ হইতেছে তপস্যা, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। পূর্ণযোগ সর্বযোগের সমন্বয়।

—গীতাভাষ্য, শ্রীপরমহংসযোগানন্দ

সাময়িকী

নরনারায়ণ আশ্রমে আলোচনা-বৈঠক—

সমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ১১৫-তম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার জীবন-দর্শন লইয়া গত ১লা বৈশাখ ১৩৭৭ বুধবার (ইং ১৫ই এপ্রিল ১৯৭০) নর-নারায়ণ আশ্রমে একটী মনোজ্ঞ আলোচনা-বৈঠকের সূচনা হয়। উক্ত সভায় ৩০ জন আগ্রহী শ্রোতার মধ্যে নিম্নোক্ত সুধীগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন—সর্বশ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরবিন্দরঞ্জন দাস, শিবনাথ ব্যানার্জী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুধীরেশ দে, সচ্চিদানন্দ গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি। বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়। শ্রীশিশির বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরিচর্যায় অনুষ্ঠানটি সর্ব দিক দিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

প্রাতঃকালীন অধিবেশন সকাল ৯টায় আরম্ভ হইয়া ১২টা পর্যন্ত আলোচনা চলার পর প্রসাদ গ্রহণ ও বিশ্রামের জন্য বৈঠকের বিরতি হয়। আবার দ্বিপ্রহর ২টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত আলোচনা চলে। অধিবেশনের সুরুতে আশ্রমের মেয়েরা মঙ্গলাচরণ করেন, উদ্বোধন সঙ্গীতে নিম্নলিখিত শ্রীনিত্যগোপাল-প্রশস্তিটি গান করেন। প্রাতঃকালীন সমাপ্তি সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের কীর্তন গাওয়া হয়।

নিত্যগোপাল প্রশস্তি

জয় জয় জয় নিত্যগোপাল হে যুগ-সূর্য জয়।
জয়তু জানানন্দ দেব জয়তু হে জয় জয়॥
মহামিলনের বাণী সুমহান,
ধরায় মানুষে করে গেলে দান,
চির শাশ্বত সে অমৃতবাণী সর্ব সময়ের
জয় জয় জয় হে মহাজীবন জয়তু হে জয় জয়।

কর্ম জ্ঞানের ভেদের দ্বন্দ্ব করে গেলে সমাধান,
সর্ব জাতির মিলনে বিশ্ব হল মহা পরীস্থান।
মহাযোগী মহা সমন্বয়ে তব
ভরিল বিশ্ব জ্ঞান অভিনব;
তব জড়াজড় মিলন বীণায় ধ্বনি জাগে মধুময়
জয় জয় জয় হে মহাজীবন জয়তু হে জয় জয়।

বিশ্ব তোমার মহাগৃহ, তুমি বিশ্ব-নাগরিক,
গৃহ সন্ন্যাসী তোমাতে অভেদ তুমি যে সামগ্রিক;
সব বিপরীতে মিলে গেছে আজ,
জাগিছে বিশ্বে প্রাণের সমাজ,
ব্রহ্ম আমি জগৎ আমি যে সর্বময়
জয় জয় জয় হে মহাজীবন জয়তু হে জয় জয়।

আশ্রম-সম্পাদিকা রেণু মিত্র সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া সংক্ষিপ্তাকারে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-জীবন ও দর্শনের কথা উপস্থাপিত করিয়া আলোচনার সূচনা করেন। অতঃপর শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস এই বলিয়া সকলের নিকট আবেদন করেন যে, যে অমূল্য সম্পদ এই প্রাণদর্শন বা পুরুষোত্তম দর্শন, যাহা শ্রীনিত্যগোপাল কর্তৃক "উদ্ঘাচ চচার চ" হইয়াছে এবং শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তৎরচিত ব্রহ্মসূত্র-অবধূত ভাষ্য, এগারখানা উপনিষদের ভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভাষ্য, শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বহু প্রবন্ধ ও ভাষণের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যা ও নিজ জীবনে আচরণ করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার মধ্যে অতি বিস্তৃত ভাবদ্যোতিত বিশ্বের সকল প্রশ্নের শেষ সমাধানের যোগ্যতা আছে, এ হেন বস্তুকে নরনারায়ণ আশ্রমে গুটিকতক হীন মানুষ কোনপ্রকারে বাতি জ্বালাইয়া আগলিয়া বসিয়া আছে, আর পথের দিকে ত

তাকাইয়া আছে তবে শক্তিধর যোগাতর অধিকারীগণ এই বিশ্বসম্পদকে গ্রহণ ধারণ ও বিশ্বের মাঝে বিলাইয়া দিবার জন্য আসিবেন। এই আকাঙ্ক্ষাই আজ এই আলোচনা চক্রের আবাহন। শ্রীবিশ্বাস শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-রচিত 'শ্রীনিত্যগোপাল—দর্শনে ও জীবনে' গ্রন্থ হইতে 'প্রাণদর্শন' অধ্যায়টি পাঠ করিয়া সকলকে শুনান যাহার সারমর্ম হইতেছে এই যে, বিরুদ্ধ পদার্থ সমানীর্ণ এই বাস্তব জগতে আজ প্রতিটি ব্যক্তি পরিবার সমাজ-রাষ্ট্র মুহূর্তে মনোবৃত্তিতে দ্বিধা-বিভক্ত। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দাবাইয়া, অস্বীকার করিয়া অথচ কুকৌশলে চোরের মত একে অপরকে দিয়া নিজ অভিসন্ধি পূরণ করাইয়া লইতে চাহিতেছে। তাহাদের এই প্রয়াস মনেরই বৃত্তি। কারণ মনের ভাষা 'নির্ধার্য নীতি'র (Law of Excluded middle), either or-এর ভাষা। মনের সাধ্য নাই বিরুদ্ধ পার্থের মধ্যে সামরস্য বিধান করার। সকল দ্বন্দ্ব বিভেদ মাঝে জাগ্রত ভালকে প্রতিষ্ঠা দিতে হইলে প্রাণের শরণ লওয়া ছাড়া, ও এই প্রাণকে সকলের মধ্যে জাগরিত করা ছাড়া গতি নাই। এই প্রাণ biologically ও psychologically জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণ, দর্শনের ভাষায় মুখ্য প্রাণ, প্রেমিক ভক্তের প্রাণ, প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বিত প্রাণ। বর্ত্তমান বিশ্ব-সংসারে যেখানে ব্যক্তি-মানুষ, তাহার সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর সংঘর্ষে সংঘর্ষে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে, সেখানে সংঘর্ষের অবসান ঘটাইয়া মানব সমাজের অস্তিত্ব ও তাহার সভ্যতার সুষ্ঠু অগ্রগমন অব্যাহত রাখিতে এই মুখ্য-প্রাণকে অগ্রবর্তী করিয়াই রওনা হইতে হইবে।

শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দের "প্রাণ-দর্শন" অধ্যায়ের উপর একটি প্রশ্ন রচনা করিয়া ঐ প্রশ্ন অবলম্বনে সকলকে পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি সহকারে আলোচনা করিতে আহ্বান করা হয়। প্রশ্নটি এই—

পৃথিবীর মানুষ আজ যেরূপ আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা, স্বার্থকেন্দ্রিক মানসিকতার হাতে বন্দী হইয়াছে, যাহার ফলে চতুর্দিকেই সংঘর্ষ, বিবাদ ও বিভেদের সৃষ্টি হইতেছে, ইহার মূল কারণ কি ঐ মন বা মনোজ কাম হইতেই সৃষ্টি হইতেছে না? Simultaneity বা যুগপৎ ভাব ধারণা করিতে পারে না যে মন, সেই মনই সকল বিরোধ ও ভাঙনের উৎস। ঐ ভেদবুদ্ধিপ্রসূত মনকে sublime করিয়া মানুষের মধ্যে তার যে প্রবণতা সমগ্রকে, সর্বকে গ্রহণ করিতে সমর্থ, যাহাকে শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ 'প্রাণ'—সর্বধরা প্রাণ—বলিয়াছেন, ঐ প্রাণের পথ গ্রহণ করা ছাড়া আর কি কোন পথ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছে?

এই প্রশ্নের উপর প্রথমে বলেন সুপ্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁহার রাশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়া বলেন যে, দেশা গিয়াছে মিলন সমন্বার্থ বিশিষ্টদের মধ্যেই শুধু সম্ভব হয়, বিরুদ্ধ-স্বার্থের মধ্যে মিলন হয় না শিবনাথ বাবুর এই কথা মনের পরে সত্য বটে। আবার পৃথিবীতে সংঘর্ষের ভয়াবহতাও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে ইহাও বাস্তব ঘটনা, fact এবং এই সংঘর্ষের পরিণামে সমূহ-বিনষ্টির হাত হইতে মুক্ত হইতে হইবে ইহাও আজিকার সাধনা, task প্রাণদর্শন সেই সাধনার কথাই বলিয়াছে।

শ্রীযুত সচ্চিৎকুমার গুহঠাকুরতা বলেন, প্রেম ভালবাসায় ধনিক শোষণ বন্ধ করিবে ইহা সম্ভব নয়।

কিন্তু শোষণের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য বর্ত্তমানে আচরিত বিদ্বেষ ও অবরুদ্ধির পথও যে পথ নয়, এ কথা বর্ত্তমান বিশ্বে আজ সুপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। চাই এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা এবং অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষ তাহার আগ্রত প্রাণ লইয়া স্বেচ্ছায় এবং স্বাধীন ভাবে নিজের জন্য এবং পরের জন্য বাঁচিয়া থাকিবে। সেই সমাজ-ব্যবস্থার পরিবেশে ধনিকের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইবে। মানুষের মধ্যে তাহার মুখ্য প্রাণকে জাগ্রত করিতে না পারিলে ঐ আকাঙ্ক্ষিত সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সম্ভব নয় এবং বিশ্বে আজ পর্যন্ত কোথায়ও হয়ও নাই।

শ্রীহৃষীকেশ দে এবং শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বিত প্রাণের পথই যে বর্ত্তমান যুগ-সমস্যার সমাধানের পথ তাহা তাঁহাদের ভাষায় বলেন।

ভারত-গৌরব মহাচিন্তানায়ক বীরশ্রেষ্ঠ মানবেন্দ্রনাথের অনুগামী ও সহকর্মী শ্রীযতেশচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁর অগাধ

পাণ্ডিত্যদ্বারা বর্তমান সমাজের বিশ্লেষণের ধারা এবং মার্কসবাদের লক্ষ্য শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা অতি সংক্ষেপে হৃদয়গ্রাহী সহজ ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলেন যে, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকার ফলে ঐ আকাঙ্ক্ষিত সমাজ-ব্যবস্থার দিকে জগতের কোন দেশই আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। রুশোত্তর চীনই এক-মাত্র দেশ যেখানে আদর্শ সমবায় প্রথার মাধ্যমে সমাজ অদ্বৈততা প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইতেছে। অদ্বৈততা ছাড়া সমাধান নাই। স্বদেশবাবুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এত প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছিল যে উহা সকল শ্রোতারই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে।

অনন্য দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত তাঁহার বিপ্লবী জীবনধারা সারা জীবন বিশ্ব সমস্যাগুলি লইয়াও গভীর চিন্তা করিয়াছেন। বিশ্বের ইতিহাস ও বিভিন্ন মতবাদ বিশ্লেষণ করিবার একটি স্বচ্ছ নিরপেক্ষ দৃষ্টির অধিকারী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের অগ্রগতির ধারা বিশ্লেষণ পূর্বক বলেন যে ভবিষ্যৎ সমাজকে সমবায়ের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইতে হইবে এবং সে জন্য সমবায়ের মনোবৃত্তি অর্থাৎ পরস্পর সহযোগিতার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে হইবে। সমবায়ের মনোবৃত্তি সৃষ্টি না হইলে সমবায়কে সার্থক করা যাইবে না।

এই আলোচনা-বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন আগামী ৩১শে মে ১৯৭০, রবিবার বিকাল ৫টা হইতে।

শ্রীপার্বতী নাথ বিশ্বাস

"গীতার প্রয়োজন ধরার ধূলিতে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকর্ম-লোক, পুরুষোত্তম-লোক প্রতিষ্ঠা। কর্মক্ষেত্র এই মাটির বুকেই হইবে জড়-অজড় দ্বন্দ্বের চরম অবসান। কর্মের বুকে নৈষ্কর্ম্যের আস্বাদনই গীতার কর্মযোগ।"—

গীতা, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগাইমাটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

(৬) উজ্জ্বল ভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্'—ঈশোপনিষদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না, ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের'—ইহাই ভারতের জপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক-শ্রমিক পরস্পরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

(৭) শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের (class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণীসমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি, নরনারায়ণভক্তি।

(৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যক্তি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল-ভারত দুইয়েরই তুলামূলা স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনি বিপন্ন হইবে না।

'উজ্জ্বলভারত', ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি আস্বাদন ধরার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেহেই ব্রহ্মলোককে আস্বাদন করিবে। মাটির দেহের নর ও নারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

(১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের ভক্তিসাধনাই এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

(১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লীব্রজ। সহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, সহর একটা idea মাত্র। এই পল্লীসভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্ণমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিসভ্যতার চরণতলেই স্বর্ণের উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসনশোষণ মুক্ত অন্নই বিশ্ব প্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহকরূপে অন্নবস্ত্রকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য। * * *"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

Central Regd. No. R. N. 2571/57 Phone No. 57-2540 UJJWALBHARAT

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'— Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২·০০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮·০০
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৬·০০
২।	ঈশোপনিষৎ	২·০০
৩।	কেনোপনিষৎ	১·০০
৪।	কঠোপনিষৎ	৩·০০
৫।	প্রশ্নোপনিষৎ	১·০০
৬।	ঐতরেয়োপনিষৎ	১·৭৫
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৭।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	২·৭৫
৮।	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	৩·৫০
	মুণ্ডকোপনিষৎ	
৯।	শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে	৩·০০
১০।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	০·৫০
১১।	গীতাজয়ন্তী	০·০৬
১২।	উজ্জীবনবাদ (পুস্তিকা)	০·৫০
১৩।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	৩·০০
১৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। গ্রন্থ সংস্করের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

সূচীপত্র, চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৬-৭৭, ১৯৭০

১।	যুগদেবতা বিপ্লবী শ্রীনিতাগোপাল শ্রীরেণু মিত্র	৪১
২।	প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৮২)	৪৪
৩।	কর্মযজ্ঞ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪৫
৪।	মুক্তি-লগ্ন (৩) অনামী	৪৮
৫।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী—(১৯৫৪)	৫৭
৮।	পারিবারিক জীবন আলোচনা (৪) ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়	৬১
৭।	পুস্তক পরিচয় শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস	৬৭
৮।	আজি হতে শতবর্ষ আগে (কবিতা) শ্রীকেত্রমোহন চক্রবর্তী	৬৮
৯।	সিদ্ধান্ত দর্শন—শ্রীশ্রীনিতাগোপাল	৬৯
১০।	একটী অমৃত ক্ষণ (কবিতা) শ্রীবিভা সরকার	৭৪
১১।	দিব্য জীবন গড়ার আগে দারিদ্র্য দূর করতে হবে শ্রীস্বদেশ রঞ্জন দাস	৭৫
১২।	সাময়িকী—নর নারায়ণ আশ্রমে আলোচনা বৈঠক	৭৮

19 MAY 1970

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া—দেশবন্ধুনগর) ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহাম

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৬, ১৯৭০ সম্পাদিকা—বেণু মিত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

যে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আজও কোন কিছুর অপেক্ষা না করে ধর্ম্মের সাধনায় সন্ন্যাসী সাজতে পারে, সেখানে কি বিশ্বরূপী ধর্ম্মের পরিবার-সাধনা, সমাজ-সাধনা বা জাতি-সাধনার জন্য কয়েক হাজার সন্ন্যাসী কর্ম্মীও মিলতে পারত না? মিলবে কি করে? দেশ-সেবার গোড়াতেই ত কর্ম্মীদের সুখ-সুবিধার কথা ভাবতে শিখান হচ্ছে। ধর্ম্ম-সাধনায় ত খাওয়া-পরার জন্য কেউ দায়ী নন। নেংটী পর, জোটে খাও, না জোটে উপবাস কর, তবে ত ভগবান মিলবে। দেশ-সেবকদের জন্য দেশ দায়ী, সেবকদের ইহাই ধারণা। এই ধারণা যেদিন উল্‌টে যাবে, সেদিন কারোও অপেক্ষা না করে, অনাহার অনিদ্রায় সেবা করবার লোভও জাগবে, কর্ম্মীও মিলবে। সন্ন্যাসী মেলে অথচ কর্ম্মী মেলে না—এর কারণ যে, সন্ন্যাসীর উপাস্য যেমন বিপ্লবের দেবতা, উপাসনাও তেমনি বিপ্লবের; আর কর্ম্মীদের উপাস্য বটে বিপ্লব কিন্তু তারা পন্থাটী চাচ্ছে ঠিক বিষয়ীদের মত আরামের। এ যাবৎ তাই কোন সঙ্ঘ দাঁড়ায়নি; দাঁড়াবেও না, যে পর্য্যন্ত কর্ম্মীবৃন্দ খাওয়া-পরায়, শোয়া-বসায় সন্ন্যাস গ্রহণ করতে না পারবে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

অ্যাঁ! বলেন কি? ব্যাঙ্ক আমাকে ঋণ দেবে?

আমি তো সামান্য কয় বিঘার চাষী!

হ্যাঁ দেবে। যদি আপনি আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চাষবাসে আগ্রহী কৃষিজীবী হন, তাহলে চাষ বাঁধ, সার, পোকা-নাশক ওষুধ—এই সব যোগাড় করতে ব্যাঙ্ক আপনাকে আর্থিক সাহায্য করবে। চাষের জন্য জমিজমা, যেমন পাম্প, পাওয়ার টিলার, এমন কি ট্রাক্টরের জন্যও ঋণ পেতে পারেন।

আপনার শস্যোৎপাদন বৃদ্ধিই হল আমাদের লক্ষ্য।

ইউবিআই-এর

যে কোন শাখা অফিসে চলে আসুন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

রেজি অফিস : ৪, নরেন্দ্রপুর রোড সরণি
(পূর্বতন ক্রাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

UBI-4 B.N

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

স্বলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
বাংলার ঋষি	৩·৫০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	১·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·৫০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

UBI PARTICIPATES IN DROUGHT RELIEF PROGRAMME IN PURULIA & BANKURA DISTRICTS.

U. B. I. has come forward with a scheme for assistance to the farmers in the drought-affected areas in Purulia and Bankura districts. As soon as the districts were declared by the Government as drought-affected, the Bank undertook a field survey to find out the feasibility of extending its assistance to the farmers in the worst affected areas. Two blocks in either of the districts (Begmundi and Arsha blocks in Purulia district and Indupur and Sonamukhi blocks in Bankura district) have been taken up under the scheme, under which loans will be provided to the farmers for the masonry work for kancha wells to be dug by the farmers in the blocks in Purulia district, while in the blocks in Bankura district the loans will be made available for sinking of shallow tube-wells with coir filters and installation of pump-sets. The maximum limits to be sanctioned for the individual loanees are: (a) For masonry for kancha wells—Rs. 1,000, (b) for shallow tube-wells—Rs. 1.000 and (c) for pump-sets.—Rs. 3,000. It is expected that these schemes would enable the farmers to raise two crops, viz, paddy and potato, which would generate sufficient income for the purpose of repayment of loans.

The scheme for assistance is proposed to be operated from two of the branches of the Bank—Purulia Branch and Sonamukhi Branch. Officers have been specially deputed by the Bank to the drought-affected areas to collect loan applications on the spot and arrange expeditious disbursement through the branches.

The Scheme will be implemented with the assistance of the State Government Agricultural Department.

—•—

উজ্জ্বলভারত সূচীপত্র, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৬-৭৭, ১৯৭০

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৮৩) ৮১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
২। অল্ বেঙ্গলীর ভারত-দর্শন ৮৫
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়
৩। শতবর্ষের আলোকে মহাত্মা গান্ধী ৯০
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
৪। পারিবারিক জীবন-আলোচনা (৫) ৯২
ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। গান্ধীজীর পথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ৯৮
শ্রীসত্যব্রত ঘোষ
৬। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী—(৩৮) ১০১
১৯৫৪
৭। সিদ্ধান্ত দর্শন—শ্রীশ্রীনিতাগোপাল ১০৬
৮। মুক্তি-পত্র—অনামী ১১১
৯। সাময়িকী—শোক সংবাদ ১২১
নবনারায়ণ আশ্রমে আলোচনা বৈঠক
ইন্দিরাজী সমীপেষু

বাটার সর্বাধুনিক ওয়েদারপ্রুফ জুতো সত্তরের দশকের জন্য

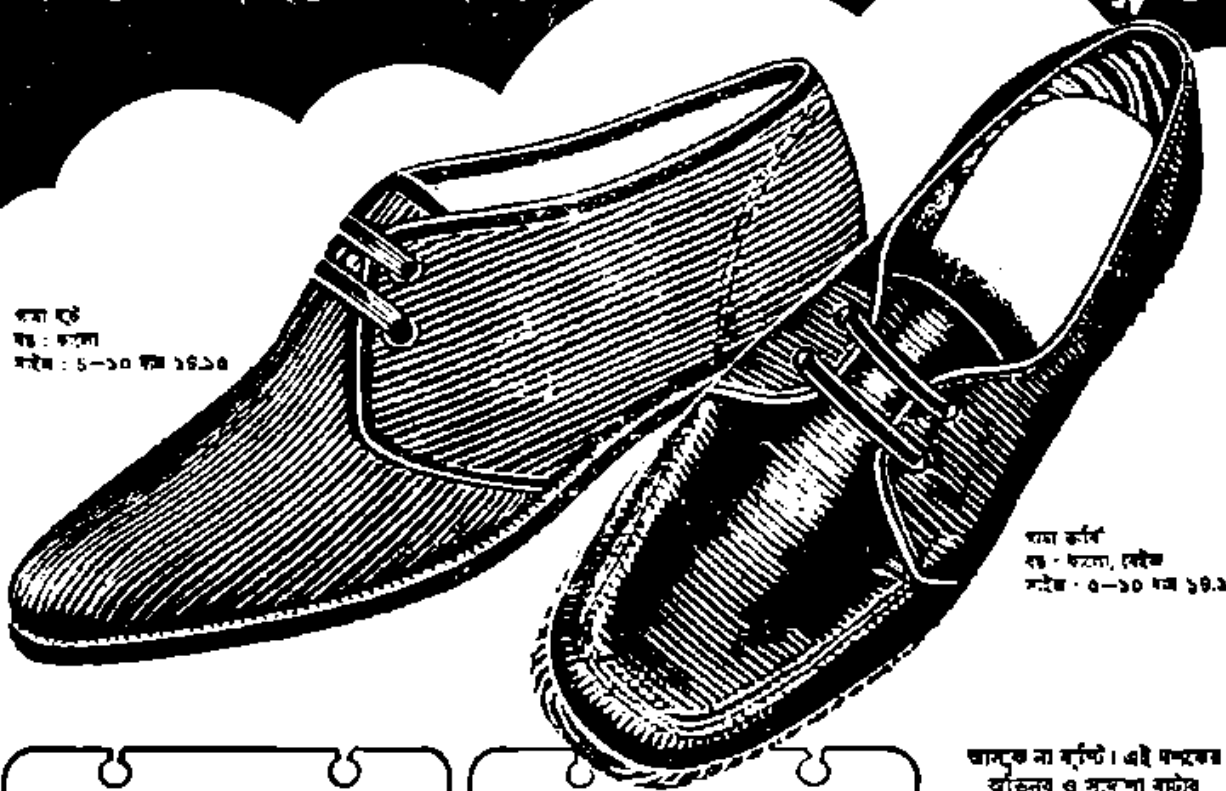

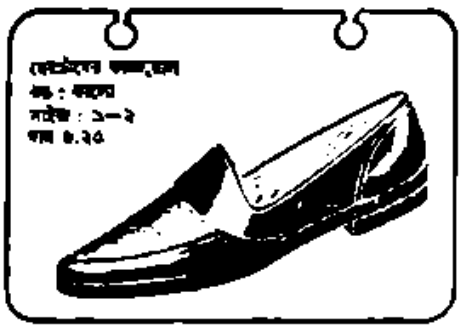

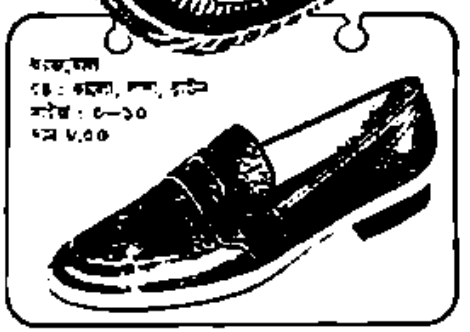

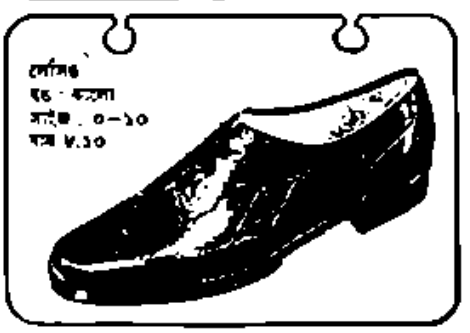

আজকে না বৃষ্টি। এই দশকের অভিনব ও সুদৃশ্য বাটার ওয়েদারপ্রুফ জুতোর বৃষ্টির মধ্যেও আপনি শৌখিন রুচির সঙ্গে অনায়াসে হেঁটে বেড়াতে পারবেন। বেছে নেবার মতো কত অভিনব নকশা ও রঙ। আবার টেকসই রবারে তৈরি বলে সহজে জীর্ণ-ছিন্ন হবে না। ভিতরে উইভ্‌ন্ট কাপড়ের আস্তর এর চমৎকার বৈশিষ্ট্য : বৃষ্টির মধ্যে হাঁটার সময়েও পায়ের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে সারাক্ষণ। তাই আজই বাটার যে-কোনো দোকানে, বেছে নিন আপনার মনের মতো। অভিনব জুতো—নতুন দশকের মতোই যা সর্বাধুনিক—দৃশ্যত শৌখিন ও ওয়েদারপ্রুফ।

Bata

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রীশ্রীভারতে

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭০ ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৮৩)

ওঁ নমো···। শ্রীনিত্যগোপাল আমার মহাসাগর। সমস্ত ধারা সেখানে গিয়ে মিলিত হয়েছে কিম্বা সমস্ত ধারা তাঁর থেকে প্রবাহিত। কর্মের ধারা, জ্ঞানের ধারা, সংসারের ধারা, সন্ন্যাসের ধারা সব তাঁতে আছে। সাগরেই সমস্ত ধারা মিলতে পারে—নিত্যগোপাল সাগর, তাই তিনি সব ধারার সমন্বয় করবার সাহস রেখেছেন।···নদীরা যার যার স্থানে দাঁড়িয়ে এলে অপরের সঙ্গে মিলতে পারে না···অহংকারের স্তরে এক ক্ষেত্র থেকে আর এক ক্ষেত্রে যাওয়া যায় না—যে কর্মী হয় সে জ্ঞানী হতে পারে না, যে ভক্ত হয় সে কর্ম করতে বিমুখ, যে রাজনীতি করে ভগবানের প্রতি প্রেম কাকে বলে তা বুঝতে পারে না, যে অর্থনীতি করে সে মনে করে ঐ দিয়েই মানুষের সকল সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু তা হবে না—সব ক্ষেত্রকে মেলাতে হবে—সে মিলন আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে সম্ভব হবে না, সম্ভব হবে বিশ্ব-সেবাবুদ্ধিতে। তাঁর স্তরে এই সর্ব ক্ষেত্রের মিলন হয়...। একমাত্র নারায়ণই সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পারেন—নিত্য গোপাল তাই করতে এসেছেন।···সাগরে কত রকম under current থাকে—জীবনের সব undercurrent-এর খোঁজ রাখতে হবে। সর্ব সমন্বয়ের স্তর ছাড়া তা সম্ভব নয়।...সাগরের থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই সব ব্যর্থ হয়—তখনই পথ হারিয়ে যায়···ব্যর্থ আমির শরণাগত হওয়াই ধর্ম। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের মানুষেরা self centered সাধনা করেছে,···কলির মানুষেরা god-centered সাধনা করবে।···আজ সাগরকে অবলম্বন করে চলতে হবে···। ওগো অবিচ্ছিন্ন আমি, তোমার আমি দিয়ে আজ সংসার সন্ন্যাস ধর্ম জ্ঞান সব ব্যাখ্যাত হবে···তাই নিত্যগোপাল বার বার বলেছেন, সাগর হও, বল I am a cosmopolitan···। বিশ্ব-নাগরিকত্বকে বাদ দিয়ে সব বিচ্ছিন্ন ব্যর্থ হয়ে যাবেই। আজ সাগরের ডাক এসেছে··· নিত্যের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে...। নিত্যগোপাল—তুমি স্বরূপানন্দে বিভোর, রূপানন্দে বিভোর...শুনেছে তোমারি নাম অনাথ আতুর জনে...তুমি শুদ্ধ, তুমি অপাপবিদ্ধ... আমায় সুন্দর কর। আমার মন either-or-এর ভাষায় কথা বলে, আমার বুদ্ধি সামঞ্জস্য করতে পারে না—তোমার বুদ্ধি আমায় দেও, তোমার মন আমায় দেও··· আমি মানুষ হব।·· জগন্নাথ নিত্যগোপাল, তোমার বিরাট সংসারে তোমার ঘর আমি গুছাব...সব দেশ যেখানে এক দেশ আমি সেই দেশ সব বাছিয়া—ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ...। তোমার জয়ে আমার জয়, তোমার জয় হউক।

৮. ৩. ৭৭ : অহংকারের স্তরের বা প্রচলিত বর্ণাশ্রমের স্তরের সংযম তিতিক্ষা ইত্যাদি শরণাগতির স্তরের সংযম তিতিক্ষা থেকে আলাদা। প্রচলিত বর্ণাশ্রমে এই সব-কিছুই নেতিমূলক—না খাওয়া, না করা ইত্যাদি।...কিন্তু সংযম তিতিক্ষার এই ব্যাখ্যার ফলে একটী জাতির বাস্তব জীবন কেবল কতকগুলি সংস্কারের পুটুলী হয়েছে, কোনরকম সৃষ্টি-ক্ষমতাই তার নেই।...কর্ম করতে গেলে

মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, আবেগে এনে ফেলে...প্রাণ শুকিয়ে যাবে—সবই সত্য; তবু কর্মকে বাদ দেওয়া বা কমিয়ে কমিয়ে আনার সাধনা যদি হয় একটা জাতির পক্ষে পরমার্থ সত্য তাহলে সে জাতি বাস্তবের খাতা সামলাবে কি করে?...খেতেও হবে, কাজ করতেও হবে—মাত্রা ঠিক রেখে খেতে হবে, কাজ করতে হবে...যুক্তাহার যুক্তকর্ম ...। কর্মও থাকবে, কিন্তু টেনে নিয়ে যাবে না, তাঁর সঙ্গে যুক্ততা নষ্ট করে দেবে না···· খেলে লোভ হয় অতএব খেয়েই না—তা হয় না...। মাত্রা ঠিক রেখে করার মধ্যে ভীষণ সংযম লাগে, অত্যন্ত সচেতন বিবেচনা লাগে ...হয় যাব, নয় যাব না—এ বরং সহজ—সাধারণ মানুষ এটা বোঝে, পারেও। কিন্তু যাব অথচ লোভের বশবর্তী হয়ে যাব না, কিংবা অন্যকে বঞ্চিত করে যাব না—আমার যা পছন্দ তা ছাড়া যাব না তা নয়—এইভাবে বুঝতে হবে যাওয়ার সংযমকে। সাধারণ মন নিয়ে এ পারা সহজ নয়। ভোগ যোগ মিলন করে কর···। ভগবানের এমন ব্যবস্থা যে মানুষের কাছে অনন্ত সুযোগ আসে —মানুষ হয় অপব্যবহার করে, নয় তাকে কাজে লাগাতে জানে না ...। রবীন্দ্রনাথের সামান্য ক্ষতি কবিতার কথা মনে করে দেখো—এইরকম করে চায় বলেই তো মানুষ সব হারায়। মানুষের সুখবোধের মাত্রা থাকে না বলেই, মানুষ বলতে গেলে শুতে চায় বলেই, ঘরে থাকলেই ঘুমোন করতে চাইবে বলেই কবিয়া বললেন—সব বন্ধ কর—ঘরেই থেকো না, সব বন্ধ করাটা, ঘরেই না-থাকাটাই হচ্ছে পরমার্থ।...কিন্তু এ দর্শন তো চলে না ..কর্ম তো একেবারে বন্ধ করা যায় না...মানুষ বস্তুর অধীন হয়ে পড়ে বলে নেতিধর্ম এসেছিল...কিন্তু কৃষ্ণ-তত্ত্ব আলাদা—যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু, তার বেশী নয়—সে প্রয়োজন-বোধ স্থির হবে ভিতর বাইরের অবস্থা আবেষ্টন বিবেচনায়...অলস যখন ট্রামে চলে তখন সেটা অন্যায়...কর্মী ট্রামে চলবে বৈ কি।... সুযোগ পেয়ে লালসায় মত্ত হয়ো না—এমনভাবে সংসার থেকে নেবে যাতে যাত্রার ভুল না হয় ...রক্ত তো হাটে বসে থাকে না, সে একবার হাটে একবার সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে—জীবনকেও একবার ভগবৎ-কেন্দ্রে, আর একবার বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে।... ...বর্তমান যুগের মানুষ—ছেলেপুলে সব—বহির্মুখীন...। এতক্ষণের কথা ছিল, পাখী, আকাশে উড়িস নি—ও মায়া...। কিন্তু উড়তে যে মন চায় সেও তো সত্য! হাঁ সত্য—তবে এই চাওয়ার যেন অন্তর্জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে ...এমন করে যাব না যাতে যাওয়ার দাস হই।..... সরোজগোপাল অধিকারীর পরিত্যক্ত ছেঁড়া এতির চাদর গায়ে দিয়ে কত বক্তৃতাই দিলাম ...। প্রয়োজনের মধ্যেই এই সে ক্রমাগত বাড়তে চায়...। নিতে হবে জীবনে অনেক কম···প্রতি মুহূর্তে ভাবতে হবে যা পাচ্ছি তার সদ্ব্যবহার করছি কি না···। জীবনে এই ভাবে চলো—যাতে শেষে বলতে না হয়—সবের প্রাণে দাগা লেগেছে, সুসময়ে ছিল যারা, অসময়ে ফেলে গেছে···। মাত্রা মাত্রা—বেশীও পাপ, কমও পাপ।···সুযোগ আসে—কিন্তু অতি-মাত্রায় নিও না···স্নেহের, ভালবাসার অপব্যবহার করো না, যা পাও তার অপব্যবহার করো না।····· সংসারী সংসারকে অতি ব্যবহারে ডুবেছে, সংসারী অব্যবহারে ডুবেছে...যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে, শেষে দেখি হায়, সব কেঁদে যায় ধুলো হয়ে যায় ধুলোতে...। মানুষ মত্ত হয় বলে পরিত্যাগের কথা উঠেছে—কিন্তু গোবিন্দ দেখিয়েছেন মত্ত না হয়েও বস্তু ব্যবহার করা যায়—তাই তিনি মাত্রার কথা বলে গেলেন...। এই মাত্রাই নিত্যগোপাল...। তিনি ভাল খাননি, ভাল পরেননি ...। পরমহংসদেব তামাক খেতেন, নিত্যগোপাল তামাকও খেতেন না।··· ভোগে সংযত হও, ত্যাগে সংযত হও...। নিত্যগোপাল, আমায় মানুষ করে দাও, পুরুষোত্তম-সংযম আমায় শেখাও···।

১.৩.৫৭। শ্রীনিত্যগোপাল এক বিশ্বরূপ রূপে আমার জীবনের সামনে দাঁড়িয়েছেন—তিনি আলোয় শিখা—সেইজন্য জীবনে কোনদিন নৈরাশ্যবাদী হই নাই।···· বর্তমান বিশ্ব ভেঙে পড়ছে—নিত্যগোপাল সেখানে আলো ···। চরৈবেতি চরৈবেতি—এগিয়ে যাওয়া জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে রোগ শোক কমে···। যেখানে স্রোত সেখানে মলিনতা দাঁড়ায় না—বদ্ধ বায়ু বন্ধ

জলে মলিনতা।...সাগরের তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ততা হলে মলিনতা কাটে...। নিতাগোপাল সেই তরঙ্গ...অথচ শান্ত বিপ্লব...। সর্বসম্প্রদায়ের মিলনের কথা তিনি বলেছেন, এ মিলন কত বড় বিপ্লবী মন হলে সম্ভব...!

নিতাগোপাল, আমি তোমারই সঙ্গে ছুটব...। তোমাদের কাছে আমি ছুটবার আহ্বান এনেছি.....। উপনিষদে আছে অশ্ব যেমন গা ঝাড়া দিয়ে জল ফেলে দেয়—তেমনি গা ঝাড়া দিয়ে ওঠ...চল চল..। নিতাগোপাল, তুমি যে ছুটবার মন্ত্র দিয়ে গেছ...সকল জাতি কুল শীল তুলিয়া.....আমি ছুটব...। ছুটবার মন্ত্র শোনাও স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মানুষকে।...তোমার ছুটবার উদ্দাম গতিতে সংসারকে তুমি নূতন করে গড়ে তোল...। নিতাগোপাল আমার প্রাণবল্লভ, আমার প্রাণ...ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ... জগন্নাথ নিতাগোপাল জগন্নাথ..।

১১.৩.৭৭। কান পাঠের ভিতর বলেছিলাম—walking with God—সব রকমের সুস্থতা বা স্বস্থতার একমাত্র সাধন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলা। সুস্থ একটী বস্তুকে না ভাবলে মানুষ সুস্থ হয় না। সুস্থ সে যে বস্তু। একজন সুস্থের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে অসুস্থ সুস্থ হতে পারে না।...জীবনের মজা এই—কোথাও কোন বিপর্যয় ঘটলে সমস্ত দেহের একটী জীবনী-শক্তি তাকে রক্ষা করবার সহায়তা করে।...রোগ হলে পরেই নিরোগের চেষ্টা হয়।...কাশী হচ্ছে মানে কাশটাকে সরাবার জন্য বেগ করার চেষ্টা করছে। গা গরমটা রোগ নয়—শরীরের বিষটাকে বের করে দিচ্ছে—যখন রোগ আসে তখন রোগের মধ্য দিয়ে ভুর্ভোগ কাটাবার পথ হয়—এটা যে জানে সে ঘাবড়ায় না।...প্রথম সাধনা দৃঢ় জীবনীশক্তির সঙ্গে যোগ।...ভবরোগী বা দেহযোগীর প্রথম কর্তব্য সুস্থতার ধ্যান।...সিংহের বাচ্চাকে মেষত্ব থেকে ফিরিয়ে আনতে তাকে সিংহত্বের ধ্যান শেখাতে হবে। রোগীর প্রথম চিকিৎসা আমি নীরোগ এই ধ্যান। দ্বিতীয় সাধনা—ভুয়ানেব আত্মকৃতং বিপাকে—যা কিছু করেছি এইবার রোগের মধ্য দিয়ে তা কাটিয়ে উঠছি—আমার জীবনে যদে রাধারাণী গোবিন্দের নাম নিচ্ছেন—আমি তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকব...। একটা বিশেষ ছন্দ না জানার জন্য রোগ হয়েছে, আমি সে ছন্দ মেনে চলব।...কলেরার মাছি মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়...। এটা হোমিওপ্যাথি—হোমিওপ্যাথি একটা রোগ সৃষ্টি করে সেই রোগ দিয়ে দেহের রোগকে টেনে বের করে সুস্থ করে।...আমার অতীতের সব পাপ কেটে যাচ্ছে... সর্বমঙ্গলার দেশে রোগও অমঙ্গল নয়। শঙ্করাচার্য লিখেছেন—রোগঃ এব পরা পূজা...। রোগে যতই disturbed হচ্ছি, ততই বাড়ছে।...শান্তিতে নিজের কর্মভোগ কর—শান্তিতে...। ভোগাদের ক্ষয়:—ভোগ করেই ক্ষয় করতে হবে। হয়তো জাগা ভাল—ঠিক জায়গায় এসে পড়া গেছে...। রোগ তো মায়া—রোগকে মেনে নাও...এই রোগের মধ্য দিয়ে কোন্ মঙ্গল আসছে কে জানে? হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানে সর্বভোগের শেষ হল।...শরণাগত হয়ে পড়ে থাকলে..ভোগকে দুর্ভোগ মনে না করলে, ভোগকে মোক্ষভোগ মনে করলে ভোগ কাটে। হরিশ্চন্দ্রের দুর্ভোগ কেটেছিল...। দুর্ভোগেরও মাত্রা আছে...করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে...হাসিমুখে যে ফল নেয়, তার ফল কাটে।... তৃতীয় সাধনা—আমার এখনকার চলাবলা দিয়ে যেন নূতন কর্মফল সৃষ্টি না করি...দুৎবাক্‌বপুর্ভিঃ বিদধাৎ নমস্তে—নোয়ারে দাও...। প্রবেশ রোগের অর্থ করেছেন নূতন একটা অবস্থা আসবার আগে রোগ হয়—শিশু যখন হাঁটতে শিখবে তখন তার রোগ হয়—একটা অবস্থা থেকে আর একটা অবস্থায় আসবার প্রবণতা আসলে, নূতন শক্তি হজম করতে না পারলে অসুখ হয়...শরণাগত হয়ে থাকলে কখন কাপড় খসে যাওয়ার মত কর্মফল খসে পড়ে...। শরণাগত হয়ে কর্ম করে যাও...from life to life—জীবন থেকে জীবন সৃষ্ট হয়ে উঠবে—তাঁর জীবন আমাদের মধ্যে এসে যাবে—আমার জীবনে নূতন lifeটাকে আনবার জন্য এই বিপদ এসেছে—এমন করে ভাবতে পারতে হতাশা আসে না।...ঝড়ের সময় তাঁতে শরণাগত হয়ে থাকতে হয়। শরণাগত মানে যা

আছে কপালে—তা নয়; তোমার বিচ্ছিন্ন অহংকেই কর্তা না বানানো, সে-ই সব সমাধান আনতে পারে তা মনে না করা, আবেষ্টন থেকে কোথায় বৃহত্তর ইঙ্গিত আসে বুঝবার প্রবণতা রাখা—সর্বোপরি শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনকে ধারণ করবার মত দেহ-মনের নমনীয়তা···। অসহায় হও—নিজেকেই একমাত্র সহায় মনে করো না, দীন হও—অপরকে স্বীকার কর—দীননাথকে পাবে।... তোমার এখনও অহংকার আছে, তবার জোর আছে—দীন তো তুমি হও নাই।...চিলে মাংসখণ্ড নিয়েছে, কাক তার পিছন পিছন তাড়া করছে...মাংসখণ্ড ফেলে দাও—কাকের উৎপাত যাবে। অহংকার ফেলে দাও, দেখবে জীবনে অনেক উৎপাত কমে গেছে।·· রোগে দেহ নির্মল হয়...রোগের ভিতর দিয়া পাপ কাটে—সকলের কৃতজ্ঞ যেন আশীর্বাদ হয়—মৃত্যুরের পরা পূজা···। নিত্য-গোপাল, কোলে করে রেখেছে...অন্ধকার অন্ধকার হয় যখন আমি কর্তা—অন্ধকার আলো হয় যখন তুমি কর্তা...। আমার সব কিছুর মালিক তুমি ..দেহ মন আত্মার···।

১২.৩.৫৭। বিজনবাবু কদিন থেকে এখানে আসেন—এই আশ্রমে সেবা করবার জন্য—২।৩ ঘণ্টা করে কাজ করেন। এর মধ্যে একবার তাঁর মাথা খারাপ হয়ে ছিল—...। এক বন্ধু ওকে আবার কাজ করতে বলে ১৫৲ টাকা advance দিয়েছে···। কাজ আরম্ভ করতেই আবার মাথা খারাপ হয়ে যায়···capitalistদের সঙ্গে ওর বিরোধ—সেইখানে ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়।... চাকুরী করতে সে পারবে না—অথচ আশ্রমে সে বেশ কাজ করে যাচ্ছে।···আজই capitalism-কে তো বন্ধ করা যাবে না—কর্মী যদি সর্বপ্রকারে যোগ্য হয়ে না ওঠে। ...ভারতীয় সাধনা কর্মকে স্থান দেয় নি ..জ্ঞানকর্মাদি অনাবৃতম্, জ্ঞানকর্মাদি শূন্যম্···। আদর্শ রইল আদর্শ, বাস্তব রইল বাস্তব···অথচ বর্তমান কালে একদল জন্মেছেন যারা আদর্শ বাস্তব দুই-ই সার্থক করতে চান...এখানে শ্রীনিত্যগোপাল তার পরিণত রূপ—বর্তমানের জটিলতম জীবন-ব্যবস্থায় নিত্যগোপাল-জীবন-দর্শন ছাড়া গতি নাই। কোন্ জায়গায় হাড়িয়ে তিনি লিখছেন 'মহা-সিদ্ধাবস্থায় গাইবা সন্ন্যাস এক বলিয়া মনে হয়'? ।···কর্ম কর্মান্তরে নিয়ে যাবেই... ঠাকুরও জানতেন বলেই কর্মকে বাদ দিয়েছেন·· সংসারের যে arrangement থাকার ফলে সংসার সন্ন্যাসের সঙ্গে রাখা যায় সে arrangement-এর পরব নিত্যগোপাল দিয়ে গেছেন···। এটা অপূর্ব—you must rise above সংসার, you must rise above সন্ন্যাস।···সাবধান—বৈষয়িকতা না আসে—এমন করে সংসার কর···। আগের মত সম্পর্কগুলি থাকবে না—আগে ছিল সব direct, এখন হবে through নিত্যগোপাল...সংসারের মধ্যে সন্ন্যাসের looseness রাখতে হবে—···যাকে কেন্দ্র করলে তবু যেমন নিজের সংসার নিয়ে থাকলে চলে না—পাঁচ ভাইয়ের সংসারও যেমন তাতে থাকে—তেমনি নিত্য-গোপালের সংসার করলে আসক্তি বিদ্বেষের রূপ আলাদা হয়ে যায়। বাবার সংসার করাই সন্ন্যাস।···প্রয়োজন অনুসারে খরচ··। বিষয় অর্থ self-centeredness—আমার দেখা দিয়ে স্ত্রীপুত্রকন্যা সংসারকে দেখা...কৃষ্ণ বললেন মদর্থং কুরু—তাঁর জন্য কর্ম না করলে কর্মের টান সামাল দেওয়া যাবে না।···মঠমন্দির উঠছে, নাটমন্দির হচ্ছে...জীবন কতটুকু পরিশুদ্ধি লাভ করছে? আমার ভয় এমন যেন এখানে না হয়—বৈষয়িকতা যেন কোন কাজে না আসে ।...সেই নূতন arrangement না আনলে...সংসার সন্ন্যাস দুই-ই থাকবে না। কর্মকে জ্ঞানের ভাবে ভাবিত করতে হবে অর্থাৎ কর্ম তখন আর আমার নয়, তাঁর;- কৃষ্ণের যুদ্ধ অর্জুন করেন—পাশ্চাত্যের কর্ম আবার কর্ম .অর্জুনের অহংকারে আমি নাই—আছে কৃষ্ণের সেবা, সমাজ রাষ্ট্রকে সুস্থ করবার বাসনা...। যে দল বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয় করতে পারল না ...তারা কি রকম যে ব্যর্থ হয়ে গেল!···অর্থের ক্ষেত্র আর পরমার্থের ক্ষেত্র এক করতে হবে—অর্জুন যুদ্ধ করলেন—এটা অর্থ না পরমার্থ?...নিষ্ক্রৈগুণ্য হওয়াও হয়েছে, যুদ্ধও হয়েছে...।...আত্মসমর্পণ হল সন্ন্যাস এবং আত্মসমর্পণের পরে নূতন করে যে সম্পর্ক স্থাপন করা হল তা সংসার।

ক্রমশঃ

অল্ বেরুনীর ভারত-দর্শন

॥ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ॥

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভে খলিফার প্রতিনিধি মহম্মদ বিন্ কাসিমের সহিত যুদ্ধে সিন্ধুরাজ দাহিরের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ দেবলবন্দর আরবদের হস্তগত হয়, এবং রাওয়ার ও মূলতান অবধি সিন্ধুদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আরবগণের অধিকারে চলে যায়। অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক অবধি দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর কালের ইতিহাস পর্যালোচনায় ঐক্যহীন, খণ্ডখণ্ড ও পরস্পরবিরোধমান নানা রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক অবস্থা লক্ষ্য করা যায়, তা যে বৈদেশিক আক্রমণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভারতবর্ষের পতনের কারণ শুধু রাজনৈতিক অনৈক্য ও দুর্বলতাই নয়। জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ নিহিত থাকে আরও গভীরে। জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায় নানা গ্লানি এবং বিকৃতি। তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত অনুরূপ অবস্থার সাক্ষ্যই বহন করে। যে প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে তদানীন্তন ভারতের অধঃপতিত অবস্থার একটা বর্ণনা খাড়া করা যেতে পারে তা প্রধানতঃ দু'শ্রেণীর, যথা—আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকের বিবরণ। অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিদেশী পর্যটক ও পরিব্রাজকদের ভারতবর্ষে আসা-যাওয়ার চল ছিল। সেলুকস নিকেটরের দূত মেগাস্থিনিস, "পেরিপ্লাস অব্ দি ইরিথ্রিয়ান সী" নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা গ্রীক লেখক, ও চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, য়ুয়ান্ চুয়াং, ইৎসিং প্রভৃতি আরও অনেকে তৎ তৎ কালীন ভারতবর্ষের যে পরিচয় -পঞ্জী রেখে গেছেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গ্রথনায় তার মূল্য অপরিসীম। তুর্ক-আফগান-মুঘল যুগেও বহু বিদেশী পর্যটক এদেশে এসেছিলেন এবং রেখে গেছেন তাঁদের রচিত কাহিনী। ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনে এসব উপাদানের সাহায্য অপরিহার্য।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকে গজনীর সুলতান মামুদের অভিযানের সাথে এসেছিলেন তেমনি একজন বিজ্ঞানমনস্ক পণ্ডিত-পর্যটক অল্‌বেরুনী। অল্‌বেরুনীর ভারতদর্শনের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। তাঁর রচিত গ্রন্থের পুরো নাম "তাহ্-ক্বি-মা-লিল্-হিন্দ্-মিন্-মাকালাহ্-মক্‌বুলাহ্-ফিল্-আক্‌ল-আও-মরজুলাহ্।" সংক্ষেপে তাহ্‌ক্বিক্-মা-লিল্-হিন্দ্ অথবা ইণ্ডিকা। এই গ্রন্থ অল্‌বেরুনীর প্রত্যক্ষ-দর্শনের ফলশ্রুতি। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন জার্মান পণ্ডিত এডোয়ার্ড সাচাও। ইনিই মূল গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক। ইংরেজি অনুবাদ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ ও ১৯১০ সনে।

আবু রইহান ওরফে অল্-বেরুনী (বিদেশী) মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত তুর্কীস্থানের খিবা নামক স্থানে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। অসামান্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন অল্-বেরুনী। অল্পবয়সেই গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস এবং জ্ঞেয়ক-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন তিনি। নানা ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। নিজ মাতৃভাষা খোয়ারিজ্‌মি ছাড়াও তিনি ছিলেন ফার্সী, আরবী, তুর্কী-ভাষা ও সংস্কৃতে পারঙ্গম। একদিকে প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক্‌পাল ব্যাস, কপিল ও ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির রচনার সহিত তাঁর পরিচয় ছিল যেমন নিবিড়, অন্যদিকে গ্রেটো-এরিস্টটেলের চিন্তাধারা বিষয়েও জ্ঞান ছিল তাঁর গভীর। কলকথা তদানীন্তন জগতে অল্-বেরুনীর সমকক্ষ আর কোন পণ্ডিত ও মনীষীর সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাঁর গভীর জ্ঞান ও মনীষার স্বীকৃতি স্বরূপ খিবাধিপতি অল্‌বেরুনীকে তাঁর রাজসভার অন্যতম সভাসদ নিযুক্ত করেছিলেন।

গজনীর বিখ্যাত সুলতান মামুদ কর্তৃক খিবারাজ্য আক্রান্ত ও অধিকৃত হলে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে অল্‌বেরুনীও গজনীতে নীত হন। ১০১৭ থেকে ১০৩১ খৃষ্টাব্দ অবধি ৫৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত অল্‌বেরুনী গজনীতে

বসবাস করেছিলেন। ১০২১ সনে সুলতান মামুদ পঞ্জাব আক্রমণ ও অধিকারভুক্ত করে নিলেন। অলবেরুনীও সে সুযোগে ভারতে এলেন ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির আরও ভালোভাবে অনুশীলন করবার উদ্দেশ্যে। তৎসময়ে মুলতান ছিল হিন্দুদের এক প্রধান তীর্থনগর। এখানকার সূর্যমন্দিরের খ্যাতি ছিল বহুদূর ব্যাপ্ত। অলবেরুনী কিছুকাল মুলতানেও বাস করেছিলেন। মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলে এবং মামুদের অভিযানের সাথী রূপে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও পরিভ্রমণ করেছিলেন তিনি। চীনা পরিব্রাজকদের মত অলবেরুনীও ছিলেন জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানান্বেষী। কিন্তু বিগত ছয় শত বৎসরের ব্যবধানে ভারতের সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন তথা অবনতি ঘটেছিল প্রচুর। পূর্ববর্তী কালের বৈদেশিক অভিযানকারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন অথবা রাজ্যজয়। মুসলমান আক্রমণকারীরা সে উদ্দেশ্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আর একটি এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য: পৌত্তলিক হিন্দু তথা কাফেরদের ধর্মান্তরিত করণ।

উপর্যুপরি তুর্ক-আফগান আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত ভারতবাসীর কাছে একজন বিধর্মী ও বিদেশী অভিযানকারী যে উদার আতিথ্য লাভে বঞ্চিত হবে তাতে আর বিস্ময় কি? অলবেরুনী নিজেই বলছেন—"Mamud utterly ruined the prosperity of the country and performed exploits whereby the Hindus became atoms of dust scattered in all directions like a tale of old."

কিন্তু অলবেরুনীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সত্যসত্যই বস্তু-নিষ্ঠ। তিনি যেমনটি দেখেছিলেন, যেমনটি বুঝেছিলেন স্পষ্ট ও নিরপেক্ষভাবে তাই ব্যক্ত করেছেন। অপ্রীতিকর হলেও তাঁর অভিমতগুলি অখণ্ডনীয়। দীর্ঘদিন বিদেশী আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত, বৈদেশিক যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন এবং বহির্জগতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন ভারতীয়দের সঙ্কীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতা হয়ে উঠেছিল মারাত্মক। অলবেরুনীর উক্তি:

"Folly is an illness for which there is no medicine. Hindus believe that there is no country but theirs, no nation like theirs, no king like theirs, no religion like theirs, no science like theirs. They are haughty, foolish, vain, self-conceited and stolid. They are by nature niggardly in communicating that which they know, and they take the greatest possible care to withhold it from men of another caste among their own people, and still much more of course, from any foreigner. Their haughtiness is such that if you tell them of any science or scholar in Khurasan and Persis, they will think you to be both an ignoramus and a liar. If they travelled and mixed with other nations, they would soon change their minds, for their ancestors were not as narrow-minded as the present generation is."

গুপ্তযুগের মনীষী বরাহমিহিরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন অলবেরুনী তাঁর নিজ বক্তব্যের সমর্থনে। বরাহমিহির বলেছেন "যবনগণ অপবিত্র হলেও সম্মানীয়"। হিন্দুগণের সেই উদার মনোভাব আর নেই, এই ছিল অলবেরুনীর ক্ষোভ। অলবেরুনী তাই বলেছেন "একবার কোন কারণে যে অপবিত্র বলে গণ্য হল, হিন্দুরা আর তাকে শুদ্ধ করে গ্রহণ করে না"। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হিন্দু-সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের কী পরিমাণ পরিবর্তন ঘটেছিল। আক্রমণকারী যবনরা কালক্রমে রাজপুতরূপে হিন্দু-সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। গ্রীকরাও হিন্দু বনে গিয়েছিল। তক্ষশিলার গ্রীক শাসনকর্তা এন্টিয়ালকিডাস্ কর্তৃক প্রেরিত বেসনগর রাজসভার গ্রীক রাজদূত হেলিওডোরাস ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পঞ্জাবে রাজত্ব করতেন গ্রীক মিনান্ডার। তিনি হয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত। বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থ "মিলিন্দো পান্

হোতে" (বিনাদ্বারের প্রশ্ন) তাঁর উল্লেখ আছে। অল্‌বেরুনীর ভারত পর্যটন কালে অনুরূপ ঘটনা সম্ভব হত না।

অল্‌বেরুনী হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্যক অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এতে প্রতিবন্ধক ছিল বহুল। তৎকালীন ধর্মোন্মাদ অভিজাতকারীরা ম্লেচ্ছদের ধর্ম ও শাস্ত্রাদিকে ঘৃণা বিনাপ্রয়োগা কিম্বা অন্য কিছুই মনে করতে পারত না। পক্ষান্তরে সঙ্কীর্ণমনা হিন্দুরাও যবন তথা ম্লেচ্ছ পণ্ডিতকে অস্পৃশ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখত। এসব সত্ত্বেও জ্ঞানতপস্বী অল্‌বেরুনী হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং বিশেষ ক'রে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করেছিলেন অতি গভীরভাবে। তাঁর মতে হিন্দু বিজ্ঞানশাস্ত্র সংখ্যায় বিপুল : এ সকল শাস্ত্রাদির আরও প্রসার সম্ভব হত যদি তদানীন্তন হিন্দুরাজগণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও শাস্ত্রব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায় উদার হতেন, অগ্রণী হতেন। কিন্তু সে সময়টা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা উভয়ই ছিল যথার্থ বিজ্ঞান চর্চার পক্ষে প্রতিকূল। অল্‌বেরুনী ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ অনুরাগী হয়েও মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় গণিত শাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যা যেন একই সুতোয় গাঁথা মুক্তো আর হুড়িপাথরের মালা। সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে অহেতুক বিশ্বাস আর অন্ধ সংস্কারের এক অদ্ভুত জগা-খিচুড়ি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেছেন ব্রহ্মগুপ্তের চান্দ্র-গ্রহণ বিষয়ক দু'টি সিদ্ধান্তের কথা। ব্রহ্মগুপ্তের বিজ্ঞানসিদ্ধ তত্ত্বটি রয়ে গেল 'নিহিতং গুহায়াং', আর প্রচলিত হয়ে উঠল জনমত, তথা অজ্ঞতা-প্রসূত ভূতুরে কল্পনা : চন্দ্রের রাহু-গ্রাস। তদানীন্তন ভারতীয় মনীষী নতি স্বীকার করেছেন মূঢ় জনমতের কাছে। সত্য বিলুপ্ত হয়েছে অজ্ঞতা ও অন্ধ বিশ্বাসের অন্তরালে। সত্যনিষ্ঠ সোক্রটিস রাজপুরুষের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করেছিলেন। আকাশের তারাগুলিকে দেব-দেবী বলে মেনে নেন নি, বরঞ্চ সত্যের সমর্থনে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে অল্‌বেরুনীর অভিমত হচ্ছে :—

"The Hindus had no men of this stamp, both capable and willing to bring sciences to classical perfection. Therefore you mostly find that even the so-called scientific theorems of the Hindus are in a state of utter confusion devoid of any logical order, and in the last instance always mixed up with the silly notions of the crowd, for example, immense numbers, enormous spaces of time and all kinds of religious dogmas, which the vulgar belief does not admit of being called into question."

অল্‌বেরুনী এদেশে এসেছিলেন জ্ঞানান্বেষীর মন নিয়ে। তখনকার ঐশ্লামিক দুনিয়ায় ভারতবাসী তথা হিন্দুদের সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন ছিল। অল্‌বেরুনী চেয়েছিলেন হিন্দুদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিধি নিয়মের একটা নিরপেক্ষ এবং তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন করতে। হিন্দুদের সঙ্কীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে নিরাশ করেছিল। কিন্তু নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও হিন্দুর সংস্কৃতি ও অভিনব চিন্তাধারায় তিনি অভিভূত না হয়ে পারেন নি। বিশেষ করে ভগবৎ-গীতার শাশ্বত বাণী আকৃষ্ট করেছিল অল্‌বেরুনীকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সমীক্ষায় অল্‌বেরুনীর 'তাখ্‌-ই-হিন্দ্‌' গ্রন্থটি হচ্ছে 'like a magic island of quiet impartial research in the midst of a world of clashing swords, burning towns, and plundered temples'।

সুলতান মামুদের অভিযানের সঙ্গেই অল্‌বেরুনী ভারতবর্ষে এসেছিলেন, এবং গজনীর রাজসভার সভাসদও হয়েছিলেন। কিন্তু পরে মামুদের সঙ্গে তাঁর ঘটেছিল তীব্র মনান্তর। অল্‌বেরুনীর কোন কোন রচনায় প্রকাশ পেয়েছে প্রচণ্ড মামুদ-বিদ্বেষ। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে গজনী শহরেই এই মহামনীষীর দেহান্তর ঘটে।

নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তাবোধ যে জাতির সংস্কৃতি ও

শক্তিকে কতখানি খর্ব করে, তারই দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালীন ভারতবর্ষে। দীর্ঘদিন বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছিল ভারতবর্ষ। মধ্য-এশিয়ার পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে স্থল-পথে মধ্যপ্রাচ্য এবং চীনের সঙ্গে যোগাযোগের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান নৌশক্তির অধিকারী আরবগণ ভারত মহাসাগর এবং পূর্বসমুদ্রের উপর নৌ-শক্তির প্রাধান্য বিস্তার করায় বণিজ্য প্রণালীর মধ্য দিয়ে দূর-প্রাচ্যের সমুদ্রপথও ভারতের পক্ষে হয়ে উঠেছিল দুর্গম। আরবের আরবসাগর তথা পশ্চিমাঞ্চলীয় সমুদ্রেও প্রতিপত্তি লাভ করেছিল আরবীয় বাণিজ্যপোত ও জলদস্যুরা। এই আন্তর্জাতিক নিঃসঙ্গতায় ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎসই যেন শুকিয়ে গিয়েছিল। ভিন্ন-ধর্মী কোন সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শ-মাত্র না থাকায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণধারা যেন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ঔদার্য ও অভিনবত্বের স্থান অধিকার করেছিল সঙ্কীর্ণতা ও স্থিতিশীলতা। সামাজিক ব্যবস্থাও কতকগুলি অর্থহীন বিধি নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। জাতি-তত্ত্বের আদি কথা গুণ অর্থাৎ যোগ্যতা এবং কর্ম অনুসারে শ্রেণী বিভাগ—যে চিরন্তন রীতি আজও অবধি Division of labour রূপে প্রচলিত—তার বিকৃতি ঘটেছিল পুরুষানুক্রমিক জাত এবং সামাজিক ছোঁয়াছুঁয়ি রূপে। অর্থহীন আচার-সর্বস্ব সমাজের এই বিকৃত রূপটি নিশ্চয়ই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ আদি সমাজ শাস্ত্রকারগণের বিস্ময় ও বিরক্তি সৃষ্টি করত।

শুধু সামাজিক অধোগামিতাই নয়, সাধারণ জাতীয় চরিত্রের অধোমুখিতাও এ যুগের লক্ষ্যনীয়। সাহিত্য ও শিল্পেরও ঘটেছিল অধোগতি। কাদম্বরীর কবি ও হর্ষ-চরিতকার বানভট্ট এবং তৎপরবর্তী মাঘ ও শ্রীহর্ষের রচনায় রুচি বিকারের ছাপ সুস্পষ্ট। গুপ্তযুগের কাব্যানুশীলনের সঙ্গে তুলনায় এ যুগের কাব্য-রচনা নিঃসন্দেহে হীন ও নিকৃষ্ট। কবিকুলপতি কালিদাসের সুন্দর, সংহত ও সুষমাময় কাব্য-সৃষ্টির পরিবর্তে কৃত্রিম, বাক্-প্রধান ও লঘু-ভাব কাব্যই এযুগের বৈশিষ্ট্য।

নৈতিক জীবনের মূল্য-বোধও হ্রাস পেয়েছিল। যৌন ব্যভিচারের দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তৎকালীন কাব্য ভারাক্রান্ত। তথাকথিত রিয়ালিজম্ বা বাস্তবতার অনুহাতে বর্তমান বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যেও এরূপ রুচি ও সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটছে। এ-হেন অপ-কৃষ্ট রচনা সাহিত্য নামের অযোগ্য এবং জাতীয় চরিত্রের অবনতিরই পরিচায়ক।

স্থাপত্য ও চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবনতির লক্ষণ প্রকট হয়েছিল। পূর্বেকার অজন্তা-এলোরা এবং খাজু-রাহোর অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির পরিবর্তে এ সময়ের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে নানা ভঙ্গীতে যৌন-সম্ভোগের নির্লজ্জ মূর্তি। আচার্য শঙ্কর অধঃপতিত ও বিকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বহুলাংশেই নষ্ট করেছিলেন। হিন্দু ধর্মকে পুনঃ-স্থাপিত করেছিলেন উচ্চ নৈতিক জীবন এবং দার্শনিকতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর। কিন্তু এ সত্ত্বেও যুগাচার্য শঙ্কর ব্যর্থ হয়েছিলেন সমাজ-জীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট নানা দুর্নীতির সংস্কার সাধনে। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের ঘটেছিল গভীর নৈতিক অধঃপতন। ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিণত হয়েছিল যেন যৌন স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্রে।

বৌদ্ধ তন্ত্রের পবিত্রতম গ্রন্থ 'গুহ্যসমাজে' বুদ্ধকে চিত্রিত করা হয়েছে দেবদূতীদের সঙ্গে যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত লম্পটরূপে। ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'সময়-মাতৃকা' গ্রন্থটি জনৈকা বারবণিতার আত্মজীবনী। নায়িকা কখনো কোন রাজমহিষীর সহচরী, কখনো কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রক্ষিতা, কখনো স্বাধীন দেহব্যবসায়িনী, কখনো বা কপট ভিক্ষুণী—ইত্যাদি বিচিত্র ভূমিকায় তার যৌন জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছে। মঠ-মন্দিরগুলিও ব্যভি-চারের অবাধ লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। বহুল-প্রচলিত দেবদাসী প্রথা তৎকালীন লোকায়ত ধর্মের ঘোরতর অবনতির সাক্ষ্যই বহন করে। ক্ষেমেন্দ্রের 'নর্মমালা' গ্রন্থটি মঠ-মন্দিরের মোহান্ত-পুরোহিত প্রভৃতির নৈতিক অধঃপতনের এক মসীলিপ্ত চিত্র। বোকাচিওর 'ডি কামেরন' গ্রন্থের মতই ভ্রষ্ট ধর্ম-যাজকগণের

কলুষিত চরিত্রের নানা আখ্যান বিধৃত হয়েছে মর্মমালায়।

তখনকার ভারতবর্ষের নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্পন্দনশীলতার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু অভাব ঘটেছিল উৎকর্ষে ও উদারতায়, মৌলিকতায় ও মননশীলতায়। জনপ্রিয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ লোকায়ত হিন্দু ধর্মের সহিত একাত্মীভূত হয়ে আসছিল। শঙ্কর-রামানুজ প্রমুখ আচার্যগণের দার্শনিক ব্যাখ্যায় সনাতন বেদান্তাশ্রিত হিন্দুধর্মের দিগন্ত যে প্রসারিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাঁচশত বৎসরের অব্যাহত শান্তিতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু দেশের অর্থ ও সম্পদ ছিল মূলতঃ মুষ্টিমেয় ধনী মানুষের করায়ত্ত—যে অবস্থায় কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন স্বাধীনোত্তর ভারতেও ঘটেছে বলা যায় না। অতীতে বহুশত ধনসম্পদের লোভেই যুগে যুগে ঘটেছে বিদেশী হানাদারদের দুর্বার অভিযান। কিন্তু দশম শতকের শেষাংশে যে নূতন ও অভাবনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার মোকাবিলায় তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা যে আদৌ অনুকূল ছিল না সে কথাও অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক সংহতির অভাব এবং সামরিক রক্ষণশীলতাই তুর্কী-আক্রমণে ভারতের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। দক্ষিণ ভারতের পল্লব, চোল এবং পাণ্ড্যরাজ্যগুলি ছিল অনেকটা জাতীয়তা-ভিত্তিক। কিন্তু উত্তর ভারতে জাতীয়তা-বোধ এবং জাতীয়তা-ভিত্তিক রাষ্ট্র বলতে কিছু ছিল কিনা সন্দেহজনক। রাজারা বংশানুক্রমে এবং উত্তরাধিকারবলে নিজস্বার্থে রাজত্ব করতেন। জাতীয়তা-বোধ বা দেশ-প্রেমের কোন প্রেরণার স্থান ছিল না জনসাধারণের মনে। স্ব স্ব প্রধান রাজ্যগুলির প্রশাসন ব্যবস্থাতেও এই আমলা-তন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হত। স্বেচ্ছাচারী রাজা ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্রের যোগসাজসে গঠিত শাসন-চক্রের কুপ্রভাবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি-বোধ জেগে উঠা সম্ভব হত না।

এমনি একটা শোচনীয় আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছিল তুর্ক-আফগান অভিযানকারীর দল। যে আক্রমণ-তরঙ্গে ভারতভূমি প্লাবিত হয়ে গেল তার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তিনটি—অর্থনৈতিক অর্থাৎ আক্রান্ত দেশের বিপুল ধনসম্পদ লুণ্ঠন, দ্বিতীয় পৌত্তলিক হিন্দুদের পবিত্র ইসলাম গ্রহণে বাধ্য-করণ তথা ইসলাম ধর্মের প্রসার, এবং তৃতীয় ভারতভূমিতে মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা-সাধন। সেদিন এই বিদেশী অভিযানের সুদূর-প্রসারী পরিণামের কথা ভারতীয়েরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি। এই আক্রমণকে সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প ও শক্তির ঘটেছিল একান্ত অভাব। তাই সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর জন্য ভারতের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে এল অনিবার্য দুর্ভাগ্যের মেঘ।

পারস্পরিক সৃষ্টি গীতা প্রথম পৌঁছালেন। God is my another half, world is my another half,....'every moment, nay every situation, is of infinite value'. প্রত্যেক মানুষ বিশ্বরূপ। নর ও নারায়ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে—কেমন করে দুইজনে এক হয়ে সৃষ্টি করা যেতে পারে—তাই জানাবার জন্যই আঠারো অধ্যায় গীতার দরকার।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শতবর্ষের আলোকে মহাত্মা গান্ধী

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ॥

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা এবং মানবিক চেতনার এক পথিকৃৎ হিসাবে গান্ধীজীর ভূমিকাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। সে চেষ্টা যদি কেউ করে তবে সে অকৃতজ্ঞ। নেতা হিসাবে গান্ধীজীর নির্দেশ দেশের ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে কিনা, সে প্রশ্ন বিতর্কমূলক হতে পারে। এমন কি দার্শনিক তত্ত্বের মত অহিংসা ও মানব-প্রেমের যে তত্ত্বকে তিনি সামনে রেখে গেছেন সে তত্ত্বও সর্বজনগ্রহণ-যোগ্য না হ'তে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের রূপ-গঠনে যাঁদের অক্লান্ত প্রয়াস ও সাধনা ছিল, গান্ধীজী যে তাঁদের মধ্যে অনন্যসাধারণ ছিলেন, একথা অস্বীকার করলে আমরা অকৃতজ্ঞতার পাপে লিপ্ত হব।

গান্ধীজী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই ভুল করি। ভুল করি, কারণ রাজনীতিক বলে ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁর একটি বিকৃত চেহারাকে লোকের সামনে তুলে ধরি। আমরা ভুল করি কারণ রাজনীতিক পরিচয় গান্ধীর পক্ষে শুধু অসম্পূর্ণই নয়, অসঙ্গতও। আমরা ভুল করি, যখন তাঁকে ধার্মিক মহাত্মা বলে বর্ণনা করি। ঈশ্বর এবং ধর্ম তাঁর অন্তর্ধান হলেও তাঁর সমস্ত ধর্মবোধ মানুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। অহিংসা যে নির্বীর্য মানুষের নিছক আত্মসমর্পণের নীতি নয়,' এ কথাও আমরা ভুলে যাই। তাই গান্ধীজীর প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে আবৃত থেকে যায়।

গান্ধীজীর স্বরূপ আমাদের কাছে আরও অজ্ঞাত হয়ে যায়, যখন আমরা—যারা তাঁর শিষ্য—তারা অতি ভক্তির বশে তাঁকে দেবতা বানিয়ে তুলি। ফলে মানুষ-গান্ধীর স্বাভাবিক ভুলত্রুটিগুলি পর্বতপ্রমাণ হয়ে আমাদেরই সংশয়িত করে।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কেবলমাত্র গান্ধীজীর নেতৃত্বের ফলেই সম্ভব হয়েছে এমন কথাও আমরা বলতে পারি না। এবং রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীজীকে একমাত্র নেতার সম্মানও আমরা দিতে পারি না। মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ অনেক আগে থেকেই মাথা তুলেছিল। সুরেন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন অথবা তিলকের কথা আমরা কখনও বিস্মৃত হতে পারি না। এমন কি সমসাময়িক কালে নেতাজী সুভাষের সংগ্রাম যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যের অবসানকে ত্বরান্বিত করে ছিল, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় বিবেকানন্দ অগ্রদূত। রবীন্দ্রনাথের মত উদার মানব-প্রেমের ধারাও গান্ধী-মানসে ছিল না। তবুও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব অনন্য-সাধারণ।

অনন্যসাধারণ বলছি এই জন্যে যে, গান্ধীজীই এই শতধা বিচ্ছিন্ন দেশকে এবং স্বাধীনতা লাভের বিক্ষিপ্ত প্রয়াসকে সংহত করে একতার সূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন। তিনি সমগ্র জাতির চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতার আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে পেরে-ছিলেন। এবং প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি ও সাহস এই দুর্বল দেশের মানুষের হাতে এনে দিয়েছিলেন।

তিনি নতুন কিছু করেন নি, নতুন কিছু বলেন নি, নতুন দর্শন সৃষ্টি করেন নি। শুধু ভারতবর্ষের মত বিরাট অথচ বিচ্ছিন্ন একটি দেশের মানুষকে এক করে যে মহা-ভারতের সৃষ্টি তিনি করেছিলেন শুধু সেইজন্যেই আমরা কৃতজ্ঞ এই মানুষটির কাছে। গণ-আন্দোলন সৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাসে এত বড় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এঁর আগে

তারা যায়নি।

অনেকদিন আগে গৌতমবুদ্ধ সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে অত্যাচার অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথাতুলে দাঁড়াবার শিক্ষা দিয়েছিলেন। বুদ্ধের উত্তর সূরী চৈতন্যদেবও অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দাঁড়াবার শিক্ষা তাঁর অনুগামীদের দিয়েছিলেন। সেই একই পথে গান্ধীজী দেশের মানুষকে অসত্য ও অন্যায়ের প্রবলতার বিরুদ্ধে এক করে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। আর পূর্ব সূরী এই দুই মানুষের মত যে ব্রহ্মাস্ত্র তিনি মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তার নাম হ'ল অহিংসা।

কি এই অহিংসা? আমরা ভুল বুঝি 'অহিংসা' মন্ত্রের উদ্গাতা মহানায়ক গান্ধীজীকে, কারণ অহিংসার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করিনি। আক্ষরিক অর্থে যে শব্দার্থ আমরা জানি, অহিংসা তার তুলনায় অনেক বিস্তৃত, প্রবল শক্তি-সম্পন্ন, গতিময় একটি ধারণা।

এবং এই ধারণা ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনার স্বরূপ। বুদ্ধ এসব মানুষের মধ্যে অন্যায়, অসত্য, শোষণ ও অসাম্যকে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। তিনিও গ্রহণ করেছিলেন অহিংসার পথ। সে অহিংসা হ'ল প্রেম ও মৈত্রীর অপরিমেয় অনুভব। আর একদিন চৈতন্যদেবও এই বিদ্বেষ-শূন্য প্রেমভাবের মধ্য দিয়েই মানুষকে পশু-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। নিরস্ত্র ও নিঃসহায় ভারতের মানুষের মনে চেতনা ও আত্মবল সৃষ্টি করবার জন্য গান্ধীজীও সেই একই অস্ত্র গ্রহণ করলেন।

অহিংসার মূল অর্থ মানুষের প্রতি নিরঙ্কুশ মৈত্রীর ভাব। কিন্তু সত্যের অনুভব ও অনুধ্যান না থাকলে অহিংসার অর্থ মিথ্যা হ'য়ে যায়। সত্যের অনুধ্যান তার পক্ষেই সম্ভব যে অসত্য ও অন্যায়কে অস্বীকার করে সত্যের পথে অগ্রসর হয়। এর জন্য প্রবল সাধনা ও আত্মরুদ্ধতার প্রয়োজন হয়। অন্যায়ের সঙ্গে, পাশব-শক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ তার পক্ষেই সম্ভব যে মনে-প্রাণে নির্ভয়।

সত্যের এই অনুধ্যান অহিংসার আদর্শ; তাই পথ (বা means) গান্ধীজীর সামনে বড় একটা প্রশ্ন। কমি-উনিজমের সঙ্গে মূল পার্থক্য এইখানেই, কারণ সাম্যবাদীরা মনে করে যে কোন ভাবে ও যে কোন পথেই হোক না কেন, গন্তব্যস্থানে দ্রুত পৌঁছানো দরকার। এর জন্য রক্তাক্ত বিপ্লব তাদের কাম্য। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে গন্তব্য বলে কিছু নেই। সত্যের সাধনা আপন আদর্শকে সৃষ্টি করতে করতে চলে। এই চলার ধর্মটাই চরম। এবং চলার গতিতে মানুষ আপন হৃদয়ের ভীরুতা ও পাশবিক-তাকে অতিক্রম করবে।

পৃথিবীতে আজ যুদ্ধের প্রতি যে বিতৃষ্ণা জেগেছে, এবং শান্তি প্রসারের জন্য যে আগ্রহের সৃষ্টি হ'য়েছে, তাকে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে নৈতিক মনোবলের প্রসার আজ আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতির প্রভাব নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করা যায়।

যিনি উচ্চ আদর্শ বুকে করে সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেবার পন্থারূপে কর্ম্মকে বরণ করেন, তিনি সৃষ্টি করবেন। যতখানি আদর্শের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে মানুষকে পেয়েছি, যতখানি আদর্শকে হৃদয়ে নিয়ে মানুষের ভিতর ডুবতে পেরেছি, ততখানি আমার কর্ম্ম সহজ ও বাস্তব। গঠন কার্য্য জ্ঞানময় তত্ত্ব জ্ঞান যুক্ত না হলে, তা মানুষকে মানুষ করে না, নিজেও বাড়ে না বরং ধীরে ধীরে সে আত্মহত্যা করে দীর্ঘ দিনের জন্য কর্ম্মীকে অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করে যায়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত।

পারিবারিক জীবন-আলোচনা

॥ ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আর একদিন

[এদিন সবই কাল্পনিক ; স্থান ও সময় দ্বিতীয় দিনের মত ; শুধু কল্পনা এ ঘরে আছে—খনা নেই]

অপ—আচ্ছা, আজকে যদি আমরা একটু জানতে চেষ্টা করি যে ও ঘরে বাচ্চাদের নিয়ে এই কয়দিন যে রাখা হোল, আমরা সবাই যখন এ ঘরে বসে আলোচনা করলাম, তখন বাচ্চারা কি কি করলো, আর বাড়ীতেই বা কি রকম কি করে, তাহলে কেমন হয় ?

কল্পনা—মন্দ কি, একটু অন্যরকম হয় তাহলে। এতদিন তো বড়দের নিয়েই আলোচনা হোচ্ছে ! তোমরা সবাই যদি একমত হও, তবে আজ বাচ্চাদের নিয়েই আলোচনা হোতে পারে।

অরুণা—বেশ তো।

অশোকা—তাই হোক্।

গায়ত্রী—(কল্পনাকে) তবে তো তোমাকেই সুরু করতে হবে দেখছি, তুমিই তো ছিলে প্রথম দুদিন ওদের সঙ্গে। গতবারও খনা ওদের সঙ্গে ছিলো—আজও দেখছি সেই আছে ওদের কাছে।

ছবি—এবং আশা করা যাচ্ছে যে এর পরদিন গায়ত্রী তুমিই থাকবে ওদের কাছে এবং খনা এসে এখানে বলবে তার অভিজ্ঞতার কথা, এ দুদিন সে বাচ্চাদের সঙ্গে থেকে বাচ্চাদের কি রকম দেখলে।

গায়ত্রী—হ্যাঁ, তাই তো মনে হোচ্ছে। আর তারপর তো তুমিই ছবি দু'দিন বাচ্চাদের কাছে থাকবে। চপলার তো মোটে পছন্দ নয় বাচ্চাদের সঙ্গ, সে কিছুতেই তাদের ভুলিয়ে রাখতে পারবে না।

চ—হ্যাঁ, সত্যি, কেন যে আমার কিছুতেই ওদের চেঁচামেচি সহ্য হয় না,—যেটা নাকি কল্পনাদির খুবই ভালো লাগে—আমি নিজেই সেটা জানি না। একদিন তোমরা এটা নিয়েই আলোচনা করে দেখ না, যদি আমায় বোঝাতে পারো, আমি এরকম হোলাম কেন ?

জয়া—তোমার তো রীতিমত মনঃসমীক্ষণ—ইংরাজীতে যাকে বলে psychoanalysis—তাই করা দরকার। একমাত্র সেই ভাবেই তোমাকে কিছুটা in-sight পাইয়ে দেওয়া যেতে পারে।

চ—মনে হচ্ছে, জয়া, তোমার ওটা আগেই করানো হোয়ে গেছে এবং তার ফলে in-sight পেয়েই তোমার বাড়ী ফেরার তাড়াটা বেড়ে গেছে, না কি ?

কল্পনা—(হাসিয়া) জয়ার যেমন বাড়ী ফেরার তাড়া, চপলার আবার তেমনই বাড়ী ফিরতে যতো দেরী হয়, ততই ভালো। এ সব দেখে মনে হয় আমাদের আলোচনার আসর বন্ধ হবার কারণ হিসেবে আমাদের আর জয়ার বাড়ী ফেরার তাড়া থাকবে কথাটা বলা মোটেই ঠিক হবে না—এতে একটি অকারণ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হচ্ছে মনে হয়।

জয়া—সে কি আর তুমি বন্ধ করতে পারবে ? এ পথ বন্ধ হোলে ও ঠিক আর এক পথ বার করে ফেলবে লড়াই করার।

ছ—যেখাই যাক না কি দাঁড়ায়। এটা আমরা না হয় মনে রেখেই চলবো। কিন্তু ঐ যে psychoanalysis, in-sight এই দু'টী কথা জয়া বলে ফেললে, ও দু'টার সম্বন্ধে তো কিছু বলা দরকার, নইলে কারো কারো বা অবস্তি থেকে যেতে পারে।

অলকা—ঠিক বোলেছ, আমি এখনই তো ওটা জিজ্ঞাসা

কোরতেই যাচ্ছিলাম।

চ—বলো জয়া, কী বলতে চেয়েছ তুমি ওই দুটী কথার মধ্যে?

জয়া—এই ছোটখাটো। আমি সত্যি কিছু শুধু চপলাকে একটু ক্ষেপাবার জন্যই ওরকম বোলেছিলাম? এ তো কোন একটু সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে লাগতে আসে কিনা।

গায়ত্রী—তাহোলে, কথাটা ঠিক কোরে শুছিয়ে বলে সবাই বুঝবে আর বোঝা দরকার।

জয়া—আচ্ছা, দেখি চেষ্টা কোরে। তোমরা তো জানই যে, ইংরাজীতে analysis শব্দটির মানে এই যে কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করার জন্য সেই বিষয় বা জিনিষটীকে তার বিভিন্ন অংশে ভাগ কোরে প্রতিটি অংশ বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা, আর psyche মানে তো মন। তাহোলে বোঝা যাচ্ছে যে psychoanalysis মানে আমাদের মনকে তার বিভিন্ন স্তরে বা অংশে ভাগ করে সেসব সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝতে চেষ্টা করা। আমরা যদি আমাদের নিজেদের মনে কখন কি ভাব আসে, কেন আসে, এসব বিষয়ে সচেতন হোতে পারি অর্থাৎ নিজের মনের ক্ষমতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধে ও সে সবের কারণ সম্বন্ধে কতকটা জানতে বুঝতে পারি—সেটাই হোল আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে in-sight পাওয়া। বাংলায় এই দুটি শব্দ অনুবাদ করতে হোলে প্রথমটিকে মনঃসমীক্ষণ ও দ্বিতীয়টীকে 'আত্মদর্শন' বা 'আত্মোপলব্ধি' বলা যেতে পারে।

ইন্দু—হ্যাঁ, আমাদের শাস্ত্রেও আছে আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা দিয়েই আত্মদর্শন হয়, আর সেটার জন্য সাধনা করার পরামর্শই সদ্‌গুরু দিয়ে থাকেন। এই জন্যই বোধহয় আমাদের দেশে গুরুর কাছে মন্ত্র নিতে হয়।

জয়া—আমিও প্রথমে আত্মবিশ্লেষণ ও মনঃসমীক্ষণ একই জিনিষ বলে ভাবতাম, কিন্তু পরে বুঝলাম যে আত্মবিশ্লেষণ (self analysis) জিনিষটি চেষ্টা কোরলে সকলেই অল্পবিস্তর নিজে নিজে কোরতে পারে, কিন্তু মনঃসমীক্ষণ (psychoanalysis) করতে হোলে মন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার।

অলকা—ও, সেদিন যে অপরাজিতা বলছিলো যে মনের অবচেতন অংশের উপর আমাদের সজ্ঞান ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ করা যায় না—সেই মনের অবচেতন অংশ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আগে শিখে বুঝে তবেই মনঃসমীক্ষণের কাজটী সম্ভব হয়, এই তো? ঐরকম জ্ঞানী লোকদের পক্ষে আত্মবিশ্লেষণ মনঃসমীক্ষণ কিন্তু একই সঙ্গে হোতে পারে, আর তাঁরা সেটা নিজেরাই নিজেদেরটা করতে পারেন, নয় কি?

জয়া—তা পারে হয়তো, তবে যতদূর শুনেছি, ঐসব জ্ঞানী লোকেরাও নাকি মাঝে মাঝে তাঁদের নিজেদের মনঃসমীক্ষণের জন্য ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকেদের কাছেই গিয়ে থাকেন।

অশ্রু—হ্যাঁ, সেটাই সাধারণ নিয়ম।

আভা—তাতো হবেই; নিজেদের দোষত্রুটী দুর্বলতা সম্বন্ধে আমরা সকলেই তো একটু অন্ধ থাকতেই চাই—তাই অন্যদের কাছেই যাওয়া দরকার সম্পূর্ণভাবে নিজের সবকিছু বুঝতে হোলে।

চ—তা, ঐ সব জ্ঞানীলোকেদের আবার নিজেদের বুঝতে কিছু বাকী থাকে নাকি যে বার বার তাঁদের নিজেদেরই মনঃসমীক্ষণ করাবার দরকার হয়?

জয়া—সে সব কথা আর একদিন হবে, তাই না, কল্পনা?

কল্পনা (হাসিয়া)—হ্যাঁ, সেই ভালো। তাহোলে আমি যে দু'দিন বাচ্চাদের সঙ্গে ছিলাম সেই দু'দিনের কথাই বলি, কেমন? প্রথম দিনে তো রুমা, রিণা, মিঠু, তুতু আসেনি। আচ্ছা, সেদিন তো স্কুল ছুটিই ছিলো।

উষা—হ্যাঁ, আমার মেয়ে তুতু বাড়ীতেই তার বাবার কাছে ছিলো।

অশ্রু—আমার ভাইঝি রুমার জন্যদিন ছিলো বলে ও রিণা আর মিঠু এদেরও নিমন্ত্রণ কোরেছিলো। আমাদের বাড়ীতেই ছিলো ওরা আমার দাদা বৌদির কাছে।

ইন্দিরা—রিণা আমার মেয়ে, আর মিঠু এবার মেয়ে।

কল্পনা—ও, তাই বলো!

অশ্রু—কেন, কেন, কী হোয়েছিলো?

কল্পনা—বিশেষ কি আর হবে? দ্বিতীয় দিনে যখন রুমা, রিণা আর মিঠু এলো—তখন থেকে দেখেছি যে তিনটীতে এক সঙ্গে থাকছে সর্ব্বক্ষণ! এখন বুঝলাম যে ওরা আগেই চিনতো পরস্পরকে, আর খেলাধূলাও করেছে একসঙ্গে।

অশ্রু—হাঁ, খেলাধূলাও যেমন হয়, মারামারিও তেমনই হোয়ে থাকে কিনা—তাই জানলাম যে পরের দিনের মারামারির গল্পটাই বুঝি তুমি বলতে চাইছো!

অপোকা—তবে আর অত আগ্রহ কোরে কি হোয়েছিলো জানতে চাইলে যে! তুমি তো নিজেই ভালো কোরে জানতে যে কি হোয়েছিলো! তোমায় তো কল্পনা নিজেই এসে ডেকে নিয়ে গেলো।

অশ্রু—হাঁ, কিন্তু কল্পনাদি তো আর আমায় বলেনি যে ঠিক কী ভাবে কি হোয়েছিলো! আমি গিয়ে দেখলাম যে আমাদের রুমা চোখ ছানাবড়া কোরে এক কোণে বসে আছে, আর মিঠু তার ভাইকে চোখ পাকিয়ে বলছে "মাথা ফাটিয়ে রক্ত বার করে দেব তোমার পাজী ছেলে"! তারপর তো এরা ছুটে গিয়ে তার তিনবছরের ছেলেটীকে কোলাতে লাগ্‌লো, আর আমি গিয়ে রুমার সঙ্গে কথা বোল্‌তে সে-ও যেন কতকটা স্বাভাবিক হোয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগ্‌লো।—তবে কিছুতেই আর মিঠুর কাছে গেলো না, রিণার কাছেও গেলো না! রিণা অবশ্য ওর সঙ্গে খেলা করতেই চাইছিলো বার বার।

ইন্দিরা—আমার রিণা কিন্তু খুব লক্ষ্মী মেয়ে, সে তার ছোট ছেড়বছরের ভাইটীকে খুবই ভালোবাসে।

অপ—সে তো খুবই ভালো কথা। তবে অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে মা বাবা কিংবা বাড়ীর আর সবাই মিলে বারবার এইরকম বলার ফলে, বাচ্চারা অনেক সময় ঐরকম ভাব দেখায়—যদিও মনে মনে অনেকখানিই বিদ্বেষ থাকতে পারে।

আলো—সে কি? অতটুকু শিশু কি আর ভান করতে পারে নাকি?

জয়া—ভান করা কাকে বলে তা অবশ্য জানেনা, আর ভান সে সজ্ঞে বলেও বোঝে না। তবে ওরা খুব ভালোরকমই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারে। এখানে রিণা ভান করছে—একথা কখনই বলা যায় না, তবে সত্যিই তার দেড়বছরের ভাইটীর উপর তার একটুও যে কখনও রাগ হয় না, এটাও বলা যায় না। শিশু হোলেও সে বেশ ভালোভাবেই বোঝে যে রাগের বশে তার ভাইটীকে দু-এক ঘা দিতে ইচ্ছা করলেও, সেটা কাজে পরিণত করাটা তার পক্ষে গুরুতর অন্যায় কারণ হতে পারে—হয়তো তার মা বাবা কেউই আর তাকে মোটেই ভালবাসবে না, এমনও হোতে পারে যে তাকেই আচ্ছা করে দুচার ঘাপ্পর বসিয়ে দিতে পারে তারা। আমি আমার নিজের কন্যাটীকে দেখে দেখে আর পড়ে শুনে ওদের ব্যাপার বেশ ভালো করেই বুঝে নিয়েছি।

অশ্রু—আচ্ছা, ঠিক ঠিক কি হোয়েছিলো, বলো না ভাই কল্পনাদি?

কল্পনা—বলতে তো হবেই, আজকের আলোচনাটাই যখন এইসব ছোটদের কথা নিয়েই হোচ্ছে! প্রথম থেকেই তাহলে বলি। আমাদের প্রথমদিনে আটটী বাচ্চা এসেছিলো, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলো চার বছরের মিঠু।

টলা—হাঁ, ও আমার ছেলে।

কল্পনা—ও দেখলাম বেশীর ভাগ সময়ই তার আড়াই বছরের ভাইটীকে নিয়ে খেলছে, সামলাচ্ছে, কত রকম গল্প হোচ্ছে দুটীতে—দেখে বেশ লাগলো যদিও কিছুই বোঝা যায় না ওদের কথাবার্ত্তা।

উমা—আমার ছেলেও ছিল—ওর বয়স সাড়ে চার বছর, নাম রাণা।

কল্পনা—ও, তাহলে তো সেই সবচেয়ে বড় ছেলে ছিলো সেদিন! তবে ওকে মিঠুর চেয়ে বড় মনে হয় নি আমার। ও কিন্তু নিজের মনে খেলা কোরলো খেলনা নিয়ে, অন্য কারো দিকে বিশেষ গেলো না, যদিও মধ্যে মধ্যে সবদিকেই চেয়ে চেয়ে দেখছিলো। বিশেষ কোরে

ছোট বোনটীর দিকে। আর দু একবার এ ঘরে এসে মাকেও দেখে যাচ্ছিল। প্রথম দিনে কোন বাচ্চাই বিশেষ কিছুই গোলমাল করে নি; একটু যেন থম্‌থমে ভাব ছিল সবার। তাছাড়া অন্য সব বাচ্চাদের দেখতেও ব্যস্ত ছিলো। অবশ্য মাঝে মাঝে দু চারজন 'মা'কেও খুঁজেছে. তবে আমি সঙ্গে কোরো এনে এ ঘরে উঁকি মেরে মা'কে দেখিয়ে দিতে আমার সঙ্গে আবার ও ঘরে ফিরেও গেছে

অপ—মনে হয়, এদের সবারই তেমন ভাবে মা'কে হারাবার ভয়টা হয় নি কোন সময় এইটুকু জীবনের মধ্যে

আভা—কি কোরে বুঝলে?

অপ—এসব নিয়ে অন্য সব দেশে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে দেখা হোয়েছে। বিশেষ কোরে এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে।

অতসী—কি রকম?

অপ—যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ঐ সময় বহু বহু নানা বয়সের শিশুদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছিলো। যুদ্ধের পর দেখা গেলো যে তাদের মধ্যে অনেকের শারীরিক নিরাপত্তা বজায় রাখার চেষ্টায় তাদের মানসিক ক্ষতি করা হোয়ে গেছে, আর শরীরেরও ক্ষতি হোয়েছে; কারণ যুদ্ধের জন্য তারা মারা না গেলেও বা অঙ্গহানি না হোলেও তাদের শরীরের পুষ্টি ও শক্তি তেমন ভাবে বাড়েনি যদিও খাওয়া দাওয়া, আলোবাতাসের কোন অপ্রতুলতা ছিলো না। ঐ সব দেখে পরে আরো এ বিষয়ে গবেষণা করে দেখা হোল। জানা গেলো যে মায়ের কাছে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিশেষ প্রয়োজন। মা যদি কাছে না থাকে তবে শিশুর নিরাপত্তাবোধ ব্যাহত হয়; ফলে সে বাইরের জগৎ থেকে তার প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি যেন নিতে চেষ্টা করলেও ভালোভাবে পারে না। মাকে কিছুদিন না দেখলে সেটা তার কাছে কতকটা যেন একটী বড়দের যেমন কেউ মারা গেলে হয় সেই রকম শোকেরই অবস্থা হয়। এমন কি দেখা গেছে যে, মা যদি হাসপাতালে গিয়ে বেশীদিন থাকে, অথবা শিশুকে কোন কারণে হাসপাতালে গিয়ে থাকতে হয়—আর সে তার মাকে কিছুদিন দেখতে না পায়—তারপর সে যেন আর তার মাকে চিনতেই চায় না। পরে হয়তো কারো কারো এমন একটী আতঙ্ক এসে পড়ে যে, মাকে এক মুহূর্ত চোখ ছেড়ে থাকতে পারে না—সর্বদা মায়ের কাছে কাছে না থাকতে পেলে মাকে আবার হারাবার আতঙ্কে অস্থির হোয়ে পড়ে।

ছবি—শুধু কি আর মায়ের জন্যই ওদের কষ্ট হয়? বাপের জন্যও ওদের যে কী মায়া থাকে, তা তো আমি আমারই নিজের জীবনে দেখলাম!

গায়ত্রী—হ্যাঁ, আমরাও দেখেছি, তোমার ছেলেমেয়েরা যে কী মনোকষ্ট পেয়েছে তাদের বাবার জন্য! ব্যাপারটা খুলেই বলি তাহোলে। ছবি তোমার কিছু আপত্তি নেই তো তাই?

ছবি—না, আপত্তি আর কি থাকবে! সবাই তো জানেই। আর এতে আমার তো কিছুই অপরাধ নেই!

অতসী—সেটাই তো ভাই আমাদের মুস্কিল কি না! আমাদের নিজেদের কোন অপরাধ না থাকলেও আমরা নিজেরাই যেন অন্যের দোষের জন্য নিজেদের মধ্যেই একেবারে গুটিয়ে যাই!

গায়ত্রী—যাইহোক, ছবির স্বামী কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রী ও দুটী সন্তানকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন আর একজন মেয়েকে নিয়ে! তখন থেকেই অনেক কাছে ছবি তার ছেলেমেয়েদের মানুষ কোরছে! সেই সময় ওই দুটী শিশুর হাবভাব চলাফেরা চোখের দৃষ্টি সবই আমার মনে পড়ে: বড়ই করুণ সে ছবি!

ছবি—তুমি আমাদের জন্য অনেক কোরেছ ভাই।

গায়ত্রী—কল্পনা আর শমাও কোরেছে খুব।

ছবি—তবার কাছেও অনেক সান্ত্বনা পেয়েছি আমি। শিশু যে বাপ-মা দুজনের মধ্যে থাকলেই সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে নিজেকে আর সবদিকে সুন্দর ভাবে বাড়তে পারে এ বিষয়ে আর আমার কোনই সন্দেহ নেই।

অপ—আচ্ছা, এসব তো আমরা এমনিতেই ভালো করেই বুঝতে পারি! এখন আমাদের আগে যে কথা হোচ্ছিল তাই হোক। কল্পনাদি, বলো না ভাই কি হোয়েছিলো দ্বিতীয় দিনে বাচ্চাদের ঘরে?

কল্পনা—তা না হয় বলছি, কিন্তু যা আমরা এমনিতেই

বুঝি—তাও আরো ভালো কোরে নিজেদের বা প্রিয়জনের জীবনে অনুভব করলে যেন আরো বেশী করে বুঝতে পারি, আর তার দামও হিং বেশী কোরে! তাই নয় কি? সে জন্য এ সব কথাও আরোও শুনতে আর আরও জেনে রাখতে হবে।

চরি—আচ্ছা, প্রথমে আগের কথাটাই শেষ করা হোক তার পর অন্য কথায় যাওয়া যাবে।

কল্পনা—দ্বিতীয় দিনের প্রথম দিকে প্রায় আগের দিনের মতই সব চলছিলো। তবে বাচ্চারা খেলার দিকে ও অন্ততঃ কিছুটা মন দিতে পারছিলো—আমাকেও চিনেছিলো তো খানিকটা? যাইহোক রুমা রিণা আর মিঠু একই সঙ্গে থাকছিলো। পুতুল নিয়েও খেলছিলো আর গল্প কোরছিলো। এরই মাঝে একবার দেখলাম রিণা তার ভাইটীর কাছে গেলো, তার সঙ্গে একটু খেলাও কোরল। যে ভাবেই হোক সে আবার রুমা আর মিঠুর কাছে চলে আসবার পর মিঠুর ভাইটী কাঁদতে লাগলো। এই ছেলেটী রিণার ভাই-এর পাশেই শুয়েছিলো। আমি তাকে খেলনা দিয়ে কথা বোলে বোলে ভুলাতে ব্যস্ত ছিলাম কতক্ষণ জানি না। হঠাৎ রুমা "আমি বলে দিচ্ছি" বলে চেঁচিয়ে উঠতে আমি তার দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখি যে মিঠু আর রিণা খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে; মনে হোল ওরা কানে কানে কিছু কথা বোলছিলো আর রুমা তাদের পিছনে উঁচু হোয়ে সেটা শুনেই চেঁচিয়ে উঠেছে। আমি ঠিক মতো বুঝতে আর ভাবতে পারার আগেই মিঠু রুমার চুলের ঝুঁটী ধোরে এক টান দিতে সে-ও কাঁদতে সুরু কোরে দিলো! মিঠুর ভাইটী তো কাঁদছিলই, আর বাকী বাচ্চাকয়টীও এদের দেখে ভয় পেয়ে কাঁদবার উপক্রম করলো। আমি দেখলাম যে এ সব সামলানো আমার একার পক্ষে আর সম্ভব নয়—তাই এ ঘরে এসে এবা আর অঙ্গকে ডেকে নিয়ে গেলাম।

এবা—হ্যাঁ, মিঠু আমায় পরে বোলেছে যে রিণা বলছিলো ভাইগুলো ভালো নয়—তার খুব ইচ্ছা করে ভাইকে ধরে পিটিয়ে দিতে, কিন্তু মা বোকবে বলে ভয়ে সেটা করে না। এখানে তো মা বাবা নেই, মিঠু আর সে ইচ্ছা করলেই তাদের ভাই দুটীকে দু'চার ঘা দিতে পারে অন্ততঃ একটু চিমটী কেটে পালাতে পারে!!

ইন্দিরা (খুবই অপ্রস্তুতভাবে)—আমি তো এসব যেন বিশ্বাস করতেই পারছি না।

ইলা—ছেলেপিলেরা এসব বলেই থাকে! ঐ যে মিঠু বলছিলো যে মেয়ে তার ভাই-এর মাথা কাটিয়ে দেবে সে কাঁদছিলো বলে, তাকি আর সত্যি সে রকম কিছু সে করতে পারে? তা পারে না।

ভদ্রা—এই রকম বলে ফেলতে পারলে তো বলার মধ্য দিয়েই কতকটা রাগ বার হোয়ে যায়, তাই হয় তো সে কাজটি করার মত অতটা উত্তেজনা আর বেশী থাকে না; কিন্তু ঐ রকম করে চলার জন্য ওকে যদি কোন কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়, তাহোলে তো সে সব বলার আর সাহস পাবে না অথচ রাগটা হয়তো ভিতরে ভিতরে থেকেই যাবে—তাতেই ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী থাকবে।

চপলা—তবে মাথা কাটিয়ে দিতে চাওয়াটাই তো আর ঠিক নয়! ও রকম সাংঘাতিক ইচ্ছার প্রতিবাদ তো করা দরকার! আর ও রকম ইচ্ছা যাতে আদৌ না হয় তার জন্য ব্যবস্থাও করা দরকার। নয় কি?

ইন্দিরা—তাইতো, তাহলে কি করা যেতে পারে? আমি তো কিছুই ঠিক করতে পারছি না!

অপ—তোমার নিজের ঠিক কি রকম বোধ হচ্ছে? মানে রিণার ওপর তোমার কি খুব রাগ হোচ্ছে মনে কর? বা অন্যরকম কিছু হোচ্ছে মনে কর?

ইন্দিরা—রাগ হবে না? মেয়ে ওপরে ওপরে বেশ সাধুপনা দেখাচ্ছেন আর ভেতরে ভেতরে যত বদ্ মতলব নিয়ে ঘুরছেন!

কল্পনা—কিন্তু আমরা তো বলতে পারি না যে ও ঐসব মতলব নিয়েই আছে! জন্মাবার পর থেকে যে সব অবস্থায় ও পড়েছে তারই মধ্যে ভালো থাকার উপায় হিসাবে ও এইটি বেছে নিয়েছে—কারণ ও হয়তো জেনেছে যে, এই রকম করতে পারলেই তার ফল ভালো হয়, না হোলো অন্য রকম করতে গেলে কষ্ট পেতে হয়। কাজেই এই ভাবে সে তার সুবিধা মতো থাকতে চেষ্টা যে করবে এটাই তো আমার স্বাভাবিক লাগছে।

ইন্দিরা—তাহোলে কি করা যায়, সেটাই বল না, শুনি।

অপ—প্রথমতঃ রিণার যখন ভাইটী হবার সম্ভাবনা হোয়েছিল, তখন থেকেই ওকে কতকটা বুঝতে দেওয়া যেতে পারতো যাতে সে জানে যে তার থেকে একজন ছোট্ট ভাই বা বোন ঘরে আসবে—আর সে ছোট্ট বোলে তার জন্ত বাড়ীর সবাইকে (রিণাকেও) একটু বেশী যত্ন কোরতে হবে—কারণ সে ছোট্ট বোলে অনেক কিছুই বুঝবে না বা করতে পারবে না। তবে সে আস্তে আস্তে বড় হবে, আর বড় হোতে হোতে সে অনেক মজার মজার খেলা দেখাবে (যেমন রিণা দেখাতো) আর কাজও কোরবে (যেমন রিণা কোরত)। অবশ্ত রিণা সব সময়ই তার চেয়ে অনেক বেশী খেলা জানবে আর কাজও করতে পারবে কারণ সে একটু একটু আগে আগেই সব শিখে ফেলবে কি না!—এই ধরণের নানা কথা আর গল্পে, ছবির মধ্যেও অন্ত সব ছোট্ট বাচ্চাদের দেখিয়ে বুঝিয়ে তাকে কতকটা এই ছোট্ট ভাইটীর প্রতি একটা মমত্ব-বোধ জাগিয়ে রাখারও চেষ্টা করা যেত।

অরু—হ্যাঁ, অনেক সময় তো শিশু জিজ্ঞাসাই করে মায়ের পেটের মাল যখন অন্তদের চোখে পড়ার মতো হয়। তখনই সব সত্যি কথা বলে ফেলেও শিশু বেশ ভালো বুঝতে পারে। আমি তো আমার শিশুদের আমার পেটের উপর হাত রেখে বুঝতে দিতাম কেমন কোরে কচি ছানা পেটে নড়াচড়া কোরছে, বুকের ধুকধুকিও শোনানো যায়।

ইলা—আমার ছোট ছেলে হবার আগে আমরা ঐরকম কোরে ছিলাম। তারপর যখন কচি হোল—আমার পিতৃ তো হাসপাতালে দেখতে গেলো, সেখানে গিয়ে কচিকে কোলে নিতে চাইতো! বাড়ীতে আসার পর একদিন সুবিধা বুঝে ওর কোলে কচিকে দেওয়া হোল। ও কি খুশী! আমার সঙ্গে সঙ্গে কচির জামাকাপড় কাঁথা ধোওয়া শুকুতে দেওয়া আবার গুছিয়ে সেসব তুলে তাঁজ করে রাখা সবই কোরত; কচির দুধ খাওয়া হোয়ে গেলে যেটুকু বাকী থাকতো খেয়ে নিত। আর কচিও ওকে দেখলেই আহ্লাদে যেন আটখানা হোয়ে পড়তো।

অপ—মা-বাবার বিশেষ কোরে চেষ্টা থাকা দরকার যাতে ছোট ভাইটী বাড়ী আসার ফলে দিদিটীর মনে এটা না হয় যে তার আর কোন আদর নেই বাড়ীতে, তাকে সবাই অপছন্দ কোরছে, সবাই ছোট ভাইটীকে ভালোবাসে! অথচ তার যে কী অপরাধ তাও সে বোঝে না—কারণ সে তো প্রাণপণ চেষ্টাই করেছে না বাবার ভালোবাসা পাবার জন্ত! অবশ্ত ছোট ভাই-বোনের উপর বড় ভাইবোনের নানা কারণেই রাগ হোতে পারে, আমাদের বড়রাই কি আর কেউ অন্ত-জনের উপর রাগ করি না? আমাদের মতো শিশুদের ওতটা সব জিনিষকে কারণ দিয়ে তো বোঝার ক্ষমতা তৈরী হয়নি! তাই তারা যা মনে আসে বলেই দেয়—আর এটার জন্ত তাদের উপর রাগ না কোরে তাদের যদি বুঝিয়ে বলা যায় তবেই ভালো—যেমন, সত্যি, ও বড় দুষ্টু, না? কিন্তু ও বুঝে তো কচ্ছে না ওসব, এখন ও বড় ছোট বলে ওর কিছু বুদ্ধিও নেই কিনা···এই ধরণের নানা কথায় ও ব্যবহারে এটাই ছোট দিদিটিকে বোঝানো যেতে পারে যে, বাড়ীর একজনের উপর আর একজনের রাগ বা বিরক্তি হবার মধ্যে কোন দোষ নেই—তবে তার জন্ত কোন ক্ষতিও করার দরকার নেই। সব কিছুই কথার মধ্য দিয়েই অন্তকে বুঝানো দরকার।

সত্যি, ভেবে দেখো, আমাদের (বড়দেরও) তো কত অন্তায় ইচ্ছা কিছু কিছু মনে আসে, কিন্তু ইচ্ছা হওয়াটা আমাদের মনে ইচ্ছা হোয়েই থেকে যায়—সেটা তো আর আমরা কাজে পরিণত কোরে ফেলি না? ভালো কোরে যদি ভেবে দেখি তাহোলে এটাই কি মনে হবে না যে, ছোট দিদিটীর কাছে কতখানি অসম্ভব দাবী আমরা করছি যে তার কোন অন্তায় ইচ্ছা মনেও আসতে পারবে না! এতখানি সংযম আমরা কেউই মনে কোরতে পারি না যে আমরা বড়রা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে অভ্যাস করতে পেরেছি বা পারবো।

ক্রমশঃ

গান্ধীজীর পথে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা

।। শ্রীসত্যব্রত ঘোষ ।।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পুণ্য দিনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আমরা ভারতবাসীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইয়াছি। ইংরাজরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈদেশিক শাসক দেশ ত্যাগ করিলেই দেশ হইতে দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ বেকারী অশিক্ষা প্রভৃতি দূর হইয়া যায় না। দেশ হইতে দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দূর করিতে হইলে দেশকে অর্থ নৈতিক দিক হইতেও স্বাবলম্বী করিয়া তোলা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষকে অর্থ নৈতিক দিক দিয়া স্বাবলম্বী করিতে হইলে কিভাবে তাহা করা প্রয়োজন তাহা বলিতে যাইয়া প্রথমেই গান্ধীজী বলিলেন :—

(১) যে সব শিল্পপণ্য ছোট ছোট কলকারখানায় তৈয়ারী সম্ভব সেই সব শিল্পপণ্য বড় বড় কারখানায় তৈয়ারী করিতে দেওয়া উচিত নয়। ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট ছোট কলকারখানায় সেইসব শিল্পপণ্য তৈয়ারী করান উচিত।

(২) কৃষিপণ্য তৈয়ারী করান উচিত ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট ছোট জমিতে, জমির মালিকানা থাকিবে প্রকৃত চাষীর।

(৩) যেসব শিল্পপণ্য ছোট ছোট কারখানায় তৈয়ারী করা সম্ভবপর নহে কেবলমাত্র সেই সব পণ্য সরকারী মালিকানায় বড় বড় কলকারখানায় তৈরী করান প্রয়োজন।

(৪) সরকারী কর্মচারী, মন্ত্রী, রাজ্যপাল হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারী কারখানায় নিযুক্ত ছোট হইতে বড় পর্যন্ত কোন কর্মীকেই বেতন হিসাবে মাসিক ত্রিশ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচশত টাকার বেশী দেওয়ার পক্ষপাতী গান্ধীজী ছিলেন না।

গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে ভারতবর্ষে কাহারও বেতন (বিশেষজ্ঞ বাদে) মাসিক পাঁচশত টাকার বেশী হওয়া উচিৎ নয় বলিয়া একটি প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে।

সরকারী মালিকানায় বড় বড় কলকারখানাদ্বারা শিল্পপণ্য উৎপাদন এবং সরকারী মালিকানায় বড় বড় খামারের মারফৎ কৃষিপণ্য উৎপাদনদ্বারা দেশকে উন্নত করিবার পথ হইতেছে মার্কসবাদসম্মত পথ। এবং শিল্পের দিক দিয়া একটি অনুন্নত দেশে মার্কসবাদ-সম্মত পথে দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশের সব শ্রমিক এবং কৃষককে মাথাতামূলভাবে বহুদিন যাবৎ কমিউনে রাখা প্রয়োজন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা মানিয়া লওয়া চলে না। বন্দুকের নলের সাহায্যে জনসাধারণকে সৎ স্বভাবে রাখা প্রয়োজন।

কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বিদায় করিয়া যেভাবে সমস্যা সমাধান করিবার কথা বলেন গান্ধীজী তাহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। গান্ধীজী সরকারী কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিকে ত্রিশ টাকা হইতে পাঁচশত টাকা দিবার কথা বলিলেও সেই পরিমাণ বেতন লইতে কাহাকেও জোর জবরদস্তি দ্বারা লওয়াইবার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। যাঁহারা স্বেচ্ছায় দেশ-কল্যাণের জন্য ত্রিশটাকা হইতে পাঁচশত টাকা লইতে প্রস্তুত থাকিবেন, তাঁহাদেরই শুধু সরকারী কাজে লাগাইবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। যাহারা ঐ পরিমাণ অর্থে সন্তুষ্ট থাকিবেন না, তাঁহাদের জন্য তিনি ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট কারখানা স্থাপন করিয়া কাজ করাইবার কথা ভাবিতেন।

১৯৪৭ সনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইবার পর গান্ধীজীর অনেক অনুরক্ত কংগ্রেস-নেতা গান্ধীজী-কথিত প্রথম তিন দফা কর্মসূচীর কিছু পরিবর্তন করিয়া মিশ্র শিল্পনীতি গ্রহণ করিয়া দেশ-গঠনের কাজ আরম্ভ করেন।

কিন্তু গান্ধীজী-কথিত চতুর্থ দফা (সরকারী কর্মচারীর বেতন ত্রিশ টাকা হইতে পাঁচশত টাকার বেশী হওয়া উচিত নহে) মানিয়া লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

গান্ধীজী-কথিত চতুর্থ দফা মতবাদ কংগ্রেস নেতারা না মানিয়া লওয়ার ফলে ফল হইল এই যে, যাহারা প্রকৃত অর্থের মালিক হইবার জন্য সাত্র, তাঁহারা নানা কৌশলে দেশ-শাসনের কাজে ঢুকিয়া পড়িলেন। সরকারী কার্যে নিযুক্ত অর্থলোভী ব্যক্তিগণ কেবল মাত্র সরকার-নির্ধারিত মাহিনায় খুশী না থাকিয়া নানা অসৎ উপায়ে অর্থ রোজগারে লাগিয়া গেলেন। সরকারী কর্মকাণ্ড দুর্নীতির পীঠস্থানে পর্যবসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়-বহুল হইয়া পড়িল।

বিদেশ হইতে ধার করিয়া আনিয়া প্রায় পাঁচ হাজার কোটী টাকা খরচ করিয়া দেশে সরকারী মালিকানায় অনেকগুলি বড় বড় কারখানা স্থাপন করা হইল।

ঐ সব কারখানায় সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি বসান হইল; ইহা সত্ত্বেও পুরাণ কারখানাগুলিতে যে মাফিক লোক লাগাইয়া যতটুকু কাজ করান হয়, সেই কাজ করিতে সরকারী কারখানাগুলিতে চার গুণ লোক লাগান হইল। ঐ সব বড় বড় কারখানা তৈয়ারী করিতে যে পরিমাণ টাকা খরচ করা উচিৎ ছিল, তাহার সাত আট গুণ বেশী খরচ করিয়া ঐ কারখানাগুলি তৈয়ারী করা হইল।

ঐ কারখানাগুলি যাহাদের দ্বারা তৈয়ারী করা হইল সরকারী কর্মচারীরা তাহাদের নিকট হইতে খুব বাবদ অর্থ আদায় করিল।

তাহা ছাড়া কারখানাগুলি চালাইবার জন্য যাহাদের নিকট হইতে কাঁচা মাল কেনা হয়, তাহাদের নিকট হইতে নিয়মমত ঘুষ নেওয়ার প্রথা চালু হইয়া গেল।

এই প্রকার অব্যবস্থা এবং চুরির ফলে সরকারী পরিচালনায় কারখানাগুলিতে লোকসান হইতে লাগিল।

দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বহুপ্রকার উন্নয়নমূলক কাজ কংগ্রেস সরকার হাতে নেওয়ার ফলে সরকারী কাজে বহু পরিমাণ লোকের নিযুক্ত করা হইল।

সরকারী পরিচালনায় পাঁচ হাজার কোটী টাকা খরচ করিয়া যে কারখানাগুলি করা হইয়াছে তাহা হইতে বছরে সরকারের অন্ততঃ পাঁচ শত কোটী টাকা লাভ হওয়া উচিৎ ছিল। ঐ পরিমাণ টাকা লাভ হইলে উন্নয়ন-মূলক কাজের জন্য সরকারের টাকার জন্য এত চিন্তিত হইতে হইত না।

তাপাস আমাদের দেশ হইতে আকরিক লোহা এবং কয়লা কিনিয়া নিয়া দশ কোটী টনের মত লোহা বৈদেশিক বাজারে বিক্রয় করিয়া দশ হাজার কোটী টাকার মত মুদ্রা অর্জন করে।

ভারতবর্ষের সরকার-পরিচালিত ইস্পাত তৈয়ারী কারখানাগুলিকে লাভজনক ভাবে চালান গেলে, দেশে আরও অনেকগুলি লোহা তৈয়ারী কারখানা স্থাপনের দ্বারা কেবল মাত্র লোহা বিক্রয়ের দ্বারাই আমরা বছরে দশ হাজার কোটী টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে পারিতাম।

কিন্তু অসাধু সরকারী কর্মচারীদের হাতে পড়িয়া কারখানাগুলিকে লাভজনক ভাবে চালান সম্ভব হয় নাই ফলে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চালাইবার জন্য দেশের উপর উৎপাদন শুল্ক বসানর প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

সর্বপ্রকার শিল্পপণ্যের উপর উৎপাদন শুল্ক বসাইয়া সরকারী খরচ মিটান সম্ভবপর না হওয়ার ফলে দেশে নোট ছাপাইয়া খরচ মিটানর ব্যবস্থা লওয়া হইল।

সরকার-পরিচালিত বড় বড় কারখানাগুলিকে লোকসান দিয়া চালাইতে হওয়ার ফলে দেশে সরকারী খাতে নূতন নূতন কারখানা স্থাপন করার কাজ বন্ধ করিতে হইল। ফলে দেশে বেকার সমস্যা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিল।

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য দেশের লোক কংগ্রেস সরকারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইল।

গান্ধী মতবাদের ঘোরতর বিরোধী, ব্যক্তি-স্বাধীনতা অবিশ্বাসী যাহারা দেশকে উন্নত করিতে গেলে দেশের সব শ্রমিক এবং কৃষককে কমিউনে রাখিবার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারেন না, তাঁহারা শ্রমিক এবং সরকারী কর্মচারীদের আরও বেশী বেতন পাওয়াইয়া দিবার প

হিসাবে ধর্মঘট এবং ঘেরাওদ্বারা দেশের সর্বস্তরের শিল্প কারখানাগুলিকে লোকসান দিয়া চালাইবার ভয়ে আনিয়া ফেলার কিছুদিন দিয়া দেশে অসন্তোষ বাড়াইয়া ভোটের মারফৎ মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কংগ্রেস-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট বাংলাদেশের শাসনভার কংগ্রেসের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে।

যদিও কমিউনিষ্টদের মতবাদ হইতেছে সরকারের মালিকানায় দেশের সব বড় বড় কারখানায় শিল্পপণ্য উৎপাদন করা, কিন্তু বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্ট সরকার শাসনভার হাতে পাইয়া কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী পরিচালনার ভার হাতে নিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ট্রাম কোম্পানীর শ্রমিকদের বেতন না কমাইলে এই প্রতিষ্ঠানকে লাভজনকভাবে চালান সম্ভবপর নহে। এবং আরও বুঝিতে পারিলেন যে ১৯৬৭ সন হইতে সরকারী কর্মচারী এবং দেশের সব কলকারখানার শ্রমিকদের বেশী বেতন পাইবার লোভ দেখাইয়া নিজেদের দলে টানিবার যে কর্মপন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বদলান প্রয়োজন। শিল্পের দিক দিয়া দেশকে উন্নত করিতে গেলে সরকারী কর্মচারী এবং কারখানার শ্রমিকদের বেতন কমান প্রয়োজন।

কিন্তু যেহেতু যুক্তফ্রন্ট সরকারের সরিক দলগুলি সরকারী কর্মচারী এবং শ্রমিকদের ভোটের জোরে সরকার দখল করিয়াছে, সেইহেতু সরকারী কর্মচারী এবং শ্রমিকদের কম বেতন লইতে বলার মত শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কাজ করিবার মত সাহস নাই। ফলে বাংলাদেশের যুক্তফ্রন্ট সরকার আর কোন শিল্প কারখানার মালিকানা নিজেদের হাতে নিতে পারেন না। শ্রমিক-অশান্তি এবং সরকার কর্তৃক আরোপিত বহুপ্রকার কর দিতে বাধ্য হওয়ার ফলে বাংলাদেশে এখন অতি অল্প শিল্প কারখানা লাভজনকভাবে চালান সম্ভবপর হইতেছে। ফলে বাংলাদেশে নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপন করাদ্বারা দেশের বেকার সমস্যা সমাধান করিবার যে প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের যুক্তফ্রন্ট সরকার দিয়াছিল, তাহা কার্যকরী করিতে পারিতেছেন না। এমত অবস্থায় বাংলাদেশের যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের উপর দোষ চাপাইয়া নিজেরা পার পাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই প্রকার প্রচার দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের প্রভাব দেশবাসীদের উপর বহুদিন যে রাখিতে পারিবেন না তাহা আজ ভালভাবেই বুঝিতে পারিতেছেন।

যদিও কমিউনিষ্টদের নীতি হইল বড় বড় খামারদ্বারা সরকারী মালিকানায় কৃষিপণ্য উৎপাদন, কিন্তু কমিউনিষ্ট-প্রভাবিত বাংলাদেশের যুক্তফ্রন্ট সরকার কলকারখানার শ্রমিকদের বেতন কমাইয়া বাংলাদেশের কলকারখানা-গুলিকে লাভজনকভাবে চালাইতে না পারার ফলে কংগ্রেস-সরকারের নীতি অনুসারে ভূমি সংস্কারের প্রথম ধাপ জমিদারদের বিদায় করার পর অসৎ সরকারী কর্মচারীদের যোগসাজসে কতক জোতদারদের কারসাজিতে প্রকৃত চাষীর হাতে দেশের সব জমির মালিকানা না বর্তানোর ফলে দ্বিতীয় ধাপ হিসাবে জোতদারদের হাত হইতে জমি কাড়িয়া নিয়া প্রকৃত চাষীদের হাতে জমি দেওয়ার যত যে কাজটুকু বাকী ছিল, সেই কাজটুকু করিয়া নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ লইয়া কমিউনিষ্ট দলভুক্ত লোকদের প্রায় তিনলক্ষ একর জমি ছোট ছোট চাষীদের কাহাকেও এক একর, কাহাকেও তাহারও কম জমি দিবার ভিতর দিয়া জন-সমর্থনের ভূমে অবতীর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ভূমিহীন কৃষকেরা জমি পাইয়া খুশি হইয়াছে। কিন্তু ঐ জমিতে ফসল ফলাইতে গেলে বীজ ধান কেনা, চাষের জন্য বলদ কেনা, আধুনিক পদ্ধতিতে জমি-চাষ করিতে গেলে ক্ষেতে জল সেচের জন্য যে জল দরকার তাহা পাইবার পথ হিসাবে টিউবওয়েল এবং পাম্প কেনা, তাহা ছাড়া পূর্বে যে জমিতে একটন ধান পাওয়া যাইত সেই জমিকে উর্বর করিয়া তিনটন ধান পাইবার জন্য যে সার প্রয়োজন তাহা কেনার জন্য যে টাকার দরকার তাহার ব্যবস্থা এইসব কাজগুলি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি করিতে পারিতেছে না।

অল্প কিছু দিনের চেষ্টার ফলে পাঞ্জাব হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের এক অংশের চাষীরা উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া পূর্বে যে জমি হইতে এক টন ধান্য পাইত,

সেই জমিতে তিন চার টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেহেতু ঐ সব দেশে বড় বড় জমিতে চাষের কাজ আরম্ভ হইয়াছে সেই হেতু ঐ সব চাষীরা জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে চাষের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন পাইতে সক্ষম হইতেছে। এই প্রকার ব্যবস্থার ফলে উপরি উক্ত প্রদেশগুলিতে ইতিমধ্যেই সরকার-নির্দ্ধারিত দর হইতে কম দামে কৃষি-পণ্য বিক্রয় করা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই প্রকারে উপরি উক্ত প্রদেশগুলির সব চাষীরা যদি উৎপাদন বাড়াইয়া যাইতে থাকে তাহা হইলে দুই তিন বৎসরের ভিতর বর্ত্তমান কৃষি-পণ্যের যে দাম আছে তাহার চার ভাগের এক ভাগ দামে কৃষি-পণ্য বিক্রয় করা আরম্ভ হইবে।

যেহেতু বাংলাদেশের কৃষকদের কাহাকে এক একর, কাহাকে তাহারও কম জমি দেওয়া হইয়াছে এবং যেহেতু ছোট চাষীদিগকে ধার হিসাবে টাকা দিলে সরকার অথবা ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে অগণিত ছোট ছোট চাষীদের নিকট হইতে পাওনা টাকা আদায় করা সম্ভবপর হইবে না, সেই হেতু উপরি উক্ত চাষীদের পক্ষে উন্নত প্রণালীর চাষ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে না। এই প্রকার ব্যবস্থায় পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অল্প খরচে অদ্ভুত পরিমাণ কৃষি পণ্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হওয়ার ফলে অল্প মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রয় করিয়া লাভ রাখিতে পারিলেও বাংলাদেশের চাষীদের চাষ করিবার খরচই উঠিবে না। ফলে বাংলাদেশের যুক্তফ্রন্ট সরকার কোন চাষীকে এক একর কাহাকেও তাহারও কম যে সব জমি দিয়াছেন তাহা অনাবাদী পড়িয়া থাকিবে। বাংলাদেশ একটি কর্ম হীনের দেশে পরিণত হইবে।

এই অবস্থায় মাওবাদী কমিউনিষ্ট—যাহাদের বিবেচনায় কলকারখানার মালিক, সরকার কর্মচারী, ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাব্রতী, সঙ্গীতজ্ঞ, হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় কলকারখানার শ্রমিকেরাও শোষক শ্রেণীভুক্ত লোক বুর্জ্জোয়া, উপরি উক্ত বুর্জ্জোয়াদের ভোটে যাহারা রাজ্য শাসনের ভার পাইয়াছে, তাহাদের কম মাহিয়ানা দেওয়ার কথা বলার মত বুর্জ্জোয়াদের স্বার্থ বিরোধী কাজ অসম্ভব। কিন্তু দেশের সব লোককে কম মাহিয়ানা নিতে বাধ্য না করা গেলে দেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বাবলম্বী করা যাইবে না। সেই হেতু দেশের বুর্জ্জোয়ারা যাহাতে কম মাহিয়ানা নিতে বাধ্য হয় তাহার জন্য ভোট ছাড়া অন্য ভাবে অর্থাৎ কৃষি বিপ্লবের দ্বারা দেশের শাসন-ক্ষমতা দখল করিবার কথা বলিতেছে।

কিন্তু রাশিয়া এমন কি চীন দেশেও বড় বড় কারখানা সরকারী স্তরে চালাইতে যাইয়া দেখা গিয়াছে সরকারী কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন জাতীয় কর্ম্মে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের স্বাভাবিক ভাবে কর্ম্মগত এবং চিন্তাগত যে বিরোধ থাকে তাহার মীমাংসাকারী সর্ব্বজাতীয় কর্ম্মে জ্ঞানবান সমদর্শী কোন লোক সরকারী কাজে না থাকায় বিভিন্ন জাতীয় কর্ম্মীদের বিরোধ মিটাইতে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয় এবং এই জন্য সরকারী কাজ দ্রুততার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে চলে না। এমত অবস্থায় মাওবাদী কমিউনিষ্টরা এই দেশের শাসনভার হাতে পাইলেও দেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারিবে এটা ভারী ভুল।

যদিও মাওএর মত গান্ধীজীও বড় বড় কারখানার মালিক, সরকারী কর্ম্মচারী, ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী হইতে আরম্ভ করিয়া কলকারখানার শ্রমিকদের এক কথায় আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত সকলকে শোষক শ্রেণীভুক্ত লোক বলিয়া মনে করিতেন এবং এই জাতীয় লোকদের স্বভাব হইতে শোষকের মনোবৃত্তি দূর না হইলে তাহাদের হাতে দেশের শাসনভার দেওয়ার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহা হইলেও মাওবাদীরা যেভাবে কৃষি-বিপ্লবের দ্বারা সমস্যা সমাধান করিবার কথা বলে, গান্ধীজীর তাহাতে বিশ্বাস ছিল না।

কৃষি-বিপ্লবের দ্বারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভবপর নহে। কৃষি-বিপ্লবশ্রেণী গঠনকর্ম্মের দ্বারা সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। নগর-সভ্যতার মূলে গ্রাম-সভ্যতা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে যদি কৃষি-বিপ্লব সংঘটিত করিতে হয় তাহা হইলে দেশের প্রতি ইউনিয়নে ব্রহ্মণ্য কর্ম, ক্ষত্রিয় কর্ম এবং বৈশ্য কর্ম সমন্বিতত বুদ্ধিশ্রমীদের এক একটি সংস্থা গঠন করিয়া সেই সংস্থার তত্ত্বাবধানে ছোট জমির মালিকানাযুক্ত চাষীদিগকে বীজধান কেনা, লাঙল চালাইবার গরু অথবা ট্রাক্টর, সেচের জন্য টিউবওয়েল ও পাম্প এবং ঐ সব যন্ত্রপাতি মেরামত জন্য যন্ত্রবিদ্ এবং সার কিনিবার জন্য যে টাকা লাগিবে তাহারযোগান দিবার ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার চাষীদের শ্রমরূপী কর্মের মিলন ঘটান প্রয়োজন। এই ভাবে প্রভূত পরিমাণে পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করিয়া উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক চাষীদের দিয়া বাকি অর্দ্ধেক গঠনমূলক সংস্থাগুলিতে দেওয়া এবং উন্নত প্রণালীতে চাষ করিলে যে সব লোক বেকার হইবে তাহাদের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন।

প্রতি ইউনিয়নে উপরি উক্ত প্রকারে একটি করিয়া গঠন-কর্মমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার মত শিক্ষিত যোগ্য কর্মী যুক্তফ্রন্ট দলের এমন কি মাওবাদী কমিউনিষ্টদের দলেও নাই। অথচ দেশকে বাঁচাইতে গেলে চাষের জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা এবং শিল্প ক্ষেত্রে সরকারী কারখানাগুলিকে লাভজনক ভাবে চালাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কল্যাণি অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে সরকারী কাজে নিযুক্ত (বিশেষজ্ঞ বাদ) যাহাদের মাসিক পাঁচশত টাকার বেশী বর্ত্তমানে যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া পাঁচশত টাকার বেশী না দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

গান্ধীবাদী রাজনৈতিক দল এবং গান্ধীজীর নির্দ্দেশনায় যাহারা পল্লী-গঠন কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি এই ভাবে নূতন করিয়া কাজ আরম্ভ করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে দেশ যে অসুবিধায় পড়িয়াছে তাহা হইতে দেশকে বাঁচাইতে পারিবেন, ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বাধীন করা যাইবে। বন্দেমাতরম্।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৪—

(৩৮)

ঠাকুর, যোগমায়া-সমাবৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছ। তাই তোমাকে কেহ চিনিতে পারিল না। যোগ ও মায়ার সমন্বয়ন তোমার জীবন। যোগীরাও তাই চিনিল না, মায়াবদ্ধেরাও চিনিল না। অবিদ্যাগ্রস্ত একদল আমাদের লইয়া তুমি ছিলে। এই হিসাবে কি দুঃখ তোমার! তোমার তত্ত্ব বুঝিবার মত কেউ বা বুঝি আমরা ছিলাম না। তুমি অবিদ্যার তত্ত্বকে সার্থক করিবার জন্য, তাহার ভার হরণ করিবার জন্যই আসিয়াছ। তাই অবিদ্যানন্দের দল তুমি সাথ করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলে। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিবা এই লাভের একদিনের জন্যও বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। অনন্ত তোমার কথা, অনন্ত তোমার প্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামায়া পর্যন্ত, আর তুমি অবিদ্যামায়া পর্যন্ত নামিয়াছিলে, কাঙালের ঠাকুর সাজিয়াছিলে। কৃষ্ণানন্দ তাই স্থান পায়, বলাইয়ের হাতের অন্নটি তুমি খাও, গোপাল গয়লানীর দুধ-ভুমি খাও, বেত্রা পায়ে হাত দিলে তোমার পায়ে সিন্দী মাছের কাঁটার মত বেঁধে না। শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা। শ্রীদুর্গা-সমাবৃত হইয়াই তুমি আসিয়াছ। তোমার জয় হউক। আসন করি। পতিতিয়া রোডের ভবনাথ ভট্টাচার্য সকালে আসেন। বেলু খাওয়ার পর বাহির

হয়। বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্রিকা দিয়া ফেরে ৫টার পর। তাহার পর আমি মঠে যাই।... ঠাকুরের স্নেহের কথা হয়। সাধিক ভক্ত সঙ্গে লইয়া আসিলে ঠিক ঠিক অবিদ্যা মায়ার ক্ষেত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ স্পর্শ ঠাকুরের হইত না। তাঁহারাই আড়াল করিয়া রাখিতেন এই ক্ষেত্র হইতে। তাই অবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁহার অবতরণকে সাক্ষাৎ প্রমাণ করিবার জন্য তিনি আসিলেন এমন একদল লোক লইয়া যাহারা মূর্তিমান 'অবিদ্যা', যাহারা তাঁহাকে সর্বতোভাবে উত্যক্তই করিয়াছে। তাঁহার সর্বশক্তিমত্তাই ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রূপ সনাতন প্রতাপরুদ্র রামরায়ের সব সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ঘিরিয়া ছিলেন বলিয়া অবিদ্যার তাপ তাঁহার গায়ে লাগে নাই। আর সেই তাপ নিত্যগোপালকে অহর্নিশি জ্বালাইয়াছে। তবুও তিনি তাহাদের মাঝে ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। আশ্চর্য তোমার জীবন। ১৫ টায় মঠ হইতে ফিরি।...

২৮শে সেপ্টেম্বর

'তুমি আপনার হতেও হও আপনার'। আমি আমার কাছে যত না আপনার, যত না প্রিয়, তাহা হইতেও তুমি আমার কাছে বেশী আপনার, বেশী প্রিয়। আমি তোমার ভিতর দিয়া আমাকে চিনিব, পাইব, উপলব্ধি করিব, আস্বাদন করিব। আমি আমাকে চিনিলাম না, পাইলাম না, পর হইয়াই রহিলাম। তোমাকে পাইয়া আমি আমার আপনার হইব, আত্ম-উপলব্ধি করিব। নিত্যগোপাল-উপলব্ধির মাঝেই আমার আত্ম-উপলব্ধি সত্য, যেমন পিতার মাঝে মা সত্য, ভাইয়া সত্য, বাবার সংসার সত্য। লৌকিক দৃষ্টান্তে বাবা যখন প্রথমে ছিলেন, মা তখন ছিলেন না, পরে বাবার সঙ্গে যুক্ত হইলেন। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াই লেখা হইয়াছে 'সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ', 'স ঐক্ষত', 'তদৈক্ষত বহু স্যাম্'। কিন্তু বস্তুতঃ বাবা মা অনাদি অনন্ত। তোমার আমার সম্বন্ধের মাঝে তুমি আমি বিশ্ব সব কিছু সত্য বাস্তব concrete। তোমাকে পাইয়া আমাকে পাইব, সবকিছু পাইব। আসন করি। ১টায় পর রেণু বাহির হয়, ফেরে ৭৷৷০ টার পর।...৮ টার পর কুসুম আসিয়া এখানে পৌঁছে। ...(মঠে) ঠাকুরের অনেক কথা হয়। একক অবিদ্যার ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য সবকিছু রকমের সাধনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল—বিষপান, অপবাদ (নিজের শিষ্যদের কাছ হইতে ও পরমহংস সম্প্রদায়ের কাছ হইতে) সব কিছুই সহিতে হইয়াছে। তবু ছিলেন অটল অটল, স্নেহ-বিতরণে অকৃপণ। আমাদের কাছ হইতে পান নাই তিনি কিছু, অথচ তিনি এমন গুণধরদের অন্ন-বস্ত্র যোগাইয়াছেন। এ কি কেহ কখনও দেখিয়াছে? মহাপ্রভুর গায়ে তাপ না লাগে, এজন্য তাঁহার আশ্রিতেরা সর্বদা জাগরূক ছিলেন, পাহারা দিতেন; আর ঠাকুর ছিলেন সকলের প্রত্যক্ষ আক্রমণের পাত্র। মধ্যবর্তিতের ব্যবস্থা তিনি রাখেন নাই। সকলেরই প্রবেশাধিকার সেখানে ছিল। ১৷৷০ টার পর ফিরি।.....

২৯শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি প্রাণ-সম্বল হইয়া একাকী, সাঙ্গোপাঙ্গ-রহিত হইয়া অবিদ্যাক্ষেত্রের বুকে আসিয়া দাঁড়াইলে। যাঁহারা তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ তাঁহারা এই লীলায় ঘুরে ঘুরে থাকিয়া পরোক্ষভাবে তোমার ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা—শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রভৃতি—সাক্ষাৎভাবে তোমাকে কেন্দ্র করিয়া মিলিত হন নাই। যাঁহাদিগকে তুমি আশ্রয় দিলে, যাহাদের তরে করিয়া তুমি প্রকটকালীন ছিলে, তাহারা তোমার আদর করে নাই। তুমিই আদর করিয়াছ। তুমি তোমাকে পর্যন্ত দিয়াছিলে, অথচ পাও নাই কিছু। প্রতি মুহূর্তে কতগুলি দাবী দাওয়া অভিসন্ধি তোমাকে ঘিরিয়াছিল, মান অভিমানের চক্রে তুমি হইতে বিচ্যুত, ত্যক্ত। আমরা তাপ দিয়াছি, তুমি দিতে চাহিয়াছ আমাদের শান্তি। ওগো অনন্ত করুণাময়, তোমার অনন্ত ক্ষমা, অনন্ত সহিষ্ণুতা, অনন্ত ধৈর্য: তাই তুমি আমাদের নিয়া থাকিতে পারিয়াছিলে। আমি তোমার শরণ লইলাম। তোমার কাছে মাথা বিকাইয়া দিলাম। আমার সবকিছু তোমার। আসন করি। রেণু ১০টায় বাহির হয়, ফেরে ৭টার পর।...শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিত সমস্ত গ্রন্থে ভক্তসমূহের hierarchy or ladder system ফুটিয়া উঠিয়াছে, একটি সংসার-ভীতি,

কাদিনী-ভাকন কীর্তি, বেতা-ভারত প্রভৃতির সংস্পর্শ-কীর্তি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা নিত্যগোপাল-জীবনে কেহ কখনও দেখে নাই। এই খানেই তাঁহার uniqueness। জীবন সন্ধ্যার পর আসে।...আমি তাহাকেও বাঁধিয়া রাখিব না। যেখানে যাহার সাংসারিক স্থিতি, সেখানে সে নিজের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকুক—এই ভাবে তৈয়ারী করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই আমার লক্ষ্য। 'সব ফল মিলাইয়া আমার অখণ্ড দল'—ঠাকুরের এই লেখা আমার খুব ভাল লাগে। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ হইতে প্রতিভা 'কর্মযোগ' পড়িয়া শুনায়—ঠিক আমারই কথা। কেন আমি ইহা পাইলাম, যদি না রবীন্দ্রনাথের মত ছড়াইয়া দিতে পারিলাম? ঠাকুর, আমায় এমন অসহায় করিয়া রাখিয়াছ!

৩০শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি আমায় তোমার সঙ্গে এক করিয়া লও, তোমার ভক্তের সঙ্গে এক করিয়া লও, আমি সমন্বয়তত্ত্ব-মূর্তি হইয়া এই সংসারের বুকে বিচরণ করিব। তোমার সম্বন্ধে ভক্তির গ্লানিকে দূর করিবার জন্য অদ্বৈত ভাবের সঙ্গে তাহাকে যোগ করিলে, জ্ঞানের রাঁধুনে শীতল করিবার জন্য ভক্তির সঙ্গে তাহা জুড়িয়া দিলে, জ্ঞান-ভক্তির বাস্তবিকতা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কর্ম যুক্ত করিলে, আমার কর্মের নীরসতা ও পরিচ্ছিন্নতা ঘুচাইবার জন্য জ্ঞান ভক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিলে। আমার দেহপ্রাণমন জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের মিলিত বিগ্রহ হউক। এ সংসারে কেউ বুঝি আমায় চায় না। তুমিই তাই আমার বন্ধু শরণ সুহৃৎ ও স্বামী, আমার জীবন-সখী। তুমি আছ আমার—ইহাই আমার সার্থকতা।...৮ টার পর বি, কে, পাল আসে। তাহাকে ২য় বর্ষ উজ্জয়ন্তারত হইতে 'কাকি' প্রবন্ধ পড়িয়া প্রতিভা শুনায়। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন হইতে 'কর্মযোগ' প্রায় সবটা প্রতিভা পড়িয়া শুনায়। কি আশ্চর্য, ঐ লেখা বুঝিবার কেহ নাই? এখানে ছাড়া ঐ আলোচনা আর কোথাও হয় না। মানুষ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কবিতাই পড়ে। কেহ তাঁহার বৈপ্লবিক দর্শনের খোঁজও রাখে না। যাহা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বলিয়াছেন, আমরা তাহা দার্শনিক ভাবে বলি। আমার দর্শন ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ অচল। বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি রবীন্দ্র-দর্শনের কি প্রচার করিবেন?...আমি সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী।...যারকার বুকে—সোমেশ্বর বুকে—সোমেশ্বর প্রতিষ্ঠাই আমার জীবন ব্রত। ইহারা (আমার পরিবারের লোকেরা) আমার সম্বন্ধে কত বড় বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে পারিত। তাহা তো করে না। আমিও কতটা ভিন্ন হইতে পারিতাম। হই নাই তো! বেণু ডাঃ সুবোধ চ্যাটার্জীর কাপড় তাহার বাসায় দিয়া আসে। সেলাইর মাষ্টারের স্ত্রীর কাপড় দেওয়া হয়। একটা নূতন দর্শন জীবনে experiment করিয়া চলিয়াছি। মাসের বাজার করা হয়।

১লা অক্টোবর

নিত্যগোপাল, বন্ধু আমার, তোমার জীবন-তন্ত্রী যে সুরে বাঁধা, আমার জীবন-তন্ত্রীও সেই সুরে বাঁধা হউক। তোমার চলিবার ছন্দ আমার হউক। তোমার জীবনে বদ্ধ হইয়া আমি সংসারময় মুক্তির আস্বাদন করিব—ইহাই তো ছিল আমার পথ-চলিবার গোড়াকার কথা। তুমি আমার বন্ধনের দেবতা, মুক্তির দেবতা। তোমাতে বদ্ধ হইয়া আমি মুক্ত হইব, সংসারকে মুক্তি-ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিব, আমার কর্ম হইবে জ্ঞান ও প্রেমের ঘনীভূত আস্বাদন, মুক্তির আস্বাদন। তোমার চং এ চলিবার কৌশল আমায় শিখাইয়া দেও, যোগেশ্বর। যোগেশ্বর, আমাকে যোগ দেও, তোমার যোগে যোগী হইবার শিক্ষা দেও। তুমি আমি একটা বৃন্তের দুইটী ফুলের মত বিরাজ করিব। তুমি আগুন, আমি ছাঁচ। তোমার মধ্যেই আমার সত্যিকার আমি। তোমার জীবন আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। আসন করি।...বিশ্বনাথ মণ্ডল (বজবজ লাইনের) ও তাহার ভাইপো আসে। আমাদের দর্শন তাহার ভাল লাগে।...মত পূজার কাপড় বাবদ ১২৲ টাকা ও হুদয় ৮৲ টাকা দিয়াছে। প্রতিভা সকালে টালিগঞ্জ গিয়া হরিগোপালবাবু ও ফুলরেণুর বাবদ ৮৲ টাকা ও ইস্কুলেখার ১৲ টাকা নিয়া আসে। মিঃ ১১৷৷০ টাকা সাতরাগাছির জন্য ধরনা হইয়া যায়। সে এবার সেলাই

করিয়া ২৫৲ টাকা মত পাইয়াছে। অর্থ হাতে পড়িলে মাথা না বিগড়ায়। এইরূপ মাথা বিগড়াইবার ঘটনা আমার জানা আছে।

৮ই অক্টোবর

নিত্যগোপাল, যোগমায়া-সমাবৃত-তনু, শক্তি-শক্তিমানে একতনু, তাই তুমিই 'বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'। তুমি তুরীয়াতীত, উমা, গিরিবালা, গিরির বুক নিংড়ানো ধন, জড়ের বুক মথন করা ধন। তুমি মাটির দাবী ও অজড়ের দাবী আকাশের দাবী দুইয়েরই সমীকরণ-মূর্তি। তুমি যোগিনী, তুমি অযোগিনী। শক্তি-শক্তিমান লয়ত্ব পরকীয়, তাই শক্তির মূলো আজ ব্রহ্ম-স্বীকৃতির দিন সমাগত। তুমি আসিতেছ সমাধি হইতে মাটির দেশে···। আমার জীবনের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম অধিকার করিয়া তুমি বস, বাস কর। তোমার অধিবাস আমার জীবনে সফল হউক। আমার জীবন তোমার বাসভূমি হউক—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। আমার সকল স্পন্দনে তোমার আবাস-ভূমি রচিত হউক। তুমিই দুর্গা, তুমিই দুর্গা, আমি পরাভক্তিময়ী হইব, প্রবৃত্তির বুকে নিবৃত্তিকে জমাইয়া তুলিবার পরাশক্তি আমায় দেও। আসন করি।...৪৮ টায় মঠে যাই। পরে প্রতিভা-কুসুম-যমুনা যায়। ৫টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। দিনাজপুরের সারদা রায়ের পুত্রদ্বয় শৈলেন রায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিল।...প্রথমে অধিবাসের ব্যাখ্যা, পরে মধু-কৈটভের দ্বারে অর্থাৎ অতীত সুসংস্কার ও কুসংস্কারের হাত হইতে ত্রাণের যুক্তি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি। সত্যের রূপ কেমন করিয়া যুগে যুগে বদলায় তাহা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ কৌশিকের গল্পদ্বারা ও 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ' ইত্যাদি প্রসঙ্গে শ্রীনিত্যগোপালের উক্তিদ্বারা ব্যাখ্যা করি। উজ্জলভারতের 'শ্রীদুর্গা ও তাঁহার দ্বাদশমূর্তি'-র উল্লেখ করি। শ্রীদুর্গা একদিকে সমাধি অপর দিকে জাগরণ, একদিকে যোগ অপর দিকে মায়া, একদিকে ব্রহ্ম অপরদিকে অন্ন। মিনু সন্ধ্যায় সাতরাগাছি হইতে ফেরে। আজিকার অমৃতবাজারে উজ্জল ভারত পূজা সংখ্যার সমালোচনা বাহির হইয়াছে। রেণু লেকমার্কেট হইতে রাত্রি ৯টায় গিয়া কিনিয়া আনে।

৯ই অক্টোবর

নিত্যগোপাল, মহাকালীর ভাব মাখিয়া তুমি আসিয়াছ, সকল অতীত মু (মধু) ও কু (কৈটভ) সংস্কারের মুণ্ড ছিন্ন করিয়া, নষ্ট করিয়া নূতন বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার উপযোগী অমৃত-দর্শন ও জীবন দিতে। মহাকালীনাথ, মহাকালীকুমার শ্রীনিত্যগোপাল, তোমার বিশ্লবঘন জীবন ও বিশ্লবঘন দর্শন জীবনে অঙ্গীকার করিব, বিপ্লবমূর্তি হইব, এই বিশ্বকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার তোমার কর্মে আমি তোমার সাথী হইব, সেবক হইব। ঐ যে নূতন বিশ্বের আলোক-রশ্মি ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। আমি দেখিয়াছি সেই বিশ্বকে; তাহাকে পাইব, আস্বাদন করিব। 'মজল আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে, মুক্তকেশীপদ-নীলকমলে'। মহাকালী, তোমার উন্মাদ নৃত্যে আমার সকল জীবন বিপ্লবের ছন্দে গড়িয়া উঠুক। সপ্তমী পূজা আমার জীবনে সার্থক হউক: আসন করি।...৫টায় আমি প্রতিভা কুসুম মিনু মঠে যাই। ৫টায় মহালক্ষ্মীতত্ত্ব আলোচিত হয়। মহাকালীর বীজ 'রক্তমণ্ডিকা'। রক্তাক্ত জীবনই সকল সংগঠনের বীজ। যাহার জীবন অতীত সকল মু ও কু-এর রক্তে রঞ্জিত হয় নাই, সে নূতন সৃষ্টির বীজ পাইবে কোথায়? অতীতের রক্তই ভবিষ্যৎ সংগঠনের বীজ। মহালক্ষ্মী সর্বদেবশরীরস্থ —সকল দেবতার শরীর-নিংড়ানো রসঘন, সত্ত্বরূপিনী। তাঁহার জীবনে দেব ও অসুর সমন্বিত। তিনি সর্ববৃত্তি-সমন্বয়মূর্তি। তিনি জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করিতেছেন। মহামৈত্রীর খবর কালীকুমার নিত্যগোপাল পৌঁছাইয়াছেন জড় অজড় অর্থাৎ অসুর ও দেবতার সমন্বয় করিয়া, গয়াসুর ও বিষ্ণুপাদপদ্মের সমন্বয় করিয়া, বুদ্ধ ও শঙ্করের সমন্বয় করিয়া, সকল বড় ও সকল ছোটর সমন্বয় করিয়া। শ্রীদুর্গাচরণতলে আজ সর্ববর্ণ—ব্রাহ্মণ কুম্ভকার মালাকার তুলি—বালক বৃদ্ধ যুবতী সব সংহত। মায়ের চরণতলে সর্বআশ্রম সংহত। তোমার জয় হউক সকল পরিবার সমাজ রাষ্ট্রে। আমি ও প্রতিভা পরে আসি। নীলরতন-

বাবু ও আশুবাবুর সঙ্গে ঠাকুর ও তাঁহার সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করি।..

৬ঠা অক্টোবর

ওগো সত্ত্বরূপিনী মহালক্ষ্মী শ্রীদুর্গা আমার, সারা জীবন সঙ্ঘ গড়িবার কামনায় ছুটিলাম, মা, তোমাকে তো গড়িতে পারিলাম না। ব্যষ্টিগত মুক্তির অন্বেষণে ব্যক্তিগত জীবন ছিন্নভিন্ন, পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিপর্যস্ত। কে দেবে অসুর ধ্বংস নিষ্টাইবে তুমি ছাড়া? কবে অসুর শক্তি তোমার সঙ্ঘ রচনার কাজে বিনিয়োজিত হইবে? নিছক দেবশক্তি দ্বারা তো সঙ্ঘ গড়ে না। দেবতা যোগীর ধ্যান, অসুর দেহ তাহার গতি, তাহার রস। Idealism দেবতার অবদান, আর realism অসুরের অবদান। তুমি একাধারে যোগ ও মায়া, আদর্শ ও বাস্তব। তুমি মহা-সুরী, তুমিই মহা-অসুরী। আমার জীবন মহাশক্তিধর হউক এই আশীর্বাদ কর। 'যেন মুখ দেখে মা তোর ছেলে সকলে চেনে। আমায় এমনি করে সাজা গো'। দুর্গা দুর্গা দুর্গা, আমাকে সঙ্ঘ দেও, যেখানে সকল প্রাণ গলিয়া গিয়া এক হইবে।...(মঠে) ঠিক ৫।০ টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। কয়েকজন নূতন লোক আসিয়াছে। কালও হইবে ঘোষণা করা হইল। বিশেষভাবে উত্তর চরিত্র আলোচনা হইল ...শুম্ভ নিশুম্ভ সুগ্রীবের মুখে সৌরীর খবর পাইয়া বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। 'মম প্রতিজ্ঞাতং পূর্বা যো মাং জয়তি' ইত্যাদি। কামুকতার ভিতর দিয়া উত্তর চরিত্রের সূচনা। সঙ্ঘ-কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিশ্বপ্রকৃতির এই challenge বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে ছড়ানো। ভোগের পথে কিছুই ধরা দিবে না অজনের পথ ছাড়া। দেহ মন প্রাণ পর্যন্ত ভোগের পথে আমার নয়। আজ বিশ্বের 'আমি' ভোগের পথে প্রান্ত ক্লান্ত পরাজিত, তাই শরণাগত। শরণাগতের কাছে বিশ্বপ্রকৃতি ও পুরুষ এক হইয়া গিয়া পুরুষোত্তমরূপে পরিণত হন। ইহাই আত্মার বিজয়। দেহ দেহীর সমন্বয়ই দেহের বিজয়, আত্মার বিজয়। ৮৷৷০ টায় ছিরি। হরিদাসী বৈষ্ণবী তালপুরী...পাঠাইয়া দেয়।...বীরেন পুত্র সহ আসে...।

৭ই অক্টোবর

বিশ্বপ্রকৃতির আদি রস কামকে 'সরস্বতী' তুমি অমৃত হরফরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য কামুক শুম্ভ-নিশুম্ভের কাম-স্পৃহা ভোগৈশ্বর্য-লালসাকে জয় করিবার ঘোষণা পাঠাইয়াছিলে—'যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি'। এই লড়াই বিশ্বময় ছড়াইয়া আছে। ভোগের পথে একটী কণাও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। 'যোঽন্যথা আত্মনঃ সর্বং বেদঃ সর্বং তং পরাদাৎ'—আমি হইতে পৃথক দেখিলেই সব আমাকে পরাস্ত করিবে। কে কাহাকে ভোগ করিবে? অজনের পথে সকলকেই আমি বলিয়া পাইবার পথে সকলকে ভোগ করা সম্ভব হইবে। 'কেন তাকেন ভূরীধাঃ'—রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম পেয়েছি অনেক আগে। বিশ্বের শুম্ভ আমি-আমার ভোগের পথে সংগ্রামে প্রান্ত ক্লান্ত পরাজিত। আমার 'আমি-আমার' তোমার চরণে বলি দিলাম, ডালি দিলাম, নিবেদন করিলাম। আমার 'আমি' তোমার হউক। মন্থেমাতরম্। আসন করি (১২০)। গোপার জ্বর (আজ ৬ দিন) ১০০°৮ পর্যন্ত উঠে।...বিমলা আসে ২৷৷০ টায়। সে পঞ্চমী হইতে ভাত খায় না। যত সংঘর্ষের প্রয়োজন বিধ্বংসের জন্য। দুপুরে খাইতে খাইতে বলিয়াছিলাম আমার জীবন অনুসরণ করিয়া চলিলে বেদান্ত বুঝিতে কষ্ট হইবে না। সকল আসক্তিকে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিয়া পিছলাইয়া আসা যায়, সামনে আগাইয়া আসা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত আমার গোটা জীবন। ৫।০ টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। মহালক্ষ্মীশক্তি সহায়ে শ্রীনিত্যগোপাল বুদ্ধ-শঙ্কর, পরস্পর-বিরুদ্ধ বেদান্ত ভাষ্যগুলির সমন্বয়-বিধান করিবেন। প্রকৃতি পুরুষ-জিত থাকিবে না, পুরুষও স্ত্রীজিত হইবে না; আত্মাও বিজেতা, অনাত্মাও বিজেতা। সবলেই সবলকে স্বীকার করিয়া বিজয়ার আশীর্বাদ লাভ করিবে। পিতা-জিত পুত্র, পুত্র-জিত পিতা বিশ্বে রহিবে না। বুকে বুকে আলিঙ্গন। সংসারীদের চেয়েও শতগুণ আসক্তি লইয়াও আমি কোথাও আটকাইয়া যাই নাই। চলিয়াছি, আজও চলিতেছি। সত্যব্রতের উপর যে দাবী আমার ছিল, সে দাবী আমার ধূলিসাৎ হইয়াছে।

তবুও তো আমি ক্ষিপ্ত হই নাই। 'আমাং ক্রোধঃ অভিজায়তে'—ইহা তো কেহ কখনও আমার জীবনে দেখে নাই। আমি আমার পথে চলিয়াছি। ঠাকুর, পরাজয় যেন আমার জীবনে কোথা হইতেও না আসে। সবই আমার বুকের মধ্যে থাকুক—তাহা হইলে কেহ পরাস্ত করিবে না। শৈলেশ সেনের পিতার শ্রাদ্ধ আজ। আমায় খবর দেয় নাই। কি আশ্চর্য!

৬ই অক্টোবর

শ্রীনিত্যগোপাল, বর্তমান নূতন বিশ্বের আদি পুরুষ তুমি, অগ্রগামী, যুগ-পন্থা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছ। আমি ছায়ার মত তোমার পথ অনুসরণ করিয়া, পথ সৃষ্টি করিয়া চলিব। তুমি কায়া, আমি ছায়া—ইহাই আমার বিজয়-যাত্রা। তোমাকে বুকে রাখিলে বিশ্বকেও বুকের মাঝে পাইব। এখন আমার 'অস্ত্র' বলিয়া বিশ্বে কিছু থাকিবে না, কেহ আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। 'যোঽস্ত্র আত্মনং সর্বং বেদ সর্বং তং পরাদাৎ'। আত্মার বিজয় লাভ হউক অনাত্মাকে শোষণ করিবার গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া, অনাত্মার বিজয় হউক আত্মার শোষণ হইতে মুক্ত হইয়া। বিশ্বে কেহ যেন অপরাধ্য 'জিত' না হয়; কেহ স্ত্রী-জিত, স্বামী-জিত, রাজা-জিত, প্রজা-জিত, ভোক্তা-জিত, ভোগ্য-জিত থাকিবে না। সকলেই বিজয়লাভ করিবে, বিশ্বময় কোলাকুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে। পারস্পরিক শক্তির টানাটানি গড়িয়া উঠুক পারস্পরিক মৈত্রী-বন্ধনে। জয় জয় শ্রীদুর্গা। আসন করি।... ৩টার পর মঠে যাই। মঠের দুয়ার তখন ভালাবন্ধ। ডাকাডাকি করিলে সেবানন্দ খুলিয়া দেয়। মন্দির-বারান্দায় বসি। নরেনবাবু ভিতরে ডাকিয়া নেন। তখন বেশ ঠাকুরকে শিব-বেশে সাজাইতেছিল। বসিয়া দেখিলাম, বেদীতে প্রণাম করিলাম, নির্মালা নিয়া আসিলাম। সেবানন্দ মাধবানন্দ করুণানন্দ নিত্যস্বামানন্দ বিভূতির সঙ্গে কোলাকুলি হয়। মন্দিরে হয় নরেনবাবু ও কোলানাথের সঙ্গে। ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গেও হয়। সত্যব্রত, বড়বৌ ও বিশ্বনাথ আসে। ঠাকুরের সামনে বসা হয়। কলিকাতায় এই প্রথম বিজয়ার দিনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসি। প্রাণ কেবল চাহিতেছিল। শ্রীনিত্য-গোপাল বর্তমান যুগের আদি পুরুষ। তাঁহার চরণ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। আমার ইষ্ট—দুর্গা—একাধারে সংসার ও সন্ন্যাস ধারা। আমি চলিয়াছি, চলিব; কোথাও আটকাইয়া পড়ি নাই। শ্রীদুর্গার চরণতলে সুরথের রাজ্যপ্রাপ্তি ও সমাধির মোক্ষলাভ ঘনীভূত। ইহাই আমার জীবনাদর্শ—একান্ত মুক্তিও নয়, একান্ত রাজ্যও নয়। আমি বিজয় অভিযানে বাহির হইব, তোমরা যতখানি পার যুক্ত থাকিও। প্রার্থনা করি,—আশীর্বাদ করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই—তোমরা সার্থক হও, রাজ্যলাভ কর, মোক্ষলাভ কর। যাহাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক, যাহাদের সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক তাহাদের সকলকে ঠাকুরের চরণে আমি নিবেদন করিতেছি। চলার পথ নিষ্কণ্টক হউক। হরিদাসী আসে উমা রেখা অজিত সহ। বরদা ডাক্তার আসিয়াছিল।

৭ই অক্টোবর

যিনি উচ্চ আদর্শ বুকে করে সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেবার পন্থারূপে কর্ম্মকে বরণ করেন, তিনি সৃষ্টি করবেন। যতখানি আদর্শের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে মানুষকে পেয়েছি, যতখানি আদর্শকে হৃদয়ে নিয়ে মানুষের ভিতর ডুবতে পেরেছি, ততখানি আমার কর্ম্ম সহজ ও বাস্তব। গঠন-কার্য্য জ্ঞানময় তত্ত্ব-জ্ঞানযুক্ত না হলে, তা মানুষকে মানুষ করে না; নিজেও বাড়ে না বরং ধীরে ধীরে সে আত্মহত্যা করে দীর্ঘ দিনের জন্য কর্ম্মীকে অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করে যায়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত।

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন ব্রহ্ম অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচারসকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দেশিত "সর্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ত্রয়ীতি বহুধাশ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব',—সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

সেইজন্য তাঁহারাও ভাবুক ছিলেন স্বীকার করিতে হয়। কোন ভাবের সহিত দিব্যভাবের সংস্রব থাকিলেই, সেই ভাবকে দিব্য-ভাব বলা যায়, যেমন অষ্টাবক্রের আপনার সহিত জনকের দ্বৈতভাব ছিল বোধ থাকায়, উক্ত চতুর্দশ শ্লোকানুসারে জনককে তিনি 'পুত্রক' সম্বোধন করিয়াছিলেন; যেমন জনকের আপনার সহিত অষ্টাবক্রের দ্বৈততা ছিল বোধ থাকায়, অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম শ্লোকানুসারে তিনি অষ্টাবক্রকে 'প্রভো' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন; তদ্রূপ দ্বৈত বোধবশত তাহারও পরমেশ্বরকে 'প্রভু' বোধ হইলে, তাঁহার সেই বোধজন্য ভাবকে দিব্য-দাস্যভাবই বলা যাইতে পারে। কোন ভক্তের পরমেশ্বরের প্রতি অন্য কোন ভাব হইলে, সেই ভাবকেও দিব্য-ভাব বলা যায়। ভক্তের পরমেশ্বরের প্রতি যে কোন ভাব হইয়া থাকে, তাহাই দিব্য-ভাব। এক জীবের অন্য জীবের প্রতি যে ভাব আছে বা যে ভাব হয়, তাহাই অদিব্য-ভাব।

সপ্তদশ সিদ্ধান্ত

এই সিদ্ধান্তের পূর্ব-সিদ্ধান্তে যে-শ্লোক আছে, তাহার অর্থ এই প্রকার হইতে পারে,—"পুত্রক! দেহাভিমান-পাশদ্বারা তুমি চির-বদ্ধ। আমিই 'বোধ'—এই প্রকার জ্ঞান-খড়্গদ্বারা তাহা ছেদন করিয়া সুখী হও।" দেহাভিমান-পাশদ্বারা যিনি চির-বদ্ধ, তাঁহার মুক্ত হইবার সম্ভাবনা কি আছে? পূর্বোক্ত চতুর্দশ শ্লোকীয় অষ্টাবক্র-বাক্যদ্বারা জনকের চির-বদ্ধত্বই প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ শ্লোকানুসারে জনক চির-বদ্ধ। চির-বদ্ধার্থে, নিত্য-বদ্ধও বলা যাইতে পারে। নিত্য-বদ্ধের মুক্তির আশা করাও অসঙ্গত। জনক যদ্যপি চির-বদ্ধ বা নিত্য-বদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য জনকের প্রতি অষ্টাবক্রের—

"দেহাভিমান পাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব।"

বলা সঙ্গত হয় নাই। উক্ত চতুর্দশ শ্লোকের শেষাংশে—'বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব' বলা হইয়াছে। 'বোধ' শব্দের অর্থও জ্ঞান। আমিই 'বোধ' স্বীকার করিলে, পরমহংস শঙ্করাচার্যের মতানুসারে 'আমি'কে অনিত্যই স্বীকার করিতে হয়। পরমহংস শঙ্করাচার্য তাঁহার আত্মবোধ নামক গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ।"

উক্ত শ্লোকানুসারে 'জ্ঞান'কে বা 'বোধ'কে স্পষ্টই অনিত্য বলিয়া বুঝিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কথিত উত্তর-গীতার তৃতীয়োঽধ্যায়ে—

"অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখং।
দৃশ্যতে তৎ খগাকারং খগাকারং বিচিন্ত্যতে॥" ১১

বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকানুসারে 'এক' 'অহং' বা 'আমিই' এই সমস্ত। অনেক অদ্বৈত-প্রকরণেই 'অহং' আত্মা-বাচক। সুতরাং উক্ত শ্রীকৃষ্ণ-কথিত শ্লোকানুসারে অহমাত্মা বা আমি-আত্মাই 'সমস্ত' স্বীকার করিতে হয়।

অষ্টাদশ সিদ্ধান্ত

পূর্ব্ব-কথিত চতুর্দ্দশ শ্লোকানুসারে দেহাভিমান-পাশ, 'আমি-বোধ' এই প্রকার জ্ঞান-খড়্গদ্বারা ছেদিত হইতে পারে। ঐ শ্লোকের প্রথম চরণে জনককে দেহাভিমান-পাশদ্বারা চির-বদ্ধ বলা হইয়াছে। জনককে দেহাভিমান-পাশদ্বারা চির-বদ্ধ বলায়, তদ্দ্বারা সেই দেহাভিমান-পাশেরও চিরত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। সেইজন্য 'আমি-বোধ' এই প্রকার জ্ঞান-খড়্গদ্বারাও উক্ত দেহাভিমান-পাশ ছেদিত হইতে পারে না। সেইজন্য চির-দেহাভিমান পাশাবদ্ধ জনকের মুক্তি হয় নাই স্বীকার করিতে হয়। অতএব সেইজন্য জনকের প্রকৃত সুখলাভও হয় নাই স্বীকার করিতে হয়। কারণ ঐ শ্লোকে জনককে জ্ঞান-খড়্গদ্বারা দেহাভিমান-পাশ ছেদনপূর্ব্বক সুখী হইতে বলা হইয়াছে। জ্ঞানকে 'খড়্গ' বলা হইয়াছে বলিয়া বোধকেও 'খড়্গ' বলিতে হয়; কারণ 'জ্ঞান' ও 'বোধ' শব্দের একই অর্থ। বোধকেই 'অহং' বলা হইয়াছে বলিয়া, অহং 'জ্ঞান' স্বীকার করিতে হয়। বোধ, জ্ঞান এবং অহং বা আত্মা পরস্পর অভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া এবং জ্ঞানও খড়্গ বলিয়া বোধও খড়্গ, অহংও খড়্গ এবং আত্মাও খড়্গ।

একোনবিংশ সিদ্ধান্ত

অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণের পঞ্চদশ-শ্লোকে লিখিত হইয়াছে,—

"নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি॥"

উক্ত শ্লোকের এই প্রকার অর্থ হইতে পারে,—"তুমি নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, স্বপ্রকাশ ও নিরঞ্জন। তোমার সমাধিতে অবস্থান করিবার প্রয়াসই তোমার বন্ধন"। জনকের নিজ দেহের সঙ্গে সংস্রব ছিল, সেইজন্য তাঁহাকে নিঃসঙ্গ বলা উচিত হয় নাই। অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণীর প্রথম-শ্লোকানুসারে এবং অন্যান্য অনেক শ্লোকানুসারে জনক কথা কহিতেন অবগত হওয়া যায়। কথা কওয়া ক্রিয়া। সেইজন্য জনক নিষ্ক্রিয় ছিলেন, বলা যায় না। জনককে প্রকাশ করিবার কেহ না থাকিলেও জনক স্বপ্রকাশ হইলে, অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণীয় প্রথম শ্লোকানুসারে তিনি অজ্ঞান, বৈরাগ্য এবং মুক্তির জন্য লালায়িত হইতেন না। অনেক শাস্ত্রানুসারে স্বপ্রকাশ যিনি, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার কোন অভাবই নাই। ঐ প্রথম শ্লোকানুসারে, জনক বদ্ধ ছিলেন এরূপ বলা হওয়া যায়। সেইজন্যই তিনি অষ্টাবক্রের প্রতি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি'। অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম প্রকরণের প্রথম শ্লোকানুসারে জনক বদ্ধ ছিলেন বলিয়া, উক্ত পঞ্চদশ শ্লোকানুসারে, তিনি 'নিরঞ্জন' ছিলেন স্বীকার করা যায় না। কারণ অদ্বৈতমতের প্রসিদ্ধ নানা গ্রন্থানুসারে যাঁহার বন্ধন নাই, তিনিই 'নিরঞ্জন'। প্রথম-প্রকরণের প্রথম শ্লোকানুসারে জনকের বন্ধন ছিল। সেইজন্য তিনি অবশ্যই নিরঞ্জন ছিলেন স্বীকার করা যায় না। জনক বদ্ধই ছিলেন প্রমাণ করা হইল। তাঁহার যদিও সমাধিতে অবস্থান করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা তাঁহার মুমুক্ষুত্বাবেশতই হইয়াছিল, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ কোন মু বাসনাই বন্ধন-প্রযুক্ত হয় না। মু বাসনাবশতই দিব্য-ক্রিয়াযোগাদলম্বিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার ক্রিয়াযোগ-দ্বারাই জ্ঞানযোগে অধিকার হইয়া থাকে। সেইজন্যই সমাধিলাভ-বাসনা বন্ধন নহে, কিন্তু তাহা মুক্তিলাভের অনুকূল; সেইজন্য সমাধিলাভ-বাসনা মঙ্গলের কারণই বলিতে হইবে। নানা যোগশাস্ত্রানুসারে বহুপ্রকার সমাধি।

ঘেরণ-সংহিতার মতে সমাধি ষড়বিধ। প্রথম ধ্যানযোগ-সমাধি, দ্বিতীয় নাদযোগ-সমাধি, তৃতীয় রসানন্দযোগ-সমাধি, চতুর্থ লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি, পঞ্চম ভক্তিযোগ-সমাধি এবং ষষ্ঠ রাজযোগ-সমাধি। উক্ত গ্রন্থের সপ্তমোপদেশোক্ত ধ্যানযোগ-সমাধি বিবৃত হইতেছে,—

"শাম্ভবীং মুদ্রিকাং কৃত্বা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ
বিন্দুব্রহ্ম সদৃষ্ট্বা মনস্তত্র নিযোজয়েৎ।
মধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ মাং কুরু।
আত্মানং মময়ং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
সদানন্দময়ো ভূত্বা সমাধিস্থো ভবেন্নরঃ॥"

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের এই প্রকার অর্থ বোধ হইয়া থাকে,—"প্রথমতঃ শাম্ভবী-মুদ্রাদ্বারা আত্ম-প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং তদন্তে বিন্দু-ব্রহ্ম দর্শন করিয়া, সেই বিন্দু-ব্রহ্মে মনোযোগ করিতে হইবে। অনন্তর শিরস্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশের মধ্যে জীবাত্মাকে আনিবে এবং শিরস্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশকে জীবাত্মার মধ্যে আনয়ন করিবে; এই প্রকারে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে বিলীন করিয়া নিত্যানন্দময় ও মুক্ত হইতে হইবে। ৭।৮।" ধ্যানযোগ-সমাধি কথিত হইল। এইবার নাদযোগ-সমাধির বিবরণ বলা যাইতেছে,—

"সাধনাৎ খেচরীমুদ্রা রসনোর্দ্ধগতা সদা।
তদা সমাধিসিদ্ধিঃ স্যাদ্ধিত্বা সাধারণক্রিয়াং॥"

উক্ত নবম শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ—"খেচরী-মুদ্রা সাধনা প্রভাবে সর্ব্বদাই স্বীয় রসনাকে ঊর্দ্ধগত করিয়া রাখিতে হইবে। তদ্দ্বারা সাধারণ ক্রিয়া পরিত্যাগ হইয়া সমাধি-সিদ্ধি হয়।"

এইবার রসানন্দ-যোগ-সমাধির বিবরণ বলা যাইতেছে,—

"অনিলং মন্দবেগেন ভ্রাময়ীকুম্ভকং চরেৎ।
মন্দং মন্দং রেচয়েদ্বায়ুং ভৃঙ্গনাদং ততো ভবেৎ॥ ১০
অন্তঃস্থং ভ্রাময়ীনাদং শ্রুত্বা তত্র মনো নয়েৎ।
সমাধির্জায়তে তত্র আনন্দঃ সোঽহমিত্যতঃ॥" ১১

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এইরূপ,—"মন্দ বেগ-সম্পন্ন প্রাণ বায়ুর রেচন দ্বারা ভ্রাময়ী কুম্ভক অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাণ-বায়ুর মৃদু রেচন প্রভাবে দেহাভ্যন্তরে ভৃঙ্গ-নাদ হইতে পাকে। ১০। অন্তরের যখায় ভ্রাময়ী-নাদ শ্রুত হয়, তথায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। ঐ প্রকার অনুষ্ঠানদ্বারা রসানন্দযোগ সমাধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা 'আমি'ই সেই 'ব্রহ্ম' বোধ হইয়া থাকে। সেই 'বোধ'দ্বারা আনন্দ সম্ভোগ হইতে থাকে। ১১।" রসানন্দযোগ-সমাধি-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া, এক্ষণে লয়সিদ্ধিযোগ সমাধি-প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইতেছে। সেই লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি এই প্রকার—

যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ।
সুষুম্নায়াস্তদৈবেহ বিহরেৎ পরমাত্মনি।
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতি যাবৈতং সমাধিস্তেন জায়তে॥

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এই প্রকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে, "অগ্রে যোনি-মুদ্রাবলম্বনে নিজে শক্তিময় হইতে হইবে; তৎপরে বোধ করিতে হইবে, পরম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম পরমাত্মার সঙ্গে, শক্তি-স্বরূপা নিজের সুষুম্নার-রসযোগে বিহার করিতেছে। ১২। তদ্দ্বারা আনন্দময় হইয়া, ঐ পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম-পরমাত্মা-ব্রহ্মণের সহিত আপনাকে অভেদ বিবেচনা করিতে হইবে। উক্ত অভেদ বা ঐক্য-বোধাত্মক লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি হইতেই 'অহং ব্রহ্মেতি যাবৈতং' বোধ হইয়া থাকে। ১৩।" লয়সিদ্ধি-যোগ-সমাধি পরে, ভক্তিযোগ-সমাধি কথিত হইতেছে,—

"স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েদ্বিষ্টদেবস্বরূপকম্।
চিন্তয়েদ্ ভক্তিযোগেন পরমাহ্লাদপূর্ব্বকং॥ ১৪
আনন্দাশ্রুপুলকৈর্দশাভাবঃ প্রজায়তে।
সমাধিঃ সম্ভবেত্তেন সম্ভবেচ্চ মনোন্মনিঃ॥ ১৫

উক্ত ভক্তিযোগ-সমাধির ব্যাখ্যা করা যাইতেছে,—"নিজ হৃদয়ে ইষ্টদেবতার 'স্বরূপ' ধ্যান করিতে হইবে; পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক ভক্তি-সংযোগে ঐ প্রকার ধ্যান করার প্রয়োজন। ১৪। তদ্দ্বারা প্রথমতঃ নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু ক্ষরিত হইতে থাকে, তৎসঙ্গে দেহে পুলক প্রকাশিত হয়। কথিত আনন্দাশ্রু ও পুলক প্রভাবে দশা ভাব স্ফুরিত হয়। (উক্ত দশা ভাবকেই দিব্য-ভাব বলা যাইতে পারে। উক্ত দশা-ভাব, দিব্য-ভাব বা মহা-ভাব

সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ চৈতন্য-ভাগবতে, চৈতন্য-মঙ্গলে, চৈতন্যচরিতামৃতে, চৈতন্য-চরিত মহাকাব্যে এবং চৈতন্য-সম্বন্ধীয় অন্যান্য নানা গ্রন্থে বর্ণিত আছে।) উক্ত দশা ভাব বা দিব্য-ভাব দ্বারাই ভক্তি-যোগ সমাধি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারাই 'মনোন্মনি' হইয়া থাকে। ১৪।" যে অবস্থায় স্বীয় ইষ্ট দেবতা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে মনোনিবেশ থাকে না, সেই অবস্থার নামই 'মনোন্মনি'। পঞ্চ প্রকার সমাধি সম্বন্ধে প্রদর্শ করিয়া ষষ্ঠ সমাধি সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করা যাইতেছে,—

"মনোমূর্চ্ছাং সমাসাদ্য মন-আত্মনি যোজয়েৎ।
পরাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥"

উক্ত শ্লোকের অর্থ এই প্রকার—"মনোমূর্চ্ছা-কুম্ভকাবলম্বনে স্বীয় মন আত্মাতে যোগ করিতে হইবে। পরাত্মার বা পরমাত্মার ঐ প্রকার যোগের জন্যই রাজযোগ-সমাধি সিদ্ধিতে অধিকার হইয়া থাকে।" এক্ষণে সংক্ষেপতঃ রাজযোগ-সমাধি-প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল। পর সিদ্ধান্তে সমাধি সম্বন্ধে বলা হইবে।

বিংশ সিদ্ধান্ত

সমাধি বহু প্রকার। প্রসিদ্ধ অনেক যোগশাস্ত্রমতেই প্রধানতঃ সমাধি দ্বি-ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম, সবিকল্প-সমাধি এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম নির্ব্বিকল্প-সমাধি। নির্ব্বিকল্প-সমাধিকেই নির্বীজ সমাধি বলা যাইতে পারে। কেবল ধ্যানানুষ্ঠান-সাধনা দ্বারাও সমাধি হইতে পারে, ভক্তিবশতঃও সমাধি হইতে পারে, অতিরিক্ত দিব্য-জ্ঞান বশতও সমাধি হইতে পারে; প্রেমবশতও সমাধি হইতে পারে। সেই সমাধির অন্তর্গত অনেক ভাব,—সেইজন্য সম্পূর্ণ দিব্য-দাস্য-ভাববশত সমাধি হইতে পারে, সেইজন্য সম্পূর্ণ দিব্য-সখ্য-ভাববশত সমাধি হইতে পারে, সেইজন্য দিব্য-বাৎসল্য-ভাববশত সমাধি হইতে পারে, সেইজন্য সম্পূর্ণ দিব্য-মধুর-ভাববশত সমাধি হইতে পারে; —ঈশ্বরের প্রতি পরম শত্রু-ভাববশতও সমাধি হইতে পারে। সমাধি-অবস্থায় মন কোন পার্থিব-ভাবে এবং কোন অনিত্য-ভাবে আবদ্ধ রহে না। সমাধিস্থ-মহাপুরুষ সম্পূর্ণ 'অবদ্ধ'। যে মহাপুরুষের সমাধি হয়, তাঁহার বন্ধনের সহিত কোন সংস্রব রহে না। যাঁহার সমাধি হয়, তিনিই জীবন্মুক্ত-সিদ্ধ-পুরুষ। সাংসারিকতা থাকিতে সমাধিতে অধিকার হয় না। সমাধি-সম্বন্ধে মহাযোগী ঘেরণ্ড কহিয়াছেন,—

"সমাধিক পরং যোগং বহুভাগ্যেন লভ্যতে।
গুরোঃ কৃপা-প্রসাদেন প্রাপ্যতে গুরুভক্তিতঃ ॥১॥

সমাধি-সাধনার অধিকারী সম্বন্ধে মহাত্মা-ঘেরণ্ড কহিয়াছেন,—

"বিদ্যা প্রতীতিঃ স্বগুরু প্রতীতি-
রাত্মপ্রতীতির্মনসঃ প্রবোধঃ।
দিনে দিনে যস্য ভবেৎ স যোগী
সুশোভনাভ্যাসমুপৈতি সদ্যঃ ॥১॥"

মহাত্মা ঘেরণ্ড তৃতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"ঘটাদ্ভিন্নং মনঃ কৃত্বা ঐক্যং কুর্য্যাৎ পরাত্মনি।
সমাধিং তদ্বিজানীয়ান্মুক্তসংজ্ঞো দশাদিভিঃ ॥"

"ঘট বা দেহ হইতে মনকে পৃথক করত, তাহা পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য করিতে হইবে। সেই ঐক্যই সমাধি। সমাধি-দ্বারা সর্ব্ব-দশা বা সর্ব্বাবস্থা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।" সর্ব্ব-দশা হইতে মুক্ত হইলে, জীবের অবশ্যই বন্ধন থাকে না। অতএব সমাধিও জীবের মুক্তির কারণ। 'সমাধি' জীবের মুক্তির কারণ বলিয়া, সমাধি-লাভ-বাসনাও জীবের মঙ্গলের কারণ। অগ্রে জীবের সমাধি-লাভ-বাসনা না হইলে, সমাধি-সাধনা-সম্বন্ধে তাহার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে সমাধি-লাভ-বাসনার প্রয়োজন। সেইজন্যই অষ্টাবক্রের—

"নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥১৫॥"

বলা সঙ্গত হয় নাই। মুমুক্ষু জীবের সমাধি-লাভ-বাসনা হইলে তাহার মুক্তিলাভের অনেক সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকারে সমাধি বর্ণিত হইল। আপাততঃ সমাধি-সিদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। সমাধি-সিদ্ধ হইলে, এইরূপ বোধ হয়,—

"অহং ব্রহ্ম ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥৪।

কথিত হইল,—'আমিই 'ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহি, ব্রহ্মই 'আমি'। সেইজন্যই 'আমি' অশোক, 'আমিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ-নিত্য-মুক্ত-স্বভাবসম্পন্ন। অতএব সমাধি সাময়িক নহে, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সমাধিযোগে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সমাধিযোগে আত্মজ্ঞান হয়, সমাধিযোগে অদ্বৈতজ্ঞান হয়। সমাধি সম্পূর্ণ মুক্তির অনুকূল। সেইজন্য সমাধি-সম্বন্ধে দার্শনিক-বিচার, পর সিদ্ধান্তে সন্নিবেশিত হইল। দার্শনিক-যোগ-প্রিয়-গণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী হইতে পারিবে।

একবিংশ সিদ্ধান্ত

প্রসিদ্ধ পাতঞ্জলদর্শনীয় সমাধি-পাদ কথিত হইতেছে,—

অথ যোগানুশাসনম্ ॥১॥
যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। ২॥
তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। ৩॥
বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪॥
বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥
প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥
প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥
বিপর্যয়োমিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্। ৮ ॥
শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যোবিকল্পঃ। ৯॥
অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥
অনুভূত বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥
অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥
তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥
স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারা সেবিতোদৃঢ়ভূমিঃ॥১৪॥
দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা
বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥
তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥
বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥
বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ ১৮ ॥
ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥
শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥
তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥
মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥
ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥
ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥২৪॥
তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্বীজম্ ॥ ২৫ ॥
স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬॥
তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥
তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥
ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমেঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥
ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥৩০॥
দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥৩১॥
তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥
মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ পুণ্যাপুণ্য-
বিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥
প্রচ্ছর্দন বিধারণাভ্যাং প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥
বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃস্থিতি-নিবন্ধিনী ॥৩৫॥
বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥
বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥
স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥
যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥
পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥
ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেবমণের্গ্রহিতৃগ্রহণ গ্রাহ্যেষু
তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ॥ ৪১ ॥
তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা ॥ ৪২ ॥
স্মৃতি পরিশুদ্ধৌ স্বরূপ শূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা
নির্বিতর্কা ॥ ৪৩ ॥
এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া
ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥
সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥
তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥
নির্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥
তত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥
শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্য সংস্কারপ্রতিবন্ধী । ৫০ ।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ।"

উক্ত সমাধি-পাদ সমাপ্ত করিয়া, এক্ষণে সমাধি-পাদের ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে ;—"চিত্তবৃত্তি-সম্বন্ধ যোগাত্ শাসন বদ্ধা যাইতেছে। ১। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হইলে, দ্রষ্টা বা সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত হন্। ৩। সেই অবস্থিতি কালে আত্মার 'স্বরূপ' অপ্রচ্ছন্ন থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তিনি নানা মনোবৃত্তির সহিত সংযুক্ত থাকায়, তৎ-স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে। ৪। পঞ্চ-প্রকার মনোবৃত্তি। সেই পঞ্চ-প্রকার মনোবৃত্তি আবার দ্বি-ধা বিভক্ত হইয়াছে। এক প্রকারের নাম ক্লিষ্ট বা ক্লেশবাসক এবং অপর প্রকারের নাম অক্লিষ্ট বা ক্লেশনাশক। ৫। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিকেই পঞ্চ-প্রকার মনোবৃত্তি বলা যায়। ৬। প্রমাণ-বৃত্তির অন্তর্গত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ৭। যাহা ভ্রমাত্মক মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রম অপনীত হইলে যে জ্ঞান স্থায়ী হয় না, সেই জ্ঞানকে 'বিপর্য্যয়' বলা যাইতে পারে। ৮। বস্তু না থাকিলেও ভ্রমাত্মক-শব্দ-জনিত যে এবপ্রকার মনোবৃত্তি স্ফুরিত হয়, সেই মনোবৃত্তিকে 'বিকল্প' বলিলে ভুল হয় না। যেমন খ-পুষ্প না থাকিলেও তাহা বলিবামাত্র মনে এক-প্রকার বৃত্তির উদয় হয়। ৯। অজ্ঞানো-দ্ভবিত স্বপ্রকাশ মনোবৃত্তি 'নিদ্রা'। ১০। প্রত্যেক অনুভূত বিষয়ই চিত্তে অঙ্কিত হইয়া আছে ; ঐ প্রকার অঙ্কিত হইয়া থাকারই অপর নাম 'স্মৃতি'। ১১। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য সাহায্যে প্রত্যেক মনোবৃত্তিই নিরুদ্ধ হইতে পারে। ১২। চিত্ত স্থির করিবার জন্য স্বল্পমনোবৃত্তি-শূন্য যে যত্ন, তাহাকেই 'অভ্যাস' কহা যায়। ১৩। প্রযত্ন সহকারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল ঐ প্রকার অভ্যাস করিতে করিতে, তবে তাহা সুদৃঢ় ও নিশ্চল হয়। ১৪। যাঁহার সমস্ত শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, যিনি সমস্ত দৃষ্ট-বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়াছেন, তাঁহারই বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। ১৫। ঐ প্রকার পরম বৈরাগ্য স্ফুরিত হইলে, প্রকৃতি-পুরুষ যে পরস্পর অভেদ নয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞান-প্রভাবে প্রাকৃতিক গুণ নিচয়ের প্রতিও বীতস্পৃহ হইতে হয়। ১৬। যে সংশয়-বিপর্য্যয়-বিরহিত সম্প্রজ্ঞান সমাধিবলে তাবৎ বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না, বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতাভেদে তাহা চারিভাগে বিভক্ত। ১৭। প্রবল বৈরাগ্যবশত যখন সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তখন চিত্ত প্রত্যেক সংস্কার পরিশূন্য হয় ; সেই অবলম্বন-রহিত অপূর্ব্বাবস্থাকেই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি বলা যায়। ১৮। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-মূলক বিদেহ লয় কিম্বা প্রকৃতি লয়, উভয়ই মুক্তির কারণ হয় না। যেহেতু উভয়ই অবিদ্যা-পরিপূর্ণ নহে। নিদ্রার পর জাগরণ হইলে যেমন নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তদ্রূপ ঐ উভয়বিধ অনাত্ম-লয়ের পরেও চিত্ত পুনঃ পুনঃ সাংসারিক ব্যাপারে আসক্ত হয়। ১৯। যিনি যোগ সম্বন্ধীয় শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধিবলে, অতুল প্রজ্ঞালাভ করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত হইয়াছেন। কোন প্রাকৃতিক প্রলোভন আর তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না। তিনি বিদেহ-লয় এবং প্রকৃতি-লয়বিহীন উপায় প্রত্যয়-নীল নিত্য মুক্ত যোগী হইয়াছেন। তিনিই চিরকালের জন্য স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ২০। তীব্র কার্য্য শক্তি সম্পন্ন সংস্কারের নাম 'সংবেগ'। তীব্র সংবেগশালী যোগীরই শীঘ্র সমাধি হয়। ২১। মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে তিন প্রকার 'সংবেগ' আছে। মৃদু সংবেগশীল যোগীর সমাধি বিলম্বে হয়। মধ্য সংবেগশালী হইলে, তদপেক্ষা শীঘ্র হয়। যাহার অধিমাত্র সংবেগ হইয়াছে, অতি শীঘ্রই তিনি সমাধিমগ্ন হন্। ২২। শুদ্ধ ভক্তি-সহকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিলেও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অধিকারী হওয়া যায়।

ক্রমশঃ

মুক্তিলগ্ন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ অনামী ॥

জজ সমরেশ মিত্রের বিজ্ঞপ্তি যেদিন খবরের কাগজে বেরোয় সেদিন সে বিজ্ঞপ্তি খুব স্বাভাবিক ভাবেই স্টেনোটিক মলয় মজুমদারের চোখে পড়ে। মজুমদার এতদিন চুপ করে বসে ছিলেন না। তাঁর কৌশলী বুদ্ধি ও দক্ষ অনুসন্ধানে উদ্ধারের আশৈশব কাহিনী, তিনকড়ির বিবাহ, তিনকড়ির জজ সমরেশ মিত্রের অধীনে চাকুরী, লটারিতে অর্থপ্রাপ্তি, তিনকড়ি দাস থেকে হরিপ্রিয় রায়ে নাম পরিবর্তন, অনিলার সাথে সজীবের বিয়ে এবং বিয়ের ব্যাপারে হরিপ্রিয়ের আত্মগোপন প্রভৃতি সমস্ত তথ্যই তিনি নিখুঁত ভাবে সংগ্রহ করেন। অনামিকার অগ্নিপরীক্ষা, নূতন বাড়ী কথাগুলির অর্থ তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। সমস্ত কিছু বিচার ও বিশ্লেষণ করে মলয় দেখলেন, তাঁর এখন একমাত্র কাজ হলো হরিপ্রিয়ের সসম্মানে আত্মপ্রকাশের পথ আরও সহজ করে দেওয়া। এই ভেবে মলয় জজ সমরেশ মিত্রের কাছে একখানা এক্সপ্রেস ডেলিভারিতে চিঠি পাঠালো। চিঠিতে এই রকম লেখা ছিল "মাননীয় মিত্র মহাশয়, তিনকড়ি দাস আপনার বিজ্ঞাপন দেখেছে। সে নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আপনার ওখানে যাচ্ছে। তিনকড়ি দাসকে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন, তার অন্যথা হলে আপনার সাথে আপনার বৈবাহিক হরিপ্রিয়বাবুর সম্পর্কে একটা অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে। কারণ যথাসময়ে জানবেন। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না আর তিনকড়ি বা অন্য বাইরের লোক কাউকে চিঠির বিষয়বিসর্গ বলবেন না। ইতি আপনার একান্ত শুভার্থী মলয় মজুমদার।" চিঠি পেয়ে সমরেশ মিত্র যেমন নিশ্চিন্ত হলেন প্রদীপের ব্যাপারে, তেমনি একটা অস্পষ্ট রহস্যের আভাষ পেয়ে একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়লেন। মলয় মজুমদারের চিঠির মর্ম সমরেশ মিত্র জানালেন শুধু সাইকলজিষ্ট শালক অমিতবাবুকে। তিনকড়িকে কি রকম শ্রদ্ধা দেখাতে হবে এরা দুজনে ঠিক করে বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

পরবর্তী শুক্রবার সকালবেলা। ঘড়িতে তখন ঠিক ৭টা। হরিপ্রিয় অনামিকাকে বললো "আমার পরিষ্কার জামা কাপড় বের করে রাখো, আর শু-টা ব্রাশ করে দাও। সেভ্‌টা সেরে আমি বাথরুমে যাবো"।

অনামিকা—"আজ ওর কোনটারই প্রয়োজন নেই। জজের বাড়ীতে সাধারণ আধ ময়লা ধুতি সার্ট পরে যাও। দাঁড়ি গোঁফ কামিয়ে কাজ নেই। আর স্নান নয়, স্পাঞ্জের পরে দিয়ে যাবে। তোমাকে ওখানে গিয়ে তিনকড়ির মত সব কিছু বলতে ও করতে হবে। জজ এখন তোমার হাতে, কোন চিন্তার কারণ নেই।"

হরিপ্রিয় জলখাবার করে তিনকড়ির সাজে সজ্জিত হয়ে কলকাতা যাত্রা করে। ৮।। টায় ট্রেন ফেল করে ৯।। টায় ট্রেন ধরে। চিন্তাক্লান্ত তিনকড়ি ধূলামলিন পরিচ্ছদে সমরেশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয় বেলা ১০।। টায়। ঐদিন কোর্টে ছাড়িয়ার তারিখ বেলা ১১।। টায়। সমরেশবাবু তিনকড়ির বিলম্ব দেখে মিনিট কুড়ি আগে নিজের উকিল পাঠিয়ে চিন্তাকুল মনে ড্রাইংরুমে বারান্দায় পাইচারি করতে থাকেন। তিনকড়িকে দেখে তিনি যেন অকূলে কূল পেলেন। সমরেশবাবু অন্য কোন কথা না বলে সোজা বললেন, "আচ্ছা তিনকড়ি, প্রদীপের জন্য আংটি কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলে তা মনে আছে"?

তিনকড়ি—নিউ গিনি হোম থেকে, বেশ মনে আছে।

সমরেশবাবু—আচ্ছা প্রদীপ যে তখন তোমার সাথে

নিউ গিনি হোমে ছিল তা প্রমাণ কর্ত্তে পারবে ?"

তিনকড়ি—"নিশ্চয় পারবো। নিউ গিনি হোমের মালিকই সাক্ষী দেবে।"

সমরেশবাবু—"তা হলে তুমি এখনই আমার গাড়ীতে বেরিয়ে গিনিহোমের সাক্ষী জোগাড় করে কোর্টে যাও ১১টার মধ্যে। আমার তালক অমিতবাবু যাচ্ছেন তোমার সাথে"। তিনকড়ি ও অমিতবাবু গাড়ীতে উঠলে ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে নিউ গিনি হোমের দিকে গেল।

কোর্ট আগেই বসেছিল। অজ মিত্র মহাশয়ের উকীল রেবতী সান্যাল প্রদীপের পক্ষের বিবৃতি পাঠ শেষ করলে ম্যাজিষ্ট্রেট ডি. সরকার বলেন, "মিষ্টার সান্যাল, আপনার বিবৃতিতে প্রদীপের উপর ব্লাকমেইলিং হয়েছে বলে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তা অবশ্য রুলআউট করা যায় না। কিন্তু আপনার বিবৃতিতে ডাকাতির সময় প্রদীপের অবস্থিতি পরিষ্কার ভাবে ধরা যায় না। ঘটনার রাত্রে ঠিক সন্ধ্যা ৬॥ টায় ওর গতিবিধি হোলো আমাদের দেখবার প্রধান বিষয়বস্তু। আপনার মক্কেলের প্রাক্তন বেয়ারা তিনকড়ি তো এলোনা ? সে এলে সুবিধা হোতো"।

মিষ্টার সান্যাল—"একদিন সময় দেওয়া যায় না হজুর ?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সরকার—"সাধারণ কেস্ হলে দেওয়া যেতো। এটায় সম্ভব নয়। কাজেই অন্ সাস্পিশন্ ওকে পুলিশ কাষ্টডীতে রাখতে হবে। পরে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে নিতে পারবেন। আজ বিকাল ৪টায় পুলিশ ওয়ারেণ্ট্ অফ এরেষ্ট নিয়ে যাবে আপনার মক্কেল মিষ্টার মিত্রের বাড়ীতে। তখন আপনার মক্কেলের ছেলে প্রদীপকে পুলিশের হাতে অর্পণ করতে যেন কোন রকম বাধা না হয়।"

ঠিক এই মুহূর্ত্তে অমিতবাবু তিনকড়ি ও নিউ গিনি হোমের মালিককে নিয়ে কোর্টরুমে প্রবেশ করেন। পেস্কার মিষ্টার সান্যালকে ইসারা করতেই সান্যাল ছুটে এদের কাছে আসে এবং সমস্ত খবর জেনে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে এসে বলে "হজুর আমার মক্কেলের প্রধান সাক্ষী এইমাত্র উপস্থিত হয়েছে। ইনি (তিনকড়িকে দেখিয়ে) আংটির ক্রেতা তিনকড়ি, আর ইনি (নিউ গিনি হোমের মালিককে দেখিয়ে) আংটির বিক্রেতা নিউ গিনি হোমের মালিক স্বয়ং কর্মকার। আর এই লাল খাতায় আংটি বিক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার সরকার খাতাখানি খুলে বিশেষ পৃষ্ঠাটি দেখে পাঠ করলেন। উহাতে লেখা ছিল "১৯৩২ সাল ইংরেজী ১১ই মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় প্রদীপ মিত্রের আঙুলের মাপ নিয়ে দশ আনা ওজনের একটি সোণার আংটি তিনকড়ি দাসের মারফতে বিক্রী করা হোলো"।

এবার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার সরকার তিনকড়ি ও দোকানের মালিককে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, "মিষ্টার সান্যাল, আপনার মক্কেলের পুত্র প্রদীপ নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে চার্জ তুলে নেওয়া হোলো, হি ইজ্ ফ্রি। পুলিশ একটা ভুল ও ভুল অনুমানের উপর নির্ভর করে ডাকাতির কেসে ওকে জড়িয়েছিল। একটা ব্লাকমেইলিং যে হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ নাই।"

মিষ্টার সান্যাল, "ধন্যবাদ, হজুর"।

এরপরে মহা আনন্দে অমিতবাবু তিনকড়িকে নিয়ে মোটরযোগে মিত্র ভবনে ফিরে আসেন। সমরেশ বাবু ও তাঁর বাড়ীর অন্যেরা চিন্তাগ্রস্ত মনে বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। অমিতবাবু এসে অজ সমরেশ মিত্রকে দেখেই বললেন, "স্যাখো, মিত্তির সাহেব, তিনকড়ি না এলে কেস্টা কীরণ খারাপ পরিণতির দিকে যেতো। প্রদীপকে আজই বিকেলে এ্যারেষ্ট করে জেলে রাখার অর্ডার দেওয়ার প্রায় উপক্রম হয়েছিল। ঠিক সঙ্কট-মুহূর্ত্তে নিউ গিনি হোমের মালিকসহ তিনকড়ির কোর্টে উপস্থিতিতে ব্যাপারটা আমাদের সম্পূর্ণ অনুকূলে গেলো। নিউ গিনি হোমের মালিকের নিজ খাতায় লিখিত বিবৃতি পাঠ করে ম্যাজিষ্ট্রেট তা সত্য বলে ধরে নেন এবং প্রদীপকে সমস্ত সন্দেহ থেকে অব্যাহতি দেন"।

সমরেশ—"তাই নাকি। যাক মাথা থেকে একটা প্রচণ্ড ভার নেমে গেলো"—বলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন।

অজের বাড়ীখানি আবার আনন্দমুখর হয়ে উঠলো। স্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে কিছু বয়সে গেলেও তিনকড়িকে সকলেই চিনতে পারলো। বড় মেয়ে নীলিমা মন্তব্য করলো "তিনকড়িদার নিশ্চয়ই দিন ফিরেছে, বেশ একটু ভদ্র ও ভারিক্কি দেখায়।" তিনকড়ি এ কথায় বিচলিত হয় না এবং নিজের থেকে তাকে কিছু বলে না। প্রদীপ ছুটে গিয়ে সেজ বৌদি অনিলাকে বললো, "জানো বৌদি, তিনকড়িদার জন্য বেকসুর খালাস পেয়ে গেলাম। তিনকড়িদা কে জানো? তিনকড়িদা এক সময় আমাদের বাড়ীতে ছিল বাবার বেয়ারা হিসাবে। ভারি ভাল ও মজার মানুষ এই তিনকড়িদা। অনিলা অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করে সহজ ভাবে বলে "তাই নাকি, ঠাকুরপো"? বস্তু অনিলার মায়ের এবং তার নিজের শিক্ষাদীক্ষা। অনিলা বাহ্যিক কোন ভাব-পরিবর্তন দেখালো না। সে জানতো তখনও তার বাবার আত্মগোপনের প্রয়োজন আছে।

তিনকড়ি স্নানাহার সেরেই এসেছিল। বাড়ীর অনেকের এবং বিশেষ করে সমরেশবাবুর পীড়াপীড়িতে তিনকড়িকে আবার মধ্যাহ্ন আহারে রাজী হতে হয়। সমরেশবাবু সানাদি করে তিনকড়িকে নিয়ে ঢোকেন ডাইনিং হলে। পাশাপাশি দুখানা আসন পাতা ছিল। সমরেশবাবু বললেন "তিনকড়ি, এসো, আজ দুজনে এক সঙ্গে বসে খাওয়া যাক্"। তিনকড়িকে ইতস্ততঃ করতে দেখে সমরেশবাবু তিনকড়িকে হাত ধরে টেনে একটি আসনে বসিয়ে দেন, এবং নিজে অন্য আসনটিতে বসেন। সমরেশবাবুর কাছ থেকে এতটা উদার ভাব তিনকড়ির কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটুকু তার মনে আশার আলো জেলে দিয়ে ছিল। বলরাম মজুমদারের সাবধানী চিঠি হয়ত সমরেশবাবুকে এতটা উদারতা দেখাবার প্রেরণা দিয়েছিল।

আহারান্তে তিনকড়ি সমরেশবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়। কন্যা অনিলার সাথে দেখা করে কথা বলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোন ইঙ্গিত তো এখনও পাওয়া যায়নি। সুযোগ অবশ্য একটু পরেই এলো। সমরেশবাবু খাওয়া দাওয়ার পর ড্রইং রুমে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। তিনকড়ি নিকটেই একটা বেঞ্চির উপর বসেছিল। সমরেশবাবু তিনকড়িকে বললেন, "তিনকড়ি, যা উপকার করলে তার ঋণ জীবনে শোধ দেওয়ার নয়। যে বিপ্রী অপ্রীতিকর অবস্থায় তুমি এ বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলে, তাতে তুমি আমাদের এ বাড়ীমুখো কোন দিন হবে আশা করিনি।"

তিনকড়ি—"কি বলেন স্যার, আমি আপনার চাকর ছিলাম, কত ভাবে আমিই আপনার কাছে ঋণী, আজ সামান্য কিছু ঋণ শোধ করে ধন্য হলাম"।

সমরেশবাবু "তুমি আর আমার কাছে চাকর বা বেয়ারা তিনকড়ি নয়, তুমি আজ থেকে আমার বন্ধু, আমার ভাই" এই বলে সমরেশবাবু তিনকড়িকে কাছে টেনে বুকেতে জড়িয়ে ধরেন।

নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করে তিনকড়ি বলে "এ কি করছেন স্যার, এতে আমার অকল্যাণ হবে।" এই বলে তিনকড়ি সমরেশবাবুকে পা ধরে প্রণাম করে। সমরেশবাবুর আজকের ব্যবহারে তিনকড়ির মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। তিনকড়ি ভাবে এ কি তার ভক্তিমতী স্ত্রীর ও তার কৃষ্ণ সাধনের প্রত্যাশিত ফলের প্রতিশ্রুতি!

এই সময় সজীব বাইরে থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢোকে এবং বলে "আচ্ছা তিনকড়িদা, তুমি হরিপ্রিয়বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করো"? প্রদীপ সংশোধন করে বলে "সেজদা, আর তিনকড়িদা নয়, আজ থেকে তিনকড়ি কাকা হলেন"। সজীব প্রদীপের কথার তাৎপর্য্য বোঝার চেষ্টা না করে নিজের প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় রইলো।

তিনকড়ি—"কোথাকার হরিপ্রিয়বাবু?"

জবাবে সমরেশবাবু বলেন—"আরে বাস্তাসতের ঘোষ কলোনীর হরিপ্রিয় রায়। বেশ ধনী ও মানী লোক, ওর মেয়ে অনিলার সাথে আমার এই ছেলে সজীবের বিয়ে হয়েছে।"

তিনকড়ি—"ও তাই নাকি" বলে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা

করে এবং একটু পরেই স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে "হরিপ্রিয় বাবুকে আমি ভালো করেই চিনি···। কিন্তু ওখানে ছেলে বিয়ে দিয়ে কি ভাল করলেন" ?

জয়ন্তী বিভাবতী—"তা কেন বলছো, তিনকড়ি।"

তিনকড়ি—"ওরা খুব নীচু বংশের কায়েত,...ওদের ঘরের লোক আপনাদের ঘরের চাকর, বেয়ারা হবার উপযুক্ত! এক সময় ওদের কি-ই না দুরবস্থা ছিল!"

সমরেশ—"কিন্তু, তিনকড়ি, রূপে গুণে শিক্ষায় যে বউ পেয়েছি তার তুলনা হয় না।"

তিনকড়ি—"হাঁ, শুনেছি, হরিপ্রিয় বাবুর বড় মেয়েটি সত্যিই সব রকমে ভালো। ওর মত আর একটি পাওয়া কঠিন।"

বিভাবতী—"তাহলে তুমি ওদের অনেক খবরই রাখো ?"

তিনকড়ি—"রাখি বইকি...। হরিপ্রিয়বাবুর কাঠের ব্যবসা, আমারও তাই। ব্যবসা উপলক্ষ্যেই ওর সাথে আমার পরিচয়।" ক্ষণকাল ভেবে, "হাঁ, হরিপ্রিয়বাবু কি ছিলেন আর কি হয়েছেন। ভাগ্য ও লক্ষ্মী দুইয়েরই অধিকারী উনি। ভাগ্যে পেয়েছিলেন লটারির মোটা টাকা আর লক্ষ্মী, কর্মশীলা, বুদ্ধিমতী ও কর্মদক্ষা স্ত্রী। অমন মহিলা নাকি উঁচু বংশেও কম দেখা যায়।"

সমরেশবাবু—"আবার বংশের কথা তুলছো।"

তিনকড়ি—আচ্ছা স্যার, আর বলবো না।"

সমরেশবাবু কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলেন, "নতুন বউমাকে দেখবে তিনকড়ি ?" তিনকড়ির উত্তরের অপেক্ষা না করে সমরেশবাবু বড় মেয়ে নীলিমাকে লক্ষ্য করে বলেন, "মা নীলু, নতুন বউমাকে একটিবার নিয়ে এসো তো এখানে।"

অনিলা যখন জানলো মিত্র-পরিবারের একজনও বেয়ারা তার নিজেরই বাবার সামনে নববধূ হিসেবে তাকে উপস্থিত হতে হবে তখন তার মনের যে কি অসহায় অবস্থা হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। মায়ের শিক্ষার গুণে অনিলার কোমল মনের সাথে গড়ে উঠেছিল একটা দৃঢ় ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী। ভাবপ্রবণতার সহজ দুর্বলতা হওয়ার মত মেয়ে অনিলা নয়। কিন্তু তার বর হোক তার বাবার কথা ভেবে। তিনি নিজেকে সামলাতে পারলে হয়। যা হোক, সাধারণ আটপৌরে শাড়ি ব্লাউজ পরে নীলিমার সাথে অনিলা খুব সহজ ভাবে এসে তিনকড়ির সামনে দাঁড়ায় ও সহজাত পিতৃভক্তি আবেগে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। নীলিমা বলে ওঠে, "না না বউ, ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে হবে না"।

অনিলা অজ্ঞাতসারে এখানে একটু ভুল করেছিল, মা থেকে তার বাবার আত্মগোপনের কথা এই মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু অনিলার ভুলের ফল যে পরিস্থিতির দিকে যায়নি সমরেশ বাবুর আচরণে। সমরেশ বাবু বললেন, "থাক গে নীলু, তিনকড়িদা বলে সত্যিই প্রদীপ ওকে বরাবর ডাকতো, সে হিসেবে তিনকড়ি তো ওদের প্রণম্য" এই বলে একটু মিষ্টি হাসি হেসে ব্যাপারটির গুরুত্ব কমিয়ে দিলেন। এই ২৩ মিনিটের ব্যাপারে তিনকড়ি ও অনিলার দুঃসহ-মানসিক অবস্থা শুধু অন্তর্যামী জানতেন, এবং অন্তর্যামীই এই সঙ্কট থেকে দুজনকে রক্ষা করলেন। অনিলা এ ক্ষেত্রেও জয়ী হোলো। সমরেশবাবুর নির্দেশে নীলিমা কিছু পরেই অনিলাকে নিয়ে অন্দর মহলে চলে যায়। তিনকড়ি আবেগকম্পিতকণ্ঠে একটিবার মাত্র মেয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নাথা নীচু করে বলেছিল, "বউটি যেন এই যে মেয়েদের মুখের দিকে বেশীক্ষণ তাকানো অনুচিত। তিনকড়ি অনেক কষ্টে আত্মদমন করলো যদিও অজ্ঞাতসারে তার দু'টো ফোঁটা অশ্রুপাত ঘটে গেলো।

তিনকড়ি অতি কষ্টে প্রকৃতিস্থ থেকে বললো, "বেশ বউ হয়েছে, স্যার"।

তিনকড়ির চোখ দিয়ে জল পড়াটা সমরেশবাবুর দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি বললেন "তোমার চোখের অসুখ নেই তিনকড়ি ?"

তিনকড়ি—"হাঁ, আছে স্যার, রোদে ঘোরা ফেরার পর চোখ দিয়ে অনেক সময় জল পড়ে।"

সমরেশ—"চশমা নাও, তাতে ঠিক হয়ে যাবে।"

তিনকড়ি—"আমি তা হলে উঠি এবার, আমার একটার ট্রেন ধরতেই হবে।"

সমরেশ—"তোমার নিজের কথা তো কিছু বললে না তিনকড়ি। তোমার তো একটী বড় মেয়ে আছে?"

নীলিমা—হ্যাঁ বাবা, ভারী সুন্দর মেয়ে, নাম খুকু। সেই ছোট্ট ১০।১১ বছরের যখন তখন ফ্রক পরে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। তখন তিনকড়িদা আমাদের এখানে।"

সমরেশ—"মেয়ের তো বিয়ের বয়স হয়েছে। মেয়ের বিয়ের জন্য হাজার খানেক টাকা তোমায় দিতে চাই। নিলে খুশী হব।"

তিনকড়ি—"স্যার, টাকার কিছু দরকার নেই। আজ কয়েক ঘণ্টার ভেতর আপনার কাছে এমন অনেক কিছু পেয়েছি যা টাকায় কেনা যায় না"। ক্ষণকাল ভেবে "যাওয়ার আগে একটা দাবী রেখে যাচ্ছি, তার দরকার হতেও পারে, নাও হতে পারে। চোখে বিস্ময়ের ভাব এনে সমরেশবাবু বলেন "কি জিনিষের দাবী, তিনকড়ি"?

তিনকড়ি—"ক্ষমা। স্যার আমি চল্লুম আর দেরী করলে একটার ট্রেন ধরা যাবে না।" এই বলে সমরেশবাবুকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে ঐ মুহূর্তেই অজয়ের বাড়ী থেকে দ্রুত পদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কিছুটা পথ হেঁটে ট্যাক্সিতে উঠে ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করে।

তিনকড়ি নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাবার পরে ডুইং রুমে অজয় সমরেশ মিত্র তার শ্যালক অমিতবাবু ও সঞ্জীব বিভিন্ন স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনজনেরই চিন্তাস্রোত যাওয়ার মুখে তিনকড়ির কথা প্রার্থনা রহস্যের একটা জিনিষ দিয়ে গিয়েছিল। সঞ্জীব কাঁধে-গামছা তিনকড়ি ও এই তিনকড়ির মধ্যে একটা আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখতে পেলো না। ওর মনে হোলো তিনকড়ি দাস যেন হরিপ্রিয়ের অভিনয় করে গেলো। অজয়ের শ্যালক সাইকোলজিষ্ট অমিতবাবু সব কিছু মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেললেন। তিনি বলে উঠলেন, 'ভাগ্নে, মিস্টার সাহেব, আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের হরিপ্রিয় আর তিনকড়ি সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।"

সমরেশ মিত্র অজয় মজুমদারের সাবধানী চিঠি, তিনকড়ির কথাবার্ত্তা ও কথার দাবী সব মিলিয়ে এতক্ষণ মনে মনে বিচার করছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, "হতে পারে, বিচিত্র কি?" ক্ষণকাল ভেবে "আচ্ছা, তিনকড়ি তো এখানে থাকার সময় লটারির টিকেট কিনেছিল। হয়ত লটারিতে বেশ মোটা টাকা ও পেয়েছিল।

অমিতবাবু—"খুবই সম্ভব।"

সমরেশ—"লটারির মোটা টাকা অনেকেই পায়। কিন্তু ঐ টাকার জোরে জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন এনে প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদার অধিকারী কম লোকেই হতে পারে।

সঞ্জীব—বাবা, আমারও মনে হয় পিসেমশায়ের সিদ্ধান্ত ঠিক। আমাদের মন তৈরীর জন্য কি দুরূহ পথে পা দিয়ে ছিলেন ভদ্রলোক এবং তাঁর সমগ্র পরিবারটি।

আঠার

একাধিক পরীক্ষার জয়ী হয়ে হরিপ্রিয় বাড়ী ফিরেছে। সমরেশ বাবুর বাড়ীতে যা যা ঘটেছে এবং যে সব কথা-বার্ত্তা হয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে হরিপ্রিয় অনামিকার কাছে বললো। অনামিকা বিস্ময়ে অবাক্ ও খুশী হয়ে সব কথা শুনলো এবং বললো "তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা দেখালে"। ক্ষণকাল ভেবে, "আমাদের "কল্যাণব্রত-ব্রত এত দিনে সিদ্ধ হতে চললো।"

হরিপ্রিয়—আপো অজ, ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে তিনকড়ি ও হরিপ্রিয় একই ব্যক্তি।

অনামিকা—"এখন শেষটুকু বাকী। তাও মা কালীর কৃপায় ভালোয় ভালোয় মিটে যাবে।"

হরিপ্রিয়—শেষটুকুরও প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। আজ রবিবার। আসছে রবিবারে অনিলার শ্বশুরবাড়ীর সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়া দাওয়া ও আনন্দ করা যাবে। টেলিফোনে তুমি নিমন্ত্রণের কাজটা সেরে ফেলো।

এখানে উল্লেখযোগ্য হরিপ্রিয় মাসখানেক আগে বাড়ীতে টেলিফোন লাইন পেয়েছিল।

অনামিকা ট্রাঙ্ক লাইনে সমরেশবাবুর সাথে কানেকশান

নের। অনামিকা "হালো, হালো! এটা মিত্র সাহেবের বাড়ী?"

অপরদিক থেকে সমরেশবাবু—"হাঁা, আমি সমরেশ মিত্র কথা বলছি।"

অনামিকা—"নমস্কার, দেখুন, আমি অনিলার মা। উনির কথামত টেলিফোন করছি। আসছে রবিবার দুপুরে আপনাদের বাড়ীর সবাইকে নিয়ে উনি একটু আমোদ আহ্লাদ ও খাওয়া দাওয়া করতে চান। কোন অসুবিধার কথা বললে চলবে না কিন্তু।"

অপরদিক থেকে সমরেশ মিত্র—"না না, অসুবিধা হবে কেন? আমরা সবাই যাবো। হরিপ্রিয় বাবুর সাথে আত্মীয়তা সূত্রে প্রথম সাক্ষাৎ, কি আনন্দের কথা। হাঁা, আমরা ১২টার ভেতরে গিয়ে ওখানে পৌঁছাবো। আচ্ছা রেখে দিচ্ছি, নমস্কার।" এদিক থেকে অনামিকা—"আচ্ছা, নমস্কার।"

মিত্র সাহেবের ঘরে দূরে উপবিষ্ট অমিতবাবু সব শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন—"তিনকড়ির এখান থেকে যাওয়ার ২।৩ দিন পরেই হরিপ্রিয়বাবুর অজ্ঞাতবাসের সমাপ্তি। এ থেকে কি বুঝতে পারছো, মিত্তির সাহেব?"

সমরেশবাবু—"আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তই ঠিক। এবার তিনকড়ি হরিপ্রিয়ের আত্মপ্রকাশের পথ প্রায় নিষ্কণ্টক করে গেছে। বাকীটুকু এখন করবেন অনামিকা দেবী।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ীতে নিমন্ত্রণের খবর জানাজানি হয়ে গেল। অনিলা বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লো। এত শীঘ্র সমস্ত বিপত্তি কেটে যাবে অনিলা ভাবতে পারেনি।

অনামিকা আদ্যোপান্ত সমস্ত খবর দিয়ে অধ্যাপক-পত্নী মালিমা মীরাদেবী ও মা বিমলাকে তার নূতন বাড়ীতে আসার জন্য চিঠি দেন। মীরাদেবী বিমলাকে নিয়ে একদিন পরেই চলে আসেন। স্কুল কলেজ খোলা ছিল বলে দেবাশীষ ও তাদের ছেলেমেয়েরা আসতে পারেনি।

আজ পরের রবিবার। হরি পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কর্মব্যস্ত লোকজনের কথাবার্ত্তায় বাড়ীখানি মুখরিত। অধ্যাপক-পত্নী মালিমা মীরাদেবী ও মা বিমলার আগমনে অনামিকা খুবই খুশী। এঁরা দুজনে অনামিকার কাছে সব শুনে যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন।

আত্মপ্রকাশের শেষ কৌশলটুকু হরিপ্রিয় আগেই ঠিক করে রেখেছিল। বেলা ১১টার সময় হরিপ্রিয় একখানা সাদা পাতলা সিনবোর্ডে তিনকড়ি দাস লিখে ফটকের সামনে হরিপ্রিয় নামাঙ্কিত নেম-প্লেটের উপর পেষ্ট করে দেয়। অনামিকা "ও কি করছো?" বলে কাছে গিয়ে আবার বললে "প্রানেটা মন্দ করনি, নিজ কথায় শেষটুকু মিটে যাবে।"

বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে হরিপ্রিয়ের বাড়ীর সবাই তার পরিবারের সকলের আগমন প্রতীক্ষা করছিলো। ঠিক পৌনে বারোটায় একখানি ট্যাক্সি এসে হরিপ্রিয়ের বাড়ীর মেইন গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। গেটের পাশে নেম প্লেটের দিকে চোখ পড়তেই সকলের কাছে হরিপ্রিয়ের আত্মগোপন রহস্যের শেষ যুবনিকাটুকু কেটে যায়। মীরাদেবীকে পিছনে রেখে অনামিকা এগিয়ে গেটের কাছে এসে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং সকলকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে হরিপ্রিয় ফিটফাট ভাবে ধুতি পরে এদের দিকে আসলে অনামিকা বলে ওঠে, "ঐ উনি আসছেন"। হরিপ্রিয় ঐদিন ভাল করে সেভ করেছিল। চোখে গোল্ড ফ্রেমের চশমা থাকাতে তিনকড়ির সাথে তার সাদৃশ্য কিছুটা কমে গিয়েছিল সব কিছু মিলে তার বর্ত্তমান পরিচয় ও আভিজাত্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এনে দিয়েছিল। মুখোমুখি হতেই সমরেশবাবু বলে উঠলেন "এই যে বেয়াই, আজ তাহলে বাড়ীতেই পাওয়া গেল"।

মুখে চোখে গাম্ভীর্য্য এনে হরিপ্রিয় বললো "আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, সেদিন বিধান-মুহূর্ত্তে সেই দায় জানিয়েছিলাম"।

সমরেশবাবু—"অপরাধ কোথায় যে ক্ষমার প্রয়োজন হবে।"

পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে দৃষ্টিভঙ্গী বদলালে মনের মতও বদলায়। তুমি তাই সুযোগ বৈষী করে নিয়েছিলে। বিয়ের প্রস্তাবের সময় তোমার পরিচয় পেলে কি যে হোতো বলা যায় না।

মলয়—আপনারা সবাই মিলে একটা সুন্দর সামাজিক দৃষ্টান্ত দেখালেন, মিষ্টার মিত্র। খুব আনন্দ পেলাম আপনাদের এই আদর্শ দীপ্ত সমন্বয়ে।

এরপরে ড্রয়িংরুমে একটা শান্তভাব চলে বহুক্ষণ মিনিট খানেক। খুশীতে নির্বাক হয়ে সবাই মিষ্টি হাসির বিনিময় করতে থাকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে।

হরিপ্রিয় আজ মহাগাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি। মুখের ভাবে ফুটে ওঠে একটা বৃদ্ধজনীয় আত্মপ্রসাদ। সরীর তিনকড়িকে খুঁজে পায় না হরিপ্রিয়ের মধ্যে। তার মন খুশীতে ভরে ওঠে। সস্নেহ প্রশংসমান দৃষ্টিতে সে শ্বশুরের দিকে মাঝে মাঝে তাকায়, শাশুড়ী অনামিকা তার কাছে প্রতিভাময়ী নারী ও মহিমান্বিতা মা বলে প্রতিভাত হলেন।

সমরেশ বাবুর স্ত্রী বিভাবতী এরপর অনামিকাকে বললেন, আই, বিয়ের সময় বরকনে একসঙ্গে বেয়াইর আশীর্বাদ পায়নি। যাওয়া দাওয়ার আগে এখনই এই শুভ কাজটি সম্পন্ন করা যাক।

খুব ভাল কথা দিদি অনামিকা জানায়।

এরপরে অনিলা ও সরীর বিবাহের পূর্ণ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ড্রয়িংরুমে সকলের মধ্যে এসে দাঁড়াল এবং হরিপ্রিয়কে একে একে প্রণাম করে। হরিপ্রিয় দুজনের মাথায় দুহাত রেখে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললে "তোমরা সুখে শান্তিতে থাকো, আর সবাইকে দেবার আনন্দ দাও এই আমার আশীর্বাদ"।

এরপরে ওরা দুজনে উপস্থিত গুরুজনদের সমস্বরে ভাবে মাথা নুইয়ে নমস্কার করল। বাড়ীর ও প্রতিবেশী মেয়েরা পেছনে দাঁড়িয়ে হুলু ও শঙ্খধ্বনি করে এই অনুষ্ঠানটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলল।

(শেষ)

সাময়িকী

শোক সংবাদ—আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষা বলিতে কিছুই নাই, তবু যাহা আছে, তাহাতে যাহারা সামান্য সাহায্যও করিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি। তাই উজ্জ্বল ভারত-লেখিকা এবং সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থা (২নং) অধ্যক্ষা শ্রীমতী গায়ত্রী বসুর পিতা প্রিয়নাথ বসু মহাশয়ের পরলোকগমন-সংবাদে বেদনা বোধ করিতেছি। ২৪ পরগণার মহেশ্বরী গ্রামে ৮৪ বৎসর বয়সে গত ১৪ মে ১৯৭০ প্রিয়নাথবাবু সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার নিজ গ্রামের এবং আশ-পাশের গ্রামের শিক্ষা-ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইল তাহা মনে করিয়াই বেদনা বোধ করিতেছি। আজীবন গণ্ডগ্রামের অধিবাসী হইলেও প্রিয়নাথবাবু একটী উদার হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। সারা জীবন গ্রামের সমাজ-কল্যাণ-মূলক কাজে নিজেকে তিনি নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। সামান্য কয়েক বিঘা জমির মালিক হইয়াও তিনি প্রায় অধিকাংশ জমি এবং তাঁহার অধিকাংশ অর্থ গ্রামের শিক্ষা-বিস্তারে দান করিয়া গিয়াছেন। গ্রামের কয়েকজন নিরক্ষর ছেলেকে ডাকিয়া একদিন বিদ্যালয় আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই বিদ্যালয় আজ একটি বড় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

পরিণত হইয়াছে এবং শীঘ্রই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইবার অপেক্ষায় আছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রিয়নাথবাবু তাঁহার বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিদ্যালয়ের মঙ্গল-প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রিয়নাথবাবুর অবর্তমানে ঐ স্থানীয় শিক্ষা-প্রসারের প্রচেষ্টা ব্যাহত না হয় আমরা এই আশা করিয়া রহিলাম, এবং ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি।

প্রিয়নাথবাবু সংভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, মানুষের হিত-প্রয়াসই তাঁহার জীবনের কাজ ছিল, তাই তাঁহার আত্মা শান্তি পাইবে ইহা আমরা জানি—তবুও আমাদের তরফ হইতে বলি, আনন্দময় গতির পথে তাঁহার যাত্রা হউক। আর তিনি যাহাদের রাখিয়া গিয়াছেন—শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী ও তাঁহার আত্মীয়বর্গকে আমাদের অন্তরের সমবেদনা জানাই। প্রিয়নাথবাবুর যাহা মুখ্য কাজ ছিল তাঁহার সেই জনকল্যাণ-ব্রত—জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রয়াস—যেন বন্ধ হইয়া না যায়, যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা যেন এই কাজকে আগাইয়া নিয়া চলেন—তাঁহাদের নিকট আমাদের এই আবেদন রহিল।

নরনারায়ণ আশ্রমের আলোচনা বৈঠক—নরনারায়ণ আশ্রমের আলোচনা-বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন ৩১শে মে রবিবার ১৯৭০-এ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত ব্রহ্মসূত্রের অবধূত-ভাষ্যের প্রথম খণ্ড হইতে 'স্বর্গ-কৃষি সমন্বয়' অধ্যায় পাঠ করিয়া উহার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্ন আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়।

"পৃথিবীর মানুষের সম্মুখে বণ্টনের (distribution) সমস্যা আজ অতি জটিল ও কঠিনরূপে উপস্থিত হইয়াছে। শক্তি যে-কোন স্থানে জমাট বাঁধিলে উহা শোষণ করিবেই, সে শক্তি ধন-শক্তি হউক, শ্রম-শক্তি হউক, আর জন-শক্তিই হউক। এই শোষণের হাত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য centralism-এর পথের কথাই মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের মধ্য দিয়া বলা হইতেছে, ব্যক্তির স্থানে রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে জমাট বাঁধার কথাই বলা হইতেছে। ইহার দ্বারা ধন বা শ্রমের মধ্যেকার স্বাধীন ও সহজ চলন-ধর্ম ব্যাহত হইয়া নিত্য-বিপ্লব (permanent revolution)কে গতিহীন করিয়া ফেলিতেছে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ব্রহ্মসূত্র অবধূত-ভাষ্যের 'স্বর্গ-কৃষি সমন্বয়' অধ্যায়ে বর্ণিত পন্থাই কি যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পন্থা বলিয়া মনে হয় না ?"

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীসত্যব্রত ঘোষ, শ্রীসুবিকেশ দাশ, শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী—সর্বশেষে পুরোহিত শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। আলোচনা শেষ না হওয়ায় পরবর্তী অধিবেশনে ইহা আলোচিত হইবে।

ইন্দিরাজী সমীপেষু—স্বাধীনোত্তর যুগে দীর্ঘকাল স্বাধীনতার যোদ্ধা-প্রতিষ্ঠানরূপে, বিশেষভাবে মহাত্মাজীর আবির্ভাবের পর হইতে মহাত্মাজীর পরিচালনায় জওহরলালজী, নেতাজী সুভাষ, মৌলানা আজাদ, বাদশা খান প্রভৃতি আরও বহু ছোট বড় মানবদরদী ত্যাগধর্মী-মহাপুরুষগণের নেতৃত্বে সঞ্জীবিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতবাসীর অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই একটি সহজ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এই কংগ্রেস যখন রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া বসিল, ভারতবর্ষের মানুষও সহজভাবেই তাহাদের সহজ বিশ্বাস কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত করিয়াছিল, বুঝি এইবারে তাহাদের দীর্ঘকালের দুঃখ দুর্দশা দূরীভূত হইবে, তাহারা সকল শোষণ বঞ্চনা, অবিচার অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া একটা স্বচ্ছন্দ জীবনের অধিকারী হইবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পর হইতেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে এমন একটি স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী চক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহারা কংগ্রেসের সকল জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে ভিতর হইতে ব্যর্থ করিয়া দিতেছিল। ভারতবাসী দীর্ঘকাল তাহাদের সহজ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের জন্য কংগ্রেসের ব্যর্থতাকে ক্ষমা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সীমা আছে—কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদের কুচক্রান্তে কংগ্রেস, প্রতিষ্ঠান হিসাবেই, মানুষের অন্তর হইতে মুছিয়া যাইতেছিল। ভারতবাসী নিরুপায় হইল। এই সুযোগে মানুষের বহু প্রতীক্ষিত আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করিবার কথা লইয়া ভারতীয় ঐতিহ্যের একান্ত

বিপরীত, সামগ্রিক জীবনবাদের পরিপন্থী, একান্ত ভাবে আংশিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হিংসাশ্রয়ী দল হিসাবে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং মার্কস্‌বাদকে অবলম্বন করিয়া আরও কতিপয় পার্টি ধীরে ধীরে জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিয়াছে। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বহু কংগ্রেস-কর্মী ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন, ফলে কংগ্রেস অধিকতর দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়াছে। কংগ্রেসেরই অঙ্গ হইতে বাহির হইয়া এই সকল দল কংগ্রেসের বিরোধী শক্তিরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই অবস্থায় কায়েমীস্বার্থবাদী শক্তিগুলিও নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। তাহারাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কংগ্রেসকে পরাভূত করিয়া ক্ষমতা দখলের নেশায় রণে অবতীর্ণ। ভারতের পরিস্থিতি যখন এইরূপ, সারা ভারতে যখন একটা রাজনৈতিক অস্থিরতার ঢেউ চলিতেছে ঠিক সেই সময়ে ১৯৬৯ সনে আগষ্ট মাসে, কংগ্রেসের নিজের মধ্যেই যে তাহার মৃত্যুবীজ নিহিত ছিল, একটানে তাহার খোলস খুলিয়া দিয়া কংগ্রেস-নেতৃত্বকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য, কংগ্রেসের আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা দানের জন্য আপনার বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা দেশবাসীর সম্মুখে সৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আবার যেন একটা আশার আলো দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ঐ সময় হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় এক বৎসর কাল অতীত হইয়াছে। এই সময় মধ্যে ঐ আশার আলো উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর না হইয়া আবার যেন স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেন এমন হইল? কোন্ আভ্যন্তরীণ এবং বাহিরের কারণে এরূপ হইতে পারিতেছে? কিম্বা ইহার জন্য কি কোন আদর্শগত দুর্বলতা দায়ী?

১৯৪৬ সনে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্বাচনী ইস্তাহার সাব কমিটির সভায় আপনার পিতা অগ্রহরলালজী বলিয়াছিলেন যে, "ভারত এক নূতন ধরণের সমাজতন্ত্রবাদ উদ্ভাবন করিতেছে—যাহা কম্যুনিষ্ট অথবা ধনতন্ত্রী এই দুয়ের কোনও দেশেই দেখা যায় না। আমরা এই মধ্য পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। গোঁড়া সাম্যবাদ ও গোঁড়া ধনতন্ত্রবাদ এই দুইটীর যে কুফল আছে, আমাদের মধ্য পন্থা সেই কুফল হইতে মুক্ত থাকিবে"।—সেই মধ্যপন্থার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপ কি?—কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি গণতান্ত্রিক প্রথায় সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা। আজ ২০ বৎসর কাল ভারতবর্ষে যে গণতন্ত্র চলিতেছে উহা কি সত্যিকার কোনো গণতন্ত্র? বরং এই গণতন্ত্রের নামে ভারতবর্ষে যে বীভৎসতা চলিতেছে, দলে দলে খেয়োখেয়ি মিতি খেউর, তাহা দেখিয়া প্রতিটি সভ্য মানুষ লজ্জায় অধোবদন হইতেছে, সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রের উপরই আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছে। ধনতন্ত্রী দেশ ইংল্যাণ্ড, আমেরিকাতেও গণতন্ত্র আছে—সে সব দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের এমন কুৎসিত পরিণতি কি লক্ষ্য করা যায়? বোধ হয় না। কেননা সেসব দেশে দেশ বলিয়া, জাতি বলিয়া যে একটী শক্ত চেতনা তাহাদের আছে, তাহাই তাহাদের বহু ক্ষেত্রে রক্ষা করিতেছে। আমাদের দেশে কেন এমন হইল? গণতন্ত্রের মূলকথা ও প্রাণকথা হইতেছে জনগণের প্রত্যক্ষ সক্রিয় রাষ্ট্রীয় অধিকার ও কর্তব্য, কোন পরোক্ষ ও নিষ্ক্রিয় অধিকার ও কর্তব্য নয়। ভারতবর্ষে প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণের সে অধিকার কোথায়? সে কর্তব্যবোধ কোথায়? একমাত্র ভোট-দানের অধিকার ছাড়া আর কোন প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় অধিকার কি তাহার আছে? রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের দিকটা তো জন-চিত্ত হইতে দূরে সরিয়াই গিয়াছে। এই ভোটই বা সে কাহাকে দেয়। বাহির হইতে চাপান প্রতিনিধি হয় বাস্তবিক; এবং বাস্তবিক নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি হয় জন-শোষক। ভারতবর্ষে হইতেছেও তাহাই। ভোটপত্রটি ভোটবাক্সে ফেলিয়া দেওয়ার পর ভোটদাতার ৫ বৎসরের মধ্যে আর কোন মূল্যই থাকে না। প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রাণকথা হইতেছে প্রাপ্ত-বয়স্ক জনসাধারণ তাহার সত্তা চৈতন্য দিয়া প্রতিনিধি সৃষ্টি করিবে। জাতির প্রতিনিধি হইবে জাতির অঙ্গ নিংড়ানো-পুত্র, আত্মিকল-পুত্র, created from within—সেই প্রতিনিধির পক্ষেই শুধু সম্ভব জাতির রক্তের সঙ্গে

একান্ততার অনুভূতি এবং জাতির রক্তের সকল দাবী পূরণের জন্য আন্তরিক ভাবে সক্রিয় হওয়া। আজ ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রে কি আমরা সেই রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি? বাহির হইতে চাপান প্রতিনিধিগণ ভোট বাক্সের মধ্য দিয়া পাশ হইয়া গিয়াই সংসদে বা বিধান সভায় দল বাঁধিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ কিম্বা দলগত স্বার্থ চরিতার্থ করিতেছে। জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরে।

কংগ্রেস ভারতবর্ষকে ভারতীয় ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার স্বর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকালের সে উহা করিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিক্রিয়াস্বরূপ একদল লোক রাশিয়া বা চীনের finished product হইয়া অভারতীয় ছাঁচে ভারতকে গড়িবার স্বপ্নে বিভোর হইয়াছে। ইহারাও ঐতদেশিক বলিয়া পরবশী, সেই হেতু ভারতবর্ষের অন্তরের সকল চাহিদা পূরণ করিতে পারিবে না। কংগ্রেসের ব্যর্থতার সুযোগ লইয়া ইহারা সস্তা জনপ্রিয়তা কথার মারপ্যাঁচে ভুলাইয়া ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ইহারাও সকল ক্ষমতা ও সম্পদ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত-করণে বিশ্বাসী। ফলে প্রকৃতির নিয়মানুসারে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ও সম্পদ পরিণিষ্ঠানীয় জনসাধারণকে অধিকতর শোষণের মধ্যে নিক্ষেপ করিবেই। আর ক্ষমতা ও সম্পদ যতদিন কেন্দ্রীভূত থাকিবে ততদিন কাড়াকাড়ি দলাদলিরও শেষ হইবে না।

আমরা মুখে বলিয়া থাকি জনসাধারণই সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু কার্যে আমরা সকল ক্ষমতা সম্পদ শহর সৃষ্টি করিয়া, দল সৃষ্টি করিয়া, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্রে সমাবিষ্ট করিয়া শোষণকেই জিয়াইয়া রাখিতেছি। মনে পড়িতেছে মহাত্মাজী তাঁহার Young India পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"Our cities are not India. India lives in her seven and half lacs of villages (বর্তমানে পাকিস্থান সহ) and the cities live upon the villages..... the cities have co-operated with the latter in the bleeding process, that has done for the past two hundred years. It is my belief based on experience that India is daily growing poorer. The circulation about her feet and legs has almost stopped. And if we do not take care she will collapse altogether."

—"আমাদের শহরগুলিই ভারতবর্ষ নয়। ভারতবর্ষ বাস করে তাহার সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের অন্তরে এবং শহরগুলি বাঁচিয়া আছে গ্রামগুলিকেই খাইয়া পড়িয়া।..... শহরগুলি গ্রামের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছে রক্তমোক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া। এই রক্তমোক্ষণ গত ২০০ বৎসর যাবৎ চলিতেছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আমার এই বিশ্বাসই জন্মিয়াছে যে, ভারতবর্ষ দিনের পর দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। তাহার হাত পায়ের রক্তসঞ্চালন তিমিত হইয়া আসিতেছে। যদি এখনও আমরা সতর্ক না হই তবে সে একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে।"

কিন্তু পবিত্রাত্মার বিশ্ব জাতির জনকের এই সাবধান-বাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্ম স্পর্শ করিতে পারে নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কর্মই করিয়া আসিতেছি। গ্রামোন্নয়ন নামে মাত্র করিয়া নতুন নতুন শহর সৃষ্টি ও শহর উন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী স্তরে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করিতেছি। ফলে শোষণ ও বৈষম্য না কমিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইতেছে। শহর-সভ্যতায় ইহাই অনিবার্য পরিণতি। এই শহর-সভ্যতা শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি—"The bourgoeisie has subjected the country to the rule of the towns." –Manifesto of the Communist Party—Karl Marx and Frederick Engels। —রাজনৈতিক স্তরে, অর্থনৈতিক স্তরে, সামাজিক স্তরে এক কথায় সর্বক্ষেত্রে গ্রামের উন্নতি সাধন না করিয়া শহরের উন্নয়ন ও নতুন শহর সৃষ্টি করিব আর দেশের রক্ত-শোষণ বন্ধ করিব ইহা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। সভ্যতার মোড় শহর হইতে গ্রামের দিকে না ফিরাইতে

পারিলে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র সবই বৃথা হইয়া যাইতে বাধ্য।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ (রাধাপালের শরৎকুমার ঘোষ) তাঁহার সম্পাদিত "উদ্বোধন ভারত" মাসিক পত্রিকায় ১৯৪৮ সনে "পল্লী উন্নয়ন" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—"বড় বড় নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা পরস্পর-বিরোধী। নগর ও গ্রামকে সমান ভাবে উন্নয়ন করা একেবারেই অসম্ভব। নগরের উন্নয়ন করিতে গেলে বেচারা গ্রামকে শুকাইয়া মরিতেই হইবে। নগর-কেন্দ্র যতই পরিপুষ্ট হইবে, পারিপার্শ্বিক গ্রামগুলি ততই ক্ষীণ হইতে থাকিবে। গ্রাম-উন্নয়নে প্রয়োজন যদি বাড়াইয়াই যায়, তবে নগর-উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতেই হইবে; গ্রামকে পোষণ না করিয়া কে নগর বাঁচিতেই পারে না। নগরের উন্নতি যত দূর হইয়াছে তাহাতেই গ্রামের সর্বনাশ হইয়াছে প্রচুর। নগরের উন্নয়নে আরও হইলে কি গ্রামসমূহকে বাঁচানো চলিবে? গ্রামকে বাঁচাইতে হইলে নগরের প্রভাব প্রতিপত্তি কমাইতে হইবে, নগরকে গ্রামমুখী করিতে হইবে, গ্রামের বুকে ধীরে ধীরে সকল ঐশ্বর্য লইয়া ডুবিয়া যাইবার জন্য নগরকে প্রস্তুত করিতে হইবে, গ্রামের ভাবে নগরকে ভাবিত হইতে হইবে, গ্রামের সেবকরূপেই নগরকে তাহার অস্তিত্ব সার্থক করিতে হইবে। এতদিন নগর ছিল সামনে, গ্রাম ছিল পিছনে; এইবার গ্রামকে সামনে রাখিয়া নগরকেই পিছনে চলিতে হইবে। সভ্যতার ধারা না বদলাইলে তো ইহা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না।" "নগর হইতেছে গ্রামগুলির জমাট মূর্তি। নগরের যত উন্নয়ন, গ্রামের তত অধঃপতন। বিশ্বে এমন কোন শক্তিধর জাতি নাই যে গ্রাম ও নগর দুইয়েরই সমান ভাবে উন্নতি সাধনে সক্ষম হইবে। যাহারা গ্রাম ও নগরের সমান উন্নয়ন চাহিয়াছে তাহারা নিজের দেশ ছাড়িয়া পরের দেশ আত্মসাৎ করিতে ছুটিয়াছে। পাশ্চাত্যের দিকে চাহিলে তাহা স্পষ্ট ধরা পড়িবে।

বিকেন্দ্রীকরণের চিন্তা যখন ভারতবর্ষের মনের কোণেও স্থান পায় নাই...অজস্র দেশের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও নিষ্কাম দায়িত্ব সে গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাকে নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম-উন্নয়নের দিকেই সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে...। সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে অন্ন-বস্ত্র সসীম, ধনদৌলত সসীম, শক্তি সসীম। সসীমের রাজ্যে সমভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা চাহিলে সকলকেই ভোগে সীমাবদ্ধ হইতে হইবে। সসীমের দেশে অসীম ভোগাকাঙ্ক্ষা বিশ্বদ্রোহ। ভোগাকাঙ্ক্ষাকে অসীম করিতে হইলে অন্যের ভোগ কাড়িয়া লইতেই হইবে; কিন্তু তাহাতেও তো ভোগ অসীম হইবে না। সকলের মান-উন্নয়নই যথার্থ মান-উন্নয়ন। এই ভাবে মান-উন্নয়নে নগরের আপত্তি হইবে, কেন না উহাতে নগর-সৃষ্টির কোন চমকপ্রদ প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। নগরের পোষণ-প্রয়োজন সমূলে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার দিকেই থাকিবে সভ্যতার দৃষ্টি। সেই সভ্যতাই তত উচ্চ স্তরের, যে সভ্যতা যত সমসুখদুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত।..."

—ইন্দিরাজীর প্রতি আমাদের প্রত্যাশা আপনার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামী নেতৃত্ব ভারতবর্ষকে কি এই সভ্যতার দিকে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে? আমরা আপনার দিকে এই আশা লইয়াই তাকাইয়া থাকিব।

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা অতীব জটিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেরূপ আকার ধারণ করিয়েছে, তাহাতে আমাদের দৃষ্টি যতদূর চলে তাহাতে দেখিতে পাইতেছি, আগামী দিনে আপনার নেতৃত্বে কংগ্রেস ও উহার সমর্থক কয়েকটি দল একদিকে, যাহারা প্রচলিত গণতন্ত্র মিশ্র অর্থনীতি সহায়ে ভারতবর্ষকে গড়িতে বদ্ধপরিকর, আর একদিকে উহারই প্রতিপক্ষ শক্তিরূপে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী কমিউনিষ্ট পার্টি ও উহার সমভাবে ভাবিত কতকগুলি বামপন্থীদল এবং কায়েমী স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী দলগুলি সমাবিষ্ট হইবে, যাহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল-দ্বারা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তিকে কেন্দ্রে সংহত করিয়া সকল সমস্যার সমাধান চায়। এতগুলি বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া টিকিয়া থাকিতে হইলে উন্নততর নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই। বর্তমান প্রচলিত গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র উভয়ই অচল হইয়া

পড়িয়াছে। বিশ্ব-সমস্যার সমাধান দিয়া বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইহা যে আর সক্ষম নয়, তাহা গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দেশগুলির দিকে তাকাইলেই বুঝিতে কষ্ট হয় না। অথচ ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে একটা গণতন্ত্রের ঐতিহ্যও রহিয়াছে, তাই তাহার নিকট কোন একনায়কতন্ত্রও কাম্য নয়। সমাজতন্ত্রীকরণ বলিতেই বা আমরা কি বুঝি? উহা যদি রাষ্ট্রীয়করণ ছাড়া অন্য কিছু না হয় তবে উহাও তো আমলাতন্ত্রীকরণেই পর্যবসিত হইতে বাধ্য, এবং হইতেছেও তাহাই। আমরা গত ২২ বছর হইল মিশ্র অর্থনীতির পথ বাহিয়া চলিয়াছি। আশা করিয়াছিলাম প্রাইভেট সেকটর সংযত রাখিবে পাবলিক সেকটরকে, পাবলিক সেকটর সংযত রাখিবে প্রাইভেট সেকটরকে; কিন্তু তাহা হয় নাই। এই অসাফল্যের মূলে রহিয়াছে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রযন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং এই দুর্বলতা আজও বিদ্যমান। ইহাকে চালিয়া সাজাইতে হইলে তো কোন জোড়াতালি দিয়া উহা সম্ভব নয়। বাস্তব অবস্থা যেখানে অতি জটিল সেখানে উন্নততর কোন আদর্শধারাই উহাকে আয়ত্তে আনিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আর কোন ম্যাজিক-পথ নাই। বিরুদ্ধ শক্তিকে হতবল করারও উহাই পথ। আইডিওলজিকে উন্নততর আইডিয়লজিই মোকাবিলা করিতে পারে। যে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি মার্ক্সবাদকে সম্মুখে রাখিয়া মানুষের প্রয়োজন-বোধের সুযোগ লইয়া শ্রেণী-সংগ্রামের পথে ক্ষমতা-দখল করিতে চাহিতেছে, তাহারাও বুর্জোয়াদের পথের অনুসরণ করিয়া সর্ব-ক্ষেত্রে centralisation, কেন্দ্রিকরণই চাহিতেছে। বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্যই এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল, গণতন্ত্রের অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও কেন্দ্রীভূত শক্তি মাত্রাছাড়া হওয়ার ফলে পুরাণো সমাজের সর্ব স্তরে দম ওলট পালট হইয়াছে এবং তাহারই বুক চিঁড়িয়া প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মার্কসবাদের জন্মরূপে আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। মার্কসবাদ তাই চাহিয়াছে, শোষণের মূল কারণ এই অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকারকে উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থলে তথাকথিত সমষ্টিবাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে এবং উহা করিতে যাইয়া তাহারাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার কথা বলিয়াছে। শক্তি মাত্রই বিশ্বের, বিশ্বের প্রতিটি মানুষের ইহাই প্রকৃতি-বিজ্ঞান। প্রকৃতির এই তত্ত্বকে না জানিয়া আসক্তি বা বিদ্বেষবশতঃ সেই শক্তিকে আত্মসাৎ করিতে গেলে বিস্ফোরণ উপস্থিত হইবেই আর তাই দেখিতেছি অবাধ স্বাধীনতার বা গণতন্ত্রী দেশেও যেমন বিস্ফোরণ তেমনই সর্বহারার একনায়কতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রী দেশেও তেমনই বিস্ফোরণ। শান্তি আজ কোথায়ও নাই।

বিশ্ব-পরিস্থিতি তথা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি যখন এইরূপ তখন জওহরলালজীর মধ্য-পন্থা কি হইতে পারে?

ভারতবাসী এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা চায় যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য বজায় থাকিবে অথচ কোন শোষণ বা পেষণ থাকিবে না। ইহা পাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে? কেন্দ্রীয়করণ পদ্ধতি যে নিশ্চয়ই নয় ইহা আজ সুপ্রমাণিত। শক্তি সে ধন-শক্তিই হউক, শ্রম-শক্তি হউক আর রাষ্ট্র-শক্তি হউক উহা সমাজ-দেহে এক স্থানে জমাট বাঁধিলে উহা যে অপর অঙ্গ সমূহে শোষণ ও বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে এ তত্ত্ব তৎকালে মানব-প্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও কার্ল মার্ক্সের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। ইতিহাসের পথ বাহিয়া আসিয়া এ সত্য আজ সুপরিস্ফুট হইয়াছে। মানুষের স্বভাবে বৃহৎকে পাওয়ার লোভ চিরন্তন। জমাট-বাঁধা বৃহৎ ধনশক্তি রাষ্ট্র-শক্তিকে অধিকার করার জন্য তাই তাহার চিরকালের কাড়াকাড়ি। ইহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে এই শক্তিকেন্দ্রগুলিকে যাহাদের সম্পদ অর্থাৎ সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিতে হইবে। বস্তু মাত্রই বিশ্বের, বিশ্বের সকলের, যা দেবী-সর্বভূতেষু। ইহার অন্যথাই অশান্তি। ভারতবর্ষের মানুষের নিকট এ তত্ত্ব অজানাও নয়, তাহার রুচি ও স্বভাব-বিরুদ্ধও নয়, সাময়িক ভাবে ভুলিয়া গিয়াছে মাত্র। ইহাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এ জন্য প্রয়োজন এমন একটি ভাবধারার অবলম্বন যাহার মধ্যে ব্যক্তি-সাধনা ও সমষ্টি সাধনার সমমূল্য স্বীকৃত হইবে, যাহার মধ্যে আমার অধিকার ও ভোগ এবং সকলের অধিকার ও ভোগ সমান মর্যাদা লাভ করিবে, ধনিক ধনিক থাকিয়াই শ্রমিক হইবে,

শ্রমিক শ্রমিক থাকিয়াও ধনিক হইবে, ধনিক শ্রমিক পরস্পর মিলিয়া মিলিয়া দেশ-সেবা বিশ্ব-সেবা করিবে। এ জন্য প্রয়োজন কিছু সংখ্যক ত্যাগী সাধক কর্মী যাঁহারা ঐ ভাবধারা নিজ জীবনে আচরণ করিয়া দেশময় একটা প্রবল প্রচার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিবে। এ জন্য micro-scopic minority হওয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"-এর পথে অগ্রসর হইতে পারিলে জয় অবশ্যম্ভাবী। এখন তো দেশে ইহার বিপরীত অবস্থাই চলিতেছে।

আমাদের শাসন-তন্ত্র রচনার সময়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রূপ-বর্ণনায় জওহরলালজীর অনুপ্রেরণায় Co-operative Commonwealth শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। গান্ধীজির নিকট হইতে পঞ্চায়েত রাজের কথাও আমরা জানিয়াছি। পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্তনের একটা ব্যর্থ-মাত্র উদ্যোগ নেওয়াও হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমতা-লোলুপতা সব উদ্যোগকেই পণ্ড করিয়াছে। আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন পঞ্চায়েত প্রথার মধ্য দিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সর্ব্ব সাধারণের হাতে তুলিয়া দেওয়া ও সমবায় প্রথার মাধ্যমে কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রবর্ত্তনের আশু নীতি বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করা। যে সকল শিল্প ও বাণিজ্য ব্যাপকতা ও গভীরতায় অতি বৃহৎ তাহাই শুধু কেন্দ্রের হাতে রাখিয়া আর সব কিছু বিকেন্দ্রীকরণের পথেই অভিপ্সীত শান্তি আসিতে পারে। কেবল এই পথেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, শ্রেণী-সংঘর্ষ, শোষণ, কুঁইকোর রাজনীতিকের চাতুরী বন্ধ হইতে পারে। জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে যে অবাঞ্ছিত ব্যবধান রহিয়াছে, পৃথক সত্তা-বোধ রহিয়াছে এই ভাব দূর হইয়া সরকার ও জনসাধারণ একাকার হইয়া সেবা বুদ্ধি লইয়া সামগ্রিক চেতনার পথে দেশ গঠন, ও সকল সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে ইহাই আমরা বিশ্বাস করি এই পরিচিতি আদর্শের মধ্যেই মহামতি কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল সত্য ও ভারতীয় ভাবাদর্শের মূল লক্ষ্য সেবাবুদ্ধি হৃদয় হইয়া গিয়া ভারতের বাস্তব রূপ প্রকাশিত হইতে পারে। এই পথেই শুধু কমিউনিজমের এই গ্রাসের রোধ করা যাইতে পারে। প্রাণ-প্রচুর কৃষি-সভ্যতার প্রবর্ত্তন ছাড়া আর কোন পথ নাই। ভারতবর্ষ আপনার দিকে তাকাইয়া আছে। যে ভাবস্থ শক্তি আপনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে উহাই ভারতবর্ষের সভ্যতার মোড় ঘুরাইয়া দিয়া বাঞ্ছিত মুক্তি আনয়ন করিতে পারিবে এই প্রত্যাশা কি আমরা করিতে পারি না? নচেৎ কমিউনিজম্ অথবা কায়েমী স্বার্থপরতা যে ভারতবর্ষকে গভীর সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে ইহা নিশ্চিত। এখনও সময় একেবারে শেষ হইয়া যায় নাই। কৃষি শিল্প বাণিজ্যকে রাষ্ট্রীয়করণের পরিবর্ত্তে সমবায় প্রথায় রূপান্তরিত করার জন্য উপযুক্ত ও আদর্শ আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্র-যন্ত্রের বেশীর ভাগ বিভাগের কর্তৃত্বক্ষমতাকে পঞ্চায়েতের হাতে সমর্পণ করার জন্য যথোপযুক্ত আইন রচনা করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব উহা কার্য্যে রূপদানের জন্য সংসদের ভিতরে ও বাহিরে একটা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারা যায়, তবেই সমূহ বিনষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। Centre is every-where, circumference is nowhere. এই কর্ম্মোদ্যোগে যদি বিরোধীতা আসে তবেও মঙ্গল, আর আনুকূল্য পাইলে তো তাহার চাইতে আনন্দের বিষয় আর কিছুই নাই। আমরা আপনার নিকট কি এতখানি আশা করিতে পারি না? শ্রীভগবান আপনার সহায় হউন। বন্দেমাতরম্

শ্রীপার্ব্বতীনাথ বিশ্বাস

শ্রীবেণু মিশ্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাঙুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

কর্ম-কৌলীন্যের স্থান গীতায় নাই। এক কর্ম বা এক অকর্মবাদ স্থাপন করাই কৌলীন্য। কোন একটীর উপর জোর দিলেই অপরগুলি হয় অকুলীন। কৃষ্ণ-সাহিত্যে গায়ত্রী-জপ ও মুচির জুতা সেলাই দুই-ই ভজন যখন দুই-ই 'অর্পিত' হইয়া 'কৃত'। মুচির জুতা সেলাই যদি গায়ত্রী জপের সঙ্গে, কোনও কিছু না করার সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হয়, একান্ত গায়ত্রী জপ বা একান্ত অকর্মে মুক্তি আনিবে না। তাই তো চাই প্রতি কর্মীকে সর্ব কর্মী হইবার জন্য সর্ব-কর্ম হীনতার সমন্বয়েই প্রাণপণ যত্ন করা। কর্ম-পরিপাটির জন্য অবশ্য বাইরের একটা কর্ম-বিভাগ থাকিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রতি বিভাগের কর্মীর সহিত, কর্ম-প্রণালীর সহিত রীতিমত হাতে কলমে পরিচিত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যে কোন অফিসে সব অফিসারদেরই সব কর্ম শিখিয়া রাখা দরকার যদিও শৃঙ্খলার সময় তাঁহারা যার যার স্বতন্ত্র বিভাগেই কাজ করেন। বিশৃঙ্খলার দিনে তো কর্ম-বাটোয়ারা, বর্ণ-বাটোয়ারা, আশ্রম-বাটোয়ারা চলে না; তখন যে সকলের ক্ষেত্রেই সকলের দাঁড়াইবার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। বিনিময় ছাড়া যে তখন সব অচল। শাস্ত্র-সমন্বয় করিয়াই গীতা যোগ-শাস্ত্র, বিনিময়-শাস্ত্র।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। যেখানে কাজ যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। পৃথিবীকে একত্র করিয়া সমবায় গড়িবার যে সংবাদ আছে নীচের ইংরাজিতে।

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করিয়া বিপ্লবী হইতে পারে, কি করিয়া সে দুঃখীর দুঃখ দূর করার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হইতে পারে, তার সোজা সরল নীতির কথা।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১। ব্রহ্মসূত্র (অখণ্ড ভাষ্য)	
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১'০০
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮'০০
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৬'০০
২। ঈশোপনিষৎ	২'০০
৩। কেনোপনিষৎ	১'০০
৪। কঠোপনিষৎ	৩'০০
৫। প্রশ্নোপনিষৎ	১'৫০
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ	১'৭৫
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	২'৭৫
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	৩'৫০
মুণ্ডকোপনিষৎ	
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে	৩'০০
১০ স্বরাজের পূর্বরূপ	০৬০
১১। গীতাজয়ন্তী	০'০৬
১২। উজ্জলকায়ত (পুস্তিকা)	০'৫০
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	৩'০০
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২'৫০

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ	২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি	

প্রতিভা রায়ের

১। নারী-প্রগতির ভ্রান্তকথা	১'২৫
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিক্ষা সম্বন্ধে কথা	০'৬১
৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫'০০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সমবয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	০'৬২
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২'০০
৩। শরৎচন্দ্রের দেবদাস	৩'০০
৪। রবীন্দ্র-স্মরণ	৫'০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা	৪'০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া—দেশবন্ধুনগর) ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য [সমন্বয়]। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"এই বিশ্বই আমার মা

ই বিশ্বনাগরিক"

যে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আজও কোন কিছুর অপেক্ষা না করে ধর্ম্মের সাধনায় সন্ন্যাসী সাজতে পারে, সেখানে কি বিশ্বরূপী ধর্ম্মের পরিবার-সাধনা, সমাজ-সাধনা বা জাতি-সাধনার জন্য কয়েক হাজার সন্ন্যাসী কর্ম্মীও মিলতে পারত না? মিলবে কি করে? দেশ-সেবার গোড়াতেই ত কর্ম্মীদের সুখ-সুবিধার কথা ভাবতে শিখান হচ্ছে। ধর্ম্ম-সাধনায় ত খাওয়া-পরার জন্য কেউ দায়ী নন্। নেংটী পর, জোটে খাও, না জোটে উপবাস কর, তবে ত ভগবান মিলবে। দেশ-সেবকদের জন্য দেশ দায়ী, সেবকদের ইহাই ধারণা। এই ধারণা যেদিন উল্‌টে যাবে, সেদিন কারোও অপেক্ষা না করে, অনাহার অনিদ্রায় সেবা করবার লোভও জাগবে, কর্ম্মীও মিলবে। সন্ন্যাসী মেলে অথচ কর্ম্মী মেলে না—এর কারণ যে, সন্ন্যাসীর উপাস্য যেমন বিপ্লবের দেবতা, উপাসনাও তেমনি বিপ্লবের; আর কর্ম্মীদের উপাস্য বটে বিপ্লব কিন্তু তারা পন্থাটী চাচ্ছে ঠিক বিষয়ীদের মত আরামের। এ যাবৎ তাই কোন সঙ্ঘ দাঁড়ায়নি; দাঁড়াবেও না, যে পর্য্যন্ত কর্ম্মীবৃন্দ খাওয়া-পরায়, শোয়া-বসায় সন্ন্যাস গ্রহণ করতে না পারবে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

"দার্শনিকবৃন্দ প্রত্যেকে যে যাহার মতবাদ দ্বারা বিশ্বের সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যান দিতে গিয়া ব্যর্থ হন। একজন দার্শনিকের মতবাদ যে সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যান দিতে সমর্থ, অন্য অন্য মতবাদও যে কতগুলি ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়াই মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার নিজ মতবাদকে অন্যান্য মতবাদগুলির সঙ্গে সমন্বয় বিধান করিয়া একটী ব্যাপকতর মতবাদের খোঁজ করাই যে উচিত ছিল, প্রকৃতি ও ব্রহ্মের সমন্বয় করিলে তিনি ইহা বুঝিতে সক্ষম হইতেন। এই সমন্বয় অখণ্ড জ্ঞানে নিছক ব্রহ্মগত, খণ্ড জ্ঞানে প্রকৃতিগত। কোনও একটী খণ্ড মতবাদের মধ্যে বিশ্বের সব ঘটনার ব্যাখ্যান পাইবার চেষ্টারূপ কুৎসপ্রসক্তির ফল দাঁড়ায় এই যে, তখন গোঁজামিল দিয়া কোনও রকমে কোনও একটি মতবাদ দ্বারাই সব ঘটনার ব্যাখ্যা দিবার একটি উন্মাদ প্রচেষ্টা ফুটিয়া উঠে, এবং তখনই ছলের প্রশ্রয় নিতে হয়, যাহার ফলে প্রতি খণ্ড অবয়বও ছাড়া হইয়া দাঁড়ায়, অবয়বহীন হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্ম-প্রকৃতির সমন্বয় হইলে প্রকৃতির প্রতি খণ্ড 'অবয়ব'ই হইত স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংমূল্যযুক্ত; এবং এই স্বয়ম্পূর্ণ অবয়বগুলির অন্যোন্য মৈথুনেই হইত সত্য বাস্তব নিরবয়ব-প্রতিষ্ঠা অবয়ব।

ব্রহ্ম ঢং (technique) মাত্র; এই ঢং বরণ করিলেই প্রতি অবয়ব হয় স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংমূল্যবান, এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম-ঢং-যুক্ত এই একমেবাদ্বিতীয় অবয়বগুলি সংহত হইয়াই নিরবয়ব সর্ব্বাবয়ব পুরুষোত্তম-বিশ্ব গড়িয়া তোলে। যখন কিছুর উপলব্ধি হয়, তখন কোনও একটী অবয়বেরই উপলব্ধি হয়; কিন্তু ব্রহ্ম-ভাবের ভাবুক তো কোন একটীর মাঝেই আটকাইয়া পড়িবেন না। উপাসক প্রতি অবয়বকে সেই সেই অবয়বের বিশিষ্ট মাধুর্য্যে আস্বাদন করিয়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের আস্বাদনের জন্য অনন্ত কাল ছুটিতে থাকেন। 'নিরবয়ব' হওয়া একটি static গুণ নহে, উহা যে মহা dynamic force"।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ, ব্রহ্মসূত্র

উজ্জ্বলভারত সূচীপত্র, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৭, ১৯৭০

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৮৩) — ১২৯
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

২। ইরাবতীর তীরে — ১৩২
শ্রীবিভা সরকার

৩। সভ্যতার রথযাত্রা (কবিতা) — ১৩৬
শ্রীকৃষ্ণদাস সাহা

৪। পারিবারিক জীবন-আলোচনা (৫) — ১৩৭
ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। শ্রীকৃষ্ণের পর-সত্তা — ১৪৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

৬। মুর্শিদাবাদের বারাণসী — ১৪৩
শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ

৭। ভক্ত-ভগবান (কবিতা) — ১৪১
শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী

৮। সমাবর্ত্তন-ভাষণ — ১৪২
শ্রীকণিকা মুখোপাধ্যায়

৯। সিদ্ধান্ত দর্শন—শ্রীশ্রীনিতাগোপাল — ১৪৫

১০। সাময়িকী—আমাদের কি করিতে হইবে — ১৬৩

আসুন... ইউবিআইতেই সঞ্চয় করুন

- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের বার্ষিক সুদ পাবেন সেভিংস অ্যাকাউন্টে শতকরা ৫½ টাকা, মেয়াদী আমানতে সর্বোচ্চ শতকরা ৭ টাকা।
- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের ফলে ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে আপনার টাকা খরচ করতে পারবেন।
- ইউবিআইতে আপনার ও আরও অনেকের সঞ্চয় একত্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পে, কৃষিতে, রপ্তানীর জন্যে, আর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্যে সরকারকে আরও অর্থ ও বেশী ঋণ দিয়ে দেশের আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করবে।

ইউবিআই

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

হেড অফিস ৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

UBI-Bn-68

বাটার শো-উইন্ডোর আড়ালে

বাটার দোকানের যে উইন্ডোই আপনাকে আকৃষ্ট করবে। প্রত্যেকটিই অপূর্ব সুন্দরী হবেন এক সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গিতে। চোখের সামনে ভেসে উঠবে সারিসারি আকাশচুম্বী বাড়ি, মাঝ দিয়ে সুন্দর ঝিকঝিকে রাস্তা, যেন সবাই এক্ষুনি সে শো-উইন্ডো থেকে বেরিয়ে এলেন।

কি-ভাবে, কী-ভাবে শো-উইন্ডোর আড়ালে? আসুন তার উত্তর এবং তারও কিছু বেশি খুঁজি।

আজ ২২,০০০ নিপুণ কর্মীর এক কর্মঠ বাহিনী, অত্যাধুনিক কারখানা এবং আধুনিক ব-দেশীয় প্রযুক্তি তৈরি করে ২,০০,০০০ জোড়া ছিমছাম জুতো। আধুনিক ও প্রতিযোগিতা সু-এনজিনিয়ারিং এবং এই উৎপাদন-ব্যবস্থাও প্রতি জোড়া জুতোই শিল্পীকারিগরের বাস্তিগত প্রযত্নের সুস্পষ্ট সাক্ষী।

অন্যত্র : আছে ১১০০টি বাটার দোকান ও এজেন্সি, আছে ৪৩০টি বি. এস. সি. পাইলিবি বিক্রয়কেন্দ্র, ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটর—আছে দোকানে-দোকানে বিক্রয়কর্মীদের সাগ্রহ কুশলী হাত—উনুকে পথে-পথে তারা পৌঁছে দেন আপনাই জুতো।

শুধু যাঁরা কর্মীদের বসবাসের জন্য গড়ে উঠেছে আধুনিক ও সুপরিকল্পিত উপনগর। তারা যে কেবল আপনার জন্যই জুতো তৈরি করেন তা নয়—সারা অঞ্চলেই, এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতেও, তাঁদের জুতোর চাহিদা বছরে এই খাতে তৈরি হয় ১০,০০,০০০ জোড়া জুতো।

এই পরিচয় তাৎক্ষণিক।

ভবিষ্যতে যাতে বিশ্বজগতে বাটার উদ্যোগ সম্বন্ধে বলবার ইচ্ছে হয়েছে। আমাদের—আশা করি আবার দেখা হবে।

Bata

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০
ভারত আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৫·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ বি. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	১·৫০
বিদ্যাসাগর	২·১৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
বাংলার ঋষি	৩·৫০
বাংলার বিপ্লবী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	১·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·৫০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

উদ্বোধন

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭০ ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৮৪)

…কলিযুগে সমস্ত দিকে এমন দুর্দশা যার জন্য অনুশোচনা করতে হয়—যীশুখ্রীষ্ট এক জায়গায় বলেছিলেন, 'I shall set husband against wife, wife against husband—এখন তাই-ই চলছে—সকলের সব ধর্ম fail করেছিল তখন একমাত্র তরসা কৃষ্ণের অবতরণ…' আজও সব ধর্ম fail করেছে—আজ একমাত্র তরসা নিতাগোপাল।…সংসারী একান্তভাবে সংসারী হতে চেয়েছিল বলে ব্যর্থ, সন্ন্যাসী একান্তভাবে সন্ন্যাসী হতে চেয়ে ব্যর্থ…জগন্নাথ নিতাগোপাল—সন্ন্যাস সংসারের দ্বন্দ্বের এই অন্ধকারে তোমার আলো জ্বালাও। কর্মী জ্ঞানী হোক, জ্ঞানী কর্মী হোক…এই সামগ্রিকতার মধ্যেই ধরার ধূলি ব্রহ্ম-ধূলি হবে, ধরার মানুষ ব্রহ্ম-মানুষ হবে…। আমার মত ক্ষুদ্রের নিকটে তুমি এতবড় গুরুতর অপূর্ব তত্ত্ব কেন নিয়ে এলে? এ আমি কার কাছে কব?…এত ক্ষুদ্র পল্লীর প্রান্তে বসে মানুষকে বিশ্বরূপ হতে বলার কথা কে শুনবে?…বিশ্বরূপ পিতা, বিশ্বরূপ স্বামী, বিশ্বরূপ প্রতিটি মানুষ…।

১৩. ৩. ৫৭। ভারতীয় সভ্যতা এতদিন পর্যন্ত যে ভাবে চলে এসেছে তাতে আমরা ছোটকে ডিঙিয়ে বড় হতে চেয়েছি…ছোটর মূল্য বুঝি নাই—ছোট যা কিছু তা অস্বীকার করেছি—ছোট মানুষকে ছোটলোক বলেছি, ছোট জাতিকে ঘৃণা করে অস্পৃশ্য করে রেখেছি, ছোট খাবার দ্রব্য ইত্যাদি আমরা অনাদর করেছি।…নিতাগোপাল ছোটর মূল্য দিয়েছেন… তিনি বলেন, সত্যিকারের যে বড় সে ছোটতেও বড়, বড়তেও বড়।…হুগলীমঠে একবার তিনি দুর্বাঘাসকে শুকিয়ে রেখে দিলেন…সে বারে এত বড় ধর্মা হল যে সেই ঘাস দিয়ে রান্না করতে হয়েছিল…। ছোটকে অনাদর করতে করতে একটা জাতি কি অধঃপাতেই যে নেমে গেছে তা সে বুঝতেও পারে না।…ছোটর প্রতি যে অনাদরের দুই হাজার বৎসর দাঁড়িয়ে আছে।…ছোটই তো আমাদের সত্যকার স্থিতি।…ছোট ব্রহ্ম…ছোটত্বকে যে ব্রহ্ম বলে বুঝেছে—সে মায়ামুক্ত হ'ল।…কাপড় পরতে গেলেই চোগাচাপকান চায়…বড়র প্রতি নেশাটা জীবন্ত—শিব ছোটর ঠাকুর…ছাই মাখেন।…বৃন্দাবনের সেই মানুষটী নিজেকে সাজাবার জন্য ময়ূর পাখা ধারণ করেন…ছোটকে যে ব্রহ্ম বলে ধারণ করলেন, তিনিই বড়।…বিদ্যাসাগর ছোট মুদিওয়ালীকে কত নিজ বলে মনে করতেন।…ছোটকে যে আদর করতে পারল না, তার কাছে বিশ্বের রহস্য অপ্রকাশিত রইল। বাজারের এক আনার হিসাব দিতে না পারায় জন্য নিতাগোপাল কালীর উপর চটে গেলেন। …ভিখারীকে দিত দিত, কিন্তু হিসাব দিতে পারবে না কেন?…অনেকদিন গেছে হিসাব করি নি…আজ দুঃখ

হয়! ঠকাবে না, ঠকবে না—এই হচ্ছে পুরুষোত্তম-নীতি। ...সব দিকে তাঁর স্পর্শ লাভ করবার জন্য জীবন বড় আকুল.... আমাদের দেশের মনোবৃত্তি হল—একটা পয়সার গ্রাহ্যই নাই...পয়সার যখন বাপ-মা নাই...তেমন একটা বড় লোকের মেজাজ...এ মেজাজ সর্বনাশের মূল। ...মাটিতে দু হাত জায়গায় পা দুটো দাঁড়িয়ে থাকে—আকাশে মাথা থাকুক। সেই দুই হাত জায়গার উপযুক্ত মূল্য দিতে পার কি না বেবে দেখো।...ছোটকে ধর, ছোটকে ধরতে না পারলে সমাজের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।...যত বাইরের দৃষ্টি আসবে, তত অন্তর কমবে। দুই দিক সমান তালে চালাতে হবে। ...যত দালান কোঠা হবে, তত পুরুষোত্তমের কবর তৈরী হবে।...আমাকে রক্ষা করবার জন্য সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একটা চেষ্টা চলছে—শিবানী বিড়ালীর বাচ্চাকে রক্ষা করবার জন্য যেমন আমাদের সকলের চেষ্টা—তেমনি একটা মহাপ্রাণ আমাদের সকলকে রক্ষা করছেন। ...বিশ্বাস কর একথা—না হলে সুস্থ হতে পারবে না—অহং-চিন্তা না গেলে সুস্থতা নেই।...নিত্যগোপালকে বিশ্বাস কর... তিনি রক্ষা করবেন। ওরে পুরুষোত্তমানন্দ, তিনি মায়ের মত সারা জীবন রক্ষা করেছেন, নইলে তখনো পাতার মত কোথায় ভেসে যেতি...। বলেছিলেন নিত্যগোপাল, "না, তোমার আমার প্রতি অবিশ্বাস হবে না।"

১৫. ৩. ৫১ (দোলপূর্ণিমার আগের দিন)—কাল দোল—শ্রীরাধা গোবিন্দের দোল—কাল মহাপ্রভুর শুভজন্ম—গত বৎসর আগামী কালের এই দিনে শ্রীনিত্যগোপালকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করি। আজ পূর্ববঙ্গে বুড়ীর ঘর পোড়ান বলে একটা ঘটনা আছে—ওটাকে এদেশে বলে মেড়া পোড়ান। এ কাজের কি উদ্দেশ্য তাঁরাই জানেন। ...আমার মনে হয় খুব সম্ভব এর অর্থ এই যে—বুড়ী হলেন অনাদি অবিদ্যা—অবিদ্যার ঘর না পোড়ালে জীবনে দোল হয় না—বুড়ীর ঘরে প্রথমে রাধাগোবিন্দের পূজা করে তারপরে পোড়াতে হয়।...গীতার শ্লোক

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—এই শ্লোকের তাৎপর্য—গুণ=দড়ি—সত্ত্বরজঃতমঃ তিন দড়ি দিয়ে মানুষ বাঁধা—তিন দড়ির হস্তপদ বন্ধনে তুমি বদ্ধ...অহংকার নিয়ে তুমি মায়া অতিক্রম করতে পারবে না।...ঘটনাগুলি সমস্যা রূপে আসে, সমাধান হল মায়া অতিক্রম.....মানুষে বলে জন্মমৃত্যুর এপার ওপার...। অহংকার নিয়ে তোমার দেহ থেকে, পরিবার থেকে যত সমস্যা উঠে থাকে—সে সবের সমাধান করতে পারবে না।.....মায়ার সঙ্গে ব্রহ্মের যোগ—যোগমায়া।.....ভগবানের মায়ায় ভগবানকে তো বিব্রাক্ত করতে পারে না।.....সাপের বিষে তো সাপ মরে না।...কৃষ্ণ বলেছেন—মায়ার সকল স্পর্শকে মেখেও তো আমি মায়াতীত,...আমার কাছে দেখ মায়াকে অতিক্রম করতে হয় কি করে?...সব নিয়েও তো আমি পরব্রহ্ম..আমি যোগমায়াকে গায়ে মেখে এসেছি...। দুটো দিককে সমান ভাবে চালালে অনেক ঘটনাই মানুষের কাছে ধরাই পড়ে না..। চরকা ঘুরতে ঘুরতে রাধা রাধা বলি—রাধারাণী বলতে বলতে সমাজ-সমস্যা বলি...মানুষ খেই পায় না—বুঝে উঠতে পারে না—এক হরষের ছলে বুঝত...। গোবিন্দ বিরাট সংসার চালাচ্ছেন ...বৃন্দাবনে সব কিছু নিয়েও মাধব কিছুতেই আটকে যান নি, তাই ধরাও পড়েন নি...। এগিয়ে গেলেন অগ্রগামী পুরুষ...। যেখানে পুরুষ প্রকৃতি এক, তিনিই গৌরাঙ্গ। ...মায়াসৃষ্টি আর যোগমায়া-সৃষ্টির তফাৎ বুঝতে হবে—নিজের আমিকে দিয়ে যখন সব কিছু দেখি এবং সেইটেকেই একান্ত বলে বুঝি তখন তা মায়াসৃষ্টি। আর অপরকে তার যথার্থ মূল্যে ও মানে যখন স্বীকৃতি দিতে পারি অথচ আমার সঙ্গে তাকে এক করে জানি—তখন সেটা যোগমায়া-সৃষ্টি।.. তাড়াটে বাড়ী আর নিজের বাড়ী—স্ত্রীপুত্রকন্যাবিত্তসম্পদ তাঁরই জন—আমি সেবা করে আনন্দ পাই—এটা তাড়াটে বাড়ীতে থাকি।...আর যখন স্ত্রীপুত্রকন্যাবিত্ত সব আমারই—আমিরই প্রকাশ...তখনই বিপদ, তখনই দুঃখ। সবলেই আমি আমি বলে—সে তো ভগবানের আমিকেই আমি বলে...সবলে একটা আমির কথা বলে...সবলের আমিকে পেলেই বিশ্বনাগরিক সার্বজনীন আমির খোঁজ পাওয়া যাবে...সবলে

যে আমিকে আমি বলে, সেই common factor আমিকে পেতে হবে...নিজকে চিনতে হলে নিজেরও যিনি নিজ তাঁকে পেতে হবে, জানতে হবে...যাঁর আমি থেকে আমার আমি সেই আমিকে পেতে হবে...সেই আমি নিত্যগোপাল, সেই আমিকে লক্ষ্য করেই থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীতে 'ওগো আমার আমি' বলে চীৎকার করে সে কি আমার কান্না!...হলন্তন্ধ মানুষ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে এইভাবে আস্বাদন করতে দেখে। এর থেকে উপনিষদের গূঢ় কথা আর কিছু নেই।...মায়াবুড়ী পুড়ে গিয়ে যেদিন যোগমায়া আমি থাকবে..তখনই দোল হবে...। ব্রহ্ম-আমি হল সেই মুদ্রা—যা দিয়ে barter system চলে...। আমিকে চেন...তাঁর আমির মধ্যে নিজের আমিকে বিসর্জন দেও—তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতম্।...তাঁকে না জানলে তাঁকে জানতে পারবে না—বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরীর মধ্য দিয়ে গিয়ে সংসারকে পাবে—আগে ভগবান, তারপর সংসার।...তখন এ সংসার লীলা—নয়তো এ সব বন্ধন।...সে মায়াবুড়ী পুড়ে গেলেই আর বার্ধক্য থাকবে না—তখন কিশোর কিশোরীর চিরন্তন খেললীলা...,সমাজের সকল স্তরের সঙ্গে সকল স্তরের রস-আলাপন...। গান—কাঙাল বলে দিবে না কি দেখা? দারুণ সংসারের আঁচে হৃদয় আমার শুকিয়েছে কঠিন ভুঁয়ে এ হৃদয়ে তোমার পদচিহ্ন আছে আঁকা।...জীবনাথ, জীবন পাষাণ হয়ে গেলেও বিষ্ণু-পাদপদ্ম আজও আঁকা আছে...। নিত্যগোপাল—জীবনে কত ঘটনা আছে! যেদিন এই বুকে তোমার পদচিহ্ন আঁকা পড়েছে সেদিন থেকে কত জটিল ঘটনা...তোমার সেই পদচিহ্ন আমার থাকবে।...পদাঙ্কিত তোমার পাদস্পর্শ নিয়ে আমি সংসার-জীবনে প্রবেশ করব...জগন্নাথ নিত্যগোপাল, সমস্ত সংসার শুকিয়ে গেছে—এই শুকিয়ে যাওয়া বিষে তুমি রস-সিঞ্চন কর।

১৬।৩।৫৭। কষ্টের মধ্য দিয়ে পথ চলবার কৌশল শিখিয়ে ভাগবত গুরু—সেইজন্য ভাগবত আমাদের মত মানুষদের শাস্ত্র। যখন চতুর্দিকে অসহায় অবস্থা—তখনকার শাস্ত্র ভাগবত। ভাগবত তাই কলিযুগের শাস্ত্র।...দুইটি বিশেষণ লক্ষ্য করবার—স্বয়ং ও ধাম্না যেন সদা নিয়ন্ত্র কুহকম্।...নিজের বুকের আলো দিয়ে পথ চলব—আমার অন্তরের দীপ্তিময় দেবতাকে যদি উজ্জীবিত করতে না পারি তবে কেউ আমাকে আলো দিতে পারবে না।...নিজের ধাম—জ্যোতি বা স্থিতি দিয়ে কুহককে নিরস্ত করতে হবে।...কুহকের সঙ্গে বিবাদ করে বা অস্বীকার করে লাভ নেই...পথ আমার বুকের মধ্যে। ...এমন কোন ঘটনা হতেই পারে না যেখানে পুরুষোত্তম পথ রেখে না দিয়েছেন।...আজকের দিনে স্ত্রী পুত্র কন্যা ... দেহ · সমাজ...সব প্রতিকূল। 'সকল দুর্যোগকে দুর্যোগ রাখিয়া যিনি সুযোগে গড়িয়া তুলিতে পারেন—তিনিই যোগেশ্বর'।.....অবিশ্বাস করো না.....ঘটনাগুলিকে impartially analyse কর—সেখানেই ব্যর্থতার বীজ রয়েছে।...যা বিষ তাই ওষুধ।.....যেখানে যার রোগ সেইখানেই ওষুধ...autovaccine। autovaccine যেমন চিকিৎসা-জগতে, তেমনি স্বয়ং অধ্যাত্ম-জীবনে ... কেন প্রকৃতি ক্ষিপ্ত?...অতীতের পথে চলা চলবে না... প্রকৃতির ঘটনা যখন প্রতিকূলে তখন তা মেনে নিতেই হবে...এর মধ্যে গোঁজামিল দিতে গেলেই পথ আবার হারাবে।...হরিশ্চন্দ্রের দুর্যোগের কথা স্মরণ কর—সমস্ত দুর্যোগকে তিনি মেনে নিয়েই দুর্যোগের শেষ করেছেন। দুর্যোগকে মেনে নিতে পারলে হরিশ্চন্দ্রের মত দপ্ করে একদিন আলো জ্বলে উঠবে।.....চতুর্দিকে ভূতপ্রেতের নৃত্য...এর মধ্যে পথ পেতে হলে নিজের বুকের মধ্যের আলোকে জ্বালিয়ে তোল...be clean...ঝরঝরে জীবন যাপন কর...পরাপেক্ষা পরিত্যাগ কর...ধীর স্থির হয়ে সংসার-পথে বিচরণ করতে হবে...। এই পথের আভাষ শ্রীনিত্যগোপালের কৃপায় পেয়েছিলাম...। শক্তি সঞ্চয় করতে হবে...। এ গ্রামের দলাদলিতে...দলে টানতে এসেছিল...কোন দলে চলব না—আমি উর্দ্ধে থাকব...। হজম করতে যা পারব না তা নেব না—জীবনে lugguage বাড়িও না.....একলা পথে চলতেই হবে কিছুটা...সূর্য নিভে যাবে, চন্দ্র নিভে যাবে, আগুন থাকবে না...সেখানে শুধু আলো জ্বেলে চলতেই হবে...নিত্য-

গোপাল, তোমায় বন্দিতা হতে নিয়ে আমি চলব।... স্বামী পুত্র স্ত্রী কন্যা কিছু নেই...আগে নিতাগোপালের খুঁটি। বাইরের আলো বাতাস আগে নয়—মাটির ভেতর থেকে রস নিতে হবে...from emptiness start করতে হবে...। নিজের জীবনে যার পূর্ণতা নেই—বাইরের বাবা মা স্ত্রী পুত্র বাড়ী গাড়ী ধনদৌলত কিছুই তাকে পূর্ণ করতে পারবে না, কেউ তার কিছু করতেও পারবে না।...কোন্ ছিদ্রপথে আমি এগিয়ে যাব—সেই পথ চিনে নাও।...আজ দুপুরে হরিদাস-হিতৈষী পাঠে দেখেছ যে কী জীবন আমি যাপন করে এসেছি... আমাকে উধাও করে নিলে হরিদাস থেকে চরণদাসও উধাও হয়ে যাবে—এটা সেদিন মহাত্মাজীকে বলতে পারা গিয়েছিল...। সেবা দিয়ে সকলের কাছে নিজের প্রয়োজনীয়তাকে feel করাও...। প্রকৃতি শক্তির দাস—সে শক্তি প্রেমেরও হতে পারে। প্রেমের শক্তি কি শক্তি নয়? তার শক্তি জৈব শক্তির চেয়েও বেশী।... তোমাদের স্ব করতে চেয়েছি...তোমরা স্ব হতে জান না, তাই তো বিরোধ।...আজ নরনারায়ণ আশ্রমের এক বৎসর পূর্ণ দিবসে তাঁর কাছে শক্তি প্রার্থনা করি।...

ক্রমশঃ

ইরাবতীর তীরে

॥ শ্রীবিভা সরকার ॥

অপরাহ্নের পড়ন্ত বেলায় পোলটি পার হতে শ্রীমতী দেখলেন নদীর দশা। পোলের নীচে প্রায় চড়া পড়ে গেছে। সেই বালু-পথ ভেঙে এগিয়ে চললেন তাঁরা মন্দিরের পথে। দিনান্তের অস্তরাগে রাঙিয়ে দিয়েছেন চরাচর দিনেশ্বর এই বেলাশেষ বিদায়বেলায়। নদীর ক্ষীণ জলে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার ছায়া। এখানে ওখানে ফেরার পথে চলেছে গরুর গাড়ি—তাদের গলার ঘণ্টার দূর থেকে শোনা যায় টুং-টাং টুং-টাং। কৌতূহল ব্যগ্রতায় মিলেমিশে শ্রীমতীর মনে জেগে ওঠে এক অপূর্ব ব্যাকুলতা। বহু দূর থেকে ভেসে আসা আজানের কণ্ঠস্বর এ গোধূলি লগ্নকে যেন আরও বিধুর করে তোলে—মন তাঁর অকারণেই আনচান করে ওঠে। সুদূর আকাশ-পথে উড়ে যায় পাখীর দল তাদের দূর কুলায় কুলায়। ক্লান্ত ডানায় তাদের বিশ্রামের ব্যাকুলতা। মৌন হয়ে হেঁটে চলেছেন তাঁরা কয়টি নীরব যাত্রী আপন আপন চিন্তায় মগ্ন।

নবাগত এলেই প্রথমে বিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করা নিয়ম এখানের, তারপর অন্য কথা, অন্য কাজ। তাঁরা পৌঁছতেই বাবাজী তাঁদের দেবদর্শনে নিয়ে গেলেন, নিয়ে গেলেন রামজীর আশীর্বাদ দেওয়াতে। এমন সময় রাধারাণী এসেছে সীতামাইয়ার ওড়না না ওড়ালে কি মান থাকে, না মানায় বলতে বলতে—সবার বিস্মিত দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মহান্তজীকে উপেক্ষা করে মাতাজী সীতামাই-য়ের একটি ওড়না এনে তাঁর মাথায় জড়িয়ে দিলেন। সস্নেহে মুখ-চুম্বন করে আপন মনেই বকবক করতে করতে অন্যত্র চলে গেলেন। আলু থালু বিস্রস্ত বেশবাস; কথা বার্তা কেমন যেন বাঁধন-হারা। তবু যেন তাঁর প্রতি এক গভীর স্নেহ শ্রদ্ধা জেগে আছে এঁদের সবারই মনে। সারা অঙ্গে আজও তাঁর আভিজাত্য মাখান। সামান্য সাধারণ যে তিনি নন এ তাঁর প্রতিপদে জেগে উঠছে।

বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হরিদাস বাবাজীর পানে তাকালেন চৌধুরী দম্পতী। হাসলেন বাবাজী। বললেন এসেছেন যখন তখন একে একে সবই জানবেন। বিশ্ব-রাজের এ আজব চিড়িয়াখানায় কত জীবই দেখবেন। মাঝে মাঝে আমারই মনে হয় এ মন্দির, না যাদুঘর। যেখানে জীবন্ত কমই আছে—আছে যত মমী আর ফসিল।

তক্তাপোষের মধ্যে এক ফালি হেঁটে চলে বেড়ায়, হাসে আর নাচে গান গায়; আপন আপন পাগলামীতে মত্ত থাকে! মন্দির ছেড়ে তাঁরা এসে বসলেন নদী কিনারের ঘাটের চাতালে। এমন সময় ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে মন্দিরের হস্তিনী 'মস্তানী' সামনে দিয়ে চলে গেল। সেই দিকে তাকিয়ে বাবাজী বলে উঠলেন—এই যে হস্তিনী মস্তানী, এ সত্যই সর্বনাশিনী। ও তো মাতাজীরই দান। মাতাজীর সব থেকেও সর্বত্যাগিনী। নিজের জন্য কিছু রাখেন না। দারুণ শীতের মধ্যে একমাত্র অঙ্গাবরণ আনান বদনে দান করে রিক্তা হয়ে যান। মাতাজীর আমার শ্রীরাধার ভাব—'নয় আন কড়ি নিয়ে ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে আছেন নৈয়া করে আসবেন সেই প্রত্যাশায়।' ধমকের দিয়ে উঠলো বাবাজীর সেবক রামচরণ। কার কথা কে বলে বাবাজী! তোমার তো ওই স্বভাব। সর্বস্ব দিয়ে বসে আছো! কি আছে তোমার? কি রেখেছ তুমি নিজের জন্য? কত ভক্ত কত সামগ্রী দিয়েছে, তোমার সেই একবস্ত্র সম্বল। শীতের দিনে কখনও কম্বল থাকে, কখনও তাও থাকে না, দান করে বসে থাক একমাত্র আচ্ছাদন—তুমি আবার অসুখে পড় কি ঠাকুর! সলজ্জে বাবাজী বলেন—চুপ কর! চুপ কর বেটা! ও সব বলতে নেই, ও সব বলাও মহাপাপ। মাতাজী আর আমি। রাজরাণী আর পথ-ভিখারী। কি আছে আমার যে তার আবার রাখবো ধের। মাতাজী যে আমার রাজরাজেশ্বরী। আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় না সর্বহারা পাগলিনী!

কণেক স্তব্ধ থেকে আবার আরম্ভ করলেন তিনি মাতাজীর কাহিনী। সরায়সিদ্ধুর বর্ধিষ্ণু জমীদার ছিলেন এঁরা। এ রামচৌতরার আশপাশের বেশীর ভাগ জমিই তো এঁদের। সরায়সিদ্ধু তাবৎঘরই এখানকার তাকষর। বংশ পরম্পরায় নামী ঘর ধনে জনে মানে মর্যাদায় এক সময় গম-গম করতো তাঁদের পুরী। সেবার এক সর্বনাশা মহামারীর রূপ নিয়ে প্লেগ দেখা দিল। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাবার জোগাড়। কে কার গতি করে এই অবস্থা! জমীদার সন্তানারায়ণ ছিলেন বড় সৎ মানুষ। ইচ্ছে করলে তিনি গাঁও ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারতেন কিন্তু প্রজাদের সে দুর্দিনে তিনি তা করলেন না, তাদের মধ্যেই তাদের সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে রয়ে গেলেন। আমিও বারণ করেছিলুম থাকতে। বলেছিলেন আমায়—আপনি কেন পড়ে রয়েছেন? বলতে বাধা হয়েছিলুম তাঁকে—তুমি আর আমি কি এক? তুমি সংসারী; তোমার ধর্ম, তোমার কর্তব্য অন্য রকম। তুমি লাখপতি, লাখ মরে, সেও সইবে কিন্তু লাখপতি যদি মরে, কোথায় যাবে এই লক্ষ অপগণ্ডরা? আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কথা আলাদা। আমার ত সংসারে কোনও দায় নেই। আমার রামজী ভরোসা—রামজীতে অর্পিত জীবন যদি নেন, সে ত আনন্দের কথা!

বলেছিলেন—বাবাজী, আমারও রামজী দেখবেন। এই দুর্দিনে আর্থিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমি যদি এদের বিপদের মধ্যে রেখে দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাই এরা দাঁড়াবে কোথায়, কার মুখ চাইবে? রামজী আমায় এতবড় অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আর কি করেই বা আমার প্রজাদের কাছে মুখ দেখাব আমি। ওরা যে আমার পুত্র-তুল্য। সন্তানকে দুঃখে ফেলে কবে কোন্ মা-বাপ পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে বাবাজী?

তিনি কিছুতেই যাবেন না জেনে নিরস্ত হয়েছিলুম বৃথা চেষ্টায়। রামজী মঙ্গলময় তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক! সন্তানারায়ণজীর জন্যই এ তল্লাট কোন রকমে টিকে গিয়েছিলো সেবার। কিন্তু ঝাড়াঝাড়ি করেছিলেন তিনি। নিজ হাতে প্লেগাক্রান্তকে সেবা আরম্ভ করেছিলেন—একদিন সর্বনাশ হয়ে গেল ছুটে গিয়েছিলুম আমি মন্দির ছেড়ে রামজীর আশীর্বাদী বিভূতি নিয়ে সে সংবাদ শুনে। থাকতে পারি নি। মাঠের মাঝে ঘর বেঁধে বেঁধে জনপদ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো সুস্থ মানুষেরা। বড় মহান্তও সেবারই দেহ রাখলেন। এ মহান্ত তখন কিশোর বিদ্যার্থী। মন্দির ছেড়ে সবাই দূরে সরে গেল। রামজীকে আঁকড়ে পড়েছিলুম শুধু আমরা তিনজন। আমি, এই মহান্ত আর মৌনীবাবা—সাক্ষাৎ মূর্তিমান ভৈরব। ফিরে এসে সকলে মৌনীবাবাকে আর আমাকে পায়ে ধরাধরি করেছিলো মহান্তপদের জন্য। আমরা অস্বীকার করি। তা ছাড়া

মৌনীবাবা যে মৌনী, সে কেমন করে মহাভঙ্গিরি করবে? স্বেচ্ছায় কবে উনি মৌনতা ভাঙবেন সে উনিই জানেন। আর ওঁর অনিচ্ছায় মৌনতা ভঙ্গ করান—শিবেরও অসাধ্য। এ মৌনতার পেছনেও আছে এক অভিসম্পাত। আমিই জানতাম এ কথা। আমাদের বড় মহাজনী দেবতার মতই মানুষ ছিলেন; কিন্তু ঐ এক দোষেই সব গুণ নাশ হয়েছিলো ওঁর—ক্রোধে বুঝি বা তিনি দুর্বাসাদেরও হার মানাতেন। তবে সে ক্রোধ আমরা কদাচিৎই হতে দেখেছি। যখন ক্রুদ্ধ হতেন আমরা খড়কুটো কাঁপতুম, কে জানে এ অগ্নি কার ওপর পড়ে কার সর্বনাশ করে। কি জানি কি অপরাধে সেই অগ্নিই একবার পড়েছিলো শিবশঙ্করের ওপর। তাকে অভিসম্পাত দিয়ে ছিলেন বিশ বছর মৌনী হয়ে থাক যদি আমার গুরু বলে মনে করিস, নয়ত নরকস্থ হও।

এও আজ প্রায় ১৫।১৬ বছর আগের ঘটনা। সেই থেকে শিবশঙ্কর মৌনী। মৌনী থাকতে থাকতে আজ লোকে তার নাম ভুলতে বসেছে, মৌনী বাবা বলেই আজ ওর পরিচয়। লোকালয়, মনুষ্য-সঙ্গ ত্যাগ করতে করতে আজ যেন শিবশঙ্কর কেমন বন্য হয়ে উঠেছে—কাল-ভৈরবের মতই শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়—যাবে একদিন সাপ বা কুমীরের হাতে। বড় দুঃখ হয় চৌধুরী অমন মানুষটার জীবন এক ক্রোধীর ক্রোধের অপঘাত হল। কণেক নীরব থেকে আবার আরম্ভ করলেন বাবাজী—সেবার সেই সর্বনাশা রোগে অনেকটি রোগী নিয়ে—শ্মশান শূন্যতায় খাঁ খাঁ করতো গাঁও—জনপদগুলো। রোগীদের সেবা করতে গিয়েই তাদের মধ্যে মৃত্যু ঘটেছিলো আমার সত্যনারায়ণজীর। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, তবু চোখে জল রাখতে পারিনি। অতবড় ঘরের মানুষটা একান্ত গরীবের মতই একটা খাটিয়ায় পড়েছিলেন। সেবার সে কাল ব্যাধি এসে দেশের সর্বনাশ করে দিয়েছিলো। ধনী নির্ধন সব এক করে একাকার করে দিয়েছিল। শুনতে শুনতে চমকে উঠলেন চৌধুরী সম্পতী। ওঁদেরও মনে পড়ে গেল সে বিভীষিকাময় ভয়ঙ্কর দিনগুলি। চৌধুরী তখন তকরারায়। জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীমতীকে কলকাতায় একেবারেই শুকতে। কোলে তখন তাঁর কচি শিশু। কি উদ্বেগময় দিনরাত কেটে-ছিলো শ্রীমতীর দিনের পর দিন। দূর প্রবাসে মৃত্যুর মাঝখানে জীবন-সর্বস্ব ফেলে চলে যেতে হয়েছিলো তাঁকে সন্তানের মঙ্গল-কামনায়—পুত্রের মুখ চেয়ে। অন্যমনা হয়ে পড়েছিলেন চৌধুরী—মানস নয়নে দেখছিলেন তিনি তখন সেদিনের সেই সব প্রায় বিস্মৃত ঘটনাগুলি। সমারোহ করে তারা একটার পর একটা মিছিলের মতই চোখের সামনে ভীড় করছিল। ওঁদেরও বাংলোয় মৃত্যু হানা দিয়েছিলো। দূরে মাঠের মাঝখানে তাঁবু ফেলে সরে গিয়েছিলেন তাঁরা। অন্য কোনও কারণেও সামান্য সর্দী খারাপ হলে লোকগুলো যেন আতঙ্কে আধমরা হয়ে যেত। কে কার সৎকার করে—গ্রামগুলির এমনই অবস্থা তখন। গরুর গাড়ী করে দুটি মাত্র লোকে নিয়ে চলেছে কাউকে সৎকার করতে। দূর থেকে তাঁকে সেই পথে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে তারা কত রকমেই না ইসারা জানাতো ফিরে যেতে। যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুকে তারা টেনে নিয়ে আসছে—ওগো জীবন্ত তুমি এ পথ ছেড়ে চলে যাও!

ভয় কি তাঁরও করত না? করত বৈ কি সে মৃত্যু-মিছিল পেরিয়ে যেতে। তবুও ফিরে যেতে তাঁর পৌরুষে বাধত, আর ফিরে যাবেনই বা কোথায়! সর্বত্রই তো এই অবস্থা। তবুও বুক দুরু দুরু করত বৈ কি তাদের পাশ দিয়ে চলে যেতে। ঘোড়াটাও যেন সহজাত সাবধানতায় প্রেরণায় সিঁটকে উঠতো। সবাই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন—সে মৌনতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন বাবাজী—'চৌধুরী! সত্যনারায়ণজীর মৃত্যু-সংবাদে হাহাকার করে উঠেছিলো মন্দিরবাসিরা, হাহাকার করে উঠেছিলো সারা জনপদ। বুঝিবা জল পড়েছিলো রামজীর পাষাণ নয়নেও সে পরম ভক্তের বিরহ বেদনায়। একটি আলো জ্বলছিলো সব অন্ধকার দূর করে। একটি বনস্পতি দাঁড়িয়েছিলো ছায়া বিস্তার করে সকলকে অভয় দিয়ে—সে আলো চমকা হাওয়ায় নিভে গেল। গাছটি ঝড়ের তাণ্ডবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি দেবপ্রিয় মানুষ চির অপরাজিত। পরা শক্তি তাই

অপরাশক্তিতে মিলে গেল। রামজীর পরম ভক্ত রামজীর বুকে লীন হয়ে গেলেন। এমন মানুষটাকে সংসারের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কি লাভ হল রামজীই জানেন। লোকান্তরে আর আমার ফিরে আসা হল না কিন্তু দিনের শুরু। এই তখন নিশ্চয় করা হয়েছিলো। স্বয়ংকে রোগের ছোঁয়াচ বাঁচাতে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না কিন্তু তবুও বাঁচানো গেল না। লোকান্তরের পর লোকান্তর শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সে মৃত্যু-তাণ্ডবে মহাকাল বুঝি বা রুদ্র তাণ্ডবে মেতে উঠেছিলেন ধ্যান-ভঙ্গে কৈলাসে। অকাল ধ্যান-ভঙ্গের সে ক্রোধকম্পন বুঝিবা মাটির বুকে নেমে এসে কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো বসুমাতাকে। হাহাকার আর মানুষের কাতর প্রার্থনায় তপস্বিনী উমা বুঝি স্থির থাকতে পারেন নি, বশ করেছিলেন সে রুদ্রকে আপন তপস্যায়। শান্ত হয়েছিলেন উমাপতি। ম্লান হাসি হেসেছিলেন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা।

সব চুকে যেতে অবস্থা আয়ত্তে আসতে স্বাভাবিক হতে মৃত্যু তাণ্ডবের অবসানে একে একে আমরা ফিরে এসেছিলুম আপন আপন আস্তানায়। মাতাজীকে মন্দিরে প্রথম দেখে আমি চমকে উঠেছিলুম। অন্তরাত্মা আমার হাহাকার করে উঠেছিলো। কোলে তখন ওঁর পাঁচ বছরের শিশু সন্তান। সন্তানবাৎসল্যের একমাত্র কূল প্রদীপ, শেষ বংশধর এক মহান বংশধারার। আমার সর্বহারা মাকে দেখে এই মৃন্ময় মূর্তি চিন্ময় দেবতাকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলুম—কেন এমন করলে প্রভু? কি তোমার অভিপ্রায়? পাষাণ স্থবীর হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন, কোনও জবাব দেননি। তখন কি জানতুম আরও অনেক আছে আমার রাজেন্দ্রাণীর মত মায়ের কপালে। বিহ্বল হয়ে চুপ করলেন কথকঠাকুর। ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল সন্ধ্যারতির সময় ঘোষণা করে। উঠে দাঁড়ালেন বাবাজী জয় রাম জয় রাম করতে করতে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মন্দির-প্রাঙ্গনে সমবেত জনগণের মাঝখানে। পঞ্চ প্রদীপ হাতে আরতি করে চলেছেন আপন মনেই গুরু মহান্তমহারাজ। সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করে চলেছেন "যো ধ্যাবে ফল পাবে ..." ইত্যাদি।

আরতি সমাপনান্তে প্রদক্ষিণে বেরলেন তিনি এবার সমবেত কণ্ঠে গীত হল, তুলসী মহারাণী নমো নমঃ পঞ্চপ্রদীপ হাতেই মন্দির প্রদক্ষিণ হল তুলসী তলা হরিপ্রিয়ার আরতি শেষে ভক্তবৃন্দসহ ঘাটে এসে দাঁড়ালেন মহান্তমহারাজ। রামজীর মন্দিরের পর নদীর উজানে মুখ করে আরতি প্রদীপ তুলে ধরলেন তিনি। এখান থেকে সাত মাইল উজানে সীতাকুণ্ডের সীতাদেবী স্মরণে, তারপর পরপারে লছমন চৌতরার দিকে। এই এখানের প্রথা। পরপারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন চৌধুরীর দম্পতি। লছমন চৌতরার মহান্তজীও ঠিক এমনি করেই রামচন্দ্রমন্দির পানে পঞ্চপ্রদীপ তুলে ধরেছেন লছমন চৌতরার ঘাটে দাঁড়িয়ে মন্দিরের আরতি সমাপনান্তে। এ যেন প্রদীপে প্রদীপে অভিবাদন শুধু এই নয়। রামমন্দিরের আরতির শঙ্খধ্বনি শোনার পরই লছমন চৌতরার আরতি আরম্ভ হয়। এটা রামের প্রতি লক্ষ্মণের আত্মসমর্পণের প্রতীক। পায়ে পায়ে আবার ফিরে এলেন তাঁরা মন্দিরে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবাজী সুন্দর সুললিত কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে লছমের দশাবতার স্তোত্র ও তারপর শিবতাণ্ডব স্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন গমগম করে উঠলো সন্ধ্যার শুদ্ধতায় তাঁর এ বন্দনা সহায় মন আনন্দময় করে মর্ত্যের মানুষকে মুগ্ধ করে যে স্তবগান যেন ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বপানে সেই অমৃত লোকের সন্ধানে চলে গেল সেই পরমপুরুষের চরণে লীন হওয়ার দুরাশায়। উপস্থিত শ্রোতাদের মনে তিনি যেন এক হারিয়ে যাওয়া ঋষির আশ্রম নতুন করে জাগিয়ে তুললেন।

বিস্মিত মুগ্ধ হলেন চৌধুরী দম্পতি বাবাজীর পাণ্ডিত্যে। বুঝলেন সাধনা তাঁর আজন্ম, আসলে মানুষটি সত্যকার বিদগ্ধ ব্যক্তি। সাষ্টাঙ্গে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রণিপাত করলেন অনেকেই মহান্ত সমেত। তারপর সকলেই তাঁরা এগিয়ে গেলেন তুলসীকুঞ্জ ছাড়িয়ে ওপাশে একটি ছোট সুন্দর শ্বেত মর্মরের মন্দিরের সামনে।

সযত্নে জ্বেলেছিলেন একটি প্রদীপ—কয়েকটি ধূপ কাঠি। চৌধুরীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির পানে চোখ পড়ায়

বললেন বাবাজী—প্রণাম তখন চৌধুরী! এ আমার এসে বসেছিলেন শুরু ঘাটে। চারিধার যেন ঘোরা কান্নায় জীবন্ত দেবতার স্মৃতিমন্দির, এ আমার সত্যনারায়ণজীর মূর্ছিত স্মৃতির বেদনায়!

সমাধি! (ক্রমশঃ)

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিলো। স্তব্ধ নির্বাক হয়ে তাঁরা

সভ্যতার জয়যাত্রা

॥ শ্রীরুহিদাস সাহা ॥

পথ চলতে সে-দিন বাঁধা এলো,
পড়লাম পথের মাঝে দাঁড়িয়ে;
সম্মুখে রেঁস্তোরা—
প্যান্ট—কোট—নেকটাই পরা
ভীড় জমিয়েছে বাঙ্গালী সাহেবেরা।
কোর্মা পোলাও কাটলেট আরও কত কি
আসিতেছে ঘরে ঘরে অর্ডার অনুযায়ী।
কাপ প্লেট চামচের টুং টাং শব্দ,
মাঝে মাঝে চলিয়াছে কত আলোচনা,
সব কিছু ছাপিয়ে আজ
এ্যাপেলো এপারোর কল্পনা।
চাঁদে পৌঁছে গেছে আর্মষ্ট্রং আর অ্যালড্রিন,
খুলে গেছে এক নতুন দিগন্ত
বিজ্ঞান জগতে।
ওদের এবার ফেরার পালা,
সকলের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ,
ইতিমধ্যে প্রত্যাবর্তনের খবর আসে
টেবিল চাপড়িয়ে সকলের চিৎকার—
বিজয় উল্লাসে।
হঠাৎ পাশের বৃদ্ধ আমায়
আকৃষ্ট করে,
এত উল্লাস তবুও ওদের মুখে
কথা নাহি স্ফুরে।
দেখি আর ভাবি—স্বপ্ন, না
বাস্তবের দ্বারে আমি দাঁড়িয়ে?
শহরের লোকারণ্য পথে
প'ড়ে আছে এলোমেলো—
ওদের জীবন না বলে
প্রাণী বলা ভালো।
ছোট বড় মিলে সাত-আটটি দেহ,
ভয়ংকর মূর্তি, কংকালসার
জরা-জীর্ণ গাত্রে আর বস্ত্রাকার।
শ্রীহীন বর্ণহীন বস্ত্রহীন দেহ
ছেঁড়া-ছোঁড়া পড়ে আছে,
সভ্যতার জয়যাত্রার মাঝে।

পারিবারিক জীবন-আলোচনা

॥ ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জয়া—এসব বলা খুবই সহজ, কোরে ওঠাই মুস্কিল; সংসারের আর সকলের সব চাহিদা আমাদের আগে মিটিয়ে তবেই তো আমাদের নিজেদের বা বাচ্চাদের এসব প্রয়োজনের কথা ভাবতে হয়! আমি তো ঠিক এইভাবেই চেষ্টা করতে চেয়েছি সবার কিন্তু দেখেছি যে সবসময় পারা যায় না।

ইন্দিরা—কোনও মা চায় না তার সন্তানের উপর অন্যায় কোরতে। বিশেষ কোরে প্রথম সন্তানটির উপর মায়ের তো বিশেষ স্নেহ থাকে।

অপু—প্রথম সন্তানের ওপর মায়ের আরো অনেক কিছুই থাকে। তবে সে সব নিয়ে আজ আর আলোচনা করার সময় হবে না।

কল্পনা—ইন্দিরা, এখন তোমার কেমন মনে হোচ্ছে? রীণার উপর এখনও কি রাগ হোচ্ছে তোমার, বা অন্য কিছু বোধ হোচ্ছে?

ইন্দিরা—(হাসিয়া)—না, এখন বুঝতে পারছি ওর তো কোন দোষ নেই! ও-তো বোঝেও না যে কি ভালো কি মন্দ! ওর সঙ্গে কথা বোলে বোলে সেটা তো আমারই শেখানো উচিত। তবে ওকে কখনো আমি ওর ভাইটী সম্বন্ধে কিছু বলা বা করার জন্য কোন শাস্তি দিয়েছি বলে তো আমার মনে পড়ে না! ভেবে দেখতে হবে, আর ওদের বাবার সঙ্গেও আলোচনা করে দেখবো।

(চা-এর ট্রেতে করে কয়েক কাপ চা, বিস্কুট ও বাচ্চাদের নিয়ে ঘনার প্রবেশ)

ঘনা—কী ব্যাপার, আজকে বুঝি তোমাদের আলোচনা খুব জোরালো হোয়েছে এবং এখনও শেষ হয় নি? বাচ্চারা তো আর থাকতে চাইছে না সেজন্য আমি চা নিয়েই একেবারে সঙ্গেও নিয়ে এলাম! আশাকরি খুব একটা খারাপ কিছু করা হোল না এভাবে এসে!

কল্পনা—না না, কী যোগাযোগ! আমরাও তো আলোচনা এখনই শেষ করবো ভাবছিলাম!

জয়া (হাসিয়া) এবার থেকে এই রকমই করা হবে মনে হোচ্ছে! কি বলো চপলা?

বৈঠকের ষষ্ঠ দিনে

[আজ গায়ত্রী বাচ্চাদের কাছে অন্য ঘরে আছে]

ঘনা—গত দু'দিন আলোচনায় আমি ছিলাম না, মনে হোচ্ছে আমাদের আগের ব্যবস্থায় কিছু যেন অদলবদল হোয়ে গেছে!

কল্পনা—কেন বলো দেখি এরকম মনে হোচ্ছে তোমার?

ঘনা—ঐ যে আগের দিনে জয়া একটু যেন রহস্যময় ভাবে বলো যে এবার থেকে এই রকমই হবে, আর তার পর চপলার দিকে চেয়ে বলো—"কী বলো চপলা?" তাছাড়া তোমরা তো সময় হোয়ে যেতেও আমাকে বাচ্চাদের নিয়ে এ ঘরে আসতে বলছিলে না!!

কল্পনা—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমরা ঠিক করেছি যে সময় হোয়ে গেলেই এখানে 'চা'-এর ব্যবস্থা রেডী রাখা হবে, কিন্তু আলোচনা বন্ধ করা হবে না। চা খেয়ে যার যখন ইচ্ছা বাড়ী চলে যাবে।

ঘনা—হ্যাঁ, এতে অবশ্য সুবিধাই হবে অনেকের। যারা বেশীক্ষণ থাকতে চায় থাকবে, কিম্বা কেউ যদি অন্য কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা বিশেষ কারো সঙ্গে করতে চায়, তা-ও করতে পারবে, তাই না?

অন্না—তাতো পারবেই—তবে আরও অনেক সুবিধা আছে এ ব্যবস্থায়। অনেকের ব্যক্তিগত অন্যরকম সুবিধার কথাই বল্‌ছি আমি।

চপলা—বেশ কোরেছ, বলে ধন্য কোরেছ সবাইকে। এবার আশা করি আজকের আলোচনা সুরু হোতে পারে, তোমার ব্যক্তিগত কোন অসুবিধা যদি অবশ্য না থাকে তাতে!

অপ—হ্যাঁ, সেই ভালো। আগের দিনের সব কয়েকটী বিষয় সকলের মনে আছে তো! যদি সে সব সম্বন্ধে কারো কিছু বলার না থাকে, তবে আমরা পরের দু'দিন খনার কি রকম অভিজ্ঞতা হোল বাচ্চাদের ঘরে সে সম্বন্ধে কিছু শুনতে পারি।

অশ্রু—আমি ভাব্‌ছিলাম যে সেদিন আমায় যেন কল্পনাদি ও ঘরে ডেকে নিয়ে গেলো—ঠিক বুঝতে পারা গেলো না তো! এবার না হয় ছেলে কাঁদছিলো বলে ওকে ছেলের কাছে নিয়ে যাবার দরকার হোয়েছিলো।

কল্পনা—কেন, তুমি তো নিজেই আগের দিনে বলে যে সেদিন গিয়ে তুমি রুমাকে কি অবস্থায় পেয়েছিলে!

অশ্রু—ও হ্যাঁ, ও যেন একটু ভয়-ই পেয়েছিলো বলে আমার মনে হোয়েছিলে!

কল্পনা—তবে তো বুঝেছ কেন ডেকে নিয়ে গেলাম তোমাকে! প্রথমতঃ নতুন জায়গায় অনেকগুলি নতুন লোকদের সঙ্গে ছিলো ও; দ্বিতীয়তঃ বন্ধুদের সঙ্গে মতের মিল হোচ্ছিল না এবং সেজন্য ওর চুলের মুঠীতে টান পড়েছিল এবং এভাবে বাধা পাওয়াটা তার জীবনে হয়তো এই প্রথম ঘটেছে! তৃতীয়তঃ ও ঘরের সাধারণ আবহাওয়াটাতেই যেন একটী ভয় ও কান্নাকাটীর আকাশ ফুটে উঠেছিলো! এ সব কিছু মিলেই ওর মনে বেশ একটা বিপর্যয় যে ঘটিয়েছিলো—সেটা বুঝেই অশ্রু আমি তখন ওর কাছে তোমার থাকাটা দরকার বলে মনে কোরেছিলাম।

অশ্রু—হ্যাঁ, ও পরে বাড়ীতে আমায় বোলেছে যে ওর খুব ভয় হোয়েছিলো আর আমারও মনে হোয়েছে যে তখন আমাকে কাছে না পেলে ও হয়তো আর এখানে কখনো আসতেই চাইতো না! সত্যি, বাড়ীর একমাত্র মেয়ে কিনা—এ রকম অভিজ্ঞতা নেই ওর।

কল্পনা - তবে তো বুঝেছই ব্যাপারটা!

অশ্রু—আমি এখন বুঝেছি অবশ্য! তবে আগে তো শুধু এ ব্যাপারটা আন্দাজই করেছি বলে ভেবেছিলাম—সেজন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম যে আমার আন্দাজটা ঠিকই হোয়েছিলো।

এষা—আচ্ছা, আমার কল্পনাদি, তুমি মিহুর সঙ্গে ভালো করে কথা বল্‌তে গেলে কেন—যখন খোকাকে কোলে নিয়ে শান্ত করে ফেলেছিলাম আমি?

কল্পনা—আমার তখন মনে হোয়েছিলো যে মিহু রীণার কাছে যেসব শুনেছে তাতে তার মনে যেন একটী দ্বন্দ্ব চলেছিলো; আর সে নিজেও তো "রুমা"র প্রতি নির্দয় আচরণই করেছে—তাতে তার মা যে রাগ কোরবে—তা-ও সে মনে মনে নিশ্চয় আন্দাজ করে খুবই অস্বস্তির মধ্যেই ছিলো। এজন্য তার মায়ের স্নেহ যে তার প্রতি অক্ষুণ্ণ আছে এ বিষয়ে তার নিশ্চিন্ত হোতে পারাটা খুবই দরকার ছিলো বলেও আমার মনে হোয়েছিলো।

এষা—হ্যাঁ, আমি যখন খোকাকে কোলে নিয়ে ওর পাশে বসে ওর মুখটী বুকে নিয়ে আদর করলাম—তখন ওর নিশ্বাস প্রশ্বাস দেখে আমারও মনে হোয়েছিলো যে ও বেশ বিচলিত আছে।

অরুণা—আচ্ছা, রীণা এ ব্যাপারটা কীভাবে নিলো?

ছবি—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম, ইন্দিরা, বাড়ীতে গিয়ে তুমি সেদিন কি কি কোরলে, কি কি হোল যদি আপত্তি না থাকে তবে আমাদের যদি বল, আমরা সবাই এ ব্যাপারটা আরও ভালো করে বুঝতে পারব।

ইন্দিরা—এ সব শুনে এখন আমার মনে হোচ্ছে যে আমাকেও যদি কল্পনাদি ও ঘরে সেদিন ডেকে নিয়ে যেত, তবে খুব ভালো হত!! কারণ ঐ দিন আমি রীণাকেও খুবই বিমর্ষ দেখেছিলাম মনে পড়েছে! যাই হোক্—এই যে আগের দিনে তোমরা আমাকে সব কথা

বুঝিয়ে বলেছিলে—তাতেও সত্যি আমাদের অনেক ভালো হোয়েছে। বাড়ী গিয়ে আমি সবই বেশ ভালো করে ভেবে দেখেছি, আর ওর সঙ্গে, ওর বাবার সঙ্গেও এ সব বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছি।

কল্পনা—সত্যি, এখন সব শুনে আমারও মনে হোচ্ছে যে এসব কথা নিয়ে আরো আগেই আলোচনা হওয়া দরকার ছিলো। তবে সেদিন তো বুঝিনি যে রীণাই মিহুকে কিছু বোলেছে, না মিহুই রীণাকে কিছু বোলেছে! মিহুকেই দেখলাম কিনা কমার চুলের মুঁটী টেনে ধরতে—তাতে আমি ভাবলাম ও-ই আরও কিছু মুস্কিল বাধাবার তালে ছিলো হয়তো! রীণাকে আমার অতটা অস্থির লাগেনি মোটেই।

অপ—দেখা যাচ্ছে ও যেন নিজের মনে যখন যে ভাব আসে, সহজে প্রকাশ করে না—বা বলেও না কাউকে। নিজের মনের কষ্টটা মনেই রেখে রেখে কষ্ট পায়—আর অন্যের পক্ষেও ইচ্ছা থাকলেও ওর মনের ভাব না বোঝার দরুন কিছুই ওকে পরিষ্কার করে বোঝানোও সম্ভব হয় না। তবু ভালো যে ইন্দিরা অন্ততঃ বুঝতে পেরেছিলো যে ওর মনটা ভালো ছিলো না মোটেই সেদিন ঐ সব কাণ্ড হবার পর—বাড়ী গিয়েও।

টলা—যাই বল বাপু আমাদের ঘর সংসার নিয়ে এতো মস্ত থাকতে হয় যে, সব সময় বাচ্চাদের মনে কি হোচ্ছে না হোচ্ছে অতটা আর তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখার বা তাদের সঙ্গে কথা বোলে বোলে বুঝতে চেষ্টা করার মত সময় করে নিতে পারি না, করিও না। নিজের মনেই কখন কোন্ ভাব আসছে তা-ই বুঝি না!! আর বুঝি না বলেই তো টিকে আছি মনে হয়!

অপ—তাইরে, ইংরাজীতে একটী কথা আছে যার মানে এই যে—ঠিক ঠিক সময়ে একটী সেলাই দিলেই যেখানে কাজ চলে যেতো—পরে নয়টী সেলাই লাগবে সেই কাজটুকুর জন্য (a stitch in time saves nine)! এটা আমি দেখেছি যে জীবনের সব কিছুতেই সব সময়ই খাটে। শিশুকে এখন তার প্রয়োজন মত সময় যদি না দাও—তবে পরে নয় গুণ (কিম্বা তার থেকেও অনেক—অনেক বেশী) সময় দিতে হবে জেনে রেখো। তুমি নিজে না দিতে পারো হয় তো, কিন্তু এটা ঠিকই যে অন্য কাউকে বা—অনেককে (এমন কি গোটা স্কুলকে) তোমার হোয়ে সেটা দিতেই হবে একদিন সেই সময়টুকুর অনেক গুণই বেশী। আর শুধু যে সময়ের ক্ষতির উপর দিয়েই এই অবহেলার ফলটী যাবে তা-ও নয়, আরও অনেক ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবারই ব্যবস্থা করা হোচ্ছে এতে। আরও একটী ইংরাজী কথা মনে পড়লো—যার মানে এই যে "একটী পয়সা বাঁচাতে গিয়ে টাকা-কে টাকা-ই যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে" (Pennywise Pound Foolish)। সেদিকে খেয়ালই না করার মতই দাঁড়াচ্ছে এই সময় করে নেবার ব্যাপারটা! সময় যে কী ভাবে করে নিতে হবে সে সম্বন্ধে আগেই তো অনেক আলোচনা হোয়ে গেছে, সে সব মনে রেখে সেইমত ভাবে যদি আমরা না চলি তবে তো এ সব আলোচনা ব্যর্থই হোয়ে যাবে!

কল্পনা—এতকাল ধরে আমরা এ রকম স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে চলে এসেছি যে ওটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের! বলতে গেলে ওটাই এখন আমাদের স্বভাবে পরিণত হোয়েছে। সেইজন্যই তো আরও বিশেষ জোরে এই সব আলোচনা বার বার হওয়া দরকার! তাহোলে তবু কিছুটা হয় তো কাজ হোতে পারে—যাতে আমরা একেবারে গতানুগতিকভাবে না চলে একটু আমাদের চিন্তাশক্তি বুদ্ধি বিবেচনাগুলি ব্যবহার করি এবং ফলে বুঝতে পারি যে আমরা ঠিকপথে চলছি কি না—আর এতে সংসারের, সমাজের, আসল উদ্দেশ্যটী ঠিক সাধিত হোচ্ছে কি না।

চপলা—তাহোলে আগেই বল দেখি শুনি সংসারের, সমাজের আসল উদ্দেশ্যটী কি?

খনা—তার আগেই কিন্তু আর একটী বিষয়ের প্রশ্ন এসে গেছে!

অভয়া—কি রকম?

অশোকা—ঐ যে টলা বলে ফেলো যে নিজের মনেই কখন কোন্ ভাব আসছে তা-ই বুঝি না—আর বুঝি না

বলেই তো দিকে আছি মনে হয়। ঐ মনোভাবের কথাই তো বলতে চাচ্ছো, তাই না খনা?

খনা—হ্যাঁ, তাই। এ যেন জীবনের সব সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে কোনও মতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করার ব্যাপার! এতে আমার মন সায় দেয় না।

ছবি—আর এ রকম এড়িয়ে গিয়ে যে বেশী দিন চলেও না সেটাও তো আমি আমার জীবনে ভালোই দেখলাম বুঝলাম! এ ভাবে এই দেখলাম যে সমস্যাগুলি ক্রমশঃ বড় হোয়ে হোয়ে জীবনে চলার পথ রোধ করেই দাঁড়ায় এক সময়ে—সুতরাং এড়িয়ে গিয়ে বাঁচা কি আর সত্যি যায় বেশী দিন। তা যায় না।—

অরুণা—সবারই কি আর এই রকম হয়, অনেকের আবার অদৃষ্ট গুণে সমস্যাগুলি তেমন তাড়াতাড়ি নাও বাড়তে পারে। ফলে সেগুলি জীবনে চলার পথরোধ করে দাঁড়াবার মত বড় হোতে হোতে হয়তো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলি শেষ হোয়ে যেতেও পারে আর তার পর হয়তো ঐসব সমস্যার আর ততখানি গুরুত্ব নাও থাকতে পারে জীবনের চলার পথে! যে নিজে ভুগ্‌ছে সে ছাড়া অন্য কারো হয়তো সত্যিকার অবস্থাটা বুঝবার মতও বড় না হোতে পারে জীবনের শেষদিন অবধি জীবনের ঐ ধরণের সমস্যা!

ছবি—হ্যাঁ, তা বটে। তবে সমস্যাটিকে সমস্যা বলে বোঝা আর তার প্রভাবে কষ্টকর অবস্থাটি উপলব্ধি করা আর কষ্ট থেকে উদ্ধার পাবার পথটী খুঁজে বার করতে চেষ্টা করা এ সবের জন্যও বেশ কিছুটা বুদ্ধি বিবেচনা আর সময়ের দরকার হয়তো। আমরা তো বেশীর ভাগই দেখছি যে ঐ এড়িয়ে যাবার পথটাই সহজ বেবে বেছে নিয়ে সুখী হোতে, অন্ততঃ কিছু না বুঝে থাকতেই চেষ্টা করছি। এতে যেন নিজেকেই ঠকাচ্ছি মনে আমার মনে হয়। সব জেনে বুঝেই যদি মেনে নিতে চাই সেটা করাই আমার মতে ঠিক ভাবে চলা। আর মেনে নিতে না চাইলে সে ব্যবস্থাও তখন নিশ্চয় করা যায় সহজেই।

অতসী—তাহোলে খনার প্রশ্নটীর উত্তর তো হোয়েই গেলো! দাঁড়ালো এই যে আমরা যেন মানে অন্ততঃ একটী দিনের কিছুক্ষণ সময় রাখতে পারি যাতে আমরা সত্যি কীভাবে আছি—সেটী উপলব্ধি করতে পারি। তারপর সে অবস্থার কিছুটা আরও উন্নতি করা যায় কি না সে সম্বন্ধে কিছু সমস্যা আছে কি না বুঝতে চেষ্টা করে প্রয়োজন মত এবং অবস্থা অনুযায়ী সেটীর সমাধানের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করতে পারি। এসব সমস্যা যে আমাদের এড়িয়ে যেতেই সাধারণতঃ ইচ্ছা হোয়ে থাকে সেটী মনে রেখে চলতে পারি। আমরা এসব এড়িয়ে গেলে বা সেই রকম চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে আরও বেশী অসুবিধাই যে হবার কথা সেটীও মনে রাখলে—এইভাবে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা বা চেষ্টা থেকে বিরত হওয়া সহজ হবে। এই তো? এর কথায় এ সব দিকেও আমাদের খানিকটা সচেতন থাকা দরকার—কেমন?

টিনা—বাপ্‌রে বাপ্—সবাই দেখছি এমনভাবে এক একদিকে আমাদের সচেতন থাকতে বলছে যে জীবনে আর 'আরাম' বলে কিছুই থাকতে পারবে না! এ বলছে এদিকে মন দাও, ও বলছে ওদিকে মন দাও, সে বলছে সেদিকে মন দাও। আরে বাবা এতদিকে মন দিতে গেলে—সচেতন হোতে গেলে—আর জীবনে 'আনন্দ' বলে কিছু থাকে কি?

অরুণা—আচ্ছা, সত্যি করে বলতো—কোন কোন বিষয়ে সত্যি নিজের সচেতন থাকার ফলে কিছুটা সুবিধা আর সেই সঙ্গে নিজের মনে আনন্দ পাওয়া যায় না কি?

আশা—কেমন কোরে এটা হোতে পারে বল দেখি শুনি!

অরুণা—ধর যেন বাসে কোরে বালীগঞ্জ থেকে ডালহৌসী স্কোয়ারে যাচ্ছো! পথে কত কিছুই তো পড়বে—বাসেও কত কিছুই ঘটবে—সে সব সম্বন্ধে যতটা সচেতন থাকতে পারবে ততটাই সুবিধা ও আনন্দ পাবার সম্ভাবনা থাকবে না কি?

আশা—কি সুবিধা আর কি আনন্দ পাবার সম্ভাবনা থাকবে?

অরুণা—এটা তো আমিও বলতে পারবো। ধর যেন

তুমি বলার ভাগ্যে পাওনি—প্রথমে দাঁড়িয়েই থাকো. কাছাকাছি কে কোথাকার টিকিট কাটছে যদি সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পার—আর সে নামার উপক্রম করতেই তার সীটটী নেবার চেষ্টা করতে পারো, সেটা তোমার বলতে পারার সুবিধা করে দিলো না কি ?

আভা—তারপর যত যেন বলেছ তুমি বাসে—কত সুন্দর সুন্দর মায়গা দিয়ে বাসটী তো যাচ্ছে—কত রকমের লোক—পথেও চলছে, বাসেও উঠছে নামছে—কোথাও বা রাস্তায় ফুলের ঝাঁকা নিয়ে মালী যাচ্ছে ফুল বেচতে—এ সবের মধ্যে আনন্দ পাবে না কি ? সে-ও তো এক সম্বন্ধে সচেতন আছো বলেই ? নইলে বাড়ীর, অফিসের বা আর কোনও বিশেষ চিন্তাতেই বিভোর থাকতে পারতে—তাহলে আর এসব চোখেও পড়তো না—আনন্দও পেতে পারতে না !

ইন্দু—তা ঠিক। তবে এইরকম সচেতন থাকতে পারতেও বেশ কিছুটা যেন শক্তি ক্ষয় করতে হয়—তাই না ?

অপ—আমার মনে হয় তার কারণ এই যে আমরা আমাদের জাগ্রত অবস্থাতেও ঠিক যেন পুরা মাত্রায় জাগ্রত থাকি না। তা যদি থাকতে পারতাম তবে জাগ্রত থাকাটাই সচেতন থাকারই সমান হোয়ে যেত। আর আরাম ও আনন্দ এ দুটী জিনিষই নানা দিক থেকে এবং বেশী মাত্রায় উপভোগ করাও হোয়ে যেত।

অলকা—কি রকম ? কেন ?

অপ—কি রকম বলবো ? ধর যেন একটি মেয়ে তার দুটি শিশু সন্তান নিয়ে তার একটী বন্ধুর বাড়ী দুপুর বেলায় গল্প করতে এসেছে, আর ঐ বন্ধুরও দু একটী শিশু সন্তান আছে। এ রকম অবস্থায় ঐ দুটী মেয়ের গল্প করার ইচ্ছাটা মিটবে কি মিটবে না, সেটা তাদের ঐ সচেতন থাকার গুণটীর উপরই নির্ভর করবে। যদি ঐ গুণটী তাদের থাকে তবে দুজনেই দুজনের বাচ্চাদের সামলিয়ে নিজের নিজের গল্প করতে ও শুনতে পারবে। আর যদি তা না থাকে তবে গল্প করা তো দূরের কথা—হয়তো বা জিনিষ পত্র লণ্ডভণ্ড হবার বা কামাচোরার ভয়ে ভবিষ্যতেও আর একাকে দুজনের দেখাশোনা হবার আশা বা ইচ্ছা কোনটাই থাকবে না ! এ রকম ব্যাপার তো আমরা কতই দেখে থাকি, তাই না ?

আচ্ছা, এবার বলি কেন এ রকম হয়। কারণ অবশ্য অনেকই আছে যার ফলে আমরা এই সচেতন থাকার ক্ষমতাটী খানেক কবি না বা শিশু বয়সে করলেও পরে একেবারে ভুলেই যাই—হারিয়েই ফেলি গুণটীকে ! এখন আমার যে কারণটী মনে পড়ছে সেটাই যদি সবচেয়ে আগে। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ছোটদের বলি যে "এসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই—এসব আমি ঠিক করে দেখ'খন"। আসলে কিন্তু সত্যি আমি 'এসব' ঠিক করে দিয়ে তাকে ভবিষ্যতে সবদিকে সচেতন থাকার গুণটীর অভাবে কষ্ট পাবারই ব্যবস্থা করে দিলাম। যে বয়সে শিশু যতটা বা কিছু করতে পারে—তাকে পুরামাত্রায় সে সব তাই করতে দিয়ে, তাকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে চলতে সাহায্য করলে তার ঐ সচেতন থাকার গুণটী অভ্যাসে দাঁড়ায় এবং পরবর্তী জীবনে সেটা তার স্বভাবেই পরিণত হয়। এজন্য তার বিশেষ কোনই চেষ্টা বা শক্তিক্ষয় করতে হয় না। আপনা থেকেই সে তার চার পাশের অবস্থা বুঝে ঠিক মত ব্যবস্থা করেও অনেকখানি শক্তি বাড়তি রাখতে পারে যাতে সে নতুন নতুন জিনিষে সেই শক্তি ব্যবহার করে আনন্দ পেতে পারে। এই রকম স্বভাবের জন্য সে যখন ঘুমায় তখন পুরোমাত্রায়ই বিশ্রামে নিয়ে থাকে, আর যখন জেগে থাকে পুরোমাত্রায়ই সচেতন থাকে। এ জিনিষটা শৈশবের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসেরই ফল।

ইলা—তাহোলে দেখা যাচ্ছে যে শৈশবে আমার মোটেই ভালো অভিজ্ঞতা বা অভ্যাস হোতে পারেনি।

কল্পনা—এটা তুমি যে দুঃখ কোরেই বলছো—সে তো বোঝাই যাচ্ছে। অনেকের কিন্তু আমার এ অবস্থায় খুবই রাগ হয়।

ইলা—সত্যি কথা বলতে গেলে আমারও যে একটু রাগ রাগ হোচ্ছে না—তা নয়।

ইলা—রাগ হোচ্ছে কেন ?

ইন্দু—কেউ যদি আমার দোষের কথা বলে—তবে আমার রাগ হবে না ? হবেই তো !

ইলা—হায় হরি—অ মার শৈশবে কি দোষেছিল না দোষেছিলো তাই মনে আমার হারিয়ে যা দোষ কি থাকতে পারে ?

ইন্দু—তবে বলো, কেন রাগ হোচ্ছে তোমার ?

ইলা—তা তো বলতে পারছি না—জানিই না—তা যদি কি বলো ?

চপলা—অন্যকেই জিজ্ঞাসা করো বরং—সে তো সবই জানে।

জয়া—সবই জানি না নিশ্চয় ! তবে এ বিষয়ে আমার যা মনে হয় তা নিশ্চয় বলতে পারি এবং বলছি, শোনো চপলা মন দিয়ে। আমাদের প্রত্যেকেরই তো নিজেদের সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে যে আমি এই রকম, অমুকে ঐ রকম ইত্যাদি—তাই তো ? এখন যদি হঠাৎ দেখতে পাই যে আমি নিজেকে যতটা ভালো বলে ভাবি—ততটা ভাল যেন আমায় দেখাচ্ছে না, এবং অন্যরাও আমাকে যতটা ভালো বলে জানতো বলে আমি মনে কোরতাম তারা যেন আর তা জানছে না দেখা যাচ্ছে, তাতে আমার নিজেরই কিছু একটা ভালো জিনিষ হারিয়ে যাবার মত বিরক্তিকরই যে ঠেকবে—এটাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং রাগও হবে দুঃখও হবে। আর সত্যিই তো এটা হারিয়ে না গেলেই যে সবচেয়ে ভালো হোত—তাতে তো আর কিছু সন্দেহ নেই ! সকলেই ভাবতে চায় যে নিজের শৈশবটা বড়ই মধুময় এবং বিশেষ ভালো ছিলো ! সে সময়ে যত গুণ আরোপ করার কথা, সবই আরোপ করেছি, এটাই তো সবাই নিজের সম্বন্ধে ভাবতে পারে।

উষা—তা যাই বলো—এ রকম একটুখানি রাগ বোধ হওয়াটা আমরা ঠিকই স্বাভাবিক বলেই ধরে থাকি। কিন্তু এর চেয়ে অতিরিক্ত প্রকাশও আমি দেখেছি। যদি ইলা এ জিনিসটা এমন ভাবেও নিতে পারতো যে ওর সুশিক্ষার অভাবের কথা এখানে বলে ওকে আমরা অপ্রস্তুত করতে চেয়েছি বলেই এসব কথা তুলেছি এবং ফলে ও আমাদের সঙ্গে প্রচণ্ড কলহ করতেও পারতো। আমাদের নানা দোষ দেখিয়ে শুনিয়ে নানা ভাবে আমাদের অপমান করার চেষ্টাও কোরতে পারতো। যতখানি রাগ হোলে এ রকম করতে বাধ্য হোত—ততখানি রাগ যে ইলার হয়নি এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। আমাদের এইটুকু আলোচনার জন্য অতটা রাগ তো হবার কথাও নয়। তবে এইটুকুতেই কারো কারো অতটা রাগও হোতে পারতো আর সেটা আমরা সকলেই স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতাম।

উষা—আমরা যেন মূল বিষয় থেকে অন্যদিকে সরে যাচ্ছি মনে হোচ্ছে। আমার মতে এখন আমার আগের কথায় ফিরে যাওয়া দরকার। কথা হোচ্ছিল এই যে শৈশবে ঠিক মতো অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস হতে পারার পূর্ণ সুযোগ পেলে প্রাপ্তবয়স্কেরা জীবনের যাবতীয় করণীয় কাজ করে প্রচুর আনন্দ ও আরামও পেতে পারে, আর তার পরেও তাদের বাড়তি শক্তি থাকতে পারে নতুন কিছু জানতে ও সে সবের মাধ্যমেও আনন্দ ও সুখ পেতে। এটা তো সত্যি আমরা সবাই বুঝি যে নিজের এবং নিজের প্রিয়জনের সুখ ও আনন্দের জন্যই আমরা সব সময়ে চেষ্টা করে থাকি। বিশেষ কোরে শিশুদের তো সবাই বিশেষ কোরে ভালোবাসে। তাদের ভবিষ্যৎ যাতে সুখের হোতে পারে তারই জন্য কত আত্মত্যাগের কাহিনীও তো আমাদের জানা আছে।

জয়া—সত্যি কথা বলতে গেলে আমি বলতে পারি যে কখন আমরা আত্মত্যাগের ব্যবস্থা করছি, আর কখনই বা নিজের স্বার্থ সিদ্ধিরই ব্যবস্থা করছি সেটা আমরা নিজেরাই অনেক সময়ে বুঝি না। আমি তো চোখে আঙুল দিয়ে অনেককেই দেখাতে পারি যে বহু সময়ে আমরা নিজেকেই সন্তানের চেয়ে বেশী ভালোবাসি এবং এই জন্য সন্তানকে অহেতুক দোষ দিই—তার ভবিষ্যৎও তারাক্রান্ত করে তুলি।

ছবি—আচ্ছা জয়া, আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাও দেখি আমি এরকম করছি কি না।

জয়া—খুব দেখাতে পারি। তুমি তোমার নিজের উচ্চ আশা পূর্ণ হয়নি বলে নিজেকে খুবই বঞ্চিত মনে কর বলেই হয় তো তোমার ছেলেমেয়ে দু'টীকে উচ্চ আশা পোষণ

করতে সর্বদা উৎসাহ দিয়ে থাকে। কিন্তু পরিমাণ উৎসাহ দেওয়া তো খুবই দরকার, কিন্তু তুমি যেন ইদানীং বেশ বাড়াবাড়ি কোরে ফেলছো এ বিষয়ে। এটা তো সহজেই বোঝা যায় যে ওদের উচ্চাশা পূর্ণতা পেলে তারই মাধ্যমে তোমারও নিজেরই যেন অপূর্ণ উচ্চাশা পূর্ণ হবার মতই হবে সেটা। কিন্তু তারা দুটীতে সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করে সুখী হতেই চায়। তুমি যদি নিজের আশা ওদের ঘাড়টা নিজের মধ্যেই রেখে ওদের মনে যে সব আশা ওরা পোষণ করে সেটা বুঝে ওদের সাহায্য করতে, যাতে ওদের আশা পূর্ণ হয় আর ওরা ওদের আশানুযায়ী সুখী হয়, তবেই সেটা ওদের প্রতি তোমার স্নেহের প্রকাশ বলে ধরা ঠিক হোত বলে আমি মনে করি। তুমি এখন যা কোরছো সেটা হোচ্ছে তোমার নিজেরই স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াস।

ছবি—তোমায় তারা এ সব বলেছে নাকি?

অরা—হ্যাঁ বলেছে-ই তো। তবে এমন করে তো আর ওদের বলতে পারার কথা নয়, পারেওনি এইভাবে বলতে। কিন্তু ওদের এবারকার পরীক্ষার ফল দেখে যদিও ওরা পাশ করেছে—তবু তুমি এতো মন খারাপ কোরেছ ওরা প্রথম পাঁচজনের মধ্যে হয়নি বলে যে ওদের সেটা খুবই দুঃখের হোয়েছে। সে দুঃখ ওরা যেন আর নিজের মধ্যে রাখতেও পারেনি। কী করে ওরা তোমায় সুখী করতে পারে এ চিন্তায় অস্থির হোয়েই আমার কাছে এসেছিলো দুটিতে।

ছবি—তা কি কি বলেছিলো ওরা সব খুলেই বল।

অরা—সে আর একদিন হবে। আপাততঃ এটাই বুঝতে চেষ্টা কর যে ওরা যেভাবে শিখতে পারে—সেই-ভাবেই ওদের শিখতে দেওয়া ভালো। তোমার মতামত ওরা ভালোই জানে, এবার ওদের মতামতটা একটু তুমি জানতে বুঝতে চেষ্টা কর।

ইন্দিরা—আমার একটা ব্যাপার মনে পড়ছে, বলি। অনেক সময় দেখেছি আমার নিজেরই একটা অদ্ভুত রাগ এসে যায়—যখনই আমার বাচ্চারা কেউ হঠাৎ কোন আঘাত পেয়ে ছুটে আসে আমার কাছে কাঁদতে কাঁদতে। একদিন রীণা যখন আরও ছোট ছিলো, তার খেয়ে ছুটে মুখ থুবড়ে গিয়ে রাস্তাতে পা বেঁধে পড়ে গেলো—আর পা কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো! ও তো ভীষণ কাঁদছিলো, কিন্তু ওকে সান্ত্বনা দেবার কথা আমার মনে এলো না। আমার কেন জানি না ভীষণ রাগ হোল—আর আমি ওকে বেশ জোরে এক থাপ্পর বসিয়ে দিলাম। বাড়ীতে অবশ্য অন্যরা ছিলো, ওকে তারাই তুলিয়ে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো। কিন্তু এখন আমার মনে হোচ্ছে যে এর ঐ অতিরিক্ততার ফলেই কি ও অমন জোরে গেছে? এটা যে আমার কেন আগে মনে পড়েনি—তাই অবাক্ লাগছে!

অরা—হ্যাঁ, এ-ও একরকম আত্মপ্রেম-ই তো। সন্তানের ব্যথা লাগলে মায়ের মনে কতগুলি ভাব আসা স্বাভাবিক—যেমন নিজের অসাবধানতার জন্যে হোয়েছে এইরূপ অপরাধ-বোধ, বাচ্চার ব্যথা লেগেছে, রক্ত পড়ছে—এটাও দেখা খুবই কষ্টকর মায়ের পক্ষে এবং এ সব অবাঞ্ছিত অবস্থার পড়ার জন্য সন্তানের দুর্ঘটনাই অর্থাৎ সন্তানই তো দায়ী! সে এই দুর্ঘটনায় না পড়লে তো আর এমন হোত না! সুতরাং তার উপর রাগ হওয়াটার মধ্যে খানিকটা যুক্তি আছে বৈকি। তবে নিজের অসুবিধার কথাই তো এখানে বিরক্তিবোধ আনছে! সন্তানের কষ্টে নিজের কষ্ট ভুলে যেতে পারলে তো সহানুভূতিই আসতো আর তার যাতে কষ্টের লাঘব হয় তাই করতে ইচ্ছা হোত! এটা ঠিকই যে সন্তানকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েও আমরা একরকম আমাদেরই ভালোবাসি। কিন্তু সন্তানকে নিজের একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত চিরকাল না দেখে তাকে একটী আলাদা গোটা মানুষ হিসাবে প্রথম থেকেই দেখতে পারাটাই সন্তানের পক্ষে মঙ্গলজনক।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণের পর সত্য

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

আঠার বৎসর আগে 'উজ্জয়িনী' মাসিক পত্রিকায় মহাভারতের সত্য সম্বন্ধে দুইজন লেখকের দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহাদের পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত উজ্জয়িনী ভারত পত্রিকার পঞ্চম বৎসরে অর্থাৎ ১৩৫৩ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উপরি উক্ত নামীয় প্রবন্ধে 'আমাদের বক্তব্য' বলিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা আজও আমাদের প্রয়োজন, আজও চিন্তা ও আলোচনার বস্তু—এইজন্য উহা আজ এই ভাদ্রমাসের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-ক্ষণে স্মরণ করিতে পুনঃ প্রকাশ করিলাম।— সম্পাদিকা উঃ ভাঃ

আমাদের বক্তব্য ঃ—

শাস্ত্র হইতে বহু ঘটনার ও বহু লেখকের উল্লেখ করিয়া সত্যের ব্যবহারিক রূপ ও সত্যের পারমার্থিক রূপে প্রতিষ্ঠা-দানকারী উভয় পক্ষকেই সমর্থন করা যায়; কিন্তু উহাতে সত্য'র মূল রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে না। আমি আলোচনা করিব, কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া দেখিলে উভয় পক্ষেরই মর্যাদা রক্ষিত হইতে পারে। সত্যের ব্যবহারিক রূপের খবর অনেক মহাপুরুষ এবং বিশেষভাবে প্রাণপুরুষ পুরুষোত্তম সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ব-দরবারে পৌঁছাইয়াছেন। ইহাকে অস্বীকার করিবার দুঃসাহস কাহার আছে? পক্ষান্তরে সত্যের পারমার্থিক রূপকে অস্বীকার করিলে তাহাতেই অবি-সত্যতারই অপমৃত্যু ঘটে। আমরা কোন্ পক্ষকে লইব, কাহাকেই বা ছাড়িব? বহু ঘটনার উল্লেখদ্বারা প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিলেও ইহার মীমাংসা হইবে না: মীমাংসা খুঁজিতে হইবে পরস্পর-বিরুদ্ধ এই ঘটনাবলীর মোড়-টানার মধ্যপথে কি রহস্য আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার খোঁজ করিয়া। সত্য একান্ত ব্যবহারিকও নয়, সত্য একান্ত পারমার্থিকও নয়। যে-সত্য দুইটি জগৎকে সমভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে, ব্যবহারিক বহির্জগতের ঘটনাবলী ও পারমার্থিক অন্তর্জগতের ঘটনাবলীকে যাহা ধরিয়া সমাধান দিতে পারে, তাহাই ভাগবতের 'পর সত্য'—'সত্যং পরং ধীমহি' শ্রীকৃষ্ণই মূর্তিমান এই পরসত্য। কোনও লোক যখন নৌকার গুণ টানিতে থাকে, তখন নৌকার হাল ধরিয়া যে মাঝি থাকে, সে নৌকার সামনের দিকটাকে অনেকটা নদীর মাঝখানের দিকে ঘুরাইয়া রাখে। নৌকার মুখ রহিয়াছে মাঝ-দরিয়ার দিকে, আর তীরে দাঁড়াইয়া টানা হইতেছে গুণ। পরস্পর-বিরোধী এই মোড়-টানার মাঝে নৌকা যেমন আগাইয়া যাইতে থাকে, ঠিক তেমনি মানুষের জীবনেও এইরূপ দুইটি টান সমভাবে আত্মপ্রকাশ করে—একটি জড় ব্যবহারিক জগতের টান এবং অপরটি অজড় পারমার্থিক জগতের টান। কোনও একটি টানে আসক্ত হইয়া পড়িলেই নৌকা বিপন্ন হইবে, অগ্রগতি নিরুদ্ধ হইবে। কোন্ টান সত্য? দুই টান সমভাবেই সত্য বলিয়া কোনও একটিই একান্তভাবে সত্য নয়। ইহাই বিজ্ঞানের 'Parallelogram of forces'। জীবন 'মধ্যপন্থা' অবলম্বনে চলিলেই তাহা হয় সহজ। একান্ত প্রবৃত্তির পথেও জীবন আটকাইয়া পড়ে, একান্ত নিবৃত্তির পথেও জীবন আটকাইয়া পড়ে। ইহাই ঐনিতাগোপালের 'অড়াজড় সমন্বয়'।

মানুষ আবেষ্টনকে সৃষ্টি করে, আবেষ্টনও মানুষকে সৃষ্টি করে। মানুষ-নিরপেক্ষ আবেষ্টন এবং আবেষ্টন-নিরপেক্ষ মানুষ দুই-ই বিমূর্ত প্রত্যয় (abstract concept)। মানুষ ও আবেষ্টন দুই-ই independent ও inter-dependent। দুই দুইয়ের দ্বারা সৃষ্ট হওয়ার দিক দিয়াই এই বিশ্ব অনন্তকাল সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু কৈন 'মন' এই দুয়ের সমান মূল্য দিতে পারে না। হয় সে মানুষকে মূল্য করে, আবেষ্টনকে করে গৌণ, নয়

তো আইনেরকে করে সে মুখ্য, মানুষকে করে গৌণ। ভারতীয় ঋষিদ্রষ্টা মুখ্য স্থান দিয়াছে মানুষের, মানুষের আদর্শের; তাই সেখানে ইহা এই জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করিতে পারিল। আর কম্যুনিজম্ মুখ্য স্থান দিয়াছে আইনের-কে, বাস্তবকে; তাই তাহা আইনের বদলাইয়াই মানুষের পরিপূর্ণ পরিবর্তন আনিতে চায়। ভারতের প্রচলিত কৃষ্টি আদর্শকেই বড় করিয়া দেখে; আদর্শই তাহার কাছে বস্তু। সৃষ্ট জগৎ তাহার দৃষ্টিতে ব্যবহারিক মাত্র। কিন্তু যে-আদর্শের কোনও কার্য্যোপযুক্ত রূপ নাই, তাহা সত্তা নয়। কার্ল মার্কস্ লিখিয়াছেন :—

'The truth i. e., the reality and power, of thought must be demonstrated in practice. The contest as to the reality or non-reality of a thought which is isolated from practice, is a purely scholastic question.....Philosophers have only interpreted the world in various ways, but the real task is to *alter* it…'

শ্রীকৃষ্ণ দুইকেই—আদর্শ ও বাস্তবকেই—সমমূল্যে গৌরব দান করিয়া দুইয়ের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। 'জীবনের' মধ্যেই হয় এই দুইয়ের সমন্বয়। জীবনের বাহিরে সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণ পণ্ডিতী আলোচনা মাত্র। পারমার্থিক সত্যস্পর্শহীন ব্যবহারিক সত্যও scholastic, ব্যবহারিক-সত্যস্পর্শহীন পারমার্থিক সত্যও প্রজ্ঞাবাদের লড়াইয়ের বস্তু মাত্র। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের মধ্যেই ব্যবহারিক পারমার্থিকের দ্বন্দ্ব তিরোহিত। তাই তিনি বলিতেছেন 'সত্যং চ সমদর্শনম্'। সমদর্শনই সত্তা। ব্যবহারিক-পারমার্থিকের সমদর্শনই 'সত্য'। শ্রীকৃষ্ণই সত্যস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণই সত্তারূপ।

আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জ্জন্ম' প্রহসনটিকে অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব। 'পুনর্জ্জন্মে'র নায়ক যাদব চক্রবর্ত্তী ছিল খুবই কৃপণ। যাদবের কার্পণ্যে তাহার স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন বিব্রত। তাহারা যাদবের উপর হাড়ে চটিয়া আছে। যাদবকে জব্দ করিবার এক ফন্দি তাহারা আটিল। যাদবের জন্ম-কোষ্ঠীতে ছিল অগাধ বিশ্বাস। কোষ্ঠীতে লেখা ছিল, অমুক দিন তাহার সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটিবে। ইহার সুযোগ যাদবের আত্মীয়স্বজনগণ লইল। মৃত্যুর নির্দ্ধারিত দিন যখন আসিল, যাদব ভয়ে ভয়ে পুকুরের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল এই ভরসায় যে সাপ আসিলে মানুষে তাহা দেখিবে ও মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু সাপ আর আসিল না। সিক্ত বসনে যখন সে বাড়ীর নিকটে আসিল, তখন শুনিতে পাইল তাহারই বাড়ীর মধ্যে একটি কান্নার রোল উঠিয়াছে। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সে দেখিল তাহাকে যেন একটি কাপড় মুড়ি দিয়া শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার স্ত্রীপুত্র পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে, আর তাহার বিপত্নীক ভগিনীপতি অশ্বিনীবাবু খুব গম্ভীরভাবে পদচারণা করিতেছে। যাদব জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার কি?' অশ্বিনীবাবু বলিল, 'যাদববাবু আজ মারা গেলেন'। যাদব বলিল—'বলেন কি?' 'হাঁ, সর্পাঘাতে। কোষ্ঠী তো আর মিথ্যা হইবার নয়। নিশ্চয়ই যাদববাবু মারা গিয়াছেন'। 'আমিই যে যাদববাবু'। 'হাঁ, আপনাকে দেখিতেছি তো যাদববাবুর মত, কিন্তু আপনাকে তো প্রমাণ করিতে হইবে যে, আপনিই যাদববাবু। কোষ্ঠীর সাক্ষে তো আপনি মরিয়াছেন।' 'আমার স্ত্রীপুত্র এবং আপনিই তো আমার সাক্ষী'। 'আমরা তো বলি, আপনি মরিয়াছেন।' স্ত্রী পুত্রের কাছে গিয়া যাদব জিজ্ঞাসা করিল, 'ওগো আমি মরিয়াছি?' তাহারা 'ভূত আসিয়াছে' বলিয়া চীৎকার করিয়া পলাইল। এদিকে থানা হইতে দারোগাবাবু 'on charge of false personification' (জাল মানুষ দাঁড়াইয়া আমার অভিযোগে) যাদবকে গ্রেপ্তার করিল। যাদবের তখন নিজের বুদ্ধির উপরই অবিশ্বাস আসিয়াছে। সে নিজের গায়ে চিমটি কাটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'যাদব তুমি বেঁচে আছ তো?'

এমনিই হয়। আজ যাদব নিজের সাক্ষ্যে নিজেই প্রমাণ করিতে পারিতেছে না যে, সে বাঁচিয়া আছে। সবাই যখন বলে, সে 'মরিয়াছে', তখন তাহার সাধ্য কি

যে, সে নিজের সাক্ষ্যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে? প্রতি মানুষের নিজকে চিনিতে হইলে, জানিতে হইলে, আত্মাদন করিতে হইলে দুইজনের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। প্রথমে নিজের সাক্ষ্য, তারপর তাহার আপেক্ষিকের সাক্ষ্য। শ্রীরামচন্দ্র নিজের সাক্ষ্যেও যেমন 'ছিলেন', তেমনি শবরী গুহক হনুমান সুগ্রীব কাঠবিড়ালীও সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, শ্রীরামচন্দ্র তাহাদের কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। আত্মার সাক্ষ্য ও সর্বের সাক্ষ্য মিলিত হইলেই তাহা হয় সত্য সাক্ষ্য। সাধারণ লোকের সাক্ষ্য ও তত্ত্ব-পরীক্ষকদের সাক্ষ্যই শ্রীকৃষ্ণকে প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনিই বিশ্বের প্রাণপুরুষ। আজন্ম বৈরাগী শুকদেব গোস্বামীর যিনি ইষ্ট, বেদান্তের বিশ্বজনেরও যিনি ইষ্ট, তিনিই আবার তালীয় নাগ, সুদামার ইষ্ট, কুব্জার ইষ্ট। কে না তাঁহার প্রাণবল্লভ-রূপের সাক্ষ্য দিয়াছে? ব্যবহার-মূলক বলিয়া যিনি ব্যবহারিক জগতের সর্বত্রেই সম্মান রাজসূয় যজ্ঞের মধ্যে পাইয়াছেন, তিনিই আবার পরমার্থ ক্ষেত্রে ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি 'আইডিয়া'-র সাক্ষ্যে 'আইডিয়াল', আবার 'প্রাক্টিস'-এর সাক্ষ্যে তিনিই 'প্রাক্টিক্যাল'। শ্রীকৃষ্ণই পারমার্থিক ভারতবর্ষ ও ব্যবহারিক রাশিয়াকে পরিপাক করিয়া সত্য বাস্তব জগন্নাথ। তিনিই বলিতে পারিয়াছেন—'ক্ষেত্রজ্ঞকাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত'। ক্ষেত্রক্ষেত্র ও অক্ষেত্রক্ষেত্রের দাবী কে সমান-ভাবে স্বীকার করিবার দুঃসাহস রাখে? সর্বক্ষেত্রে দাঁড়াইবার অধিকার আছে বলিয়াই তিনি পুরুষোত্তম। আজ তাঁহার শ্রীচরণতলে বিশ্ব এক-বিশ্বে গড়িয়া উঠিবার জন্য ব্যাকুল-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

'সত্য' নির্ধারণ সম্বন্ধেও এই বিচার চলিবে। সত্যের এই বিচার আশ্রয় করিয়া আমরা বুঝিতে পারিব, কেন 'সত্য' ভাবণ করিয়া মহাভারতের নৈতিক নায়ক গমন করিলেন, আবার কেনই বা 'মিথ্যা' বলিয়া যুধিষ্ঠির নরক দর্শন করিলেন। নৈতিকের সত্যও পরমসত্য নয়, উহা মিথ্যাপদবাচ্যই; আবার যুধিষ্ঠিরের 'মিথ্যা'ও মিথ্যা হইতে পারিল, কেন না সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবাক্যে যুধিষ্ঠির সম্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়াছিলেন, 'মিথ্যা-ভাষণের জন্য যুধিষ্ঠির নরকদর্শন করেন নাই, যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন সম্ভব হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণবাক্যে সন্দেহ প্রকাশের জন্যই'। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে বলিয়াছিলেন—'অশ্বত্থামা হতঃ', কিন্তু সত্যের অভিমান লইয়া যুধিষ্ঠির তাহা বলিতে পারিলেন না। তিনি সত্যরক্ষার মিথ্যা অভিমানে 'ইতি গজঃ' যোগ দিলেন। এইখানে তাঁহার ভাষণ মিথ্যা হইল। শ্রীকৃষ্ণের সামনে দাঁড়াইয়া সত্য মিথ্যা নির্ধারণের এই ধৃষ্টতা বিশ্বপ্রকৃতি বরদাস্ত করেন নাই; তাই তাঁহার নরকদর্শন অনিবার্য। সত্য কি মিথ্যা কি, তাহা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও বেশী বুঝিলেন যুধিষ্ঠির! আজ বিশ্বরূপ সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রান্তে বসিয়াই লিখিতে হইবে সত্য মিথ্যার স্বরূপ কি। মনঃকল্পিত প্রচলিত সত্য মিথ্যার ভেদ গলাইয়া দিয়া তিনি বাস্তব সত্যের আদর্শ বিশ্বের সামনে প্রচার করিয়াছেন।

আত্মহিত ও বিশ্বহিতের দৃষ্টিকোণেই সত্যকে বিচার করিতে হইবে। ধীরেন মজুমদার মহাশয় শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-জগতগণের পর আমরা বর্তমান যুগের মানুষ এই সত্যকে তেমন করিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে মানিয়া উঠিতে পারিতেছি না। দশরথ একদিন মহিষী কৈকেয়ীর সেবায় তুষ্ট হইয়া বরদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত বুঝিতে আমাদের কোনও অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু পরের ঘটনার ভিতর আমরা 'বাক্ছলে'র সূচনাই দেখিতেছি। বরদানের প্রতিশ্রুতির সময় কি রাজা দশরথের হৃদয়ের তলদেশেও এমন অভিপ্রায় ছিল যে, কৈকেয়ীর বর চাহিবার নমুনা হইবে রামচন্দ্রের বনগমন? বরদানের প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত 'সত্য'; কিন্তু বরদানের ব্যবসের মধ্যে রহিয়াছে ন্যায়শাস্ত্রের ছল। এ বিচার না করিলে সত্য-মিথ্যার বিচার হইবে কেমন করিয়া? 'বক্তুরভিপ্রায়াৎ অর্থান্তরকল্পনা বাক্ ছলম্'—বক্তার অভিপ্রায়ের অর্থান্তর কল্পনাকে বাক্যের ছলনা বলে। কৈকেয়ী এই ছলের আশ্রয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দশরথের যাহা মনের কোণেও ছিল না, তাহা একজন ছলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আদায় করিলে কি তাহা সত্য হয়? তাহা কি শ্রীরামচন্দ্রের

'পিতৃসত্য' হয়? 'মুখের সত্য' সত্য নয়, হৃদয়ের সত্যই সত্য। মুখের সত্য ও হৃদয়ের সত্য যখন পৃথক হয়, তখন কোন্ সত্য প্রতিপালন করিব? অন্নময় কোষের সত্য, প্রাণময় কোষের সত্য, মনোময় কোষের সত্য, বিজ্ঞানময় কোষের সত্য এবং আনন্দময় কোষের সত্যের মধ্যে যখন সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন কোন্ সত্যের আশ্রয় লইব? এই পাঁচ স্তরের সত্যের সমন্বয়ে যে সত্য প্রকাশিত হইবে, তাহাই 'পরসত্য'। মানুষের Lower self-এর সত্য, এবং higher self-এর সত্য পৃথক হইতে বাধ্য। কোন্ সত্য নিব? গীতা বলিতেছেন—'যাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, সে-ই ভক্ত'। তাহা হইলে যীশু-লুথার-সক্রেটিস-গৌরনিতাই-বুদ্ধ প্রভৃতি আর ভক্তপর্যায়ে পড়েন না। যীশু মানুষকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই না তিনি ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াছিলেন? ঐ সব মহাপুরুষগণ মানুষের নিম্নতর সত্তাকেই উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন ঠিকই। বিশ্বের উচ্চতর সত্তাকে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা ছিলেন পরম ভক্ত। ছেলেমানুষী সত্য বিশ্বজীবনে চলে না। আমি যে-অর্থে যে-বাক্য বলিব এবং সেই-অর্থে সেই-বাক্য গ্রহণ করিলে বিশ্বজীবনে তাহার যে-ফল ফলিবে, তাহার উপর সত্যাসত্য-বিচার নির্ভর করিবে। 'আমি-সূর্য-দেখিতেছি'—এতখানিই সমগ্র সত্য। আমার দেখাই সবখানি 'সত্য দেখা' নয়, সূর্যকে সূর্যের মতই দেখিতে হইবে। আমার 'দেখা'র ভিতরে আমি ও সূর্যের সমন্বয় বিহিত হইবে, তবেই না দেখা 'সত্য' হইবে,? আমি তোমাকে 'যাহা' বলিয়া দেখিতেছি, তুমি যতক্ষণ না আমার সেই-দেখাকে প্রাণ খুলিয়া অনুমোদন করিতেছ, ততক্ষণ আমার দেখা সত্য 'দেখা' হইল না। ঐরূপ দেখা আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত, বস্তুতন্ত্র দেখা; উহা বস্তুতন্ত্র নয়। কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা যদি দশরথ প্রাণ খুলিয়া অনুমোদন করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যু হইত না, সত্যাশ্রয়ের ফলে বাঁচিয়াই থাকিতেন। কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনায় দশরথের স্বীকৃতি আদৌ ছিল না। কাজেই কৈকেয়ীর চাওয়াও মিথ্যা, দশরথের তথাকথিত বরদানও মিথ্যা। আমরা সব ব্যাপারের মধ্যে একটা মিথ্যার প্রশ্রয়ই দেখিয়াছি। এমন একটি 'ছুতা', ছলপূর্ণ পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমন করিবার অধিকার তেমন করিয়া স্বীকার করিতে আমরা দ্বিধা বোধ করি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যদি কোনও রোগীর অবস্থা দেখিয়া বলেন যে, 'তোমার বাঁচিবার আর আশা নাই', তবে কি ইহা সত্য-ভাষণ হইবে? না, হইবে না। ডাঃ রায় কি মানুষের 'জীবন' সম্বন্ধে এমনই স্থির-বুদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন যে, তিনি বলিতে সাহস পাইলেন যে, 'তোমার বাঁচিবার আশা নাই?' বাঁচিবার আশা ছিল না, অথচ বাঁচিয়াছে—এরূপ ঘটনা কি কোনও দিন ঘটে নাই? জীবনের গতি অতি সূক্ষ্ম; তাহার রহস্য কোনও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাও ঠিক ঠিক আয়ত্ত করিতে পারে নাই, পারিবেও না। আরও বিশেষতঃ ডাঃ রায় যদি বলেন যে, রোগীর বাঁচিবার আর আশা নাই, তখন রোগীর উপর এই সত্যভাষণের কি প্রতিক্রিয়া হইবে? যে দুই দিন বাঁচিত, সে তৎক্ষণাৎ হৃতে মারা যাইবে। কি অধিকার আছে এই সত্যভাষণের? সত্যভাষণ যদি জীবনের একটি 'দল' হয়, তবে তাহা সার্থক হইতে পারে। কিন্তু জীবন লইয়া যাহাদের কারবার নয়, তাঁহাদের পক্ষে এই যথার্থ ভাষণের 'সখ' না থাকিলেই সত্যের মুখ উজ্জ্বল হইবে। সেই জন্যই ভূতহিতের সঙ্গে যথার্থ-ভাষণকে বিরোধী শ্রীকৃষ্ণ জুড়িয়া দিয়াছেন।

বীরেন মজুমদার মহাশয় লিখিতেছেন: "কর্ণপর্বে কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতিজ্ঞাকে উড়িয়ে দেননি। প্রকারান্তরে তিনি সত্যরক্ষার সহায়তা করেছিলেন। তিনি অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন—'তোমার প্রতিজ্ঞা যদি রাখতে হয়, তবে তুমি যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা কর, কারণ মানী ব্যক্তির পক্ষে ভর্ৎসনা বধেরই তুল্য'। যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করে পরে তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন, বীরেন বাবুর প্রবন্ধে এ কথার উল্লেখ নাই"। কিন্তু বীরেন মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধেও উল্লেখ নাই, কেন যথার্থভাষণ সত্ত্বেও কৌশিক 'গতঃ সঃ কটং নরকম্'? কৌশিক যথার্থভাষণ করিয়াও নরকে গমন

করিলেন—এইটার রহস্য অনুধাবন করিলে সব-কিছুরই মীমাংসা হইত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতিজ্ঞার বালকোচিত সখ মিটাইবার জন্যই বলিয়াছিলেন—'তোমার প্রতিজ্ঞা যদি রাখতে হয়', তবে যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করিয়া সেই সখ মিটাইতে পার। শ্রীকৃষ্ণ যদি অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কোনও মূল্যই দিতেন, তবে কি 'যদি প্রতিজ্ঞা রাখতে হয়'—এই বাক্য প্রয়োগ করিতেন? অর্জুনের প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাপন-বাচাই নয়, উহা নিছক ছেলেমানুষী। ইহার প্রশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেন নাই। কিন্তু কৌশিকের বেলায় শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দিগ্ধ। তাহার মধ্যে কোনও 'যদি'-র অবসর নাই। কতগুলি শ্লোক ধীরেন মজুমদার তাঁহার পক্ষ-সমর্থনে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্যাখ্যার অবসর নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কৌশিকের যথার্থভাষণ তাঁহাকে নরকেই নিয়াছিল, ইহার মধ্যে অন্য কোনও ব্যাখ্যারই স্থান নাই। তাবুক কৌশিক, একান্ত পারমার্থিক সত্যের পূজারী কৌশিক নরকগমন করিতে বাধ্য। কেন না, তাঁহার সত্যের সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের সত্যের কোনও সামঞ্জস্য নাই। সত্যের বাহিরের রূপের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, সত্যের হৃদয়ের খোঁজ তাঁহার মিলে নাই। ভাবের দৃষ্টিকোণে যাহা সত্য, কৌশিক তাহারই সেবা করিয়াছেন; রসের দৃষ্টিকোণে যাহা সত্য, তাহার সঙ্গে কৌশিক আদৌ পরিচিত নন। কিন্তু 'রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ' শ্রীকৃষ্ণ সত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে সত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের খবর পৌঁছাইয়াছেন।

পার্বতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি ধীরেন মজুমদার মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন—'আত্মাহেতু, পরার্থের জন্য, কিম্বা হাস্যবশতঃ যাহারা মৃষা বলেন না, তাঁহারা অনাগামী হন।' ইহার মধ্যে আলোচনার অবসর থাকে। ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—সত্য-মিথ্যার কোন একান্ত রূপ নাই—তাহারা আপেক্ষিক। ধীরেন মজুমদার মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকটিকে ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন—'যে মানুষ সমগ্র দৃষ্টি হারাইয়া, কেবল ব্যক্তিগত পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি লইয়া আত্মকল্যাণ চায়, কিম্বা পরহিত চায়, কিম্বা ধর্ম রক্ষা করে, সেই মানুষের পক্ষে আত্মহিতের বা পরহিতের দোহাই দিয়া মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া মহা অন্যায়'। কেন না এই মিথ্যা 'অপরিচ্ছিন্নতায়' নয় বলিয়া উহা নিছক মিথ্যাই। যে বাক্য যুগপৎ বক্তার হিত, শ্রোতার হিত, বিশ্বের হিত সাধনে সমর্থ, তাহা আপাতদৃষ্টিতে মিথ্যা হইলেও তাহাই 'সত্য'। সত্য সম্বন্ধে যে বিচার, অহিংসা সম্বন্ধেও সেই একই বিচার খাটিবে। 'হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে' সার্থক হয় যে স্তরে, সেই স্তরে দাঁড়াইয়া মিথ্যা বলিলেও তাহা সত্যই। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্ম-দ্রোণকে হনন করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সর্ত হইতেছে 'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে'। যে-হনন হন্তার অহংজ্ঞান আনিয়া দেয়, 'বাসাংসি জীর্ণানি' পরিত্যাগ করাইয়া যে ভীষ্মাদির নূতন বসন পরাইয়া দেয়, দুর্যোধনের রাজত্বকে পুরুষোত্তম-রাজ্যে গড়িয়া তুলিতে পারে, যে হননের ফলে বিশ্বকল্যাণ আপনা আপনি জমিয়া উঠে, সেই হনন করিয়া হন্তা 'ন হন্তি ন নিবধ্যতে'। অহিংসা সম্বন্ধে যে-সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছেন, সত্য ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধেও সেই একই সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন। তিনি 'ভগবান'; তাঁহার সিদ্ধান্তই চরম এবং নিখুঁত। তাঁহার উক্তির মাঝে সকলের সব সিদ্ধান্ত সমন্বিত।

যে-দুনিয়ার উপর শোষণ কায়েমীভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই দুনিয়ার মুখের সত্য ও হৃদয়ের সত্য কখনও এক হইতে পারে না। কেন না সেখানে প্রত্যেক প্রজাকে অক্রূরের মত 'মুখে' কংসের জয় গাহিতেই হয়, অথচ হৃদয় চায় শ্রীকৃষ্ণের জয়গান। কংসের রাজ্যে সত্যভাষণ অর্থ কংসরাজ্য ত্যাগ। কংসরাজ্যে থাকিয়া কাহার সাধ্য যথার্থভাষণ করে? কংস যেখানে রাজা, সেখানের প্রতিটি মানুষকে কার্যতঃ মিথ্যাভাষণ করিতেই হইবে। শুধু 'সত্য' 'সত্য' বলিয়া যৌথিক চিৎকার করিয়া কি ফল? কংসরাজ্যে, অধর্মরাজের দেশে, দুর্যোধনের শাসনে সবই মিথ্যাশ্রয়ী। সেখানে যথার্থ ভাষণের 'সখ' মিটাইতে গেলে বিদুরের মত পদাহত হইতেই হইবে। মিথ্যার রাজ যেখানে,

সেখানে মানুষ মৌখিক সত্যের উপাসনা করিবে না, এই আশা বাতুলের আশা। সেই দুর্যোগের মধ্যে সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণের মানদণ্ড যদি বদলানো না হয়, তবে মানুষকে সত্যবাদী করার সাধু চেষ্টা চলিতে পারে, কিন্তু সে সত্য কেহ পালন করিতে পারিবে না, মিথ্যাচারেরই প্রশ্রয় দিবে মাত্র। দুর্যোধনের দেশে দেহের সত্য হইতে প্রাণের সত্য বড়, প্রাণের সত্য হইতে মনের সত্য বড়, মনের সত্য হইতে বিজ্ঞানের সত্য বড়, বিজ্ঞানের সত্য হইতে আনন্দের সত্য বড়, আনন্দের সত্য হইতে আত্মার সত্য বড়। যে 'সত্য' এই পঞ্চকোষের দৃষ্টিকোণে সত্য, সেই পরসত্যের খোঁজই শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছেন। সত্যের এমন ব্যাপক ও গভীর রূপ কেহ কোন দিন উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। আবার বলি, একমাত্র দুঃসাহসিক শ্রীকৃষ্ণ-জীবনেই পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যবহারিক সত্য ও পারমার্থিক সত্য সমন্বিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের শোষিত মানুষ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণতলে বসিয়া তাঁহারই জীবনালোকে সত্য-মিথ্যার ক্ষেত্র চিনিয়া লইবে। তখন সব অসুরের মিথ্যা আচরণ ধরা পড়িবে, তাহাদের মিথ্যাও সত্যে গড়িয়া উঠিবে।

তথাকথিত সত্যবচনের অহঙ্কার লইয়া মসগুল হইয়া থাকিলে মানুষকে দুর্যোধনের রাজত্ব ছাড়িয়া 'বনগমন' করিতেই হইবে। দুর্যোধনের সঙ্গে পাশা খেলার ভিতর দিয়া মিথ্যা আচরণই যুধিষ্ঠিরের ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সত্য-রক্ষার্থ শ্রীরাম বনগমন করিলেন, যুধিষ্ঠিরাদি অজ্ঞাতবাসে চলিয়া গেলেন, হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে চণ্ডাল হইলেন। যে সত্যরক্ষা করিয়া প্রত্যেককেই রাজ্য ত্যাগ করিতে হইল, সে কিরূপ সত্য? বিশেষতঃ যে প্রশ্ন দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার জবাব তো যুধিষ্ঠির দিতে পারেন নাই। পাশা খেলায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরের কি অধিকার ছিল দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার? আর জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন বাদ দিলেও কি বর্ত্তমান যুগের মানুষ আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না, কি অধিকার আছে স্বামীর স্ত্রীকে পণ রাখিবার? কি অধিকার আছে নিজের রাজ্যকে, নিজের ভাইদের পণ রাখিবার? কোন্ সত্যের মুখ চাহিয়া যুধিষ্ঠির নিজ রাজ্যকে, নিজ রাজ্যের প্রজাগণকে দুর্যোধনের হাতে সঁপিয়া দিয়া বনগমন করিলেন? সে-সময়ের সত্যে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সত্যের যে রূপ আমাদের যুগের সামনে উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহার আলোকে আমরা বলিব—প্রজার উপর থাকিবে রাজার পবিত্র দায়িত্ব। স্বামীর দেহ যেমন স্বতন্ত্র, স্ত্রীর দেহও তেমনি স্বতন্ত্র ও পবিত্র। প্রজার বিনা সম্মতিতে রাজার নিজ খেয়ালে প্রজাকে বাঁধা তার কাছে দিতে পারেন না। সত্যের আদর্শ আজ ব্যাপকতর ও গভীরতর হইয়াছে। পাশা খেলায় হারিয়া বনগমনের ভিতর আমরা কোনও সত্যের খোঁজ পাই না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের প্রতিটি জটিল কার্যের মধ্যেই আমরা বাস্তব সত্যের খোঁজ পাই। হেগেলের ভাষায় বলিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণই 'Cunning God', 'ধূর্ত ভগবানের' সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণই বর্ত্তমানে শোষিত মানুষকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে।

মুখস্থ-করা সত্য অপেক্ষা সত্যের এই রূপ আপাত-দৃষ্টিতে আজ জটিল হইতে পারে, লোকে ইহাদ্বারা সুযোগ আদায়ও করিতে পারে, আত্মপ্রতারণাও করিতে পারে। কিন্তু আত্মপ্রতারণাই যে-দুনিয়ার আজ ধর্ম, সে-দুনিয়ায় ইহার চেয়ে বেশী আত্মপ্রতারণা করিবার সম্ভাবনা আর নাই। ডুবিতে ডুবিতে মানুষের পা আজ মাটিতে ঠেকিয়াছে, আর অধঃপতন হইবে কোথায়? এখন যে-টুকু নাড়াচাড়া দেওয়া যাইবে, তাহাতেই মানুষ একটু উপরে উঠিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'ন শমানঃ পতত্যধঃ'। যে-বিশ্বে মিথ্যাচরণ রাষ্ট্র-নায়কদের অস্ত্র-হাত হইয়া পড়িয়াছে, সেই বিশ্বের সত্য মিথ্যা-নির্দ্ধারণ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কে করিতে সক্ষম? তথাকথিত সত্যের আচরণ করিয়া বোকা বনিয়া গিয়া রাজ্য ছাড়িয়া আপন পা বাঁচাইবার শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ দেন নাই। যিনি বলিয়াছেন—'হৃষ্ণ রাজ্যং', তিনিই বলিতে পারিয়াছিলেন 'অপঘ্নন্ হতঃ'। তিনিই নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া চক্র লইয়া ভীষ্মের পানে ছুটিতেও পারিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষা কিসে হয়, তাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই জানিতেন। কোনও সময়ে কোনও অবস্থায়ই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার সাহস যাহার নাই, তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষার অধিকারও নাই। শ্রীকৃষ্ণই সত্যস্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প, সত্যপ্রতিজ্ঞ। তাঁহার প্রতিজ্ঞাই টিকিয়াছে, তাঁহার জীবন নমনধর্ম্মশীল বলিয়াই তিনি সত্যকে চিনিতেন। তাঁহার সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণ আমাদের জীবনকে বীর্যে গড়িয়া তুলুক।

বন্দেমাতরম্

মুর্শিদাবাদের বারাণসী (বড়নগর)

॥ শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

বাংলা দেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য যার আদর্শ ও ঐতিহ্য আশ্রয় করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের এক অনবদ্য নিদর্শন বড় নগর।

বহুদিন থেকে পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর স্মৃতি-বিজড়িত তীর্থক্ষেত্র তুল্য পবিত্র পল্লীটি দর্শনের বাসনা মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। সময় করে কিন্তু স্থানটি দেখার সৌভাগ্য হচ্ছিল না। একদিন মন ঠিক করে মাঘ মাসের শেষাশেষি কয়েকজন মিলে রওনা হ'লাম। আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে নেমে জানলাম মাত্র এক ক্রোড় মাইলের পথ। তাই পদব্রজেই পুণ্যশ্লোকা ভাগীরথীর তট বেয়ে অগ্রসর হ'তে থাকলাম। আজিমগঞ্জ ছেড়েই এক রজত-শুভ্র বৈষ্ণব তুল্য দেবালয় দৃষ্ট হ'ল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হ'লাম। সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে পঞ্চ-মুণ্ড মহাদেবের মূর্ত্তি দর্শন করলাম। সেখানে জিজ্ঞাসা করে জানলাম আজিমগঞ্জের জনৈক ধনাঢ্য মাড়োয়ারীর নির্ম্মিত এ' শিব-মন্দির।

পরম উৎসাহে একটু পা চালিয়ে চললাম। ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে আমাদের গন্তব্যস্থলে এসে গেলাম। প্রাণ-মন আনন্দে ভ'রে উঠলো। দেখলাম 'দেবের টোপর ঘেউলে ঘেউলে কাঁপিছে বিরল ঝুরি।' প্রথমেই আমরা চার বাংলার মন্দির-প্রাঙ্গণে হাজির হ'লাম। একটি বর্গ ক্ষেত্রের চার বাহুর উপর চারটি মন্দির। প্রতি মন্দিরে তিনটি করে দেবাদিদেবের মূর্ত্তি। ঘেউলের গাত্রদেশ কারু-কার্য্যময় পোড়ামাটির ভাস্কর্য্যে শ্রীমণ্ডিত। অপলক নয়নে নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করে মুগ্ধ হ'লাম।

এরপর আমরা কয়েক পা অগ্রসর হয়ে রাজরাজেশ্বরী ভবনে পৌঁছালাম। সেখি পূজক তখন পূজার ব্যবস্থা করছেন। একটি বিশাল প্রস্তর বেদীর উপর সারি সারি তিনখানি প্রতিমা—রাজরাজেশ্বরী, অন্নপূর্ণা ও দক্ষিণাকালী। পূজকের কাছে জ্ঞাত হ'লাম—প্রথম-খানি রাণী ভবানীর, দ্বিতীয়খানি তাঁর শাশুড়ীর ও তৃতীয়খানি তাঁর মায়ের প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি বর্ত্তমানে ভগ্নাবশেষ; তবে অতীত সৌন্দর্য্যের সাক্ষী স্তম্ভগুলি অনুপম কারুকলা নিয়ে এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

শুরু হ'ল আমাদের আবার পদযাত্রা। এবারে প্রবেশ করলাম ভবানীশ্বর দেবালয়ে। এত উন্নত গগণস্পর্শী মন্দির সাধারণতঃ দেখা যায় না। এখানকার শিল্প শৈলীও মন-মুগ্ধকর। দুঃখের বিষয় মন্দিরটী অসংস্কৃত। শিবমূর্ত্তি আছে কিন্তু অর্চ্চনা হয় না। মন বেদনায় ভরে গেল। কবিগুরুর ভাষা মন্দিরের একটী স্তবক স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো—

সুন্দর এসে ঐ হেসে ছেদে ভরি দিল তব শূন্যতা
জীর্ণ হে তুমি জীর্ণ দেবতালয়
ভিত্তি রন্ধ্রে যাহে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য 'জয়-জয়'।

এরপর আমাদের ইচ্ছা জাগল রাণী ভবানীর গুরুদেব পুরু রাজযোগী রামকৃষ্ণের সাধন স্থল পঞ্চ-মুণ্ডীর আসন দর্শনের। আশে পাশের দুচারের লোককে জিজ্ঞাসা করে কোন পাত্তা পেলাম না। শেষে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর পদরজঃ-মণ্ডিত রাজবাটিতে প্রবেশ করলাম। জনৈকা পরিচারিকাকে প্রশ্ন করলে সে জানাল—আইরি ক্ষেতের ভিতর একটী গাই বাছুর বাঁধা আছে, ওটাই পঞ্চমুণ্ডীর আসন। কথামত সেখানে গিয়ে উঠলাম। দেখলাম বেদীর মত উঁচু ঢিপি। এবার আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। মনে মনে ভাবলাম এত কাছে থেকেও এমন মনোরম স্থানটি দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কবিগুরুর কথা আজ যেন বাস্তবে রূপ নিল—

বহুদিন ধরে' বহুক্রোশ ঘুরে
বহুব্যয় করে বহুদেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা;
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

ভক্ত-ভগবান

॥ শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী ॥

সেথা বৈকুণ্ঠে নাহিক তৃষ্ণা অনন্ত ঐশ্বর্যভরা
অনন্ত সে অসীমের সীমা ভরে রয়।
নিয়ত নির্ঝরে যেথা সুমধুর সে অমৃত ক্ষরা—
নাহি দুঃখ, নাহি মৃত্যু, নাহি অপচয়।

তবু ভরিল না চিত্ত!
চিদ্‌ঘন যেন রিক্ত।
স্ব-প্রেম আনন্দ কন্দ প্রেমঘন সাথে
তবু কেন আসি ছুটি
ধরার ধূলায় লুটি?
মাটির এ বৃন্দাবনে কোন্ মধু রাজে?

ওগো ও গোলোক-ধন!
দেখা তোর বৃন্দাবন
সেথায় সঁপিয়া মন লীলামৃত ধারা কর পান
যুগ হতে যুগান্তর
নিত্য লীলা নিরন্তর;
তোমার বাঁশরী সাথে প্রেম-লীলা গান।
নিত্য লীলা রস রাসে
সেই ভক্ত ছুটি আসে—
অর্পিত প্রেমরস করিবারে দান
ভক্তরূপ ভক্তপ্রাণ ভক্ত-ভগবান।

সমাবর্তন-ভাষণ

(সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির শিক্ষণ-সংস্থা (২)-তে শ্রীকরুণাকেতন সেনের ভাষণ)

॥ শ্রীকণিকা মুখোপাধ্যায় ॥

রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থা (ইউনিট নং—২)-র প্রথম 'সমাবর্তন' উৎসব গত ২৮শে জুলাই বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে মাননীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত করুণাকেতন সেন মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ও আচার্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী নির্মোহানন্দ জীউ মহারাজ সমবেত সুধীগণের নিকট সভাপতি ও আচার্যদেবের পরিচয় জ্ঞাপন করেন।

মাননীয়া অধ্যক্ষা মহাশয়া শ্রীযুক্তা গায়ত্রী মূর্তির পরিচালনায়, অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং অন্যান্য কর্মীদের সহযোগিতায় ও শিক্ষার্থীদের উদ্যম, উৎসাহ ও সাহচর্যের মাধ্যমে রজনীগন্ধার শুভ্র সজ্জায়, ধূপের সুগন্ধে সমাবর্তন-সভা মুখর হয়ে ওঠে এক আড়ম্বরহীন পরিবেশনায়।

বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ সভায় উপস্থিত হলে অতিথি-বরণের পর অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ছাত্রীদের দ্বারা গীত "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" এই বেদগানের সুরে সমস্ত পরিবেশ এক অপূর্ব সংহত ও ভাবগম্ভীর রূপ ধারণ করল। পরে আচার্যদেবের উদাত্ত স্বরে "মঙ্গলাচরণ" সমস্ত শ্রোতৃবর্গের মনকে এমনই এক সুউচ্চ স্তরে পৌঁছে দিল যা সভাকে সমাবর্তনের উপযোগী গভীর ভাবের আনুকূল্য দান করল!

মাননীয়া অধ্যক্ষা মহাশয়া বিবরণী পাঠান্তে (১৯৬৫, ১৯৬৬,] ১৯৬৭ সালের) ছাত্রীদের সভাপতি মহাশয়ের নিকট উপস্থাপন করলেন। মাননীয় সভাপতি মহাশয় তাদের অভিজ্ঞান-পত্র প্রদান করেন ও আচার্যদেব তাদের উপবেশনান্তে আশীর্বাদ করেন। পরে সভাপতি মহাশয় তাঁর সময়োচিত ভাষণ দেন।

মাননীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত করুণাকেতন সেন মহাশয় তাঁর সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে যে কথাগুলি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন তার মোটামুটি সারাংশ এখানে দেওয়া গেল।

প্রথমেই তিনি বলেন যে, এখানকার কথা তিনি আগে অনেকবার শুনেছেন কিন্তু তাঁর আসবার সুযোগ বা সুবিধা এর আগে কখনও হয়নি। যাঁরা তাঁকে এখানে আসবার সুযোগ দিয়েছেন তাঁদের তিনি ধন্যবাদ ও তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের কথা জানান।

তিনি বলেন—নাগরিক কোলাহল ও বিশৃঙ্খলার বাইরে গ্রামীণ পরিবেশে, এই রকম স্নিগ্ধ শুচিযুক্ত সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত একটি ছোট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে—দূর থেকে মাত্র শুনে এতদিন তিনি স্পষ্ট ধারণা করতে পারেন নি। সেজন্যে এখানে এসে মন তৃপ্তি ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এজন্য তিনি কৃতজ্ঞও। কেন কৃতজ্ঞ সে কথার উল্লেখে তিনি বলেন একথা বলার একটি অর্থ আছে। বর্তমানে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন আমাদের দেশ একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। সকল রকম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দিয়ে একটা দুর্যোগ চলেছে। দেশের একটি অংশের জনসমাজ বা ছাত্র সমাজের মধ্যে একটি ধ্বংস-প্রবণ বিকৃত মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে দেশের কল্যাণকর, সমাজহিতকর কোন প্রতিষ্ঠান তাদের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। বিশেষ করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিই তাদের বেশী লক্ষ্য। দেশের যাঁরা বরণীয় ও স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন যেমন,—স্বামী বিবেকানন্দ, স্যার আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—তাঁরাও গ্লানি অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না।

তাঁরা এই বাংলা দেশে একদা জন্মগ্রহণ করে প্রাচীন ঐতিহ্যময় ভারতকে নতুন ভাবে বিশ্বের কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে স্থান করে দিয়েছিলেন, তাদের উত্তরাধিকারী বর্তমান ছাত্র-সমাজের একটি বড় অংশ, বিকৃত মনোভাবসম্পন্ন ছাত্রদল প্রতি দিনে প্রতি ক্ষণে ভারতের বিশেষ করে বাংলা দেশের সম্মান বাইরের কাছে ধূলায় লুটিয়ে দিচ্ছে। বাংলার এই কৃতি সন্তানদের প্রতি অপমান দেখিয়ে এরা এক ধরণের আনন্দলাভ করছে। এরা ভুলে গেছে ভাঙ্গাটা খুবই সোজা। কিন্তু গড়াটা যে কি কঠিন, তার যে কি অপরিসীম মূল্য একথা বোধহয় তারা ধারণা করতে পারে না। আমাদের যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে, যদি দয়া, ভালবাসা, আত্মত্যাগের অভাব হয়ে থাকে তা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিতে হবে। তার অর্থ এই নয়, আমাদের দেশের যা কিছু তাকে হিংসা দিয়ে, আঘাত দিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে। বিনাশের মধ্যে দিয়ে গঠন করা যায় না। তাতে ভাঙা যেড়েই চলে। এদের প্রকৃত লক্ষ্য কি, কি তারা চায়—একথা এখনও ধারণা করা যাচ্ছে না। দেশের এই রকম শোচনীয় পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ অনুসারে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানে এসে তাঁর ভাল লেগেছে। এখানে প্রকৃত মানুষ তৈরী করার আদর্শ এখানকার পরিচালকরা অনুসরণ করেন বলেই তাঁর ধারণা, এবং শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের কৃতজ্ঞতা সে কারণেই।

তিনি মনে করেন, দেশের পক্ষে প্রয়োজন আজ প্রকৃত শিক্ষক ও শিক্ষিকার। যথার্থ শিক্ষা দিয়ে যদি জীবনের মূল ভিত্তি তৈরী করা যায় তাহলে হয়তো বিকৃত রুচি মানুষের আর সৃষ্টি হবে না। আর তাই এখনও প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খলাপূর্ণ সুন্দর শিক্ষাদান প্রণালী, যেটি এখানকার বিদ্যার্থী ছাত্রীরা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আপনারা যারা এখানকার শিক্ষা সমাপনান্তে চলে যাচ্ছেন তাঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে গিয়ে প্রকৃত মানুষ তৈরী করার কাজ করুন—যে নৈতিকতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের আজ অতি অভাব আপনাদের শিক্ষাদানের ভিতর দিয়ে তা জাগিয়ে তুলুন।

তিনি আরও বলেন, আমি একটা অনুরোধ করব—এখানকার যাঁরা পরিচালক তাঁরা যেন মধ্যে মধ্যে এই শিক্ষিকা বোনেদের এখানে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন করে উৎসাহ উদ্দীপনা ও অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন করে তোলবার সুযোগ দেন।

শিক্ষাদানের কল্যাণকর প্রচেষ্টা যাঁরা জীবনের পুণ্যব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁরা অর্থাৎ আশ্রমের পরিচালকরা নানা অসুবিধার মধ্যে দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন—একথা তিনি বিশ্বাস করেন ও মানেন। সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সরকারী সাহায্যের দরকার। কিন্তু শিক্ষায় যাতে ব্যয়িত হবার উপযুক্ত অর্থ সরকারের হাতেও নেই। অতএব যে টাকার নিতান্ত প্রয়োজন তা'ও তাঁরা প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নকল্পে দিতে পারেন নি। কিন্তু শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের অভিমত হোল যে শিক্ষাদান কার্য্য যাতে ব্যাহত না হয়, যাতে পরিচালকদের শিক্ষাপ্রচারে ও প্রসারে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য দিয়ে শিক্ষাকে সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীণভাবে বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।

শিক্ষার অর্থ বিলাসিতা নয়। একটা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা দু'ধাতে বইলে অসুবিধে হয়। যদি আলাদা করার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায় তাতেও দুঃখের বা ক্ষোভের কোনো কারণ নেই বলেই শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় মনে করেন। তাঁর ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল যে প্রকৃত শিক্ষাই হোল চরিত্রের শিক্ষা। অতএব শিক্ষার উদ্দেশ্য সর্ব শিক্ষা ব্যবস্থাতে একই। যা ভালো, মহৎ, কল্যাণকর তা বুনিয়াদীতেও যেমন—অন্যতেও তেমনি। অতএব যা ভালো তাকেই শিক্ষা দিতে হবে। আজকের শিক্ষা যেমন পুঁথিগত শিক্ষা হওয়া উচিত নয়। হাতের কাজের মাধ্যমে শিশুর চরিত্রকে, মনকে, কার্য-ক্ষমতাকে ব্যবহার করার শিক্ষা দিতে হবে। সেটা যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু করা চলে। এতে সাধারণ শিক্ষা আরও বড়ো হয়ে উঠবে। শিক্ষা-বিভাগে যাঁরা আছেন,

তাঁদের কর্তব্যের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন ও যারা শিক্ষা সমাপনান্তে ফিরে যাচ্ছে তাদের কল্যাণ কামনা করে বলেন যে শিশুকে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার যে আনন্দ সেই আনন্দ তাঁরা গ্রহণ করুন।

পরিশেষে তিনি প্রার্থনা করে বলেন যে, তিনি আশা করেন, আমাদের জাতীয় জীবনে দুর্যোগের যে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, সেই অন্ধকার কেটে যাবে একদিন,—আমরা আবার নিজেদের জ্যোতিঃস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব—"তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ" এই বলে তিনি তাঁর সুচিন্তিত ও সহজ ভাষণটি শেষ করেন।

মাননীয় শ্রীমৎ স্বামী নির্মোহানন্দজী মহারাজ সভাপতির ভাষণান্তে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর বর্তমান ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক কবিগুরুর 'রক্তকরবী' নাটিকা বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হওয়ায় একটি মনোজ্ঞ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই নাটিকার বিভিন্ন চরিত্র যারা রূপায়ন করেছে তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হল :—অমলা মজুমদার, সুপর্ণা বেরা, মুক্তি দত্ত, মীরা বিশ্বাস, শিবানী বসু, মধুশ্রী চক্রবর্তী, মীনা সরকার, সন্ধ্যা সরকার, শ্যামলী দাস, আরতি বিশ্বাস, মল্লিকা সাহা, মধু সিংহরায়, প্রতিমা পাল মজুমদার, সুভদ্রা মণ্ডল, মাধুরী মিত্র, লিপ্সা ভট্টাচার্য্য, আরতি সেন, চঞ্চলা সাহা। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে সতী দত্ত, তারা জানা, মধুশ্রী মণ্ডল, মধু সোম, অঞ্জলি পাল। ছাত্রীদের দ্বারা গীত সমাবর্তন সঙ্গীতদ্বারা অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়, কিন্তু যিনি নিজ জীবনে সবকেই পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়া আস্বাদন করিতেছেন, তিনি কাহারও একচেটিয়া নন; তিনি প্রত্যেকের মাঝে পরিপূর্ণ থাকিয়াও প্রত্যেকেরই অধিক। কেহই কাহারও কাছে ধরা পড়িলেন না, সকলকেই সমভাবে জীবনে হজম করিতেছেন, তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধিক। 'They complete, by excluding each other' —De Broglie. পূর্ণযোগের এক একটি দৃষ্টিকোণ হইতেছে তপস্যা, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ। পূর্ণযোগ সর্বযোগের সমন্বয়।

—গীতাভাষ্য, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ

সিদ্ধান্ত দর্শন

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"এই সিদ্ধান্ত দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় লইয়াই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্ত দর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিকূল বিচারসকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, এক এবং বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈতভাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়কেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অধৃত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ত্রয়ীতি বহুধাশ্রুতিঃ" বলিয়া, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব',—সেইজন্য উভয়ই 'অভেদ-তত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই অদ্বৈত।"

২৩। যে পরম-পুরুষকে বা পুরুষোত্তমকে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক বা কর্ম্মফল এবং আশয় অধীন করিতে পারে না, যিনি সর্ব্বাত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তিনিই ঈশ্বর। ২৪। যিনি ঈশ্বর তিনি সর্ব্বজ্ঞ—তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ নিহিত আছে। ২৫। সেই ঈশ্বর ব্রহ্মার এবং সমস্ত দেবগণেরও গুরু। তিনি চিরকাল আছেন, সেই জন্যই তিনি 'নিত্য'। ২৬। সেই ঈশ্বর ওঙ্কারের বাচ্য। তাঁহার নাম ওং বা ওঁ। ২৭। ঈশ্বর-বাচক ওঙ্কার বা প্রণব জপ করিতে করিতে, ঈশ্বর-বাচক ওঙ্কার বা প্রণবের অর্থ ভাবিতে ভাবিতে সেই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। সম্যক্ একাগ্রতার উদয়ে ঐ প্রকার জপদ্বারা সমাধি হয়। ২৮। নিয়ত ওঙ্কার বা প্রণব-জপ এবং তদর্থ ভাবনা করিলে, সমস্ত যোগ-বিঘ্নই অপসারিত হয়—ক্রমে সমল-চিত্ত অমল হয়; নিজ দেহের মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহাকে জানা যায়, তাঁহাকে জানিলে স্বভাবতঃ সমাধি-শক্তির স্ফুরণ হয়। ২৯। ব্যাধি, স্ত্যান বা (সমাধিস্থ হইবার ইচ্ছার অভাব না থাকিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতার অভাব), সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি বা অনিবার্য বিষয়াসক্তি, ভ্রান্তি-দর্শন বা ভ্রান্তি-মূলক অনিত্য-জ্ঞান, অলব্ধ-ভূমিকত্ব এবং অনবস্থিতত্ব বা নানা বিষয়গত যোগ-শক্তির অপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিঘ্ন-বিঘ্ননিচয়-প্রভাবে সমাধি লাভ করা যায় না। ঐ সকল চিত্ত বিক্ষেপের বিশেষ অন্তরায়। ৩০। দুঃখ, শারীরিক কম্প, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং ইচ্ছার ব্যাঘাতজনিত ক্ষোভ হইতে যে মনোবিকার উপস্থিত হয়, তাহা সমাধি লাভের মহা-বিঘ্ন। ৩১। ঐ সকল প্রতিবন্ধক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এক-তত্ত্বাভ্যাস বা একাগ্রভাবে একমাত্র ঈশ্বরের ধ্যানই অভ্যাস করিতে হইবে। ৩২। অন্যের সুখে সুখ বোধ হইলে, অন্যের দুঃখে দয়া হইলে, অন্যের পুণ্যে হর্ষ হইলে এবং অন্যের পাপে উপেক্ষা করিলে চিত্তে যে এক অপূর্ব্ব অমল-ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার তুলনা নাই। সে ভাব প্রফুল্লতাময় চিত্ত-প্রসাদ। সেই ভাব-ময় চিত্ত-প্রসাদই সমাধির জনক। ৩৩। পুনঃ পুনঃ বহির্বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে অন্তরে ধারণ করিয়া পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিলেও চিত্ত স্থির হইতে পারে। চিত্ত

স্থির হইলে একাগ্র হওয়া যায়। ৩৬। দিব্যজ্ঞানময়ী সর্ব্ববিষয়বতী প্রবৃত্তিপ্রভাবে সর্ব্ব-তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া, সর্ব্ব-তত্ত্বময় চিত্ত করিতে পারিলেও তাহা সুস্থির হয়; সেই সুস্থির চিত্ত এরূপ সুনির্ম্মল হয় যে, তৎপ্রভাবে দিব্য-গন্ধ আঘ্রাণ করা যায়, দিব্য-শব্দ শ্রবণ করা যায়, দিব্য-রস আস্বাদন করা যায়, দিব্য-রূপ দর্শন করা যায়, দিব্য-সুখ অনুভব করা যায়। এই সকল ফল প্রত্যক্ষ করিলে স্বতঃই আরও যোগানুশীলনে চিত্ত সুদৃঢ় হয়। ৩৫। মনোস্থির হইলে এক প্রকার অপরূপ জ্যোতি-দর্শন হয়। সে জ্যোতির তুলনা নাই। তাহা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি চিরকালের জন্য অশোক হইয়াছেন। তিনি সেই জ্যোতিষ্মতী সাত্ত্বিকী বুদ্ধি প্রভাবে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অধিকারী হইয়াছেন। ৩৬। পরম বৈরাগীদিগের বৈরাগ্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও চিন্তা করিলে, চিত্ত স্থির হয়। চিত্ত স্থির হইলে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আর বিলম্ব থাকে না। ৩৭। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন-যোগে কোন দিব্য মূর্ত্তি দর্শন অথবা অপ্রাকৃত সুখানুভব হইলে, জাগিবামাত্র যদি সেই দিব্য-মূর্ত্তি এবং অনুভূত সুখচিন্তা করা যায়, তাহা হইলে ও একাগ্রচিত্ত হওয়া যায়। ৩৮। নিদ্রাভিন্নত যে কোন দিব্য-বস্তু ধ্যান কর না কেন, তৎপ্রভাবে অবশ্যই একাগ্রতা শক্তি প্রবল হইবে। ৩৯। উক্ত অভ্যাসগুলি সুনির্ম্মল স্থির-চিত্ত হইলে, অতি ক্ষুদ্র-পরমাণু হইতে পরম-মহৎ-পরমাত্মাকে পর্য্যন্তও বশে আনা যায়। ৪০। অতি স্থূল হইতে যখন অতি সূক্ষ্ম বস্তুতে পর্য্যন্ত মনোস্থির করিবার যোগ-সাধকের সামর্থ্য হইবে, তখনি ঈশ্বরে মনোলয় হইবে। তখন কোন বস্তুতে বা কোন তত্ত্বে মনোস্থির করিতে হইলে, বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। যখন সম্যক প্রকারে মনোবশ হইবে, তখন আর একাগ্রতা অভ্যাসের প্রয়োজনও হইবে না। তখন কোন স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম-অবলম্বনে মনোস্থির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। তখন নির্ম্মল-স্ফটিক যেমন যখন যে বর্ণের যে পদার্থের সন্নিহিত করা হয়, তখন তাহা যেমন সেই বর্ণের সেই পদার্থে রঞ্জিত হইয়া যায়, তদ্রূপ অনুভূত একাগ্রতা বলে নিবৃত্তিক নির্ম্মল-চিত্ত-বৃত্তি সর্ব্ব-বস্তুতে, সর্ব্ব-বিষয়ে, এমন কি ঈশ্বরে পর্য্যন্ত নিবেশিত হইতে পারে এবং তদ্বিষয়ক ফলভোগও করিতে পারে। কাষ্ঠ অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইলে, অগ্নির ন্যায় কাষ্ঠও দাহ করে। তখন অগ্নি যে সকল ফলভাগী, কাষ্ঠও সেই সকল ফলভাগী হয়। ঐ প্রকারে নিবৃত্তিক-নির্ম্মল-চিত্ত যখন যে বস্তুতে সংযুক্ত হয়, তখন তাহা সেই বস্তুরই ফলভাগী হয়। ৪১। ঐ সকল সমাপত্তির বা তন্ময়তার মধ্যে যে সমাপত্তি শব্দ, অথবা যে সমাপত্তির বা তন্ময়তার অর্থ ধ্যাতার স্পষ্ট বোধ হয় না, সেই সমাপত্তির বা তন্ময়তার নামই সবিতর্ক সমাধি। ৪২। ধ্যাতা, ধ্যেয় বস্তু-বাচক পদার্থ বিস্মৃত হইলে, কেবল মাত্র তাঁহার চিত্তে ধ্যেয় প্রকাশিত থাকেন। সেই কেবল মাত্র ধ্যেয়-বস্তুর প্রকাশকেই নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলা যায়। ৪৩। কথিত সবিতর্ক নির্ব্বিতর্ক সমাধির ব্যাখ্যাদ্বারা সূক্ষ্ম-বিষয়ক সবিচার নির্ব্বিচার সমাধিও নির্ণয় করা হইয়াছে। ৪৪। সূক্ষ্ম বিষয়ক সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি, প্রকৃতি অতিক্রম করিতে পারে না। প্রকৃতি পর্য্যন্তই তাহাদের সীমা। ৪৫। ঐ সকল সমাধি সবীজ-সমাধির বা যে সমাধির অবসানে পুনর্ব্বার সংসারাসক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেই সমাধির অন্তর্গত। ৪৬। নির্ব্বিচার-সমাধি প্রভাবে সুবিমল চিত্ত হইলে, সর্ব্ব প্রকাশক অধ্যাত্ম-প্রসাদ লাভ হয়। সেই অধ্যাত্ম-প্রসাদেরই অপর নাম অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। ৪৭। সেই অধ্যাত্ম-প্রসাদ বা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলে, ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা বা যে প্রজ্ঞাবলে কেবল সত্যই প্রকাশিত হয়, সেই প্রজ্ঞা স্ফুরিত হয়। ৪৮। শ্রুতানুমান-জ্ঞাত-প্রজ্ঞা বা ইন্দ্রিয়-জনিত-প্রজ্ঞা বা অনুমান-প্রসূত-প্রজ্ঞা অথবা অন্য কোন প্রকার প্রজ্ঞাই সর্ব্বজ্ঞানময়ী-সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা সর্ব্বশক্তিশালিনী ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞার সমতুল্য নহে। ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা। তাহার সহিত অন্য কোন প্রজ্ঞারই তুলনা হইতে পারে না। ৪৯। সেই ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা-প্রসূত সংস্কার বলে সমস্ত পূর্ব্বসংস্কারই বিনষ্ট হয়। ৫০। তৎপ্রভাবে সমস্ত পূর্ব্ব-সংস্কার বিনষ্ট হইলে, তাহাও নিরুদ্ধ হয়। তাহা নিরুদ্ধ হইলে, সর্ব্ব-নিরোধক নির্ব্বীজ সমাধির আবির্ভাব হয়।

নির্বীজ সমাধি বা বীজমুক্ত সমাধি বা যে সমাধিতে চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত-বৃত্তির অভাব হয়, সেই সমাধি হইলে, চিত্ত সর্ব্ব-বৃত্তিশূন্য হয়। তখন তাহার কোন গুণ ও কোন ক্রিয়া থাকে না। তখন তাহা আপনার প্রকৃতি-মূল প্রকৃতিতে লয় হয়। তখন আত্মাও নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হইয়া 'কেবলমাত্র' হন্। ৪১।" সমাধি-পাদের উক্ত শেষ সূত্রানুসারে নির্বীজ সমাধিবশত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হইতে হয়। অতএব সমাধি, জীবত্ব হইতে মুক্ত হইবারই উপায়। সেইজন্য সমাধি প্রাপ্তির অনুকূল যাহা, তাহাও মুক্তির অনুকূল বলিতে হইবে। সেইজন্য জনকের প্রতি অষ্টাবক্রের—

"নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি। ১৫।"

বলা উচিত হয় নাই। কারণ সমাধিবশত মুক্তি হয় বলিয়া, সমাধির জন্য বাসনাও মুক্তির অনুকূল। ঐ প্রকার বাসনাকে কখনই বন্ধন অথবা বন্ধনের কারণ বলা যায় না।

ষাত্রিংশ সিদ্ধান্ত

ষোড়শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে.—

"ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্।"

উক্ত শ্লোকের অর্থ এই প্রকার,—"তুমিই এই বিশ্বে ব্যাপ্ত। যথার্থতঃ বিশ্ব তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। ক্ষুদ্রচিত্ততা ত্যাগ কর। তুমি যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপ।" জনক কর্ত্তৃক যদপি এই বিশ্ব ব্যাপ্ত থাকিত, তাহা হইলে সেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধে জনকের জ্ঞানও থাকিত। নানা-শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম কর্ত্তৃকই বিশ্ব-ব্যাপ্ত। নানাশাস্ত্রানুসারে সেই ব্রহ্ম বদ্ধ নহেন। নানা শাস্ত্রানুসারে সেই ব্রহ্ম আত্মজ্ঞান-বিহীন নহেন্। জনকের নিজ বাক্যানুসারে এবং অষ্টাবক্রের বাক্যানুসারে জনক বদ্ধ ও অনাত্মজ্ঞানী ছিলেন। অতএব তিনি বিশ্ব-ব্যাপ্ত ছিলেন, স্বীকার করা যায় না। পরিমিত-দেহবিশিষ্ট পরিমিত জনকে বিশ্ব অধিষ্ঠিত ছিলও বিশ্বাস করা যায় না। পরিমিত-জনকে যদপি বিশ্ব অধিষ্ঠিত ছিল বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে আমাতেও বিশ্ব অধিষ্ঠিত আছে, বিশ্বাস করিতে পার। কারণ বেদান্তানুসারে জনকে ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই। তোমার ঐ প্রকার বিশ্বাস হইয়াছে—তুমি নিজে বলিলেও আমি তাহা স্বীকার করিব না; কারণ এই বিশ্ব আমাতে অধিষ্ঠিত থাকিলে, আমি তাহা অবশ্যই বুঝিতাম এবং অন্যান্য সকলেও তাহা অবশ্যই দর্শন করিতেন। বেদান্ত প্রকৃতিমতে বুদ্ধিও প্রাকৃত। অতএব বেদান্ত প্রকৃতি মতে অবশ্যই বুদ্ধি সত্য ও নিত্য নহে। যাহা প্রাকৃত, তাহা অদ্বৈতমতের কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থমতেই শুদ্ধ নহে, অদ্বৈতমতের সর্ব্ব গ্রন্থানুসারে আত্মাই কেবল 'শুদ্ধ'। সে সকল গ্রন্থের কোন গ্রন্থমতেই অনাত্মা 'শুদ্ধ' নহে। সেইজন্য অনাত্মা-বুদ্ধিকে 'শুদ্ধ' বলা যায় না, সুতরাং অষ্টাবক্রের 'শুদ্ধবুদ্ধ' শব্দও ব্যবহার করা উচিত হয় নাই। অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক জনককে 'শুদ্ধ বুদ্ধ' বলা হইয়াছে বলিয়া, জনককেও প্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে—সেই-জন্য জনককে অনাত্মা বলিয়াও স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ অদ্বৈতমতে আত্মা 'বুদ্ধ'ও নহেন্, 'শুদ্ধ' বুদ্ধও নহেন্। সমস্তই আত্মা স্বীকার করিলে, জনককেও 'বুদ্ধ' বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জনককে 'শুদ্ধ'বুদ্ধ বলিয়াও স্বীকার করা যায়। জনককে শুদ্ধবুদ্ধের স্বরূপ স্বীকার করিলেও জনককে অনাত্মা বলিতে হয়, কারণ শুদ্ধ-বুদ্ধের 'স্বরূপ' যাহা, অদ্বৈতমতে এবং পাতঞ্জল দর্শনমতে তাহা অনাত্মা বা প্রকৃতি। জনক তাহা স্বীকার করিলেও জনককে আত্মা বলা যায় না। বাস্তবিক অষ্টাবক্রের যদপি জনককে বিশ্ব-ব্যাপ্ত, জনকেতে বিশ্ব অধিষ্ঠিত এবং জনক 'শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপ' ধারণা হইত, তাহা হইলে তিনি ঐ প্রকার মহান্ জনককে ক্ষুদ্র চিত্তবিশিষ্ট বোধ করিয়া, তাঁহাকে ক্ষুদ্র-চিত্ততা পরিহার করিতে বলিতেন না। মহান্ ব্রহ্মই বিশ্ব-ব্যাপ্ত। তিনি নির্ব্বিকার সুতরাং তাঁহার ক্ষুদ্র-চিত্ততাও নাই। জনক যদপি ঐ মহান্-ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার ক্ষুদ্র-চিত্ততা রহিত না, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার কোন প্রকার বিকার রহিত না। তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং মুক্তির প্রয়োজনও হইত

না। কারণ সর্বশক্তিমান সম্পূর্ণ ব্রহ্মে কিছুরই অভাব নাই। সেইজন্য তিনি ব্রহ্মের সহিত অদ্বৈত ছিলেন, অংশই বলা যায় না।

ত্রয়োবিংশ সিদ্ধান্ত

সপ্তদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"নিরপেক্ষো নির্বিকারো নির্ভরঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধস্ত্বং চিন্মাত্রবাসনঃ ॥"

উক্ত শ্লোকের অন্বিপ্রায় এই প্রকার হইতে পারে,—"তুমি নিরপেক্ষ, নির্বিকার, নির্ভর, শীতলাশয়, অগাধ-বুদ্ধি, অক্ষুব্ধ এবং চিন্মাত্র-বাসনাবিশিষ্ট হও।" উক্ত শ্লোকে জনককে নির্বিকার হইতে বলা হইয়াছে অথচ তাঁহাকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥
ধর্মাধর্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো।
ন কর্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্বদা ॥"

উক্ত দুই শ্লোকানুসারে, জনককে প্রকারান্তরে নির্বিকারই বলা হইয়াছে। তবে তাঁহাকে উপরোক্ত সপ্তদশ শ্লোকে পুনর্বার নির্বিকার হইতে বলা হইয়াছে কেন? তাহা এক প্রকার বিকার। নির্ভর যিনি, তিনিই নির্বিকার। উক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকানুসারে জনককে নির্বিকার বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। অতএব সেই জন্য তাঁহাকে নির্ভর বলিয়াও প্রমাণ করা হইয়াছে। যাঁহার কোন প্রকার আশাতে আস্থা নাই, তিনিই নির্বিকার। যিনি কোন প্রকার আশাধীন নহেন, তিনিই নির্বিকার। সেইজন্য অষ্টাবক্র কর্তৃক যে জনককে নির্বিকার হইতে বলা হইয়াছে, আবার তাঁহাকেই অষ্টাবক্রের শীতলাশয় হইতে বলা সঙ্গত হয় নাই। নির্বিকারের বুদ্ধির সহিত কোন সংস্রব নাই। সেইজন্য উক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে যিনি নির্বিকাররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাকে অগাধ-বুদ্ধি বলাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই। নির্বিকারের কোন বাসনা থাকে না। কারণ বাসনাও একপ্রকার বিকার। সেইজন্য উক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে নির্বিকার প্রমাণিত জনককে 'চিন্মাত্রবাসনঃ' বলাও যায় না। অষ্টাবক্রেরই কোন কোন শ্লোকানুসারে জনকই আত্মা। অতএব সেইজন্য তাঁহাকে 'চিন্মাত্রবাসনঃ' বলা উচিত হয় নাই। কারণ অদ্বৈতমতের অনেক গ্রন্থমতেই আত্মা 'চিৎ'। অষ্টাবক্রও তাঁহার অষ্টাবক্র-সংহিতা গ্রন্থের প্রথম প্রকরণীয় তৃতীয় শ্লোকে আত্মাকে 'চিদ্রূপঃ' কহিয়াছেন। পরমহংস শঙ্করাচার্যের অনেক গ্রন্থের অনেক শ্লোকানুসারেও আত্মা 'চিৎ'।

চতুর্বিংশ সিদ্ধান্ত

অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥"

উক্ত শ্লোকের অর্থানুসারে বুঝিতে হয়,—"সাকার অসত্য—নিরাকার নিশ্চল বা সত্য। এই তত্ত্বোপদেশ প্রভাবে পুনর্জন্ম হয় না"। সাকার অসত্য স্বীকৃত হইলে, নিরাকারকেও অসত্য বলিতে হয়। কারণ সাকার যাহা, তাহাই আকাশবিশিষ্ট নিরাকার। সেইজন্য সাকার মিথ্যা নহে। অষ্টাবক্র এবং জনকেরও আকার ছিল। তাঁহারাও আকাশবিশিষ্ট সাকার নিরাকার ছিলেন। আমাদের প্রত্যেকেরও আকার আছে। আমরা প্রত্যেকেই আকাশ-বিশিষ্ট সাকার নিরাকার। অতএব আকার, সাকার এবং নিরাকার—এই তিনই সত্য বলিতে হয়। নিরাকারকে 'সত্য' বলিয়া নিজে অষ্টাবক্রও স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে সাকার অসত্য। আমরা প্রমাণ করিয়াছি—আকার, সাকার এবং নিরাকার এই তিনই সত্য। আমরা যে সাকার তাহা স্পষ্টই বুঝিতেছি। আমাদের আকার আমরা আপনারাই দর্শন করিতেছি। অতএব সেইজন্য আকারাভাব স্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে প্রত্যক্ষের সহিত যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে, আমরা সেই যুক্তিই বিশ্বাস করি। 'সোঽহং' অর্থাৎ 'আমি-সেই' এবং 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমি-সেই' আনুমানিক যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে; কিন্তু 'সোঽহং' এবং 'তত্ত্বমসি' প্রত্যক্ষ যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে না। আমি কথায় বলি 'আমি-সেই' বা 'সোঽহং' 'আমি-শিব' বা 'শিবোঽহং',

'আমি-বিষ্ণু' বা 'অহং-বিষ্ণু' বলিতে পারি; কিন্তু 'আমি-সেই' বা 'সোঽহং' জানবারা বুঝি না। তুমি যথায়থার 'তুমি-সেই' বলিতে পার, কিন্তু তুমি—'তুমি-সেই' বলিবার বা 'তত্ত্বমসি' বলিবার তাৎপর্য্য বুঝ না। উহা তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে হয়। যদি বল, আত্মজ্ঞান লাভ হইলে 'আমি সেই' বা 'সোঽহং' বুঝিব—যদি বল, আত্মজ্ঞান জ্ঞান লাভ হইলে 'তুমি-সেই' বা 'তত্ত্বমসি' বলিবার তাৎপর্য্য বুঝিবে, তাহা তোমায় বলা উচিত নহে। কারণ অদ্বৈত-মতানুসারে আত্মার বা ব্রহ্মের সহিত আমি-আত্মার এবং তুমি-আত্মার কোন প্রভেদ না থাকিলে, আমি-আত্মা বা আমি-ব্রহ্ম, তুমি-আত্মা বা তুমি-ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার এবং তোমার অজ্ঞান থাকিতে পারে না। তাহা হইলে আমি-তুমি আত্মার নিয়ত 'সোঽহং' এবং 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান থাকা উচিত। তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে কখনই বাহিক্রম হওয়া উচিত নহে। অষ্টাবক্র সংহিতার প্রথম প্রকরণীর উক্ত অষ্টাবশ শ্লোকানুসারে নিরাকারই নিশ্চল—নিরাকারই সত্য। আকাশ নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহা ত সত্য নহে। বায়ু নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহা ত সত্য নহে। মন নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহা ত সত্য নহে। বুদ্ধি নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহা ত সত্য নহে। অহঙ্কার নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহা ত সত্য নহে। প্রত্যেক মনোবৃত্তিও নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈত-মতে তাহাদের কোনটীই ত সত্য নহে। শব্দ নিরাকার, কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহাও ত সত্য নহে। উক্ত সকল দৃষ্টান্তানুসারে বহু প্রকার বহু-নিরাকার উদাহৃত হইয়াছে। অতএব সেইজন্যই অদ্বৈতমতে নিরাকারকেও অনাত্মার একপ্রকার বিকাশ বলিতে হয়। অদ্বৈতমতে কেবল আত্মারই বহু প্রকারত্ব নাই, কিন্তু সে মতে অনাত্মারই বহুত্ব এবং বহু-প্রকারতা আছে। পূর্বে নিরাকারেরও বহুত্ব এবং বহু-প্রকারতা প্রদর্শন হইয়াছে। সেইজন্য নিরাকারকেও অনাত্মার একপ্রকার বিকাশ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক জড়ও নিশ্চল। নিরাকারকে নিশ্চল বলিয়া কি তাহাকেও এক প্রকার জড় বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই? অষ্টাবক্র 'নিরাকারস্তু নিশ্চলম্' বলিয়াছেন বলিয়া, নিরাকারকেও প্রকারান্তরে জড় বলিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান মতে অনেক জড়-পরমাণু আছে। সে সকলের প্রত্যেকটীই নিরাকার। তবে অষ্টাবক্রের নিশ্চল নিরাকার কি এই প্রকার জড়-পরমাণু? অচল অর্থেও পর্ব্বতও বলা যাইতে পারে। অচল এবং নিশ্চল শব্দের একই অর্থ। তবে কি নিশ্চল নিরাকারার্থে 'পর্ব্বত-নিরাকার' বুঝিতে হইবে? যদি বল নিরাকার অদৃষ্ট, পর্ব্বত দৃষ্ট, অতএব সেইজন্য অষ্টাবক্রের মতে নিশ্চল নিরাকার 'পর্ব্বত-নিরাকার' নহে বলিলেও তুমি বলিতে পার। কিন্তু নিরাকার শব্দার্থে কি কেবল অদৃষ্টই বুঝিতে হয়? নিরাকার শব্দের কি অন্য কোন প্রকার অর্থ নাই? —অবশ্যই আছে। নিরাকার শব্দার্থে 'যিনি আকার নহেন্'ও হইতে পারে। 'যিনি আকার নহেন্' বলিলে, যিনি 'সাকার' বুঝিলেও বুঝা যায়। পর্ব্বতেরও আকার আছে। সুতরাং পর্ব্বত অবশ্যই আকারবিশিষ্ট। অতএব সেইজন্য পর্ব্বতকেও 'সাকার' বলা যায়। কারণ আকার-বিশিষ্ট যাহা তাহাই 'সাকার'; সুতরাং নিশ্চল নিরাকারার্থে 'সাকার-পর্ব্বত'ও হইতে পারে। নিরাকার শব্দে যদিপি 'যাহার আকার নাই' স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নিরাকার শব্দের অর্থ, 'অ'কার' বুঝিবার পক্ষেই বা বাধা কি? কারণ 'যাহার আকার নাই' অর্থে 'যিনি আকার নহেন্' ত বুঝিতে হয় না। নিরাকার শব্দের অর্থ যদিপি 'যিনি আকার নহেন্' করা হয়, তাহা হইলেও নিরাকার শব্দার্থে 'যিনি সাকার' ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। অষ্টাবক্র যদিপি 'সমস্তই ব্রহ্ম'—অবধূত দত্তাত্রেয়-কথিত 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি' এই বাক্যানুসারে স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কথিত নিরাকারকে নিশ্চল বলায় আমাদের কোন আপত্তিই হইত না। তাহা হইলে আমরা ভাবিতাম যে-ব্রহ্ম 'সমস্ত', তিনি অবশ্যই নিশ্চল-নিরাকারও বটেন।

পঞ্চবিংশ সিদ্ধান্ত

একোনবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"যথৈবাদর্শমধ্যস্থে রূপেঽন্তঃ পরিতস্তু সঃ।
তথৈবাস্মিন্ শরীরেঽন্তঃ পরিতঃ পরমেশ্বরঃ॥"

মুকুর মধ্যে যে সামগ্রী প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা সেই মুকুর মধ্যে রহে না। পরমেশ্বর শরীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছেন স্বীকার করিলেও তিনি শরীরাভ্যন্তরে আছেন, স্বীকার করা হয় না। আকাশই যেমন স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে আকাশ জড়। অথচ নিরাকারকে কেহ কখন দর্শন করেন নাই। অথচ নিরাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে স্বীকার করিলে, অথচ নিরাকারও 'আকার' স্বীকার করিতে হয়; কারণ আকারেই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আকার যে স্বচ্ছ-পদার্থে প্রতিবিম্বিত হয়, সে স্বচ্ছ-পদার্থও জড়। কোন প্রকার জড় স্বচ্ছ পদার্থে জড়-চৈতন্য-পরমেশ্বরের প্রতিবিম্বিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অদ্বৈতের মতানুসারে, তোমরা যদ্যপি এরূপেই শরীরে পরমেশ্বর প্রতিবিম্বিত রহিয়াছেন বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই সেই পরমেশ্বরকে 'আকার' বলিয়াই স্বীকার কর। কারণ পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, আকার ব্যতীত এবং জড় ব্যতীত অন্য কিছুই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। অতএব সেইজন্য অনাকার নিরাকারও প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না, স্বীকার করিতে হয়। তোমাদের মতে পরমেশ্বর দেহে প্রতিবিম্বিত আছেন স্বীকার করিলে, তিনিও জড়-বিশিষ্ট আকার অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে তিনিও জড় অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আকার যাহা তাহা অনন্ত নহে—কে না জানে? জড় যাহা, তাহাও অনন্ত নহে—কে না জানে? তোমাদের অদ্বৈতবাদের নির্দ্দেশানুসারে পরমেশ্বরকে অবশ্যই জড়াকার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জড়াকার যে 'নিষ্ক্রিয়' তাহা আমরা দর্শন করিয়া থাকি। তুমিও পরমেশ্বরকে নিষ্ক্রিয় বলিয়াই অবশ্য স্বীকার কর। কারণ তোমার মতে ঐ পরমেশ্বর অবশ্যই 'ব্রহ্ম'। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম 'নিষ্ক্রিয়' বলিয়াই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অতএব সেইজন্য তুমিও ঐ পরমেশ্বরকে অবশ্যই নিষ্ক্রিয় বলিয়া জান। উক্ত প্রকার নিষ্ক্রিয় পরমেশ্বরে পতিতের কি প্রয়োজন আছে? সে পরমেশ্বর ত পতিতকে উদ্ধার করিতে পারেন না। কারণ উদ্ধার করাও একপ্রকার কার্য্য। কার্য্যই ক্রিয়া। যিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি অবশ্যই পতিতকে উদ্ধার করিতে পারেন না। সেইজন্য তিনি অবশ্যই পতিতপাবনও নহেন্। উক্ত প্রকার নিষ্ক্রিয় পরমেশ্বরকে দয়াময়ও বলিতে পার না। কারণ দয়া করাও এক প্রকার কার্য্য। পতিতপাবন দয়াময়-পরমেশ্বর 'সগুণ-সক্রিয়'। সেই পরমেশ্বরের কাছেই পতিতের বড় আশা-ভরসা আছে। সেই পরমেশ্বরই পতিতোদ্ধার জন্য এই পৃথিবীতে কতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই পরমেশ্বরই পতিতোদ্ধার জন্য, তাঁহার ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বারম্বার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেই জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। ৭।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।৮।"

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের নির্দ্দেশ ব্যতীত, ভূভার-হারী-শ্রীকৃষ্ণ-পরমেশ্বরের অবতার হইবার অন্যান্য বহু কারণও আছে। সেই ভূভার-হারী করুণাময়-ভক্তবৎসল-পরমেশ্বরে ভক্তি-যোগদ্বারাই ভক্ত তাঁহাতে মিলিত হন্। সেইজন্য ভক্তি-যোগের বিশেষ মাহাত্ম্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ভক্তিযোগ এই প্রকার—

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ॥
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥৭॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১॥
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২॥
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১৮॥
তুল্যনিন্দাস্তুর্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

যে সমস্ত ভক্ত তোমাকে সততযুক্ত হইয়া তোমাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা এবং যাঁহারা অক্ষরাব্যক্তকে উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যোগ-বিত্তম?" ১। শ্রীভগবান বলিলেন, "আমাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিত্য-যুক্ত হইয়া সতত পরমা শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা আমার অর্চ্চনা করেন, আমার বিবেচনায় তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যুক্ততম। ২। যে সমস্ত সর্ব্ব-ভূত-হিতে-রত সর্ব্বত্র-সমবুদ্ধি-সম্পন্ন-ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া, সর্ব্বত্র-গমনশীল, অচিন্ত্য, অচল, কূটস্থ, ধ্রুব এবং অনির্দ্দেশ্য-অক্ষরাব্যক্তকে উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকে লাভ করেন। ৩-৪। অব্যক্তাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে; কারণ দুঃখেই দেহীগণ অব্যক্ত-গতি প্রাপ্ত হন্। ৫। যে সকল ব্যক্তি আমাকে সর্ব্ব-কর্ম্ম এবং সেই সর্ব্ব-কর্ম্মের ফলসকল প্রদানপূর্ব্বক আমাতে রত, যে সকল ব্যক্তি অনন্য ভক্তিযোগ-বিনিষ্ট-ধ্যানদ্বারা আমাকে উপাসনা করেন, সেই-আমাতে আবেশিত-চিত্ত ভক্তিযোগ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে আমি অবিলম্বে মৃত্যুর কারণ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। ৬-৭। আমাতে ধৈর্য্যদ্বারা মনোযোগ কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, নিঃসন্দেহ ঐ উভয় কার্য্যদ্বারা ইহলোক পরিত্যাগান্তে 'গোলোকে' আমাতেই বাস করিবে। ৮। আমাতে যদ্যপি স্থিরতার সহিত চিত্ত-সমাধান করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে ধনঞ্জয়, অভ্যাস যোগাবলম্বনে আমাকে পাইবার ইচ্ছা কর। ৯। অভ্যাস-যোগানুষ্ঠানে যদ্যপি অক্ষম হও—তাহা হইলে কেবল আমার জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও—আমার জন্য কর্ম্ম করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিবে। ১০। এই প্রকার অনুষ্ঠানেও যদ্যপি অশক্ত হও তাহা হইলে মদ্যোগ আশ্রিত এবং আত্ম-সংযত হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম-ফল-ত্যাগে রত হও। ১২। অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর, জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যানের প্রাধান্য, ধ্যানাপেক্ষা কর্ম্ম-ফল-ত্যাগের প্রাধান্য, অনন্তর সেই কর্ম্মফল ত্যাগবশতই শান্তিলাভ হয়। ১২। সর্ব্ব-ভূত-প্রতি অদ্বেষী, মিত্রতা-সম্পন্ন, করুণ বা করুণাসম্পন্ন, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সতত-

উক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত ভক্তিযোগ সমাপ্ত হইল। একণে উক্ত ভক্তিযোগের অর্থ বিবৃত হইতেছে,—"অর্জ্জুন কহিলেন,

সন্তুষ্ট, সংযতাত্মা, মদ্ভক্তে দৃঢ়নিশ্চয় এবং মর্পিত-মনোবুদ্ধি যে ভক্তিযোগী সে ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। ১৩-১৪। যে ভক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকর্তৃক কোন লোক শঙ্কিত হয় না, যিনি কোন লোককর্তৃক শঙ্কা প্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগমুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। ১৫। যে ব্যক্তি সর্ব্ব-বস্তুতে স্পৃহাশূন্য বা অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথারহিত ও সর্ব্বোদ্যম-ত্যাগী আমার ভক্ত—তিনিই আমার প্রিয়। ১৬। হৃষ্ট হইবার সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেও যাঁহার হর্ষ-বোধ হয় না, দ্বেষ করিবার কারণ উপস্থিত হইলেও যিনি দ্বেষ করেন না, শোকের কারণ উপস্থিত হইলেও যিনি শোকার্ত্ত হন না, যিনি আকাঙ্ক্ষা-শূন্য এবং শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান, তিনিই আমার প্রিয়। ১৭। শত্রু-মিত্রে সমভাবাপন্ন, মানাপমানে সমভাবাপন্ন, শীতোষ্ণ-সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন, নিন্দা-স্তুতিতে সমবোধ-সম্পন্ন, সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত, মৌনী, কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট, নিকেতন-শূন্য, স্থিরমতি, ভক্তিমান নরই আমার প্রিয়। ১৮। ১৯। এই নিত্য-ধর্ম্ম যে প্রকার কথিত হইয়াছে, তদনুসারে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচরণ করেন, সেই সকল শ্রদ্ধা-সম্পন্ন মৎপরায়ণ-প্রাণ আমার ভক্তগণ আমার অতিশয় প্রিয়। ২০।" ভক্তিযোগ কথিত হইল। এক্ষণে অষ্টাবক্র সংহিতার প্রথম প্রকরণোক্ত একোনবিংশ শ্লোক-সম্বন্ধে আরো কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বিচার-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের প্রতিবিম্বমাত্র জীব-শরীরে আবিষ্ট আছে। কিন্তু 'স্বয়ং পরমেশ্বর' জীব-শরীরে আবিষ্ট নহেন। বহু জীব বিদ্যমান। কথিত প্রমাণানুসারে, সেই সকলের কোন-টীতেই পরমেশ্বর বিদ্যমান নহেন্। সুতরাং সেইজন্য সেই পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপীও বলা যায় না। কারণ অষ্টাবক্রের মতে জীবসকলে পরমেশ্বর বিদ্যমান নহেন্। অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম প্রকরণোক্ত উক্ত একোনবিংশ শ্লোকে যাঁহাকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই সগুণ-সক্রিয়। তাঁহাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। কারণ যাঁহার পরমৈশ্বর্য্য আছে, তিনিই পরমেশ্বর। তাঁহার সেই পরমৈশ্বর্য্যের প্রকাশ গুণ-কর্ম্মদ্বারা হইয়া থাকে, তাহা নানা স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রানুসারেই অবগত হওয়া যায়। নানা স্মৃত্যনুসারে, নানা পুরাণানুসারে এবং নানা তন্ত্রানুসারে সেই পরমেশ্বরকে 'সগুণ-সক্রিয়' বলা হইয়াছে। স্বচ্ছ-পদার্থেই ঈশ্বরাবের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে। কোন জীব-শরীরই স্বচ্ছ নহে। তবে তাহাতে কি প্রকারেই বা পরমেশ্বর প্রতিবিম্বিত হন্? অনেকের পক্ষে তাহা অবধারণ করাও দুষ্কর হইয়া থাকে।

ষড়্বিংশ সিদ্ধান্ত

অষ্টাবক্র-সংহিতোক্ত আত্মানাত্মবিবেকের নাম প্রথম-প্রকরণের বিংশ বা শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে।—

"একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা।"

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—"এক-সর্ব্বগত-ব্যোম যেমন ঘটের বহিরন্তরে বিদ্যমান, তদ্রূপ নিত্য-ব্রহ্মও নিরন্তর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান।" বলা হইয়াছে—নিত্য-ব্রহ্ম নিরন্তর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। অষ্টাবক্রের মতে নিত্য-ব্রহ্ম নিরন্তর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান বলিয়া, সর্ব্বভূতেরও অবশ্যই নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। উক্ত শ্লোকে নিত্য-ব্রহ্ম কিয়ৎকালের জন্য সর্ব্বভূতে বিদ্যমান বলা হয় নাই। সেইজন্য অষ্টাবক্রের মতে সর্ব্বভূতের অনিত্যতা স্বীকার করা হয় নাই, অবশ্যই বলিতে হইবে। অষ্টাবক্রের মতে, ব্রহ্মের নিত্যতার ন্যায় সর্ব্বভূতের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া, সর্ব্বভূতকেও অসত্য বলা যায় না। শ্রুতি-বেদান্তমতে যাহা অসত্য নহে তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম। অষ্টাবক্রের মতে নিরন্তর বা সততব্রহ্ম 'সর্ব্বভূতে' বিদ্যমান, কিন্তু অষ্টাবক্র-কথিত উক্ত শ্লোকানুসারে নিত্য-ব্রহ্ম ও নিত্য-সর্ব্বভূতকে অভেদ বুঝিবার কোন কারণ নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে নিত্য-ব্রহ্মের, নিত্য-সর্ব্বভূতের সঙ্গে পার্থক্য আছেই বুঝিতে হয়। অথচ উক্ত শ্লোকানুসারে উভয়কেই নিত্য বলা যায়। কোন প্রসিদ্ধ অদ্বৈত-গ্রন্থমতেও আত্মা 'বহু' নহেন্। অতএব সেইজন্য সর্ব্বভূতকে আত্মা বলা যায় না। অদ্বৈতমতানুসারে কেবল ব্রহ্মকেই আত্মা বলিতে হয়। অদ্বৈতমতে সর্ব্বভূত অনাত্মারই অন্তর্গত।

অদ্বৈতমতানুসারে 'সর্ব্বভূত' অনাত্মার নামান্তর বলিয়া সর্ব্বভূতকেও অনাত্মা বলিতে হয়। অনেক অদ্বৈত-গ্রন্থানুসারে 'অনাত্মা' অনিত্য। কিন্তু অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম প্রকরণের উক্ত বিংশ শ্লোকানুসারে সর্ব্বভূতেরও নিত্য-ব্রহ্মের ন্যায় নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। নিরঞ্জন ব্রহ্ম 'সর্ব্বভূতে' বিদ্যমান বলিলে, কোন বুদ্ধিমানই সর্ব্বভূতের অনিত্যতা বুঝেন না। নিরঞ্জন নিত্য-ব্রহ্ম যাহাতে বা যে সকলে বিদ্যমান, তাহাই বা সে সকলও অবশ্যই নিত্য। কারণ নিরঞ্জন নিত্যের অনিত্য-বিদ্যমানতা থাকিতে পারে না। কেহ সেই ব্রহ্মের ঐ প্রকার বিদ্যমানতা অসঙ্গত নহে বলিলে, আমরা তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া তাঁহার অযৌক্তিক অসত্য কথা ভ্রম-প্রসূত বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকি। কারণ অষ্টাবক্র স্পষ্টই নিত্য ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বভূতেরও নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা।"

অষ্টাবক্র-সংহিতোক্ত আত্মাত্মতত্ত্বোপদেশ নাম প্রথম প্রকরণসম্বন্ধীয় মত সমাপ্ত।

সাময়িকী

আমাদের কি করিতে হইবে?—চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে তাহা কি বলিতে চায়? তাহা সব কিছু ভাঙিতেছে। ভাঙন তো বহু পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যেদিন 'দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন' লিখিয়াছিলেন, সেদিনই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এই ভাঙনকেই। প্রায় আশী বছরেরও আগে শ্রীনিত্যগোপাল যখন সন্ন্যাসী হইয়াও লিখিয়াছিলেন 'পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধীয় জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান', তখনও তিনি এই ভাঙনেরই পথে কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর নূতন সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপিত হইবে তাহারই সূত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আজ ভাঙিতে ভাঙিতে যদি গড়িয়া চলিতে না পারি তাহা হইলে আমরা কোন্ অতলে যাইয়া পৌঁছিব? একথা ভুলিয়াছি বলিয়াই কেবলই অন্যকে আঘাত করিতেছি, মনে করিতেছি উহাই আমার ব্যক্তির বা আমার দলের বাঁচিবার পথ। কিন্তু এ ভুল ভাঙিতেই হইবে। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করিতে চাহিলে ব্যক্তিভাবেই হউক, সমষ্টিভাবেই হউক অপরকে অস্বীকার করিয়া আঘাত করিয়া আর একজন বাঁচিবে—এ কথা ভুলিতেই হইবে। 'সে যুগ হয়েছে বাসি' যখন একে অপরকে শোষণ করিয়া নিজে বড় হইতে পারিত, অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিত। আজ তো শোষণেরই বিরুদ্ধে, অত্যাচারের, অপমান অন্যায়ের বিরুদ্ধেই ছিল অভিযান, কিন্তু এক অন্যায় রদ করিতে চাহিয়া যদি আর এক অন্যায় করি, এক রকমের শোষণ বন্ধ করিতে চাহিয়া যদি অন্য রকমের শোষণ করি, অন্যায়ের পথেই চলি—তাহা হইলে সমূলে ধ্বংস অনিবার্য। আজ আমরা সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

তাই আমাকে যদি বাঁচাইতে চাই, তোমাকে বাঁচাইয়াই আমাকে বাঁচিতে হইবে—এই কথা বলিতেই —ধর্ম দর্শন সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি সর্বত্র—এই তত্ত্ব প্রস্থাপন করিতেই—সর্বসমন্বয়-মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন। অর্থনৈতিক বা সামাজিক সকল পুরনো কাঠামো ভাঙিয়া উহার পদার্থপ্রধান বস্তু সমাজের মত সকল অংশের প্রাধান্য স্বীকৃতির সঙ্গে সকলকে যে সমষ্টি-বদ্ধ হইয়া সমাস বা সমাজ সৃষ্টি করিতে হইবে—নূতন যুগের এই কথা বলিতে শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব, আর সেই কথা দার্শনিকভাবে সর্বত্রে প্রস্থাপন করিতেই

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের অস্তিত্বের প্রমাণ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই আমাদের আবেদন যে আমরা যে মানুষ এ কথাটা মনে রাখুন। আত্মপ্রতিষ্ঠার স্থলে দলীয় প্রতিষ্ঠার নামে যে হানাহানি চলিতেছে, তাহা মানুষের সমাজের কথা নয়। সমাজের সমগ্রতার ধারণা যেমন এতদিন ছিল না এখন যাহা হইতেছে তাহাতেও তো সমগ্রতার বোধ কোথাও নাই? অপর দলকে ঘায়েল করিয়া আমার দলই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে ইহাও কি ধনিক-মনোবৃত্তি নয়? যদি মতভেদ সত্যিকারেরই কিছু থাকে যে জন্য এত দল হইয়াছে—তাহা হইলে সকল মতকেই স্বীকার করিয়া মর্যাদা দিয়া কি করিয়া সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকা যায় তাহাই চেষ্টা করা ছাড়া তো আর পথ নাই। দলে দলে হানাহানি করিয়া কি ধনিককে হঠানো যাইবে? অপরকে বাদ দিয়াই আমি বাঁচিব—কিংবা আমার প্রয়োজনে, আমার মন-মত অপরকে ব্যবহার করিয়াই আমি বাঁচিব অথচ আমার জীবনে তাহার প্রয়োজনকে প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিব না—ইহাই তো ধনিক-মনোবৃত্তি। স্বীকার করুন, প্রত্যেকে অপরকে স্বীকার করুন, অস্বীকার করুন, মর্যাদা দিন—'সকল দল লয়ে আমার এক অখণ্ড দল' বিশ্বনাগরিক শ্রীনিত্য গোপালের এই কথাকে বুঝিতে চেষ্টা করুন—বাঙালা-দেশকে, বাঙালীকে বাঁচান, ভারতবর্ষকে বিশ্বকে বাঁচান। পারস্পরিক হানাহানি করিয়া আর প্রাথমিক স্তর হইতে শেষ পর্যন্ত পড়া শুনা সব বন্ধ করিয়া দিয়া কি বিপ্লব সার্থক হইবে? দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখুন—যাহা আজ বাংলাদেশে হইতেছে—ইহার নাম বিপ্লব? ইহার নাম নূতন সমাজ-সৃষ্টি? একটু ভাবিয়া দেখুন আমরা কোথায় চলিয়াছি, নিগৃহীত অত্যাচারিতের জীবনে হাসি ফুটাইবার এই কি পথ? আমরা ধনিকের টুঁটি চাপিয়া ধরিবার কথা বলিয়া নিগৃহীতকেই কি আরও নিগৃহীত করিতেছি না? আমরা ধনিক হইতে চাই বলিয়াই আমরা এই পথ লইয়াছি। ধনিক-মনোবৃত্তি আমাদিগকে সর্বাগ্রে দূর করিতে হইবে। আমরা যে পথে চলিতেছি তাহাতে ধনিকত্ব দূর হইবে না, ধনিক-মনোবৃত্তিও নয়। দলে দলে এই বিভেদ কলহ বন্ধ না করিতে পারিলে বিভিন্ন দল থাকিলেও সকল দল ধনিকের গদী হইতে নামাইয়া নূতন সমাজ গড়িতে পারিব না। নূতন সমাজ গঠন একমাত্র তখনই সম্ভব হইবে যখন ধনিকত্বের মোহ হইতে আমরা মুক্ত হইব—নিজেরা টেবিলিন টেরিকট ব্যবহার না করিয়াই খুশী থাকিতে পারিব—গোপনে প্রত্যেকেরই মোটা হুকুমের নামী দামী দস্তর বিভিন্ন হুকুমে তৈরী হইয়া উঠিবে না এবং অপর সকলকে প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিয়া সংগঠনের পথে পা বাড়াইব। কি করিতেছি আমরা তাহা কি ভাবিয়া দেখিতেছি? বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব—সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষকে আজ বাঁচিতে হইলে একই মনোবৃত্তির অধিকারী হইতে হইবে—তাহা হইতেছে—আমরা পশু নই, মানুষ। জঙ্গলের পশুদের একের অপরকে নস্যাৎ করিবার পথই বাঁচিয়া থাকার শ্রেষ্ঠ পথ—মানুষের পথ তাহা নহে। আমরা মানুষ—মানুষ আমাদের পথ অপরকে স্বীকার করা, মর্যাদা দেওয়া, সকলে মিলিয়া বাঁচিব—ইহাই বুঝিতে শেখা। নহিলে নূতন সমাজ কিসে হইল? এতদিন ধনিক নামধেয় শোষকদের দ্বারা অপরে শোষিত হইতেছিল, এখন শ্রমিকের নামে বিভিন্ন দল তৈরী করিয়া অপরদের শোষণ করা, অত্যাচার করা, নিগৃহীত করা হইতেছে। দৈনন্দিন জীবন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ব্যবসা বাণিজ্য কাজকর্ম বন্ধ হইয়া এক জীবন অবস্থার সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। এতটুকু উন্নতি হইল? কোন্ সমগ্রত্ব রহিল? নূতন কি করা গেল? আমরা প্রতি মানুষের কাছে, প্রতি দলের কাছে আবেদন করি আমরা কোথায় চলিয়াছি, কি করিতেছি যেন ভাবিয়া দেখি। ধনিক ঠেঙাইতে যাইয়া যে ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি বসাইবার পথ ধরিলাম—ইহা যে আজকের দিনের বিপ্লবের পথ নয় তাহা আজ বুঝিতে হইবে।

আমাদের যাহা হইতে হইবে, যাহা করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে এই—প্রতি ব্যক্তি বা দলের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সকলের সম্মিলনদ্বারা সমাজ সৃষ্টি—সুস্থ সমাজ সুন্দর সমাজ—যেখানে মানুষের বুকে মানুষ ছুরি বসাইবে না, একজন অপরকে বঞ্চিত করিয়া অপরে ভোগের প্রমত্ততায় ডুবিবে না। শ্রীনিত্যগোপালের প্রতি অখণ্ড খণ্ডের সমন্বয়ে এক সামগ্রিক অখণ্ড গড়িয়া তুলিবার সাধনা লইতে হইবে। ইহা ছাড়া আর পথ নাই।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বারুইহাটি, পোঃ অম্বিকানগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্টিং ইণ্ডিয়া ৩১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

কর্ম-কৌলীণ্যের স্থান গীতায় নাই। এক কর্ম বা এক অকর্মবাদ স্থাপন করাই কৌলীণ্য। কোন একটীর উপর জোর দিলেই অপরগুলি হয় অকুলীন। কৃষ্ণ-সাহিত্যে গায়ত্রী-জপ ও মুচির জুতা সেলাই দুই-ই ভজন যখন দুই-ই 'অর্পিত' হইয়া 'কৃত'। মুচির জুতা সেলাই যদি গায়ত্রী জপের সঙ্গে, কোনও কিছু না করার সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্বন্ধ না হয়, একান্ত গায়ত্রী জপ বা একান্ত অকর্মে মুক্তি আনিবে না। তাই তো চাই প্রতি কর্মীকে সর্ব কর্মী হইবার জন্য সর্ব-কর্ম হীনতার সমন্বয়েই প্রাণপণ যত্ন করা। কর্ম-পরিপাটির জন্য অবশ্য বাইরের একটা কর্ম-বিভাগ থাকিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রতি বিভাগের কর্মীর সহিত, কর্ম-প্রণালীর সহিত রীতিমত হাতে কলমে পরিচিত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যে কোন অফিসে সব অফিসারদেরই সব কর্ম শিখিয়া রাখা দরকার যদিও শৃঙ্খলার সময় তাঁহারা যার যার স্বতন্ত্র বিভাগেই কাজ করেন। বিশৃঙ্খলার দিনে তো কর্ম-বাটোয়ারা, বর্ণ-বাটোয়ারা, আশ্রম-বাটোয়ারা চলে না; তখন যে সকলের ক্ষেত্রেই সকলের দাঁড়াইবার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। বিনিময় ছাড়া যে তখন সব অচল। শাস্ত্র-সমন্বয় করিয়াই গীতা যোগ-শাস্ত্র, বিনিময়-শাস্ত্র।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

কৃষ্ণকে কৃষ্ণির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। যেমনি আত্মা যেমন অনন্তর, কৃষ্ণিহীন কৃষ্ণার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে এক করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches' - Radhakrishnan

—ধর্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জন হওয়ার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার নির্দেশ আছে নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১। ব্রহ্মসূত্র (অনুবাদ ও ভাষ্য)
- ১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ২·০০
- ২য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত) ৮·০০
- ৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত) ৬·০০

২। ঈশোপনিষৎ ২·০০
৩। কেনোপনিষৎ ১·০০
৪। কঠোপনিষৎ ৩·০০
৫। প্রশ্নোপনিষৎ ১·৭৫
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ ১·৭৫
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২·৭৫
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩·৫০
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে ৩·০০
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ ·৫০
১১। গীতাসমন্বয় ·৭৫
১২। উদ্ধবগীতা (পুস্তিকা) ·৫০
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে
১৪ পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৩·০০
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
১৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২·০০

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীপ্রতিভা মিত্রের

১। নারী-প্রগতির ভূমিকা ১·২৫
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ পদ্ধতি নিত্যগোপাল
ও শিক্ষা প্রসার কথা ·৩১
৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ৫·০০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল ·৬২
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২·০০
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ৩·০০
৪। মণীন্দ্র-কুমার ৪·০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পো: অশ্বিনীনগর, (তারা—দেগঙ্গানগর) ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীবিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহামঠ

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৭, ১৯৭০ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কর্ম-কৌলীন্যের স্থান গীতায় নাই। এক কর্ম বা এক অকর্মবাদ স্থাপন করাই কৌলীন্য। কোন একটীর উপর জোর দিলেই অপরগুলি হয় অকুলীন। কৃষ্ণ-সাহিত্যে গায়ত্রী-জপ ও মুচির জুতা সেলাই দুই-ই ভজন যখন দুই-ই 'অর্পিত' হইয়া 'কৃত'। মুচির জুতা সেলাই যদি গায়ত্রী জপের সঙ্গে, কোনও কিছু না করার সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হয়, একান্ত গায়ত্রী জপ বা একান্ত অকর্মে মুক্তি আসিবে না। তাই তো চাই প্রতি কর্মীকে সর্ব কর্মী হইবার জন্য সর্ব-কর্ম হীনতার সমন্বয়েই প্রাণপণ যত্ন করা। কর্ম-পরিপাটির জন্য অবশ্য বাইরের একটা কর্ম-বিভাগ থাকিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রতি বিভাগের কর্মীর সহিত, কর্ম-প্রণালীর সহিত রীতিমত হাতে কলমে পরিচিত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যে কোন অফিসে সব অফিসারদেরই সব কর্ম শিখিয়া রাখা দরকার যদিও শৃঙ্খলার সময় তাঁহারা যার যার স্বতন্ত্র বিভাগেই কাজ করেন। বিশৃঙ্খলার দিনে তো কর্ম-বাটোয়ারা, বর্ণ-বাটোয়ারা, আশ্রম-বাটোয়ারা চলে না; তখন যে সকলের ক্ষেত্রেই সকলের দাঁড়াইবার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। বিনিময় ছাড়া যে তখন সব অচল। শাস্ত্র-সমন্বয় করিয়াই গীতা যোগ-শাস্ত্র, বিনিময়-শাস্ত্র।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

সূচীপত্র. অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭৭-১৯৭০

১। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জন্মোৎসব ২১৭
২। যুগ-সমস্যা ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ২১৯
শ্রীপার্বতী নাথ বিশ্বাস
৩। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ২২৯
শ্রীসত্যব্রত ঘোষ
৪। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ২৩৭
৮৮তম জন্মদিনে
শ্রীশান্তশীল দাশ
৫। সমবায় এবং সমন্বয় ২৩৯
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৬। সমবায়—তত্ত্বে ২৩২
শ্রীপার্বতী নাথ বিশ্বাস
৭। কবি কুমুদ-প্রয়াণে ২৪২
শ্রীসুন্দররঞ্জন কাব্যতীর্থ
৮। পারিবারিক জীবন-আলোচনা ২৪৩
ডা: অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। বৈজ্ঞানিকের শেষরক্ষা ২৫১
অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
১০। মানববাদী সর্বোদয়ী ও গণতান্ত্রিক বন্ধুগণের ২৫৯
নিকট আবেদন
শ্রীবদেশ রঞ্জন দাস
১১। সাথী ২৬২
শ্রীসুনীতি সান্যাল
১২। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৮৫) ২৬৩
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
১৩। সাময়িকী: রাজনীতির মূল লক্ষ্য ক্ষমতা দখল ২৬৫
শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস

বাটার শো-উইন্ডোর আড়ালে

বাটার যে-কোনো শো-উইনডোই আপনাকে আকৃষ্ট করবে। তাকে বলতে আপনি মুগ্ধ হবেন এবং সম্পূর্ণ নতুন ঠকবেন। চোখের সামনে ফোটে উঠবে অনিন্দ্যসুন্দর আকাশকুসুম কল্পনা, সঙ্গেই পাবে সুন্দর ডিজাইনের জুতো যেন সবাই একটুনি ঐ শো-উইনডো থেকে নেমে এলেন।

কিন্তু কী আছে ঐ শো-উইনডোর আড়ালে? আছে বাটার উৎপাদন আর হাজারো কিংবদন্তী।

আছে ২২,০০০ নিপুণ কর্মীর এক বাড়ি বাহিনী, কারখানায়-কারখানায় রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে ২,০০,০০০ জোড়া বিভিন্ন জুতো। আধুনিক ও অভিজাত সু-এনথিউসিয়াস্ট এবং এই উৎপাদন-হাজারও প্রতি জোড়া জুতোই বিশেষজ্ঞদের কঠিন-গড় প্রত্যেক সুষম সন্ধানী।

আরো : আছে ১১০০টি বাটার দোকান ও এজেন্সি, আছে ৬০০টি বি এস সি পাইলিটা বিক্রয়কেন্দ্র, ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটর— আছে দোকানে-দোকানে বিক্রয়কর্মীদের সদাহ কুশলী হাত— উৎসুক পায়ে-পায়ে তারা পৌঁছে দেন মাপসই জুতো।

শুধু বাটা কর্মীদের বসবাসের জন্য গড়ে উঠেছে আধুনিক ও সুবিধা-সম্পন্ন উপনগর। তারা যে কেবল আপনার জন্যই জুতো তৈরি করেন তা নয়—সারা পৃথিবীর, এমনকি পৃথিবীর অন্যের দেশগুলিতেও, তাদের জুতোর চাহিদা— বছরে এই খাতে তৈরি হয় ১০,০০০,০০০ জোড়া জুতো।

এই পরিচয় চমৎকার।

ভবিষ্যতে আরো বিস্ময়করভাবে বাটার উন্নয়ন সম্পর্কে বলবার ইচ্ছে রইলো আমাদের—আশা করি আবার দেখা হবে।

Bata

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০
ভারত আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৩·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০
বিদ্যাসাগর	২·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
বাংলার ঋষি	৩·৫০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	২·৫০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১২·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা-১২

সব মানুষের জন্য-সব কলমের জন্য

সুলেখা

স্পেশ্যাল

পার্মানেন্ট ঃ
ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়েল ব্লু
ব্ল্যাক ★ রাইটিন
ওয়াশেবল ঃ রয়েল ব্লু
রেড ★ টীল

সুলেখা

একজিকিউটিভ

পার্মানেন্ট ঃ
ব্লু-ব্ল্যাক ★ নেভি ব্লু ★ সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেবল ঃ রয়েল ব্লু ★ এমারেল্ড টীল
ভারমেট রেড

সুলেখা

জেনারেল

পার্মানেন্ট ঃ ব্লু-ব্ল্যাক
ওয়াশেবল ঃ
রয়েল ব্লু ★ রেড ★ ব্ল্যাক

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের গৌরব-ধন্য

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

UNIVERSITY

উদ্বোধন

অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, খ্রী: ১৯৭০ ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের আশীর্বাদ-ধন্য শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ৮৮তম জন্মতিথি কার্তিকী কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দের ২৯া অগ্রহায়ণ—ইং ২২শে নভেম্বর ১৯৭০ বুধবার) শ্রীমৎ স্বামীজীর সমাধি নরনারায়ণ আশ্রমে সমগ্র মানুষ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের বন্দনা হয়। এই উপলক্ষে ৬ই অগ্রহায়ণ রবিবার সর্বসাধারণের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে বন্দনা-অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। ঐ দিন দ্বিপ্রহরে আশ্রমস্থ বিদ্যালয়গুলির শিশুগণসহ সাড়ে চারি-শত জনকে খিচুড়ী ইত্যাদি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকাল ৪টাতে শতাধিক বয়স্ক ব্যক্তিসহ শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবন ও দর্শন আলোচিত হয়। সেখানে পঠিত প্রবন্ধাদি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। ইহা ছাড়া শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমদেশরঞ্জন দাস মৌখিক ভাষণ দেন। সন্ধ্যারতির পর বর্তমান দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কিছু সংখ্যক সঙ্গীত-অনুরাগীর উপস্থিতিতে শান্ত ও নীরব পরিবেশে মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন আশ্রমের বিশেষ হিতৈষী, স্থানীয় অধিবাসী অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীত্রিভেদ্রমোহন রায় মহাশয় যিনি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই গ্রামে আসিবার পূর্ব হইতেই আশ্রমকে বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং আজ পর্যন্ত তাঁহার শক্তিহীন দেহ লইয়াও সাধ্যমত সহযোগিতা করিতেছেন। আলোচনান্তে আশ্রম-সম্পাদিকা অতি সংক্ষেপে শ্রীমৎ স্বামীজীর সহজ জীবনের কথা একটু বলিয়া সকলকে সাদর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বর্তমান যুগ-চেতনার কাছে একটী সহজ জীবনের সামগ্রিক রূপ উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। সে রূপ তিনি তাঁহার উপলব্ধির ভাষাতেই শুধু বলেন নাই, তিনি উহা ভারতীয় প্রস্থান-ত্রয়ের—উপনিষৎ বেদান্ত ও গীতার—কাঠামোর মধ্যেও রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব যে সুস্থ মুক্ত জীবনের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে জীবন-বিমুখতার অসুস্থতাও নাই, আবার মাত্রাহীনতায় দ্বারা ব্যক্তি বা সমাজ-জীবনকে ক্লেদ-পঙ্কে টানিয়া আনাও নাই। যে আসক্তি বা বিদ্বেষ ব্যক্তি-জীবনকে কলঙ্কিত করে সেই আসক্তি-বিদ্বেষ হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটী কল্যাণঘন সামগ্রিক জীবনকে জীবনের সম্মুখে রাখিতে হয়। সুস্থ ব্যক্তি-জীবন সম্ভবই নয় যখন সে নিজের অন্য-নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও নিজেকে সমগ্রের মধ্যে বিধৃত বলিয়া না জানে। সমগ্র পরিবেশ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া যে আত্ম-ভক্তির পথ, তাহাতে ফাঁকি থাকে, ফাঁক থাকে। স্বরূপ ও বিশ্বরূপ উভয়ত্র যখন মানুষ মুক্ত প্রাণ লইয়া বিচরণ করে—কিছুতে আসক্তিবশতঃ আটকাইয়াও থাকে না, আবার সর্বের প্রতি দরদেরও অভাব হয় না—স্বরূপ বিশ্বরূপ সমন্বিত সেই সুস্থ সামগ্রিক মুক্ত জীবন-কথাই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ রাখিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তি জীবন তখনই সুস্থ হইতে পারে যখন তাহার নিজস্ব অনন্যতা ও নিরপেক্ষ স্বভাব লইয়াও সে মনে করিতে পারে যে সে-ও একটী সমগ্র বস্তু। সমগ্র হইতে পৃথক হইয়া, বিচ্ছিন্ন হইয়া সে সুস্থ বা সুন্দর হইতে পারিবে না।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এমন জীবনই যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন সহজ মানুষ—বেশভূষায় আহারে আচরণে এমন সহজ মানুষ তিনি ছিলেন যে ভাবিলে হৃদয় পুলকিত হয়। তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়া গিয়াছেন, একেলা যাইবে, সুখ না পাইবে। পুরুষোত্তমানন্দের বেশভূষা আহার সহজভাবেই এই রকম ছিল যাহাতে সর্ব সাধারণের সঙ্গে তাঁহার সহজ যোগ ছিল। তিনি যাহা খাইতে ভালবাসিতেন তাহাও সর্বসাধারণের সুখের—কচুশাক, নেটে শাক, বিউলী ডাল এইগুলিই ছিল তাঁহার প্রিয়। কফি, পটল তাঁহার প্রিয় খাদ্য নয়। ছেঁড়া মানুষের দলের লোক তিনি। সকলের সঙ্গে একই ছেঁড়া মাদুরে বসিয়াই তিনি নেতা বা গুরু। তাঁহার কথা ইহাই ছিল যে অন্যের মানুষের সকলের অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন সন্দেহ নাই এবং সকল মানুষকে অন্যের দিবার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করিতে হইবে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে শিখাইতে হইবে যে সে মানুষ—নিজের পেট যেন তেন ভরানই তাহার একমাত্র সাধ্য হইতে পারে না। তাহার মনকে প্রথম হইতেই এই শিক্ষা দিতে হইবে যে তাহার নিজের পেট যেমন ভরাইতে হইবে তেমনি তাহার প্রতিবেশীর পেটও—আজ বিশ্বটাই প্রতিবেশী—পেট ভরাইতে হইবে। প্রত্যেকের নিজের পেট ভরাইবার শিক্ষা একবার পাইলে সে পেট কোনদিন ভরাইয়া শেষ করা যায় না—অর্থাৎ অপরের পেট ভরানর কথা আর তাহাকে শেখান যায় না। সেই জন্যই উপনিষদ্ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা বলিয়াছেন—এই ত্যক্তেন প্রথম হইতে না শিখাইলে মানুষের প্রয়োজনবোধের সীমা বা মাত্রা থাকে না। অপরের পেট ভরান মানেই উচ্চ চিন্তা, সমগ্রের চিন্তা। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই কথাটাই বলিতে চান যে মানুষ একটী সমগ্র বস্তু—তাহার সকল সমস্যাও সামগ্রিক, সমাধানও করিতে হইবে সামগ্রিক ভাবে। তাঁহার মতে মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক, রাজনীতিক বা অর্থনীতিক সব সমস্যার সমাধানই এক সূত্রে গ্রথিত—সেটা হইতেছে শোষণহীনতা—কেহ কাহারও শোষণ করিতে পারিবে না—এক মানুষেরই বিভিন্ন দিকের এক দিক অপর দিককে শোষণ করিতে পারিবে না এবং প্রত্যেকের প্রত্যেককে মর্যাদাদান বা স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি। আমার আধ্যাত্মিকতা আমার বাস্তব জীবনকে শোষণ করিতে পারিবে না, আমার বাস্তব জীবনও আমার আধ্যাত্মিকতাকে শোষণ করিতে পারিবে না। আমি অপরকে তার স্বতঃ মূল্য ও মানে স্বীকৃতি দিব, আমারই বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিকে যথাস্থানে স্বীকৃতি দিব। এইভাবে জীবনের প্রতিটি দিক সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। তেমনই ধনিক যেমন শ্রমিককে শোষণ করিতে পারিবে না, শ্রমিকও ধনিককে শোষণ করিতে পারিবে না। প্রত্যেককে অপরের উপযুক্ত স্থান মান মর্যাদা দিয়া প্রত্যেকেই যে একই সমগ্রের অঙ্গ, অপরের সঙ্গে মিলিয়াই যে সে পূর্ণ ইহাই বুঝিয়া চলিতে হইবে। এইভাবে শোষণহীন সুস্থ একটা জীবন-চেতার কথাই সর্ব দেশের সর্ব মানুষের কাছে শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনকে অবলম্বন করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ রাখিয়া গিয়াছেন। আপনারা এই সমস্যাকুল দিনে এই ধ্বংসোন্মুখ আত্মঘাতী বিপর্যয়ের মুখে এই সামগ্রিক positive সংগঠনাত্মক জীবন-চেতনাকে বুঝিয়া দেখুন, সমগ্র সমাজের কাছে উপস্থিত করুন—এই আবেদন আপনাদের সকলের নিকট উপস্থিত করি।

যিনি উচ্চ আদর্শ বুকে করে সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেবার পন্থারূপে কর্মকে বরণ করেন, তিনি সৃষ্টি করবেন। যতখানি আদর্শের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে মানুষকে পেয়েছি, যতখানি আদর্শকে হৃদয়ে নিয়ে মানুষের ভিতর ডুবতে পেরেছি, ততখানি আমার কর্ম সহজ ও বাস্তব। গঠন-কার্য্য জ্ঞানময় তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত না হলে তা মানুষকে মানুষ করে না, নিজেও গড়ে না ; বরং ধীরে ধীরে সে আত্মহত্যা ক'রে দীর্ঘ দিনের জন্য কর্মীকে অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করে যায়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত।

যুগ-সমস্যা ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস ॥

ওঁ নমো তত্ত্বমূর্ত্তয়ে ভক্ত ভগবতে নিতাগোপালায়
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় তুরীয়াতীতায়
ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবৎ পুরুষোত্তমায়।
ওঁ আজানুলম্বিত ভুজ কনকাবদাতং
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষং
বিশ্বপ্রেমঘন নরনারায়ণসেবীং
বন্দে সমন্বয়-গুরুং পুরুষোত্তমানন্দং।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দজীর শুভ ৮৮তম জন্মোৎসব-বাসরে আপনাদের সঙ্গে সমবেত হইয়া আমার সকল সত্তা দিয়া প্রথমেই প্রণাম জানাই সমন্বয়াচার্য্য ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল দেবকে এবং তাঁহারই স্বরূপপ্রাপ্ত ও সমন্বয়তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে।

পুরুষোত্তমানন্দজী আসিয়াছিলেন, আবার চলিয়াও গিয়াছেন। তিনি আসিয়াছিলেন একটা mission লইয়া। সেই mission-এর স্থিরলক্ষ্যে অচ্যুত থাকিয়া তাঁহার সাধিতা, তাঁহার লেখনী, তাঁহার সামগ্রিক জীবনের সকল আচরণের ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া যে জীবনবাদের ব্যাখ্যান ভবিষ্য সমাজের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অনুধাবন করা, তাহাকে ধরাই তাঁহার জীবন আলোচনা করার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি কেন আসিয়াছিলেন, কি লইয়া আসিয়াছিলেন, কি রাখিয়া গেলেন এবং যাহা রাখিয়া গেলেন তাহা আমাদের জীবনের পক্ষে কতখানি প্রয়োজন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থ-নৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, আমাদের পারমার্থিক জীবন, লৌকিক জীবন, এক কথায় আমাদের সামগ্রিক জীবন বৃদ্ধির পক্ষে কতখানি উপযোগী তাহা অনুসন্ধান করাই তাঁহার জীবন-আলোচনা করার সার্থকতা।

আমরা এ যুগের মানুষ আজ সর্ব্ব দিকে বিব্রত উৎপীড়িত। কাহারও কোন স্থানে যেন কোন স্থিতিভূমি নাই। ক্রমশঃ আমরা যেন frying fan to fire-এ পড়িতেছি। কেন এমন হইল? ইহার মূল কারণ কি? বুদ্ধি আর কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। বুদ্ধি আজ যেন সর্ব্বক্ষেত্রে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। এই জগতে বিচরণ করিতে যাইয়া, জীবন যাপন করিতে যাইয়া আমাদের কাছে জগৎটা একটা কঠিন নিষ্ঠুর রূপে উপস্থিত হইতেছে। আসলে জগৎটা কি সত্যই নিষ্ঠুর? রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন, "চোখে দেখিস প্রাণে কাদা হৃদয় মাঝে দেখ না ধ'রে ভুবনখানা"। আমরা চোখে দেখি, চোখে দেখি শুধু নয়, বুদ্ধির শক্তিতে গ্রহ গ্রহান্তরের অতি সূক্ষ্মতম বস্তুকেও দেখার সামর্থ্য রাখি এবং ঐ দৃষ্টিশক্তিও আমাদের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির কৌশলে ক্রমবর্দ্ধমান। কিন্তু আমরা প্রাণে কাণা, তাই হৃদয়হীন হইয়া পড়িতেছি। প্রাণহীন একান্ত বুদ্ধি যতই প্রখর হউক উহা যে একটা intellectual crisis-এর সৃষ্টি করে, মানুষের জীবনে বিপর্য্যয়ই আনয়ন করে এ কথা আজ আর বুঝিতে কষ্ট হয় না। অথচ বুদ্ধি ছাড়া চলিবারও উপায় নাই। বিপরীত পক্ষে বুদ্ধিহীন প্রাণও কোন শুভ আনয়ন করিতে পারে না। প্রাণহীন প্রজ্ঞা যে আমাদের সকল দুঃখের মূলে এ কথা বৈজ্ঞানিক ভাবে দার্শনিকভাবে সত্য। এই প্রাণ ও বুদ্ধিকে একটা স্তরে মিলিত করার সাধনাও জগতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে না—এইখানেই আমাদের সকল সমস্যার মূল নিহিত। মানবতার মূলও এইখানেই। শ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যুগ-প্রয়োজন এই প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বিত দর্শন সমন্বয় দর্শন, প্রাণ-দর্শন বা পুরুষোত্তমদর্শন লইয়া আবির্ভূত হইলেন। এই সমন্বয় দর্শন বা পুরুষোত্তম-দর্শনের আলোকে প্রাণের স্তরে সকল ঘটনাকে সকল বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করিয়া নতুন যাত্রা পথের নিশানা রাখিয়া গেলেন। আমরা যাহারা তাঁহার সাক্ষাৎ সাহচর্য্য

লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম এবং যাহারা তাঁহার করুণা ধারণ করিতে সামান্যও সক্ষম হইয়াছিলাম তাহারা দেখিয়াছি তাঁর সমগ্র জীবনে ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আধ্যাত্মিক সকল স্তরে তাঁহার সকল আচরণের মধ্য দিয়া এই প্রাণ-দর্শন বা পুরুষোত্তম-দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মনে পড়ে ১৯৫৩ সনে সেদিনের কথা যেদিন আমি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিলাম। প্রথমেই তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পাঠ করিতে দিলেন। কবিতাটি আজিকার দিনে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক বলিয়া পূর্ণ চাই পাঠ করিতেছি।

দূর হ'তে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন ?
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
সপ্ত কক্ষ হ'তে মুক্ত রক্তের কল্লোল
বহ্নি বন্যা ঝঞ্ঝের বেগ,
বিশ্বনাশ ঘটিকার মেঘ
কৃতান্ত গর্জন
মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,—
ডাকিছে কাণ্ডারী—এসেছে আদেশ
বন্দরে বন্ধন কাল এবারের মতো হ'ল শেষ।
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা
আর চলিবে না।
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
তুফানের মাঝখানে নূতন সমুদ্র তীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারিদিক হ'তে ওই দাঁড় হাতে ছুটে আসে দাঁড়ি
নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর ?

একথা শুধায় সবে ভীত আর্তস্বরে
ঘুম হ'তে অকস্মাৎ জেগে
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো
রাত্রি আছে কি না আছে জানেনা তো কেউ।
তারি মাঝে হুঙ্কারে কাণ্ডারী
নূতন সমুদ্র তীরে দিতে হবে পাড়ি।
বাহিরিয়া এল কারা ?
মা কাঁদিছে পিছে, প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে
ঘরে ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল
যাত্রা করো যাত্রা করো যাত্রী দল।
উঠেছে আদেশ
বন্দরের কাল হ'ল শেষ।
মৃত্যু বেদ করি, দুলিয়া চলিছে তরী
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে কবে হবে পার
সময় তো নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী
এসেছে আদেশ
বন্দরের কাল হ'ল শেষ।
অজানা সমুদ্র তীরে, অজানা সে দেশ
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল
যত অশ্রুজল
যত হিংসা হলাহল
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া

ভুল উড়াজিয়া
ঊর্দ্ধ আকাশেরে লক্ষ্য করি
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার।
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার
শিরে বয়ে উন্মত্ত দুর্দ্দিন
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন
হে নির্ভিক, দুঃখ-অভিহত।
ওরে ভাই কার নিন্দা করো তুমি, মাথা কর নত
এ আঁধার এ তোমার পাপ
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হ'তে তুমি বাহু কোণে আঁখিকে ঘনায়
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, সবলের উদ্ধত অন্যায়
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ
জাতি-অভিমান
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙ্গিয়া পড়ুক ঝড় জাগুক তুফান
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবান।
রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব অভিমান
শুধু এক মনে হও পার
এ প্রলয় পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।
দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেঙ্গে যায় তারা সরে যায়
জীবনেরে ক'রে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখো তাহাদের অন্তরেতে বিরাট স্বরূপ।
তারপরে দাঁড়াও সম্মুখে
বলো অকম্পিত বুকে—
তোরে নাহি করি ভয়
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দেব কেহ,
শান্তি সত্য শিব সত্য সত্য সেই চিরন্তন এক।
মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে
পাপ যদি নাহি সরে যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়
অহঙ্কার ভেঙ্গে নাহি পড়ে
আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘর ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিবে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত!
বীরের এ রক্তস্রোত মায়ের এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখ-রাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

কবিতাটি পাঠান্তে তিনি "এই আমার কথা এই আমার সাধনা" বলিয়া আমাকে মন্ত্র দান করিয়া তাঁহার সাধনায় অংশীদার হইবার জন্য আহ্বান জানাইলেন কী সে সাধনা? কবি যেখানে প্রশ্ন রাখিয়াছেন—স্বর্গ কি হবে না কেনা? এই জগতে দেবতার অমর মহিমা কি দেখা দিবে না? কবির এই আকাঙ্ক্ষা তথা সমগ্র মানব-সমাজের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তপস্যা ও সাধনার জন্যই শ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ

একটি সামগ্রিক জীবনবাদের কথা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার মুখে সদাসর্বদাই শুনিয়াছি "ধরার ধূলি হোক, ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ"। তিনি তাঁহার বহু ভাষণেই বলিয়াছেন, 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারই রসাল নন্দনে' এ কথা আমাদের নয়, আমাদের কথা 'কবে তৃষিত এ মরু "গড়িয়া" তুলিব তোমারই রসাল নন্দনে"। এই ছত্রটাকে আজ আমাদের অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ও কর্মের দোষে তৃষিত মরুই করিয়া ফেলিয়াছি; ইহাকে সোনোক বৈকুণ্ঠের রসাল নন্দনরূপে গড়িয়া তোলাই আত্মিকার যুগের সাধনা। তাই তিনি কাণ্ডারীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ডাক দিয়াছেন—পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা আর চলিবে না—নূতন সমুদ্র তীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি। সামগ্রিক জীবন রূপ নূতন সমুদ্র তীরে পৌছানই তাঁহার লক্ষ্য। বহ্নি বন্যা তরঙ্গের বেগে, বিষবাষ্প বটিকার মেঘে তৃতল গগন আচ্ছন্ন, কালোয় আলো ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অনর্থ, যত অমঙ্গল যত হিংসা হলাহল সমস্ত আজি কূল উজিয়ে তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে। ইহারই মাঝে তরী লইয়া পাড়ি দিবার জন্য পথ চিরিয়া চিরিয়া চলার সাধনা ছিল তাঁহার সাধনা। শ্রীনিত্যগোপালের নিকট বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া, শ্রীনিত্যগোপালে সব কিছু সমর্পণ করিয়া দিয়া, শ্রীনিত্যগোপালে শরণ প্রাপ্ত হইয়া তিনি মহাবিপ্লবীরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। তাই তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি তিনি কোন একটি বিশেষ অবস্থাতেই আটকাইয়া থাকেন নাই। গৃহী হইয়াও তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি ছিলেন গৃহী। অধ্যাত্মবাদী ধার্মিক হইয়া তাঁহার রাজনীতি করিতে সন্ন্যাসীত্ব নষ্ট হয় নাই। রাজনীতি ছিল তাঁহার নিকট রাধানীতি বা বিপ্লবনীতি। এই রাধানীতিকে তিনি ১৯০৭ সনে তাঁহার লেখা "স্বরাজের পূর্বরূপ" পুস্তিকাতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আজিকার রাজনীতি তো দেখিতেছি যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখল ছাড়া আর কিছু নয়। ইহার মধ্যে বিপ্লব কোথায়? দিল্লীর লাল কেল্লা দখল করিয়া সমস্ত ভারতবাসীকে এবং তাহার সকল সমাজ ব্যবস্থাকে লালকেল্লার অধীনস্থ করার মধ্য দিয়া সমাজের প্রতিটি নরনারীর স্বাধীন সাবলীল হাসা নাচাকে কোন্ উন্নততর স্তরে পৌছাইয়া দিবে? রাধারাণী শ্রীবসন্তি রায়ানের ঘর ছাড়িয়া "বাসুদেব সর্বম্ ইতি" সর্ববাদ-বিষয়-প্রতিরূপশীল জীবনরঞ্জন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও রাধারাণীর ভজনা করিয়াছিলেন, রাধারাণীর জীবনেই প্রগতিপন্থী পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বপ্রকৃতির সুস্থ হওয়ার কথা, স্বস্থ হওয়ার কথা, স্ব-এর রাজত্বে স্বরাট হওয়ার কথা নিহিত আছে। পুরুষোত্তমানন্দের রাজনীতির এতখানি ছিল অর্থ। এই অর্থ লইয়া রাজনীতি বর্তমানে কে করেন?

তাঁহার সামনে ছিল এমনই একটি উন্নততর সমাজের চিত্র যেখানে প্রতিটি নরনারী **Independent at the same time interdependent**। যেখানে প্রতিটি নর-নারী সকল ক্ষেত্রে স্বাধীন, অনপেক্ষ থাকিয়া স্বরাটে অবস্থিত থাকিয়া তাহারই জ্যোতিতে সমস্ত মায়া মোহ অহঙ্কার আসক্তিরূপ কুহককে নিরস্ত করিয়া আধার পরস্পরের অপেক্ষা করিয়া, পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া সমাজবদ্ধ। যিনি নিজমুখে বলিয়া গিয়াছেন "I am a cosmopolitan"—"আমি বিশ্ব নাগরিক" সেই শ্রীনিত্যগোপালের নিকট নতুন সমাজ গঠনের মূল-সূত্র জড়াজড় সমন্বয়, আত্মানাত্ম সমন্বয়, নিত্য-অনিত্য সমন্বয়, চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়, সাকার নিরাকার সমন্বয়, আকার নিরাকার সমন্বয়, জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়, সর্ব-সমন্বয়ের দীক্ষা লইয়া পুরানো সঞ্চয়ের বেচা-কেনার পরিবর্তে নূতন জীবন-বোধের কথা, পরিপূর্ণ মানবতার কথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবনের এমন দিক নাই যাহার সম্বন্ধে যুগের উপযোগী নূতন ব্যাখ্যা দিয়া যান নাই। তাঁহার সকল কথা এই অল্প পরিসর সময়ে সঠিক ভাবে প্রকাশ করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই। গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায় তাঁহার কথা দিয়াই তাঁহাকে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে মাত্র।

মনুষ্য জীবনে যত প্রকার সমস্যা আছে, যত প্রকার দুঃখ আছে সকলের মূল ধরিয়া তিনি সেইগুলির সমাধানের

কথা রাখিয়া গিয়াছেন। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক সমস্যা, শিক্ষাগত সমস্যা, কৃষিগত সমস্যা, আধ্যাত্মিক সমস্যা, আদর্শ ও বাস্তব সব কিছুরই সর্ব্ব-সমন্বয়ের আলোকে নতুন যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নূতন অর্থ তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্র, গীতা, এগারখানা উপনিষদের অবলুপ্ত ভাষ্যে ও বহু প্রবন্ধে, তাঁহার দৈনিক দিনপঞ্জী ও চিঠি-পত্রের মধ্য দিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান ভারতের সমস্যাবলীকে কেমন ভাবে তুলিয়া ধরিয়া তাহার সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা স্বরূপ তাঁহারই কথার উদ্ধৃতি দিয়া আপনাদের নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিতেছি।

পুরুষোত্তমানন্দজী সম্পাদিত উদ্ভোধনভারত মাসিক পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় ১৩৪৪ (বাংলা) সালের মাঘ মাসে (ইং জানুয়ারী, ১৯৪৮)"আমাদের কথা" নামক প্রবন্ধে তিনি লিখিতেছেন—"ভারতবর্ষ আজ ব্রিটিশ কবল মুক্ত। এই মুক্ত ভারতকে মথিত করিয়া একটি উজ্জ্বল ভারত এবং তাহার অন্তপ্রেরণায় 'এক জগৎ' (One World) গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সনাতন আর্য্যশাস্ত্রের প্রগতিশীল ও তেজস্বী ব্যাখ্যান সাহিত্য সৃষ্টি এবং তাহারই ভিত্তি ভূমিতে বাস্তবের দেশে, সর্ব্ববিধ সংগঠন ক্ষেত্রে তাহার কর্ম্মগত ছন্দের ও প্রয়োগ-কৌশলের সম্যক আস্বাদন করাই এই উজ্জ্বল ভারত পত্রের পরম প্রয়োজন। সাধনা তাহার আনন্দ মঠের 'ভক্তি', একমাত্র যাহা বুদ্ধি ও শ্রম ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধদিগকে পরস্পরের মাঝে গলাইয়া হজম করাইয়া এক সমগ্র জীবনসত্তার সৃষ্টি করিতে পারে। একমাত্র ইহারই সৃজনী শক্তির যাদুস্পর্শে সর্ব্ব-ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রাম (Class War) পরিণত হইতে পারে শ্রেণীসমন্বয়ে :

ভারতবর্ষ আজ সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ শেষ প্রশ্নের সম্মুখীন। তাহার প্রশ্ন আজ আর বিশেষ কোনও ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া নয়, তাহার প্রশ্ন সর্ব্বতোমুখী। জটিল এই প্রশ্ন সমূহের সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ জীবন্ত সৃষ্টির যাত্রাপথে অচলায়তন ভারতবর্ষের মূলতঃ স্থিতিপ্রধান কৃষ্টির পিছটান তাহার গতিরোধ করিবেই। ভারত আজ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে দো-টানার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া। ব্রিটিশ আজ আর নাই ; তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে রাজনৈতিক প্রেরণা সে এতদিন পাইয়াছে, সে রাজনীতি তাহা আবেদন নিবেদন বা শান্তিপূর্ণ সহযোগই হউক, সশস্ত্র বিদ্রোহ বা অহিংস অসহযোগই হউক আজ সর্ব্বতোভাবে অচল। সে প্রেরণার কেন্দ্র আজ তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আর তো 'কুইট ইণ্ডিয়া' বাণী তাহার দেশপ্রেমের প্রেরণা দান করিবে না। তাই প্রশ্ন জাগিয়াছে, ব্রিটিশের রুদ্ধ পীড়নে যে আত্মশক্তি জাতির বুক চিড়িয়া মুক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে শক্তির উৎসকে কোথায় আজ সে ন্যস্ত করিবে? কোনও নূতন ইহা-ধর্ম্মী (positive), ব্যাপক ও গভীর দর্শন ও ভাবধারার শরণ না লইলে তো পুরাতনকে হজম করিয়া আগাইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইবে না। কে তাহাকে এই নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতন প্রেরণা যোগাইবে? ব্রিটিশ ভারতও নাই, আবার দার্শনিক যুগের স্বাস্থধর্ম্মী, প্রজ্ঞাবাদী যে ভারত নেতিবাদের যুক্তিতে জগতের ও-পারে তাহার ইষ্টলোকের ধ্যানে ব্যাপৃত ছিল, সে ভারতও নাই। কাল-প্রবাহে তাহারই অন্তর হইতে উদ্ভূত প্রাণঘন বৌদ্ধ প্রাণন ও বহির্গত প্রাণের ধাক্কায় গতিক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যন্ত্র-চালিতবৎ সামনের দিকে অনেকখানি সে আগাইয়া আসিয়াছে।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই প্রাণ-স্পন্দন সমূহকে হজম করাইয়া ভারতীয় জীবনকে অনুপ্রাণিত ও পরিপূরিত করিবার জন্য নানক-কবীর তুলসীদাস প্রভৃতি বীরভক্তগণ ও দার্শনিক সমাজ সংগঠকগণ, বাংলার গৌর সুন্দর এবং বর্ত্তমান যুগের দয়ানন্দ-রামমোহন প্রভৃতি পুরুষ সিংহগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সমাজের একটা অংশকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিতও করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজ কাঠামোর মেরুদণ্ড স্বরূপ দর্শন ও চিন্তাধারাকে জীবনের ছাঁচে ঢালিয়া না নেওয়ার ফলে তাঁহারা সনাতনে ধাক্কা দিতে গিয়া নিজেরাই বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িলেন। যেই সনাতন সেই সনাতনই আবার রহিয়া গেল। ভারতবর্ষ কি আবার পিছনে ফিরিয়া অতীতকেই তীব্র সবেগে আঁকড়াইয়া

থাকিবে, না অতীতকে মিশ্চিহ্নে মুছিয়া ফেলিয়া প্রাণধর্ম্মের উদ্দামস্রোতে একদম বর্ত্তমান জীবনের পথ বহিয়া চলিবে? সে যে বহিরাগত প্রাণধর্ম্মীদের আকর্ষণে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, ফিরিবার পথ ও সুযোগ কি তাহার এতটুকুও খোলা আছে? সামনে তাহাকে চলিতেই হইবে, অথচ সামনে পথ চলিবার শাস্ত্র বা বিজ্ঞান কিছুই তাহার জানা নাই। সর্ব্বগ্রাসী একটা অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও অজ্ঞেয়তা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এমন কি কোনও ভারতবর্ষ আছে—যেখানে পরস্পর-নিরপেক্ষ অথচ পরস্পরা-পেক্ষ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মহামিলন সম্ভব, যেখানে স্থিতি ও গতির, প্রজ্ঞা ও প্রাণের সমন্বয় বাস্তব দৃষ্টিতে কার্য্যকরী? এমন মহান উজ্জ্বল ভারত যদি থাকেই, তবে তাহার স্বরূপ কি, বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে তাহার পরিধি কত দূর, কোন্ সাধনাতেই বা তাহার বাস্তব রূপায়ন সম্ভব হইতে পারে—সর্ব্বপ্রথমে এই প্রশ্নেরই একটা স্পষ্ট সমাধান এই নবীন সৃষ্টির প্রাক্কালে খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা যেমন নিরালম্ব, সাহিত্য ক্ষেত্রে সে বিপদ ততোধিক ঘনীভূত। 'বাজরে শিঙা বাজ এই রবে'—'পরের পথো খোয়া সৈন্যে জাহাজ কেন বয়'—'তুম্ব দ্বীপ হতে পদ্মপাশ এসে'—'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়'—ইত্যাদি গীতি কবিতার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে; দেশ আজ মুক্ত। দেশ-প্রেমের উদ্বোধন কল্পে যে নীলদর্পণ, রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী ও সিরাজদ্দৌল্লা প্রভৃতি নাটকগুলি জাতীয় সত্তার নিংড়ানো রসরূপে আত্ম-বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহারও পরিপূর্ণ সার্থকতা আজ মিলিয়াছে। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে, কোন্ বাস্তব আদর্শকে বুকে লইয়া সাহিত্য আজ জাতি সংগঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিবে? সাহিত্যের আদর্শ নিশ্চয়ই হইবে পজিটিভ; তাহাকে আজ অস্ত্রবাস্তবের নেশা কাটাইয়া স্বরূপ বাস্তবস্থিতির পথ বাছিয়া লইতে হইবে। জগতের ওপারে আদর্শ-লোক স্থাপনেচ্ছু মতবাদসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সাহিত্যের কর্ত্তব্য আরও গুরুতর, সাহিত্যকে আজ নবযুগ সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করিতেই হইবে। "মনের ভূতের ব্যাগার খেটে"—"শঙ্কটের কাদে ব্রহ্ম পড়ে কাদে"—"চল মন নিজ নিকেতনে"—ইত্যাদি চোখের সামনে জাজ্বল্যমান রূপ-রস-গন্ধস্পর্শময় এই বাস্তব বিশ্বের প্রতি বিদ্বেষ-উৎপাদনকারী গানগুলি আর জাতিকে আবৃত্তি করিতে দেওয়া চলিতে পারে না। যাহার প্রভাব বংশীনিনাদে বিশ্বের আকাশ বাতাস সর্ব্বজনের নিনাদিত ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারিবে, সেই বাঁশীর খোঁজ, সেই বংশীধারীর খোঁজ আজ আমরা কোথায় পাইব? ইহাই তো আজিকার প্রশ্ন।

আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আমরা ত্রিশঙ্কুবৎ অবস্থান করিতেছি। ইহলোক-পরলোক, নর-নারী, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ধনিক-শ্রমিক ও হিন্দু-মুসলমানের যে দ্বন্দ্ব সংঘাতকে সনাতন ভারতের হাজার চিন্তাধারা এতদিন ঠিকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারই সুযোগ লইয়া ইংরেজ এ দেশকে পদদলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। উপনিষদের গভীর ও বিস্তৃত প্রাণোপাসনাকে কার্য্যাত্মকরূপে সমাজ-ব্যবস্থায় প্রয়োগ করিতে না পারার ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় যে ফাঁকি রহিয়াছিল, ফাঁকের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারই অন্তরাল দিয়া একান্ত প্রাণধর্ম্মী বহিরাগতদের আক্রমণ সম্ভবপর হইয়াছে। প্রাণধর্ম্মের সব জটিলতা কুটিলতা হইতে মুক্ত একটি নিখুঁত সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টাতেই সিঁড়িতন্ত্রের (ladder system) নিয়মানুযায়ী পুরুষতন্ত্র, ব্রাহ্মণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও নিষ্কৃষ্টদের ক্রীট আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছিল। পারস্পরিক অবস্থার চাপে সেদিন ভারত শুধু নিজেকে গুটাইয়াই আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে, আত্মপ্রসারের কোন সাধনাই সে বরণ করিতে পারে নাই। বহিরাগত ব্রিটিশ আজ তাহাকে যখন ইহকাল-সর্ব্বস্ব করিয়া ফেলিয়াছে, নারীকে ঘরের কোণ হইতে টানিয়া আনিয়া বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে রাস্তায় দাঁড় করাইয়াছে, নিম্নবর্ণের অন্তরে সুপ্ত আত্মসম্মানবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে, শ্রমিক-সঙ্ঘ রচনার মধ্য দিয়া ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, মুসলমানকে ধর্ম্মযুদ্ধের নেশায় উন্মাদ বানাইয়া পাকিস্তান স্থাপনে প্রেরণা জোগাইয়াছে, তখনই ভারতবর্ষের চক্ষু মেলিয়া বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর মিলিয়াছে। সে

অন্তরের অন্তরে বুঝিয়াছে যে, সে তো আর পূর্ব্বের মত ঘর লইয়া "ঘর" সামলাইতে পারিবে না, তাহাকে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। আর কী তাহার আশ্রয় হইবে? ইহকাল না পরকাল? ঘর না বাহির? পর না আপন? সে যদি আজও ইহাদের সমন্বয় বিধানের জন্য বদ্ধপরিকর না হয়, সব পরস্পর-বিরুদ্ধদের রক্তাক্ত সংঘর্ষে তাহার অস্তিত্বই মুছিয়া যাইবে। বাহিরের মধ্যে ঘরকে এবং ঘরের মধ্যে বাহিরকে গড়িয়া দিয়াই আজ তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে, ভারতকে বিশ্বভারত হইয়াই উজ্জ্বল ভারতে গড়িয়া উঠিতে হইবে।.....সত্য বাস্তব দর্শনে কোন দৃষ্টিকোণই একান্ত মুখ্য বা একান্ত গৌণ নয়, একান্ত আদি বা একান্ত অন্ত নয়। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া যে সিদ্ধান্তের খোঁজ মিলিবে, আদর্শের স্তর হইতে রওনা হইলেও যদি তাহাতে উপনীত হওয়া না যায়, বুঝিতে হইবে যাত্রারম্ভে ও যাত্রাপথে নিশ্চয়ই কোথায়ও কোন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। জীবন যাত্রার কোনও দৃষ্টিভঙ্গি হইতে রওয়ানা হইলেও অপর যে কোনও দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছিতে হইবে। কেননা প্রত্যেকটিই যে পরস্পর নিরপেক্ষ অথচ পরস্পরাপেক্ষভাবে অন্যোন্যমিথুন (interpenetrated) হইয়া একই জীবন্ত বস্তুকে বাস্তবিক করিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছে। বিশেষ কোনও দৃষ্টিকোণ হইতে বস্তুর যে একান্ত ব্যাখ্যান, তাহা নিশ্চয়ই ঐকদেশিক ও খাণ্ডিক। একান্ত আইডিয়ারও ভিত্তি হইবার যেমন স্পর্দ্ধা থাকিতে পারে না, অর্থনীতির একান্ত ভিত্তি হইবারও স্পর্দ্ধা তেমনি বাস্তব বস্তু বেশী দিন ও বেশী দূর সহ্য করিবে না। ইহার সমাধানও আজ পুরুষোত্তম-জীবনের আলোকে জীবনকে সংগঠন করার উপর নিহিত রহিয়াছে।"

পুরুষোত্তমানন্দজীর এই প্রবন্ধের মধ্যেই, তাঁহার এই গ্রন্থের মধ্যেই দেখিতেছেন, তিনি সমস্যার কত গভীরে প্রবেশ করিয়া সমাধান দিতে তৎপর ছিলেন। ভারতবর্ষের বুকে তথা বিশ্বের বুকে আজ যে হলাহল তীব্র আকারে তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে এই অবস্থা তিনি দিব্যদৃষ্টিতেই আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলেন এবং ইহার সমাধানের পথের কথাও রাখিয়া গিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার উপযোগিতা ও সার্থকতা। তাঁহার সমস্ত সমাধান সম্বন্ধে সব কথা বলা আজিকার শ্রদ্ধাবাসরে সম্ভব নয়। তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারি এমন সামর্থ্যও আমার নাই। আপনাদের নিকট আমার এই নিবেদন তিনি যে নিগ্রহের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহাকে সমগ্র করিয়া একটু অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিয়া আমাদের দায়মুক্ত করুন। নরনারায়ণ আশ্রম আপনাদের জন্য, ভারতবাসীর ও বিশ্ববাসীর জন্য শ্রীনিতাইগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ কর্ত্তৃক রাখিয়া যাওয়া সম্পদ আপনাদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। জয় শ্রীনিতাইগোপাল, জয় শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ।

"গীতার প্রয়োজন ধরার ধূলিতে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকর্ম্ম-লোক, পুরুষোত্তম-লোক প্রতিষ্ঠা। কর্ম্মক্ষেত্র এই মাটির বুকেই হইবে জড়-অজড় দ্বন্দ্বের চরম অবসান। কর্ম্মের বুকে নৈষ্কর্ম্মের আস্বাদনই গীতার কর্ম্মযোগ।"—

গীতা, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

।। শ্রীসত্যব্রত ঘোষ ।।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতজীর কথা বলিতে গেলে পুরাণ যুগের কিছু কথা না বলিলে তাঁহার কার্য্যকলাপের পুরাপুরী ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নহে। তাই ভারতীয় সভ্যতার পুরাণ যুগের কিছু বলিয়া আমার বক্তব্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

ঈশ উপনিষদের নবম শ্লোক হইতেছে :—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাম্ উপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো যে উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে কিন্তু তাহার চাইতেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে যে ব্যক্তিরা বিদ্যায় রত।

আচার্য্য শঙ্করের মতে—মোক্ষে ধিঃ জ্ঞানম্ অন্যত্র বিজ্ঞানম্ শিল্প শাস্ত্রয়ঃ। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান ছাড়াটা হইতেছে বিদ্যা তাহা ছাড়া আর সব শিল্প এবং শাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান তাহা অবিদ্যার অন্তর্গত।

আচার্য্য শঙ্করের সংজ্ঞা অনুসারে উপনিষদের উপরিউক্ত শ্লোকের অর্থ করিলে দাঁড়ায়—যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা চর্চা অর্থাৎ শিল্প এবং শাস্ত্র লইয়া চর্চ্চা করে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে কিন্তু তাহার চাইতেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে যাহারা কেবল মাত্র আত্মজ্ঞানের প্রচেষ্টায় রত।

যে সময়তে ঈশ উপনিষদের এই শ্লোক লেখা হইয়াছিল নিশ্চয়ই সেই সময়তে একদল লোক আত্মজ্ঞান পাইবার চেষ্টা করিত এবং অন্য আর একদল লোক অনাত্মজ্ঞান অর্থাৎ শিল্প এবং শাস্ত্র লইয়া চর্চ্চা করিত। ঈশ উপনিষদ-কারের মতে এই দুই শ্রেণীর লোকদের কাহারও চলার পথ ত্রুটিহীন নহে।

রামায়ণের সময়তে—বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং লঙ্কার রাবণের মত শিল্প এবং শাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ উপনিষদের সংজ্ঞা অনুসারে রাবণ রাজার দল যেহেতু অবিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছে সেইহেতু তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াছে—পক্ষান্তরে যেহেতু বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানের চর্চ্চায় রত ছিল সেই হেতু তাহাদিগকে রাবণের অত্যাচারের শীকার হইতে হইয়াছে। রাবণের চরেরা সেই কালের মুনিদের যজ্ঞ করিতে বাধা জন্মাইত এবং মুনিরা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ করিতে পারে তাহার জন্য বিশ্বামিত্র রামকে নিয়া যাইতে বাধ্য হইয়া ছিলেন।

রাম এবং কৃষ্ণ চরিত্র হইতেছে ভারতবর্ষের আদর্শ চরিত্র —এই প্রকার চরিত্রে বিদ্যা এবং অবিদ্যার সমন্বয় দেখা গিয়াছে। এই চরিত্র সামনে রাখিয়া ঈশ উপনিষদকার মীমাংসা দিলেন—

বিদ্যাং চ অবিদ্যাঞ্চৈব যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যু তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তির জীবনে বিদ্যা এবং অবিদ্যার মিলন হইয়াছে সে অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু জয় করে এবং বিদ্যাদ্বারা অমৃত আস্বাদন করে।

বিদ্যা এবং অবিদ্যার সমন্বয় খুব সহজলভ্য বস্তু নহে। এই কারণেই ভারতবর্ষে রাম এবং কৃষ্ণের মত মানুষের দেখা কয়েক হাজার বছরের ভিতর পাওয়া যায় নাই। ভারতীয় শাস্ত্রমতে এমন কি অদ্বৈত সিদ্ধান্তের লেখক মধুসূদন সরস্বতীর মত অদ্বৈতবাদীকেও বলিতে শোনা গিয়াছে—কৃষ্ণের পর অন্য কোন তত্ত্ব আছে বলিয়া তাঁহার জানা নাই। বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার সব কয়টী শাখার মিলন কৃষ্ণ-চরিত্রে দেখা গিয়াছে।

আত্মজ্ঞান

যোগীদের মত হইল—কণ্ঠ হইতে ভ্রূ মধ্য পর্য্যন্ত স্বর্গ—সমান বায়ুর বা সত্ত্বগুণের স্থান। নাভি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত প্রাণবায়ু বা রজোগুণের স্থান। আর নাভির নিম্নে পাতাল

অর্থাৎ অপান বায়ুর স্থান। এই তিন গুণ—মূলাধার গ্রন্থি, হৃদয় গ্রন্থি, ও জিহ্বা গ্রন্থি—গুরুকৃপায় এই তিন গ্রন্থি ভেদ করিয়া সাধক দিনে বা সত্য লোকে স্থান লাভ করিতে পারিলে পুনরাগমন রোধ হয়।

উপরে যে গ্রন্থি-ভেদের কথা বলা হইল তাহা অনেক প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে।

গুরুনানকের মতে

নানক কহিছে যদি উর্দ্ধলোক যাবি
শ্বাসের সহিত নামের ঝঙ্কার মাঝে আছে তার চাবি

বাউলের মতে

হরদম গুরুজীর নাম লইও
দমে দমে লইওরে নাম কামাই নাহি দিও।

কবির বলেন

সহজি শ্বাসজো সুমিতরী একদিন মিলনী আয়।

যে ব্যক্তি শ্বাসে শ্বাসে ভগবানকে স্মরণ করে একদিন না একদিন সে নিশ্চয়ই ভগবান পাইবে। এখানে ভগবান পাওয়া অর্থ হইল গ্রন্থি ভেদ করিতে সক্ষম হওয়া।

অদ্বৈতবাদীদের মত হইল—যতদিন পর্য্যন্ত শ্বাস বায়ুকে সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া পাঠাইতে না পারিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত সাধকের এই জগতে কর্ম্ম করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি কোন সাধক কোন প্রকারে শ্বাস বায়ুকে সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া চালনা করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যাইবে। অদ্বৈতবাদীদের মত হইল বদ্ধ অবস্থার লোকদের জন্য কর্ম্ম—মুক্ত ব্যক্তিদের কোন কর্ম্ম নাই।

ইহা দেখা গিয়াছে যোগের উচ্চতম স্তরে যাহারা যাইতে পারিয়াছে তাহাদের পক্ষে জাগতিক কর্ম্ম করা সম্ভবপর নহে। যোগের উচ্চস্তরে যাহারা যাইতে পারিয়াছে তাহাদের শরীর টিকিয়া থাকা নির্ভর করে যে সব লোক কর্ম্ম করিয়া জীবন ধারণ করে তাহাদের সদিচ্ছা অথবা বনের ফলমূলের ভরসায়।

জড়বাদ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাক্ষস প্রভৃতি ব্যক্তিরা ছিলেন জড়বাদী। তাঁহাদের বক্তব্য হইল—মানুষকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় খাদ্য পানীয় ইত্যাদির প্রয়োজন। সাধারণ লোকের পক্ষে অপরিহার্য্য এমন কি যে সব লোকের আত্মজ্ঞান পাইয়াছে তাহাদেরও শরীর রক্ষা করিবার জন্য খাদ্য এবং পানীয় প্রয়োজন। এই হেতু যে পদার্থ না হইলে মানুষের চলে না সেই জিনিষ তাহারা নিজেরা তৈয়ারী করিবেন না, পক্ষান্তরে সেই জিনিষ যাহারা তৈয়ারী করে তাহাদের সেই কর্ম্ম নিন্দনীয় বলিবেন তাহাদের সেই মতবাদ ঠিক নহে। এবং যে জাতীয় তপস্যা করিলে মানুষ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়—সেই কর্ম্ম করা বিধেয় নহে। সুতরাং আত্মজ্ঞানের চর্চ্চা করাটা ঠিক কাজ নহে। যে বুদ্ধি এবং প্রচেষ্টাকে লাগাইয়া আত্মজ্ঞান পায় তাহা এইভাবে না করিয়া এই বুদ্ধি এবং প্রচেষ্টা জাগতিক দ্রব্য সমূহ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী করিয়া লোকদের দেওয়া সম্ভব হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিৎ। যে সব লোক বুদ্ধি এবং প্রচেষ্টাকে জাগতিক দ্রব্য সম্ভার প্রস্তুত করিতে না লাগাইয়া বুদ্ধি এবং প্রচেষ্টাকে আত্মজ্ঞান পাইবার কাজে লাগাইয়া দেশের লোকদের পঙ্গু করিয়া দিতেছে তাহাদিগকে ধ্বংস করা প্রয়োজন। এই জন্য রাবণের দলের লোকেরা সেই যুগে মুনি ঋষিদের সর্ব্ব প্রকার প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করিত।

আত্মজ্ঞানী সমাজ-ব্যবস্থা

মানুষের জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গে খাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে এটা মানুষের সহজাত। কিন্তু মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এ কথা তাহার বোধগম্য হয় না যে তাহার আত্মজ্ঞান পাওয়া প্রয়োজন। মানুষের এই বোধ আসে অনেক পরে যখন তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ভালভাবে জাগ্রত হয়। তখন, সুতরাং আত্মজ্ঞান বুদ্ধি-প্রধান।

তাই যে সমাজে আত্মজ্ঞানের প্রাধান্য সেই সমাজে বুদ্ধিকে বড় বলিয়া মানিতে হইয়াছে। এইজন্য আত্মজ্ঞানী সমাজে যাহারা শাস্ত্র চর্চ্চা লইয়া থাকে তাহাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। এইজন্য আত্মজ্ঞানী সমাজে ব্রাহ্মণদিগকে সকলের উপর স্থান দেওয়া হইয়াছে।

যেহেতু ব্রাহ্মণদের রক্ষা করিবার জন্য সব সময় ক্ষত্রিয়দের দরকার হইয়া পরে সেইহেতু আত্মজ্ঞানী সমাজে ক্ষত্রিয়দের স্থান নিরূপিত হইয়াছে ব্রাহ্মণদের ঠিক পরে।

এবং যেহেতু রাজস্ব রক্ষা করিতে গেলে প্রচুর সৈন্য রাখা প্রয়োজন এবং সৈন্যদের খাওয়া পরার ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন সেইহেতু যাহারা উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত অর্থাৎ শূদ্রদের এবং উৎপাদিত পণ্য যাহারা ক্রয় বিক্রয় করে অর্থাৎ বৈশ্যদের নিকট হইতে রাজস্ব বাবদ অর্থ নেওয়া প্রয়োজন হয়, এবং যেহেতু উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত শূদ্র এবং বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত বৈশ্যদের ভিতর বৈশ্যদের কাজে বুদ্ধি-প্রধান, সেইহেতু সামাজিক ব্যবস্থায় বৈশ্যদের স্থান হইয়াছে শূদ্রদের উপরে। আত্মজ্ঞানী সমাজ হইল বুদ্ধি-প্রধান সমাজ, এই সমাজে কর্মের স্থান বুদ্ধির নীচে। যেহেতু ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা আত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড় করান হইয়াছে, সেইহেতু এই সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান হইয়াছে সকলের উপরে, তাহার পর স্থান হইয়াছে ক্ষত্রিয়দের, তাহার পর স্থান হইয়াছে বৈশ্যদের, সকলের নীচে স্থান হইয়াছে শূদ্রদের।

অস্পৃশ্যতা

যেহেতু আত্মজ্ঞানী সমাজ-ব্যবস্থা বুদ্ধির প্রাধান্যের উপর দাঁড় করান হইয়াছে সেইহেতু যাহারা বুদ্ধির চর্চা করেন তাহাদের সঙ্গে যাহারা জন্মাইবে সেই শিশুরাই যদি নীচু স্তরের লোকদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে তাহা হইলে নীচু স্তরের লোকদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিতে পারে এবং বুদ্ধির চর্চায় মনোযোগী না হইয়া খাওয়ার চর্চায় মনোযোগী হইয়া উঠিতে পারে—এই অবস্থা হইতে বুদ্ধিমানকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষের হিন্দুদের ভিতর অস্পৃশ্যতার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণেরা কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ্য কর্মই করে—ক্ষত্রিয় কর্ম, বৈশ্য কর্ম, শূদ্র কর্মও করে না, ঐ জাতীয় লোকদের সংস্রবে না যাইয়া থাকিলে যায় না। অনুরূপ ভাবে হিন্দু সমাজের ক্ষত্রিয়দের কেবল মাত্র ক্ষত্রিয় কর্ম করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ্য কর্ম, বৈশ্য কর্ম অথবা শূদ্র কর্ম করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। অনুরূপ ভাবে ভারতীয় হিন্দু সমাজের বৈশ্যদের কেবলমাত্র বৈশ্য কর্ম করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ্য কর্ম, ক্ষত্রিয় কর্ম এবং শূদ্র কর্ম করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার অধিকারও দেওয়া হয় নাই। অনুরূপ ভাবে ভারতীয় হিন্দুসমাজের শূদ্রদের কেবলমাত্র শূদ্রকর্ম করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ্য কর্ম, ক্ষত্রিয় কর্ম, অথবা বৈশ্য কর্ম করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। এবং ঐ সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার অধিকার দেওয়া হয় নাই।

জড়বাদী সমাজ-ব্যবস্থা

জড়বাদী সমাজ-ব্যবস্থার উপরে লিখিত নিয়মানুযায়ী অস্পৃশ্যতাকে মানিয়া লওয়া হয় নাই। ঐ ব্যবস্থা অনুসারে তখনই ঠিক ঠিক ব্রাহ্মণ্য কর্ম হইবে যখন ব্রাহ্মণ্য কর্মের সঙ্গে ক্ষত্রিয় কর্ম, বৈশ্য কর্ম, এবং শূদ্র কর্মের যোগ হইবে। অনুরূপ ভাবে তখনই ঠিক ঠিক ক্ষত্রিয়কর্ম হইবে যখন ক্ষত্রিয় কর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য কর্ম, বৈশ্যকর্ম এবং শূদ্রকর্মের যোগ সাধিত হইবে। অনুরূপ ভাবে তখনই ঠিক ঠিক বৈশ্য কর্ম হইবে যখন বৈশ্যকর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য কর্ম, ক্ষত্রিয় কর্ম, এবং শূদ্রকর্মের যোগ সাধিত হইবে। অনুরূপভাবে তখনই ঠিক ঠিক শূদ্র কর্ম হইবে যখন শূদ্রকর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য কর্ম ক্ষত্রিয় কর্ম এবং বৈশ্য কর্মের যোগ সাধিত হইবে। কিন্তু এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নাই।

আসুরী ভাবের ব্রাহ্মণ্য কর্ম

আধুনিক কবি, দার্শনিক তাহাদের অভিজ্ঞতা প্রথমে কাগজে লেখারূপ ব্রাহ্মণ্য করেন। তাহার পর সেই লেখারূপী ব্রাহ্মণ্য কর্মের সঙ্গে মুদ্রা যন্ত্রে ছাপান কর্মরূপী শূদ্র কর্মের সহায়তা গ্রহণ করেন। তাহার পর সেই ছাপান বই পাঠকদের কাছে পাঠানরূপী ক্ষত্রিয় কর্ম করেন। এই ভাবে বই যদি সমাদর লাভ করে তাহা হইলে বই বিক্রয়রূপী বৈশ্য কর্মের সহায়তা নেন এবং এইভাবে প্রভূত অর্থের অধিকারী হইতে পারেন।

পুরাকালে এই পদ্ধতির প্রচলন ভারতবর্ষে ছিল না। সেই যুগে কবি, দার্শনিককে রাজদরবারে গিয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের প্রমাণ দিতে হইত এবং রাজা তাঁহাদের ভরণ পোষণ করিতেন।

আসুরী ভাবের ক্ষত্রিয় কর্ম

আধুনিক যুগে উন্নত ধরনের মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের জন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাররূপী ব্রাহ্মণ্য কর্মকে লাগান হয়। ঐ কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আবিষ্কারের ফলে এরোপ্লেন ট্যাঙ্ক এবং আণবিক বোমা অস্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক-দের আবিষ্কার-লব্ধ পদ্ধতিতে বহুল পরিমাণে অস্ত্র তৈয়ারীর জন্য বড় বড় কারখানায় বহু পরিমাণ শরীর শ্রমরূপী শূদ্র কর্মে নিযুক্ত বহু লোককে লাগানর ভিতর দিয়া ক্ষত্রিয় কর্মের সঙ্গে শূদ্র কর্মের সহায়তা নেওয়া হয়। বড় বড় কারখানা তৈয়ারী করিতে গেলে বিপুল পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন এবং কারখানা চালাইতে গেলে অস্ত্র আরও বহু প্রকার পদার্থের বেসা বেচারূপ কর্ম করারূপী বৈশ্য কর্মের সহায়তা নেওয়া হয়। তাহার পর যে সব অস্ত্র তৈয়ারী হয় তাহা দ্বারা যুদ্ধ কর্ম করারূপী ক্ষত্রিয় কর্ম সম্পাদন করা হয়।

বর্ণাশ্রম ধর্মসম্মত সমাজ-ব্যবস্থায় এই প্রকার পদ্ধতি ছিল না। সেখানে যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ারী, যুদ্ধ করা সবটাই ক্ষত্রিয় কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের করণীয় কাজ ছিল—এইজন্য বর্ণাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে সৈন্যবাহিনী হইতে আসুরী ব্যবস্থা অনুসারে সৈন্যবাহিনী অনেক শক্তিশালী ছিল।

আসুরী ভাবের বৈশ্য কর্ম

আধুনিক যন্ত্র সভ্যতা প্রবর্তিত হইবারও আগে নীলকর সাহেবেরা এই বাংলা দেশে বহু নীল কুঠী স্থাপন করিয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নীল গাছ কি ভাবে চাষ করিলে ভাল এবং বেশী পরিমাণে নীল পাওয়া যাইবে তাহা এবং সেই নীল গাছ হইতে কি প্রকার প্রক্রিয়াদ্বারা নীল নিষ্কাসন করিলে অধিক পরিমাণে নীল পাওয়া সম্ভব তাহার পদ্ধতি আবিষ্কাররূপী ব্রাহ্মণ্য কর্ম করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের সহায়তা নিয়াছিল। তাহার পর নীল গাছ চাষ এবং কারখানায় নীল নিষ্কাসন করা রূপী শূদ্র কর্ম করিবার জন্য এই দেশের চাষী এবং শ্রমিক-দের লাগাইয়া ছিল। তাহার পর ঐপ্রকারে উৎপাদিত নীল কোথায় বিক্রয় করিলে বেশী মুনাফা পাওয়া যাইবে সেই স্থানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং ঐ নীল চাষ করিবার জন্য যে টাকার দরকার হইয়াছিল তাহার যোগানরূপী বৈশ্য কর্মের যোগ করিয়াছিল। নীলকর সাহেবদের সঙ্গে সেই কালের ইংরেজ রাজকর্মচারীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকিত। রাজকর্মচারীদের সঙ্গে এই প্রকার যোগাযোগ ব্রাহ্মণরূপী ক্ষত্রিয় কর্মের যোগে নীলকর সাহেবেরা চাষীদের ন্যায্য প্রাপ্তির সিকিভাগ দিত। এইভাবে চাষীদের শোষণ করিত। এবং এইভাবে নীলকর সাহেবেরা প্রভূত ধনের মালিকে পরিণত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্যাদি চতুর্বিধ কর্মকে প্রয়োগ করিয়া নীলকর সাহেবেরা এই দেশে যে ভাবে প্রভূত অর্থের মালিক হইয়াছিল এই পদ্ধতি আমাদের দেশে ছিল না। আমাদের বৈশ্যরা কেবল বৈশ্য, কেনাবেচারূপী বৈশ্য কর্ম করিতেই অভ্যস্ত ছিল। বৈশ্য কর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য কর্ম, ক্ষত্রিয় কর্ম এবং শূদ্র কর্মকে যোগ করিলে যে একটী অধিক শক্তিশালী বৈশ্য কর্ম হয় তাহা এই দেশে বর্তমান ছিল না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অল্পসময়ে বাঙ্গালীর পরাজয় এবং তাহার প্রতিকার বইতে লিখিয়াছেন যে আমাদের ব্যবসায়ীরা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মোটেই সমকক্ষ নহে এবং প্রতিযোগিতায় প্রতিদিন পরাস্ত হইয়া কর্মহীন হইয়া পড়িতেছে।

আসুরী ভাবের শূদ্র কর্ম

বর্তমান শিল্প-উন্নত দেশে পূর্বে যেখানে এক একর জমিতে এক টন ধান তৈয়ারী হইত বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাররূপী ব্রাহ্মণ্য কর্মকে লাগাইয়া এক একর জমিতে চার পাঁচ টন ধান তৈয়ারীর পদ্ধতি আবিষ্কার করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত পদ্ধতিকে রূপায়িত করিতে শরীর শ্রমরূপী শূদ্রকর্ম করিবার জন্য শ্রমিক-দের লাগান হইয়াছে। বড় বড় খামার চালাইবার জন্য বহু যন্ত্রপাতি কিনিতে এবং শ্রমিকদের মজুরী দিতে টাকা লাগে তাহা পাইতে এবং উৎপাদিত পণ্য লাভজনক ভাবে বিক্রয় করিয়া লাভবান হওয়ার জন্য বৈশ্য কর্মকে লাগান হয়। এই প্রয়োজনের চাইতে অধিক পণ্য উৎপাদন করিতে পারা হওয়ার ফলে তাহা বিক্রয় করিয়া লাভবান

হইবার জন্য ক্ষত্রিয়ত্বের সহায়তা নিয়া অন্যান্য দেশ দখল করিয়া প্রভূত ধনের মালিকে পরিণত হইয়াছে।

উপরি উক্ত চতুর্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন চাষীদের যোগ্যতা আমাদের চাষীদের চাইতে অনেক বেশী। আত্মজ্ঞানী ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের চাষীরা প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া দেউলিয়ে পরিণত হইয়াছে।

ত্যাগ ধর্ম

গুরু-কৃপায় ভজনশীল সাধক শিষ্য আস্তে আস্তে নাভি মূলে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুর সহিত মিলাইয়া ভজন করেন ও তৎপরে হৃদয় গ্রন্থি বা কণ্ঠে বিষ্ণু গ্রন্থি ভেদ করিয়া সমান বায়ুর স্থান দিদলে বা তপলোকে স্থিতি লাভ করেন। ইহাই স্বর্গস্থান বা ব্যোমলোক।

ইহাও গুণ-স্থান—অর্থাৎ সত্ত্ব গুণস্থান। প্রকৃত পক্ষে এই স্থানে উঠিতে পারিলে সাধক নানা প্রকার যোগৈশ্বর্য্য লাভ করেন ও ইহাতে আকৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের হয়ত আবার অধোগতি বা যাতায়াত হইতে পারে।—শ্রীগুরু সংঘ ত্রৈমাসিক পত্রিকা ১৩৭৭ শ্রাবণ। উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে আত্মজ্ঞানের পথে যোগ ঐশ্বর্য্য পাইতে গেলে সাধককে বহু তপস্যা করিতে হয় এবং বহু তপস্যাদ্বারা শেষ ধাপ পর্যন্ত যদি সাধক না যাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার যোগ ঐশ্বর্য লাভ হয় না।

পক্ষান্তরে জড়বাদের ক্ষেত্রে অল্প চেষ্টায় তপস্বীরা নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারে এবং এই আবিষ্কার সমূহের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যাদি চতুর্বিধ কর্ম যোগ করিতে সক্ষম হইলে প্রভূত ধনের মালিক হইয়া বসিতে পারে। আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত একজন ডাক্তার অতি সহজেই একজন ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিলে পারে কিন্তু একজন যোগীকে একজন রোগীকে রোগমুক্ত করিতে হইলে সেই যোগীর যোগের অতি উচ্চস্তরে যাওয়া প্রয়োজন—যে স্তরে অতি অল্প যোগীই যাইতে পারে—এই হিসাবে আত্মজ্ঞানের পথ হইতেছে ত্যাগের পথ এবং জড়বাদের পথ হইতেছে ভোগের পথ।

আত্মজ্ঞানের পথের পথিকরা তাহাদের পথের কথা সকলের কাছে কিছু গোপন না রাখিয়া সহজেই বলিতে পারে। কিন্তু জড়বাদের পথের পথিকেরা তাহাদের আবিষ্কৃত পদ্ধতি যদি সকলের কাছে বলেন তাহা হইলে তাহাদের বহু ধনের মালিক হওয়া সম্ভবপর হয় না। তাই জড়বাদী আবিষ্কার ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ঐ পদ্ধতি সমাজের হিতে এমন কি জাতির হিতে লাগান হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। কিন্তু ঐ পদ্ধতি জগতের সকলের হিতে লাগান হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত নাই।

জড়বাদী পদ্ধতিকে যদি জগতের সকলের হিতে লাগান যায় তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে বলার কিছু থাকে না।

কিন্তু যেহেতু জড়বাদী পদ্ধতির প্রতি স্তরে অসুর হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা সেইহেতু এই পথে সকলকে লইয়া যাইতে গেলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। এবং এই প্রকার বিপদ সংঘটিত হয় এবং এই কারণেই উপনিষদকার বলিলেন যে যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে।

উপরিউক্ত অধ্যায়গুলিতে জড়বাদী সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল তাহাতে দেখান হইয়াছে জড়বাদী সমাজ-ব্যবস্থা আত্মজ্ঞানী সমাজ-ব্যবস্থা হইতে অনেক বেশী সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী।

পুরাণ কালেও জড়বাদী সমাজ-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সঙ্গে আত্মজ্ঞানবিশ্বাসী সমাজ-ব্যবস্থার লোকেরা পারিয়া উঠে নাই, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হৃতরাজ্য হইয়াছে। এই প্রকার অবস্থায় আত্মজ্ঞানবিশ্বাসী সমাজ-ব্যবস্থার লোকেরা নিজেদের ভিতরে যে বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া সমাজ গড়িয়া ছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া সকলের শক্তিকে তৃতীয় আর একজন ব্যক্তির ভিতর মিলিত করিতে সক্ষম হওয়ায় অসুরদের ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

চণ্ডীর উপাখ্যান—অসুরদের নিকট পরাজিত হইয়া দেবতারা হৃতরাজ্য হইয়া বিষ্ণুর কাছে গেলেন এবং বিষ্ণুর পরামর্শে সকল দেবতারা তাঁহাদের সকলের তেজ দান করায় দেবী দুর্গার সৃষ্টি হইল এবং সেই দেবী দুর্গা অসুর বধ করিলেন। তাই দেবী দুর্গাকে দেবী এবং অসুরী দুই বলা হয়।

ত্যাগসমন্বিত জড়বাদী সমাজ-ব্যবস্থা

আত্মজ্ঞানী সমাজ-ব্যবস্থার স্থলে ভারতবর্ষে ত্যাগ-সমন্বিত সমাজ-ব্যবস্থা যদি প্রবর্তন করা যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষ বর্তমানে যে অস্তিত্বসংকটজনক অবস্থায় পড়িয়াছে তাহার হাত হইতে এই দেশকে বাঁচান যাইবে এই কথা প্রথম বলিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার বক্তব্য হইল উপনিষদে যে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি একই সঙ্গে বিদ্যা এবং অবিদ্যার চর্চা করে সেই ব্যক্তি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু জয় করে এবং বিদ্যাদ্বারা অমৃত আস্বাদন করে তাহাদ্বারা ত্যাগ সমন্বিত জড়বাদী সমাজ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার কথা বলা। এই ভাবে বাংলা দেশে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্রাহ্ম সমাজের দৌলতে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে ত্যাগ-সমন্বিত জড়বাদী পথে বহু লোক অগ্রসর হইতে ছিল এবং এই প্রচেষ্টার ফলে এই দেশে বহু দিকপালের আবির্ভাব দেখা গেল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি ব্যক্তিরা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ত্যাগসমন্বিত ভ্রম ও বুদ্ধির মিলন এবং আত্মজ্ঞান সমন্বিত ভ্রম ও বুদ্ধির মিলন এক জাতীয় জিনিষ নহে। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মত হইল আত্মজ্ঞান সমন্বিত ভ্রম ও বুদ্ধির মিলন হইতেছে অতি উচ্চস্তরের পদার্থ। এই অবস্থা পাইবার কথা উপনিষদকার বলিয়াছেন। এই কথা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল আরও স্পষ্ট করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত দর্শন বইতে লিখিয়াছেন। পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্বজড় এবং অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই হইতেছে পূর্ণজ্ঞান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের আবির্ভাবের পর বাংলাদেশে নূতনভাবে তপস্যা আরম্ভ হইয়া গেল। এই দুই মহাপুরুষের ভাবধারা অনুসারে সমাজ গঠনের কাজ আরম্ভ হইল। এই ধারার প্রথমতম ব্যক্তি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে আত্মজ্ঞান এবং অনাত্মজ্ঞানের ব্রাহ্মণ্য শাখার যোগ হইয়াছে দেখা গিয়াছে। এই ধারার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁহার জীবনে আত্মজ্ঞান এবং অনাত্মজ্ঞানের ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষত্রিয় শাখার যোগ হইয়াছে দেখা গিয়াছে। এই ধারার তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার জীবনে আত্মজ্ঞান এবং অনাত্মজ্ঞানের ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য শাখার যোগ হইয়াছিল দেখা গিয়াছে। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দও ছিলেন এই ধারার একজন। তাঁহার জীবনে আত্মজ্ঞান এবং অনাত্মজ্ঞানের ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষত্রিয় শাখার যোগ হইয়াছিল দেখা গিয়াছে।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী গান্ধীজীর জীবনে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে অনাত্ম জ্ঞানের ব্রাহ্মণ্য শাখা ক্ষত্রিয় শাখা এবং বৈশ্য শাখার যোগ দেখিয়া ভাবিয়া ছিলেন যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা ত আসিবেই, এই দেশে শোষণহীন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিতর দিয়া এই দেশের সব সমস্যার সমাধান হইবে। এই সব বিবেচনা করিয়া তিনি গান্ধীজীর প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া ছিলেন।

কিন্তু গান্ধীজীর সহকর্মী বাছাই এবং দেশবন্ধু দাস মহাশয় কর্তৃক স্থাপিত স্বরাজ্য দলকে সমর্থন দেওয়ার পদ্ধতি দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইয়া ছিল যে গান্ধীজীকে দিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার কাজটুকুই পর্যন্ত হইবে কিন্তু তাঁহারদ্বারা এই দেশে শোষণহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজীর বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সামনে বর্তমানে যে সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইলে এমনতর একজন মানুষের দরকার যাঁহার জীবনে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে অনাত্ম জ্ঞানের ব্রাহ্মণ্য শাখা, ক্ষত্রিয় শাখা, বৈশ্য শাখা এবং শূদ্র শাখার যোগ হইয়াছে। এই মানুষ হিসাবে তিনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে দেখিয়াছেন। উপরিউক্ত মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া স্বামীজী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ না রাখিয়া নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতন যুগের বাণী প্রচারের জন্য ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৮তম জন্মদিনে—

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

কী অশান্ত চারিধার! অসাড়তা ছড়ানো চৌদিকে;
মানুষ কোথায় গেল! এরা কারা—সম্মুখে পিছনে?
নানা অস্ত্র হাতে নিয়ে? জীবনের কোন মূল্য নেই;
পথে পথে মৃতদেহ, এখানে ওখানে চারিদিকে।

মানবতা দ'লে চলে দুই পায়ে, এক একটি ক'রে
ভেঙ্গে ফেলে সুন্দরের প্রতিমূর্তি যখন তখন;
রক্ত, রক্ত চারিধারে—আর্তনাদ দেহের মনের
কে শোনে? কেউ তো নেই; এরা কারা? কোথায় রয়েছি?

না না, আমি হারাইনি—আমি আছি, এই যন্ত্রনার
অন্ধকারে আলো খুঁজি আজো আমি; সে আলো তো ছিল—
সেই আলো দিয়েছিলে তোমরা; পেয়েছি সেই আলো
আমি, আজো মনে পড়ে যায়, আজো দেখি মাঝে মাঝে।

বসেছি তোমার কাছে, কী প্রসন্ন ওই মূর্তিখানি,
আর ওই কণ্ঠে বাণী: যে বাণী শাশ্বত জীবনের;
আগামী দিনের কত স্নিগ্ধ স্বপ্ন সে-বাণীর কাছে;
সেই স্বপ্ন বুকে নিয়ে এসেছি, সে-ঐশ্বর্য কত না!

আজকে শুনি না সেই প্রাণপদ জীবনের বাণী:
আজ শুধু অসাড়তা চারিদিকে শ্মশান রচনা;
প্রেতভূমি—নৃত্য করে সেইখানে অপশক্তি যত।
মন তাই ছুটে যায় বারবার তোমার আশ্রয়ে।

তাইতো এসেছি আজ ওই স্নিগ্ধ আরামের কাছে
মনে মনে: চোখ ভ'রে দেখি তুমি তেমনি রয়েছ;
আর সেই মুখে বাণী—কী ঐশ্বর্য ঝরে ও বাণীতে!
ভুলে যাই সব ব্যথা, অন্ধকার যন্ত্রণা কোথায়!

সমবায় এবং সমন্বয়

॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সমষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে সমবায় আন্দোলন এবং পঞ্চায়েতিরাজ প্রথা। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দান করিয়া প্রতিক্ষেত্রে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহারা দুস্থ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার মান উন্নয়ন করিয়া সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তি সবল করিয়া সমৃদ্ধ দেশ গড়িয়া তুলিবার মহান আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এই মহান আদর্শে পরিচালিত হওয়ার পরে, বলওয়ান্ত মেহা কমিটির রিপোর্টে জাতীয় উন্নয়নের পরবর্তী পদক্ষেপ সূচিত হয়। এই কমিটির মন্তব্যে বলা হয় যে সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সার্থক হইলেও সমষ্টি উন্নয়নের কার্যে একক সরকারী প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। প্রতি দেশবাসীর অভাব পূরণ করিয়া এই সরকারী প্রতিষ্ঠান সমগ্র জাতির উন্নয়ন একক ভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না। এই কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে। এই বিকেন্দ্রীকরণের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে অর্থনীতি ক্ষেত্রে সমবায় প্রথাকে এবং প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠা। এই আদর্শ অর্থনীতি ক্ষেত্রে রূপায়নের জন্য গ্রাম্য সমীক্ষা কমিটির (Rural Euquiry Committee) নির্দেশ কার্যকরী করা হইয়াছে। এই কমিটি বলিয়াছেন—"Cooperation must succeed" —সমবায় আন্দোলনকে অবশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে হইবে এবং এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে ইহাকে সফল করিবার সর্বপ্রকার পরিবেশ সৃষ্টি করিতেই হইবে। গ্রাম্য সমীক্ষা কমিটীর নির্দেশসমূহ আমাদের জাতীয় সরকার গ্রহণ করিয়া তাহার রূপায়নের জন্য সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করিয়াছেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় আন্দোলনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের দেশের ধনী, শিল্পপতি প্রভৃতি আমাদের দেশেরই নাগরিক। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া কোন উন্নয়ন সম্ভবপর নয়; কেননা জাতি গঠনের কার্যে তাঁহাদের ধন এবং শিল্পদক্ষতার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই private sector পুঁজিবাদী শিল্পপতিগণ এবং দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটী সমন্বয় সাধনের প্রয়াস এই মিশ্র অর্থনীতির মধ্যে রহিয়াছে। এই সমন্বয় সাধনের সূত্ররূপে সমবায় আন্দোলনকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ধনীর ধন কাড়িয়া লইয়া সাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া যে সাম্য এবং দরিদ্রকে শোষণ করিয়া ধনতন্ত্রের যে প্রতিষ্ঠা তাহার বিপরীত পথ গ্রহণ করা হইয়াছে। ধনিক এবং শিল্পপতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহাদের ধনসম্পত্তি এবং শিল্পে কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়া নিজেদের ধন ও শিল্প জমাট বাঁধার প্রবণতাপরায়ণ। ইহার মোকাবিলা করিবার জন্যই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে সর্বক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে তাহাদের ধন লোভ-প্রবৃত্তি প্রতিরুদ্ধ করিবার এবং ক্রমান্বয়ে সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে public sector-এর প্রসার করিয়া private sectorকে সংকুচিত করিয়া ধন-লোভ মন্ততা সংযত করিতে।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিক্ষেত্রে শোষণমুক্ত সবল অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে প্রতি গ্রামে সেবা সমবায় সমিতি গঠন করিয়া, চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এই সমিতির মাধ্যমে সরবরাহ করিয়া, চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ সার প্রভৃতিও এই সমিতি মাধ্যমে সরবরাহ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সবক

অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ সৃষ্টি করিয়া উৎপন্ন কৃষিপণ্য যাহাতে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া তাহারা উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারে তাহার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কৃষি-বিপণন সমিতি। এই সমিতি সভ্যগণকে উপযুক্ত মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সহায়তা করিবে এবং প্রয়োজন বোধে মাল গচ্ছিত রাখিয়া অগ্রিম দাদন করিয়া কৃষককে প্রয়োজনের তাগিদে অনমূল্যে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের পরিবেশ হইতে মুক্ত করিবে। অনুরূপ ভাবে প্রতি শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম অনুদান দিয়া বিভিন্ন উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে উৎপাদক রাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেওয়া হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের ২৩ বৎসর পরে দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে এবং সমবায় সংগঠন কার্যে যে চিত্র আমরা দেখিতেছি, তাহা পরিকল্পনা-রচয়িতাদের স্বপ্নকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়াছে বলিলে বোধহয় কোন অতিশয়োক্তি হইবে না। স্বাধীনতা লাভের পূর্বের অবস্থায় সমবায় আন্দোলনকে বর্ণনা করিয়া গ্রানা সমীক্ষা কমিটি বলিয়াছেন, সমবায় আন্দোলন যেন একটি চারা গাছ—এখনও মাটিতে শিকড় গজাইতে পারে নাই। তাহাকে হাতে ধরিয়া দাঁড় করিয়া রাখা হইয়াছে। এই ২৩ বৎসর পরে আমরা কি দেখিতেছি? সমবায় আন্দোলন কি শিকড় গ্রহণ করিতে পারিয়াছে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে প্রচুর অর্থ কৃষি-ঋণ রূপে প্রবাহিত হইয়া বছরের পর বছর খেলাপী টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া অর্থ-প্রবাহ বন্ধ হইতে চলিয়াছে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন যাহা সার্থক বলিয়া মনে হয়, তাহা একটা phantom of delight বলিয়াই মনে হয়। বিশেষ কয়েকজনের স্বার্থেই এই প্রতিষ্ঠান চলিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদক সমবায় সমিতি ভাল কাজ করিলেও তাহার উপর ভবিষ্যতের কোন আশা নাই। সাধারণতঃ মুষ্টিমেয় কয়েকটী ক্ষেত্রে পরোক্ষ স্বার্থের তাগিদে সমবায় প্রতিষ্ঠান ভালভাবে কাজ করিলেও, ভবিষ্যতের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করা যায় না। কেন এমন হইল? সমবায় নীতির প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জমকালো ভাবে চলিতেছে, কিন্তু তাহাতে কি সমবায়ীগণের মনের কোন পরিবর্তন হইয়াছে? মূলকথা বলিতে গেলে বলিতে হয় আত্ম-কেন্দ্রিক ভাবধারার প্লাবনে সমবায়ী গোষ্ঠীবদ্ধ ভাব অচল হইয়া পড়িতেছে. পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে আমরা আত্ম-কেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ এবং সমবায় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আছে আমরা তাহা আয়ত্ত করিতে পারি নাই। কলিযুগে অর্থ রাজনীতির দিনে অর্থের প্রভাব দুর্বার। অর্থ না হইলে সকল অচল। ব্যক্তিগত অর্থ-বৃদ্ধির মত্ততা সমবায় আন্দোলনের এক অন্তর্নিহিত প্রতিবন্ধক। প্রত্যেকেই নিজের নিজের সমস্যাদ্বারা জর্জরিত। সমাজ-ক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিকতা সমবায় সংগঠনের একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। যে সমাজে সংহতি ছিল, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন-যাপন ছিল, পরস্পরের আদান প্রদানের মধ্য দিয়া যে সমাজ তাহার অস্তিত্ব দীর্ঘদিন বজায় রাখিয়া আসিয়াছে সেই সমাজ আজ ভাঙ্গিয়া চৌচীর। সমাজের বন্ধন ছিল ধর্ম। এখন ধর্ম বলিয়া যাহা আছে তাহা অনুষ্ঠান মাত্রে পর্যবসিত। সেই ধরিয়া রাখার বস্তু যাহা অতীতকালে সে কালের উপযোগী ছিল, সেই ধর্মকে বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেই সমাজ-সংহতি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

এই ধর্মকে ধরিয়া ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া সর্বধর্ম সমন্বয়-রূপে আজ আত্মপ্রকাশ লাভ করিতে চাহিতেছে; জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা-সভায় রামধুন সঙ্গীতের মাধ্যমে রাখিয়া গিয়াছেন এই সর্বধর্মসমন্বয়ের মহান মন্ত্র—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম
সবকো সন্মতি দে ভগবান।

এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ বর্তমান যুগে প্রথম প্রচার করিয়াছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার পর শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব। তিনি বলিয়াছেন, "আমি ত জানি ধর্ম একই"। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিয়াছেন, "ধর্ম বলিতে হিন্দু, খৃষ্টান এসবের কিছুই বোঝায় না। যাহাকে ধরিয়া ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত সত্তা-চৈতন্য-আনন্দ যথাযথ সম্যকভাবে সার্থক হইতে পারে, তাহাই ধর্ম।

যে পিতাকে ধরিয়া পুত্রগণ সত্তা-চৈতন্য-আনন্দ আস্বাদন করিতে পারে সেই পিতাই ধর্ম ; দেশকে ধরিয়া যদি সকলের সঙ্ঘবদ্ধ সচ্চিদানন্দত্ব আস্বাদিত হয়, সেই ধর্ম ; সমাজকে ধরিয়া যদি সর্ব্বক্ষেত্রে ঐক্য আনয়ন করিতে পারে সমাজই ধর্ম। যাহা দুনিয়ার সকলকে একসূত্রে গাঁথিতে পারে তাহাই ধর্ম"।

ভারতীয় সংবিধান দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য যে সকল নীতি নির্দেশ করিয়াছেন, সেই নির্দেশের অনুশাসন মানিয়াই ভারতবাসী সঙ্ঘবদ্ধ এবং ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিশ্ব-সত্তা-চৈতন্য-আনন্দ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় সংবিধানের আদর্শই ধর্মাদর্শ এবং এই সংবিধানের অনুশাসন নিষ্ঠাপূর্ব্বক মানিয়া চলিয়া ভারতবাসী একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আনন্দ আস্বাদন করিবে।

ভারতীয় সংবিধানে প্রতি নাগরিক সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান নির্দেশ দিয়াছে জীবিকা অর্জনের সুযোগ সকলকে সমান ভাবে প্রদান করিতে হইবে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে সংবিধানের নির্দ্দিষ্ট নীতি হইতেছে— সাধারণের সুবিধার জন্য সমষ্টির সম্পদ সমভাবে বণ্টিত হইবে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে এমন নিয়ন্ত্রণ রাখিতে হইবে যে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের হাতে ধন সম্পদ জমাট না বাঁধে এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহ যাহাতে সাধারণের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় এবং ক্রমান্বয়ে যাহাতে উৎপাদকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং অনুচিত শোষণ-রহিত সমাজ এবং অর্থনীতি কার্য্যাত্মক রূপ গ্রহণ করিতে পারে— এই মহান উদ্দেশ্যে সমবায় প্রথার প্রবর্ত্তন এবং প্রসার রাষ্ট্রীয় নীতি। এই রাষ্ট্রীয় অনুশাসন ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া যে বিধান দিয়াছেন তাহার অনুবর্ত্তন করিয়াই গড়িয়া উঠিবে নূতন ভারত। সকল ধর্ম্মের লোকেরই এই রাষ্ট্রীয় অনুশাসন অবশ্য পালনীয়। ধর্ম্মনিরপেক্ষ এই সংবিধান-ঘোষিত নীতিই ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের ধরিবার বা অবলম্বন করিবার বস্তু ; সুতরাং ইহাই বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম। কালের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে ধর্ম্মের এই রূপ পরিবর্ত্তন একান্ত অপরিহার্য এবং রাষ্ট্রীয় অনুশাসন ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইলেই, সকল নাগরিক ধর্ম্মীয় নিষ্ঠায় এ অনুশাসন মানিয়া চলিলেই প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃত ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যাহা ধর্ম্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা নয় এই সমানাধিকারী শোষণমুক্ত সমাজ এবং অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান-ঘোষিত নির্দ্দেশ অনুসারে সর্ব্বত্র সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রতি নাগরিককে রাষ্ট্র অর্থনীতি এবং সমাজনীতি-ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে ইহার কার্য্যকরী পরিচালনা করিবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিরোধসমূহ এই সমবায় প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করিতে হইবে এবং এ সমবায় প্রতিষ্ঠানের দোসর হইবে পঞ্চায়েতিরাজ। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানত প্রতিষ্ঠিত হইয়া অর্থনীতি ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রতি গ্রাম-পঞ্চায়েৎ এলাকার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবেন। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সমবায় প্রতিষ্ঠান সমষ্টি-উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবার একমাত্র যন্ত্র। সমবায় নীতির মূল কথা প্রতি সমবায়ী নিত্যব্যয়িতা স্বাবলম্বন এবং পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া সর্ব্বত্র সমবায়ী মনোভাবের সৃষ্টি করিবেন এবং সমবায় প্রথায় তাহাদের সমস্যার সমাধান করিবেন। প্রতি গ্রামে এই দুইটী প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিবে, ইহাই রাষ্ট্রীয় নীতি।

এই সমবায়িক রাষ্ট্রনীতির অনুসরণে সর্ব্বসমন্বয় তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ চাহিতেছে। এই সমন্বয় দর্শন শ্রীনিত্যগোপাল দেব প্রাণের তত্ত্ব হইতে প্রচার করিয়াছেন এবং সমাজ রাষ্ট্র এবং অর্থনীতি-ক্ষেত্রে এই সমন্বয় তত্ত্বই বর্ত্তমান যুগের দিগদর্শন। এই সমন্বয় শব্দটি সম-পূর্ব্বক ই ধাতুর উত্তর অচ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। 'ই' ধাতুর অর্থ গতি। সম এবং অনুযোগে ই-ধাতুতে বিশ্বের সকল গতির সামঞ্জস্য সাধনের ইঙ্গিত রহিয়াছে। প্রচলিত অচলায়তন সমাজ-ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার করিয়া এই সমন্বয় আদর্শই পুরুষোত্তম-বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারে। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন, ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষই ইহলোকে প্রসিদ্ধ।

তাহার মধ্যে সমস্ত ভূতগণ ক্ষর এবং নির্বিকার পুরুষ অক্ষর বলিয়া বিদিত। ইহা ভিন্ন অন্য একজন উত্তম পুরুষ আছেন, পরমাত্মা নামে তিনি অভিহিত, যিনি অব্যয় ঈশ্বররূপে লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন। আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট; এই আমি লোক মধ্যে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বরের অদ্বৈত তত্ত্বেই এই বিশ্ব-সংসার প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্ব পুরুষোত্তমের দেহতত্ত্ব। এই বিশ্বের রাস, ক্ষেম, ক্ষর, অক্ষর, প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত পুরুষোত্তম প্রাণবল্লভ। তিনিই সমন্বয়। তিনি নিত্যই বর্তমান অথচ নিত্যই নব নব সৃষ্টি করিয়া অতীত হইতে বর্তমান এবং বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে সংযোগ স্থাপন করিয়া অনাদি অনন্তকাল চলিয়া আসিতেছেন। চলমান জগতের চলার ছন্দে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমন্বয় রূপে পুরুষোত্তম প্রতি অণু এবং খণ্ডের মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়া খণ্ডাতীত।

পুরুষোত্তম সর্বব্যাপ্ত হইয়া অংশ সত্ত্বে আত্মনিলয়ে পূর্ণতম। এই অংশ খণ্ডগুলির পরস্পর মিলন সংঘটন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাপ্ত রাখিয়া তিনি পূর্ণতম। তিনি অংশ-সত্ত্বে পূর্ণতম থাকিয়াও পরিপূর্ণতম। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে—"রাধাকান্তের ষোড়শ কলা থেকে ষোল গেলে ষোলই থাকে বাকি"। প্রতি কালখণ্ড দেখিতে দেখিতে বর্তমান হইতে অতীত হইয়া যাইতেছে এবং বর্তমান অতীত হইতে না হইতেই ভবিষ্যৎ আসিয়া দেখা দিতেছে। কোন ব্যক্তি যদি কালের ভবিষ্যৎ বর্তমান এবং অতীতকে সমন্বিত করিয়া চালাইতে পারেন তিনিই বিশ্বে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। আজ হইতে ৫০০০ বৎসরাধিক কাল পূর্বে শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়া নিজকে বিশ্বস্রষ্টা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার রাস-লীলাই বিশ্বসৃষ্টি লীলা। প্রতি দুই জন গোপী অন্যোন্য-বাহুবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া রাসলীলা করিয়াছেন। প্রতি গোপীই এক একটি খণ্ড ক্ষণ এবং ক্ষণের সন্ধিক্ষণে বিরাজ করিতেছেন পুরুষোত্তম। সকল সজাতীয় বিজাতীয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া পুরুষোত্তম এই বিশ্ব অনাদি অনন্তকাল পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নাই। সর্বত্র ভারসাম্য রক্ষা করিয়া পৃথিবী তাহার কক্ষ-পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; কখন সূর্য্য পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছে না অথবা পৃথিবী কক্ষপথ হইতে ছিটকাইয়া বাহিরে পড়িতেছে না। ঋতু ঋতু পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি আসিতেছে যাইতেছে, দিনের পর রাত্রি হইতেছে আবার রাত্রির পর দিন হইতেছে, এই অনন্ত চলার পথে কোথাও বিন্দুমাত্র ছন্দ পতন নাই। ক্ষর অক্ষর সমন্বিত পুরুষোত্তমের বিশ্বের সাথে এক হইয়া চলার ছন্দ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

অচঞ্চলের অমৃত ধরিবে চঞ্চলতার নাচে
বিশ্বনীলা ত দেখি কেবলি সে নেই নেই করে আছে।
ভিৎ কেঁদে যারা তুলিছে খেয়াল
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল
তারা বুঝিল না অনন্তকাল
অচির কালেরই মেলা।
তোমার ছন্দে পাখীর ওড়া সে
তোমারই ছন্দে ফুল ফোটে ঘাসে
অনিত্য তারা তব ইতিহাসে
নিত্য নাচন নাচে।

এই সমন্বয় আদর্শ ই পরস্পর বিরুদ্ধের যৌগপদ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া পরস্পর একে অপরের ভিতর মিলিয়া মিশিয়া গলিয়া গিয়া সন এবং অনুগমন করিয়া সর্ব ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে। বহির্বিশ্ব আজ এই সমন্বয় আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা চাহিতেছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভাবধারার সমন্বয় সাধন করিয়াই গড়িয়া উঠিতে পারে আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সংবিধান অনুসারে প্রত্যেকেরই স্বাধীন চিন্তাধারা এবং মতবাদ প্রকাশের অধিকার রহিয়াছে। সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভাবধারার সমন্বয় সাধন করিয়া রাষ্ট্রীয় আদর্শে কার্যক্রম পরিচালিত হইলেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সুস্থ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য নিজ নিজ দলীয় আদর্শে পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়া সর্বত্র অশান্তির আগুন উদ্গীরণ

করিতেছে। সমন্বয়ের মোহন মন্ত্রই এই বিপরীত অবস্থার সহ অবস্থান করাইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। প্রতি দল যদি নিজের মতবাদকে রাষ্ট্রীয় আদর্শের সহিত মিলন করিয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার কার্যে সহযোগিতা করেন তাহা হইলেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে গতি সঞ্চারিত হইয়া উদ্দিষ্ট সাধনে অগ্রগতি হইবে। অন্যথা পরস্পর বিরোধমান দলগুলি যদি রাষ্ট্রের অগ্রগতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেই পরস্পরের বিদ্বেষ উৎসারিত হইয়া চলমান বিশ্বের কর্মস্রোতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া পুনরায় অতলান্তিক সনাতন রাষ্ট্র-নীতি এবং অর্থনীতি ক্ষেত্র সৃষ্টি করিবে এবং ডাকিয়া আনিবে পরম বিপর্যয়। বর্তমান যুগ পুরুষোত্তম-যুগ। এই যুগে পরস্পর বিরুদ্ধের মিতালীই পুরুষোত্তম-যোগ। অনন্ত জগতে অনন্ত ধর্মমত প্রচলিত। এই ধর্মমত সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই হইবে প্রকৃত ধর্ম। অনন্ত রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন মতবাদ সকল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সংবিধান-ঘোষিত নীতিতে এক হইতে পারিলেই হইবে প্রকৃত স্বরাজ।

আজ ভাগবত ধর্মকেই রাষ্ট্র অধিকার করিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে প্রচলিত সনাতন ধর্ম :

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিয়াছেন—

পরাধীন-রাষ্ট্রে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সমাজ রাষ্ট্র মিথ্যা না বলিয়া উপায় কি? রাষ্ট্র যখন শোষকের হাতে তখন কোন রকমে সত্য রক্ষা করিতে হইলে রাষ্ট্রের বাহিরে তো থাকিতে হইবে। মায়াবাদ পরাধীন দেশে না চলিয়া উপায় নাই। ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র করিবার প্রয়োজন হয় তখনই যখন রাষ্ট্র শোষকের হাতের মুঠার মধ্যে গিয়া পড়ে অথচ রাষ্ট্র দখল করিবার কোন উপায় নাই। এই ভাবেই এই দেশে রাষ্ট্র ধর্ম হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল। আজ যুগ অনুকূল। বিশ্বকে হজম করিয়া আত্ম-সত্তা আত্মচৈতন্য আত্ম-আনন্দ আস্বাদনের সুযোগ করতলগত। অতীতের পুনরাবৃত্তি নবীন ভারতের পক্ষে আত্ম হত্যারই নামান্তর হইবে। বর্জন নীতির স্থান অধিকার করিবে হজম নীতি। ইহাই "পুরুষোত্তম যোগ"। এই যোগের গুহ্যতম কথা হইল সর্ব সমন্বয়।

এই সমন্বয়ের দোসর হইল সমবায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলেও দেশবাসী আজ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না করায় অভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। অর্থনীতি ক্ষেত্রে শোষণ এখন চলিতেছে। এই শোষণ-মুক্তির একমাত্র উপায় সমবায় সংগঠন। কিন্তু এই সমবায় সংগঠন সার্থকভাবে গড়িয়া উঠিতেছে না, কেননা এই সমবায় সম্বন্ধে জ্ঞানের অপূর্ণতা রহিয়াছে। কর্ম ও কর্মীর নিত্য সম্বন্ধই সমবায়। সমন্বয় এবং অনবস্থিতির অর্থাৎ কর্মে কর্মে সমতা এবং নিজের আশ্রয়-ভূমির সহিত অভাব সম্বন্ধ-বোধ-সাধনেই পুরুষোত্তম-কর্ম অনাদি অনন্তকাল লীলারূপে চলিয়া আসিতেছে।

পাশ্চাত্ত্য সাধনায় কেবল মাত্র তর্কের ভিতর দিয়া সমবায় গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। কিন্তু 'নিষ্ক্রিয়দের বন্ধু সম্বন্ধই সমবায়। তাহা কর্ম হইতে নিবিড়'। কেবলমাত্র কর্মদ্বারা কেহ সমবেত হইতে পারে না, কর্মক্ষেত্রে সঙ্ঘ রচনা করিতে পারে না যদি না কর্মের মতই সমবায়েরও একটী স্বতন্ত্র পদার্থত্ব স্বীকৃত হয়। প্রতিটী কর্মকে বিশ্ব-কর্ম-রূপে আস্বাদন করিয়া এবং সমভাবাপন্ন এই সব কর্মের মধ্যে অন্তোন্যভাবে যদি আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তখনই কর্মের সঙ্গে কর্মের, একের কর্মের সঙ্গে বিশ্বকর্মের এবং কর্মের সঙ্গে কর্মীর সমবায় সাধন হয়। ..

অবিনাশী কারণ কার্যে আশ্রিত, অবিনাশী অবয়বী অবয়বে আশ্রিত, অবিনাশী কর্মী কর্মে আশ্রিত, অবিনাশী জাতি ব্যক্তিতে আশ্রিত। এই আশ্রিতত্ব জ্ঞানের হেতুভূত যে সম্পর্ক তাহা সমবায়। নিত্য সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ।

অবয়ব ও অবয়বী, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান, জাতি ও ব্যক্তি, বিশেষ ও নিত্য দ্রব্যের নিত্য সম্বন্ধই সমবায়। পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিয়াছেন "পুরুষোত্তম দর্শনে সমবায় একটী নিত্য পদার্থ। এই সমবায় প্রথমে দ্রব্যের অন্তরে, গুণের অন্তরে, কর্মের অন্তরে জাতিরূপে থাকিয়া পরে বাহিরের পদার্থান্তরের সঙ্গে উহাদিগকে সমবেত করিয়া চলিয়াছে। সমবায়ও ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর পর্যায়ে অগ্রসর হইতেছে, অন্তরের সমবায়-সম্বন্ধই বহির্বিশ্বের সমবায় সম্বন্ধে গড়িয়া উঠিতেছে। এইভাবে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে কারণোপাধি ঈশ্বর পর্যন্ত কার্যোপা-

পারি জীবসমূহের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে মিলিত হইতেছেন। তখনই ঈশ্বর জীবাশ্রিত। ঈশ্বরের এই জীবাশ্রয়ত্ব প্রত্যয়ই গড়িয়া তুলিবে এই বিশ্বকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্ররূপে। কারণের কার্য্যাশ্রয়ত্ব, গুণীর গুণাশ্রয়ত্ব, জাতির ব্যক্তি-আশ্রিতত্ব প্রত্যয়ের এবং ঈশ্বরের জীবাশ্রিতত্ব প্রত্যেকেরই ঘনীভূত রূপ আমাদের পুরুষোত্তম-জীবন। পুরুষোত্তম-জীবনেই জীব ঈশ্বর, কার্য্য কারণ পারস্পরিক সমবায় সম্বন্ধে সমবেত"।

এই সমবায় দর্শনের আদর্শে, সমবায় প্রথায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবায়ীগণ অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করিয়া মুক্ত দেশে মুক্ত ভাবে বিচরণ করিয়া পুরুষোত্তম বিশ্বসৃষ্টি করিয়া কর্ম্মের বাধনে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

সমবায়ের এমন মোহন মধুর দর্শন আর কোথায় আছে? যে সমবায় আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশে কর্মকেন্দ্রিক হইয়া আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা করিতেছে এবং যাহার প্রসার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুবিধা দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই সমবায় দর্শন বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্বকে সমবায় আদর্শে মিলিত করিয়া ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ব্ব-বিধ সমস্যার সমাধান করিয়া পুরুষোত্তম-বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত। ভারত আজ এই সমবায় আদর্শে সমবায় সাধারণতন্ত্র গড়িয়া বিশ্বের পথ-প্রদর্শক হইতে যোগ্যতাসম্পন্ন। এই সমবায় দর্শন বিচার বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় এই আদর্শেই ভারতীয় সমবায় আন্দোলন পরিচালিত হইলে সার্থক সমবায় রূপায়ন হইবে। বর্ত্তমান যুগ সমবায়ের যুগ। "সঙ্ঘ শক্তিঃ কলৌ যুগে"। এই সঙ্ঘশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমবায় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইবে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং দেশবাসী লাভ করিবে মুক্তির অনাবিল আনন্দ। আজ প্রতি সমবায়ীর প্রাণে ধ্বনিত হউক "সমবায়সঙ্ঘং শরণম্ গচ্ছামি"। গুণের আশ্রয়ে গুণীগণ সমবেত হইয়া সঙ্ঘ গঠন করিলে গুণ হইবে নির্গুণ এবং কর্ম্মের আশ্রয়ে কর্ম্মীগণ সমবেত হইয়া সঙ্ঘ গঠন করিলে কর্ম্ম হইবে নৈষ্কর্ম্ম। ব্যক্তি জাতির আদর্শে সমবেত হইয়া সঙ্ঘ গঠন করিলে জাতি অবতরণ করিবে প্রতি ব্যক্তিতে। ক্রমান্বয়ে এই সমবায়সঙ্ঘ বিশ্ব-সঙ্ঘে পরিণত হইবে। এইরূপ নির্গুণ এবং নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অবতীর্ণ হইলেন ঈশ্বর জীবাশ্রয়ে। এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে জীব-ঈশ্বর সঙ্ঘ এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে পুরুষোত্তম-বিশ্ব। ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের মোহন মধুর উপায় এই সমবায়ী সমবায় দর্শন।

শক্তির কার্যই হইতেছে 'জমাট বাঁধা', এবং সেই জমাট বাঁধা বস্তুর প্রয়োগে অন্তকে লুঠ করা। এই শক্তি-ক্ষেত্রকে ভক্তি-ক্ষেত্রে গড়িয়া তোলাই পুরুষোত্তমের প্রয়োজন। ধন যখন শক্তি, শ্রম যখন শক্তি, তখন অবাধ লুঠ অনিবার্য; কিন্তু এই ধন ও শ্রম যদি ভক্তিতে পরিণত হয়, তখন উহারাই করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেবা। ভক্তির মধ্যে রহিয়াছে ভজ্ ধাতু। ভজ্ ধাতুর অর্থ 'সেবা করা' ও 'ভাগ করা'। ভক্তির ক্ষেত্রে আদর্শও ভক্ত, ধনও ভক্ত, শ্রমও ভক্ত। জমাট-বাঁধা (crystalised) যা-কিছুকে বিভক্ত (divided) করাই ভক্তিবাদ। তখনই হয় ভজনের পূর্ণ সার্থকতা। ভক্তি নিজের সব কিছুকে লুঠ করিয়া দিবারই মনোবৃত্তি; ইহাই 'হরির লুঠ'।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

সমবায়—তত্ত্বে

॥ শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস ॥

সমবায় কথাটি বর্ত্তমান যুগে সুপ্রচলিত। পৃথিবীর বহু দেশেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমবায় প্রথা অবলম্বিত হইতেছে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও এ ব্যাপারে পিছাইয়া নাই। এ দেশেও বহু সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং বহু চিন্তাবিদ্ সমবায় সম্বন্ধে আলোচনা ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

নরনারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্ব-সমন্বয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজও তাঁহার রচিত 'ব্রহ্মসূত্র অবধূত ভাষ্য'-র ২য় খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান যুগ এই সমবায়ের (co-operative) যুগ। বর্ত্তমান যুগেই সমবায়ের অর্থ বস্তুতন্ত্র হইবে। সমবায় ব্যতীত বর্ত্তমান যুগ ব্যর্থই। 'সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে'। 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'। বৈশেষিক দর্শনের 'সমবায়' পদার্থের ভিত্তিতেই বেদান্ত গড়িয়া উঠিবে। এই যুগই তপোদেব-শঙ্করের, বৈশেষিক-বেদান্তের সমন্বয়ের যুগ। 'সমবায়ের' স্বয়ংমূল্য প্রচার করিয়া বৈশেষিক দর্শন অমর। বৈশেষিক ভিত্তিতেই বেদান্তসৌধ বাস্তব সত্য। ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্য ইহারই প্রচারক"।

'সমবায়'কে বুঝিতে হইলে আগে তত্ত্বতঃই বুঝিতে হইবে। 'সমবায়ের' সত্তা কি, অভিপ্রায় কি, লীলা কি বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির অন্তরের একটি গুহ্যতম রহস্য হইতেছে, দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত বা ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট সত্তার সমবেত হওয়ার প্রেরণা। পরমাণুলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক, ভূ-লোক, জীবলোক সমস্ত লোকেই এই সমবেত হওয়ার প্রেরণা। এই সমবেত হওয়ার প্রেরণার নামকেই দর্শনশাস্ত্রে 'সমবায় সম্বন্ধ' বলা হইয়াছে। এই সমবায়ের অভিপ্রায় কি ?—সৃষ্টি, নব নব সৃষ্টি, বহু সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকে আগাইয়া লইয়া যাওয়া, সৃষ্টির সামনের দিক চিরতরে মুক্ত রাখা, অনন্তায়িত করা, সার্থক সৃষ্টি করা। 'অব্যক্তি-চারিত্ব সমানাধিকরণরূপ 'ব্যাপ্তি' যোগে সমবেত হইয়া সৃষ্টিলীলাব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে। এই সমবেত হওয়ার ছন্দ, সমবায় ছন্দই আমাদের প্রণিধানের বিষয়।

"সমবায়াত্ত্বাসগনাৎ চ সাম্যাৎ অনবস্থিতেঃ।"

২।২।১৩ ব্রহ্মসূত্র।

সমবায়ের ব্যাখ্যায় মহর্ষি কণাদ বলিতেছেন—'ইহ ইদম্ ইতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ।'—বৈশেষিক-৭।২।২৬। শঙ্কর মিশ্র কৃত উপস্কারে আছে, 'অযুত সিদ্ধানাম্ আধার্য্যাধার ভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ ইতি প্রত্যয়হেতুঃ স সমবায় ইতি। অসম্বন্ধয়োরবিদ্যমানত্বম্ অযুতসিদ্ধিঃ। অর্থাৎ অসম্বন্ধ যাহাদের অবস্থান নাই (non-existence of things unrelated), আধারী-আধারভাবে অবস্থিত সেই সব পদার্থের যে ইহ-প্রত্যয়ের (আশ্রিতত্ব জ্ঞানের) হেতুভূত সম্বন্ধ, তাহারই নাম 'সমবায়'।' বস্তুপদবাচ্য হইতে হইলে তাহাকে related হইতেই হইবে, unrelated পদার্থ অবস্তুই হইয়া যায়। ইহা এই বস্তু, উহা ঐ বস্তু এইরূপ যে প্রত্যয় হয় তাহা সম্ভব হইতেছে এই 'সমবায় সম্বন্ধের' ফলেই। হাইড্রোজেন পরমাণুতে দেখা যায় কেন্দ্রে স্থিতিশীল অবস্থায় আছে একটী পজিটিভ-বৈদ্যুৎধর্ম্মী প্রোটন ও একটী সামান্যধর্ম্মী অর্থাৎ বৈদ্যুৎধর্ম্ম বর্জ্জিত নিউট্রন আর তাহাদের চারিদিক বেষ্টন করিয়া গতিশীল একটি নিগেটিভ বৈদ্যুৎধর্ম্মী ইলেকট্রন আপন খেয়ালে ঘুরিতেছে। এই ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমবায়ে সৃষ্ট পরিমণ্ডলকেই হাইড্রোজেন পরমাণু বলা হয়। এইভাবে আটটি প্রোটন, আটটি নিউট্রন ও আটটি ইলেকট্রনের সমবেত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে অক্সিজেন পরমাণু। হাইড্রোজেন পরমাণু ও অক্সিজেন পরমাণু মিলিত হইয়া জল নামক আর একটী ভিন্ন পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। এইভাবে 'সমবায় সম্বন্ধের' মধ্য দিয়া বিশ্ব চরাচর সৃষ্ট

হইয়াছে। এই মিলনের মধ্যে তিনটি ঘটনা সুপরিস্ফুট। একটী অযুতসিদ্ধি আর অপর দুইটী উপরোক্ত সূত্রের অভিউপগমদ্বারা সামঞ্জস্য, 'সাম্য' অর্থাৎ স্থিতিশীলতা এবং অনবস্থিতি অর্থাৎ গতিশীলতা। অযুতসিদ্ধি শব্দের দ্বারা আমরা কি বুঝি? 'যয়োঃ দ্বয়োঃ মধ্যে একস্ অবিনশ্যৎ অপরাশ্রিতত্বেন অবতিষ্ঠতি তে) অযুত-সিদ্ধৌ'। অর্থাৎ যে দুয়ের মধ্যে একটী অবিনাশী থাকিয়া অপরটির আশ্রিত, সেই দুইটীই অযুতসিদ্ধ। বিপরীত অবিনাশী, বিনাশ সেখানে নাই। যেমন একটী হাইড্রোজেন পরমাণু। দুইটী বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎকণা অবিনাশী থাকিয়া একটী অপরটির আশ্রিত আছে। বৈজ্ঞানিকের বীক্ষণাগারে ধরা পড়িয়াছে দুইটী বিপরীতধর্মী পদার্থ পরস্পরকে কাছে টানে আর সমধর্মীকে ঘৃণা ঠেলিয়া দেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে অনেক পরমাণু আছে যেখানে সমধর্মী অনেক-গুলি প্রোটন ও ইলেকট্রন একটা পরিমিত নৈকট্যে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে রূপায়িত হইতেছে। এই সমধর্মীদের মিলন সম্ভব হইতেছে অত্যুপগম ধর্ম থাকার জন্যই। কিন্তু একান্ত স্থিতিশীলতাই তো সৃষ্টির সবখানি কথা নয়। 'সমবায়' যেমন সম্ভব হইতেছে বৈশেষিকের 'অত্যুপগম' ধর্মের দ্বারা, তেমনি সৃষ্টির অনন্তত্ব (develop-ment) সাধিত হইতেছে বৈশেষিকের 'অনবস্থিতি' ধর্মের দ্বারা। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ উপরোক্ত সূত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন, "অবিনাশী কারণ কার্য্যে 'আশ্রিত', অবিনাশী অবয়বী অবয়বে 'আশ্রিত', অবিনাশী গুণী গুণে 'আশ্রিত', অবিনাশী কর্ম্মী কর্মে 'আশ্রিত', অবিনাশী জাতি ব্যক্তিতে 'আশ্রিত'—এই 'ইহ প্রত্যয়' বা আশ্রিতত্ব জ্ঞানের যে হেতুভূত সম্বন্ধ, তাহাই সমবায়। সমবায় সম্বন্ধটী নিত্য এবং এক। দ্রব্য দেখিলেই যে তৎসঙ্গে জাতি ও গুণাদির প্রতীতি হয়, 'সমবায়'ই তাহার কারণ।" পৃঃ ৩২০। পরমাণু প্রভৃতি অবয়ব-সমূহ হইতে উৎপাদমান অত্যন্ত ভিন্ন ঘটপটাদি অবয়বীই পরমাণু প্রভৃতি অবয়বে সমবায়লক্ষণ সম্বন্ধদ্বারা সম্বেত হয়, অস্তি-প্রত্যয়ের গোচর হয়। ঠিক এইভাবে সমবায়ও সমবায়ী দ্রব্য হইতে অত্যন্ত ভিন্ন; সুতরাং তাহাও অন্য সমবায়ের দ্বারা সম্বেত হওয়া উচিত। ফলে এই সমবায় অন্য সমবায় এবং সেই সমবায়ও অন্য সমবায় দ্বারা সমবেত—এইরূপে 'সমানভাবে' (সামান্যাৎ) অনন্ত কল্পনায় প্রবৃত্ত হইলে 'অনবস্থা' দোষই (অনবস্থিতেঃ) আপতিত হইবে, কোথায়ও কোন স্থিতিধর্ম্মী জ্ঞানভূমি লাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।"—ব্রহ্মসূত্র অখণ্ড ভাষ্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯। ইহার দৃষ্টান্ত—ইংল্যাণ্ডের রচ্‌ডেল শহরের একটী কাপড়ের কলের ২৮ জন শ্রমিক ১৮৪৪ সনে মিলিত হইয়া একটী ক্রেতা সমবায় বিপনন সমিতি স্থাপন হইতে কেমন করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পাইকারী সমবায় বিপনন সমিতি ও উৎপাদক সমবায় সমিতি স্থাপন করিতে হইয়াছিল দেখিতে পাই। (শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়ের 'বিপ্লবীর জীবন-স্বপ্ন—সমবায় সমাজ'। পৃঃ ৩০-৩৪)

প্রথমতঃ অযুতসিদ্ধিতে (আশ্রিতত্বে) আছে কারণ অবিনাশী থাকিয়া কার্য্যে আশ্রিত, গুণী অবিনাশী থাকিয়া গুণে আশ্রিত, কর্ম্মী অবিনাশী থাকিয়া কর্মে আশ্রিত, জাতি অবিনাশী থাকিয়া ব্যক্তিতে আশ্রিত। ইহারা সকলেই অবিনাশী থাকিতে পারিতেছে যেহেতু তাহাদের সকলেই স্বতঃসত্তাবিশিষ্ট ও স্বয়ংপূর্ণ। মানুষ আজ ঘন মোহে পতিত হইয়া এই বিরুদ্ধধর্ম্মী এবং স্বয়ংপূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তাবান কার্য্য-কারণ, গুণ-গুণী, কর্ম্ম-কর্ম্মী, ব্যক্তি-জাতি প্রভৃতির সমবায়তত্ত্ব আস্বাদন করিতে না পারিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জগতের বিপরীতধর্ম্মীদের সম্বেত করিতে না পারিয়া তাহার নিজের অস্তিত্বই বুঝি আজ মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কার্য্য আছে কারণ নাই, কিম্বা কারণ আছে কার্য্য নাই, গুণ আছে গুণী নাই কিম্বা গুণী আছে গুণ নাই, কর্ম্ম আছে কর্ম্মী নাই কিম্বা কর্ম্মী আছে কর্ম্ম নাই, ব্যক্তি আছে জাতি নাই কিম্বা জাতি আছে ব্যক্তি নাই ইহা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাই পুরুষোত্তমের এই বাস্তব বিশ্বে 'সমবায়' একটী নিত্যপদার্থ। এই 'সমবায়'কে আস্বাদন করিতে না পারিয়াই আমরা পথভ্রষ্ট গতিহীন।

সমবায়কে সার্থকভাবে আস্বাদন করিতে হইলে প্রাণ খুলিয়া গীতার 'ভাবয়ন্তঃ পরস্পরং' বা ব্যাপ্তি যোগকে গ্রহণ করিতে হইবে, নিজ আশ্রয়ের সঙ্গে অন্যোন্যভাবে সমানা

দিকরণ রূপ ব্যাপ্তি জীবনে বরণ করিতে হইবে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ব্রহ্মসূত্র-অবধৃত ভাষ্যের ১ম খণ্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "পরমাণু-অবয়ব হইতে অবয়বী দ্বাণুকের, অনন্ত ব্যক্তি হইতে জাতির উৎপত্তি এবং ব্যক্তির বুকে সমবায়ের ভিতর দিয়া জাতির অবতরণ কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না, দুই-ই দুইয়ের নাগালের বাহিরেই থাকিবে, যদি পরমাণু-দ্বাণুক, ব্যক্তি-জাতি ব্যাপকতর জীবন-সত্তার মাঝে I. C. M.-এর সমবায়ে সমবেত না হয়। অণুর সঙ্গে অণুর কিংবা অণুর সঙ্গে অণুক ত্রাণুক চতুরণুকের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে জাতির এবং জাতির সঙ্গে জাতির সমবায় সম্ভব হইতে পারে, মহাজাতিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে পুরুষোত্তম-জীবনের সমানাধিকরণেই। সেখানে সবই স্বয়ংমূল্যবান সত্তা লইয়া সম, সকলেই এক অধিকরণে নিজ আশ্রয়ের সঙ্গে অভাব-যোগে যুক্ত, তাই 'অনবস্থিত'। এই ভাবে ভাব-অভাবের সমবায়েই বিশ্ব-সংগঠন সম্ভবপর। যদি জীবনের মাঝে পরমাণু-দ্বাণুক-মহদ্দীর্ঘের অবস্থান না থাকিত, তবে সমবেত হইবার প্রবৃত্তিই (urge) জাগ্রত হইত না, কেহই পরস্পরের জন্য-জন্য হইতে চাহিত না, পারিতও না। পুরুষোত্তম-জীবনই সকলকে স্ব স্ব আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত রাখিয়া অথচ প্রত্যেককেই আবার স্ব স্ব আশ্রয়চ্যুত করিয়া অবস্থান-অনবস্থানের সমন্বয়ে, উপনিষদুক্ত নিলয়ন-অনিলয়নের সমন্বয়ে দিব্য ব্রহ্মধাম গড়িয়া তুলিতে সক্ষম। ব্যক্তির কাছে জাতি থাকিত অথচ, জাতিও ব্যক্তিকে ধরিয়া ফেলিতে পারিত না, যদি না উভয়ে জীবনের মধ্যে সমবেত হইত। ব্যক্তিসমূহের সংযোগে জাতি হয় না, জাতির বিভাগেও ব্যক্তি হয় না যদি না ব্যক্তি ও জাতি সংযোগ-বিয়োগ সমন্বিত পরকীয় সমবায় সাধনাশ্রয়ে জীবনে সমবেত হইত"।—একটি organism-এর মধ্যে "each cell live for itself as well as for the whole organism"। "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"—স্বামীজী তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের-অবধৃত ভাষ্যে লিখিতেছেন, "বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্ত্য সাধনা যে কর্ম্মের ভিতর দিয়া 'সমবায়' ধরিতে পারিতেছে না, তাহারও মূলে রহিয়াছে বৈশেষিক-দর্শন প্রচারিত সমবায় জ্ঞানের অপূর্ণতা। কর্ম্ম-কর্ম্মীর নিত্য সম্বন্ধই সমবায়। কিন্তু যে-সমবায়ের ফলে কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের, এবং কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মীর সমবায় সম্ভবপর, সেই সমবায়ের তত্ত্বজ্ঞান যদি কর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে স্বয়ংমূল্যে সমবেত না হয়, কেমন করিয়া কর্ম্ম-কর্ম্মীর সমবায় হইবে? 'নিষ্ক্রিয়াণাং সমবায়ঃ কর্ম্মভ্যো নিষিদ্ধঃ'—বৈশেষিক ৫।২।২৩ (The relation) of the inactive (i. e Attribute and Action) (to Substance) is Combination, (which is) independent of action। 'নিষ্ক্রিয়দের দ্রব্য-সম্বন্ধই সমবায়, তাহা কর্ম্ম হইতে নিষিদ্ধ। 'তন্তু সম্বন্ধত উৎপত্তিরের নাস্তি দূরে তু কর্ম্মাধীনতা' ইত্যাদি। কেবলমাত্র কর্ম্মদ্বারা কেহ সমবেত হইতে পারে না, কর্ম্মক্ষেত্রে সঙ্ঘ রচনা করিতে পারে না, যদি না কর্ম্মের মত সমবায়েরও একটি স্বতন্ত্র পদার্থত্ব স্বীকার করা হয়। কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের, একের কর্ম্মের সঙ্গে বিশ্বের কর্ম্মের, কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মীর সমবায় তবেই সম্ভব হইতে পারে, যদি প্রতিটি কর্ম্ম নিজের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মের আস্বাদন করিয়া 'সম' হয়, এবং সমান ভাবাপন্ন এইসব বিশ্বকর্ম্ম-কর্ম্ম-সমূহের মধ্যে পারস্পরিক আশ্রয়াশ্রয়ীভাব-সাধন স্ফূর্ত্তি হয়। কর্ম্মে কর্ম্মে সমতাও যেমন আছে, নিজের আশ্রয় ভূমির সঙ্গে তাহার 'অভাব' সম্বন্ধও তেমনি আছে। এই সমত্ব ও অনবস্থিতির ভিতর দিয়াই পুরুষোত্তম-কর্ম্ম অনাদি-অনন্ত লীলাপদবাচ্য।"

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রেই 'সমবায় পদ্ধতি'র কল্পনা করা যাক না কেন, সব ক্ষেত্রেই প্রথমে অযুতসিদ্ধি অর্থাৎ প্রতিটী স্বয়ংমূল্যবান স্বয়ংপূর্ণ সত্তা অবিনাশী থাকিয়া পারস্পরিক আশ্রিতত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকিতে হইবে। সেখানে Genus will take the name of species সামান্যং বিশেষসংজ্ঞাম্ অপি লভতে। যেমন মালিক মালিক থাকিয়াও শ্রমিক হইবে, শ্রমিক শ্রমিক থাকিয়াও মালিক হইবে। 'সমবায় সম্বন্ধ' বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেই শুধু ইহা সম্ভব। 'সমবায় সম্বন্ধ'কে প্রাণ খুলিয়া সাধনা রূপে জীবনে গ্রহণ করিতে পারিলেই 'সমবায় পদ্ধতি'র যাত্রারম্ভ সার্থক হইবে। তখনই সাম্যও প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ভাবে একটি সমবায়ের

অন্য সমবায়ের সঙ্গে সমবেত হইবার জন্য প্রকৃতির বিধানেই তাহার মধ্যে প্রেরণা জাগিবে। আমাদের কাজ শুধু সমবায় কাঠামোকে এমনভাবে সাজাইয়া প্রস্তুত রাখা যাহাতে আমরা অন্য সমবায়ের সঙ্গে 'সমবায় সম্বন্ধে' মিলিত হইতে পারি। 'সমবায়ের' প্রাণকথা 'সাম্য' ও 'অনন্যস্থিতি' আমাদের জীবনে স্বীকৃত হইলে বিশ্বের অখণ্ডরস ধারায় থাকিয়া আমাদের জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবে।

আমাদের দেশে যে 'সমবায় পদ্ধতি' বা সমবায়ের কাঠামো প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে এই অনুভূতসিদ্ধ 'সাম্য' ও 'অনন্যস্থিতি' আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাকে partnership business-এরই রকমফের বলিয়া মনে হয়। সমবায় বিষয়ে পণ্ডিতগণই 'সমবায় তত্ত্বের' সঠিক রূপায়নের উপযোগী কাঠামো বা গঠনতন্ত্র রচনা করিবেন এই প্রত্যাশা জানাইয়া আমার সংক্ষেপ বক্তব্য শেষ করিলাম। বন্দেমাতরম্। *

---

* নরনারায়ণ আশ্রমে আলোচনা বৈঠকের চতুর্থ অধিবেশনে গত ৪ঠা অক্টোবর ১৯৭০ তারিখে এই প্রবন্ধটি এবং ইহার পূর্ববর্তী শ্রীদেবীপ্রসাদ চৌধুরীর সমবায় ও সমবয় প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল।

কবি কুমুদ-প্রয়াণে

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

তমসময় পল্লীপথ নিভে গেল প্রদীপ্ত দেউটি
অন্ধকারে শোকের বান নেমে আসে অজয়ের চরে ;
ম'লতী মাধবী আর যুঁইচাপা ভূঁয়ে পড়ে লুটি :
শুভ্র কুমুদ হায় নিমজ্জিত মরণ-সায়রে।

পল্লীপ্রকৃতির কৃতি উপাসক গ্রামবাংলার দক্ষ রূপকার
নিঃস্ব, দীন, অসহায় প্রতি সে কি অসীম মমতা !
তোমার কাব্য নয় উচ্চ ভাব-ভাবনার হীরকের হার
মালতীর মালা সম মাখা পবিত্রতা।

বৈষ্ণবোচিত প্রাণ বয়েছিলে বৈরাগীর পূত উত্তরীয়
সপ্তস্বরা বীণা নয় বাজায়েছ একতারা লয়ে ;
নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, আশুতোষ তাই সর্বপ্রিয়
ভক্তির সুরধুনী অনলস সাধনায় কাব্যে দেছ বয়ে।

'মঙ্গল চণ্ডীরা রেখেছেন তাই ছেঁয়া আছি'
কি অপূর্ব তৃপ্তিসুখ পল্লির অন্তরে ;
ঐ ভক্তি প্রেমরস কিঞ্চিৎ দিয়ে যাও, কবিবর, যাচি—
তোমার তর্পণ করি অশ্রুজলে মুক্ত যুগ্ম করে।

পারিবারিক জীবন-আলোচনা

।। ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অপ—আবার পুরাণো কথাতেই আসা যাক্। ঐ যে বলছিলাম যে বাচ্চারা যে যখন (শরীর মন ও সামাজিক ব্যবস্থাও) যেমন যেমন বুঝতে চায়, আর (অন্যের ক্ষতি না কোরে) যা কিছু করতে চায়—বিশেষ কোরে নিজেদের কাজগুলি—সে সব করতে দেওয়া বা করতে সাহায্য করা দরকার মতো, এটাই ভালো। তাতে অবশ্য বড়দের অনেকটা সময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়; কিন্তু শৈশবে শিশুর যা কিছু প্রয়োজন সেটাই করা আমাদের প্রধান কাজ বলে ধরতে হবে আর করতেও হবে। শিশু কি রকম হোলে বা কি করলে বড়দের কি সুবিধা হবে—সেটাই যদি আমরা—বড়রা—সব সময় দেখি তাহলে শিশুর শৈশবের প্রয়োজন যে মিটানো হোচ্ছে না সেটা বড়দের বুঝবার আর মনে রাখবার সময় এসে গেছে অনেকদিন ধরেই।

অভয়া—তোমরা মায়েদের আর বাচ্চাদের সমস্যাগুলি নিয়ে একসঙ্গে এমন জট পাকাচ্ছো যে আমার আলোচনার সূত্রটি ধরা মুস্কিল হয়ে পড়ছে।

করুনা—আমি একটু চেষ্টা করি জট ছাড়িয়ে দিতে। প্রথমতঃ আমরা তো ছোটদের ব্যবহার ও তার কারণ বুঝতে চেষ্টা করলাম। সেই কারণ বুঝতে গিয়ে দেখছি যে এটা বুঝতে হলে শিশুর প্রতি মায়ের ব্যবহার ও তার কারণ সম্বন্ধে আগে বুঝতে হবে। মায়ের ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে মায়েরা যা বলছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এটা বুঝতে হলে বাড়ীর অন্যদের মায়ের প্রতি ব্যবহারও আমাদের ভালো করে জানতে হবে। বাচ্চাদের ঠিকমত অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের পূর্ণ সুযোগ দিতে হলে মাকে সেদিকে যতটা সময় ও মনোযোগ দিতে হবে তার ব্যবস্থা বাড়ীর সবাইকে করে দিতে হবে। এ সবের পরেও কথা আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, এ সব সুবিধা পাবার পরও মায়ের নিজের শৈশবের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসেরও প্রভাব থাকবে মায়ের শিশুর দিকে মনোযোগ দেওয়া—শিশুর হয়ে শিশুর দিকটা দেখা কতখানি সম্ভব—তার উপর। সুতরাং এ সব ব্যবস্থা করার পরও যদি কোনও মা শিশু-পরিচর্য্যায় নিজে আনন্দ না পায়—তবে তাকে নিন্দা না করে তার সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলা দরকার যাতে তার নিজের কী অসুবিধার জন্য সে পারছে না—সেটা সে নিজে বুঝতে পারে এবং সেজন্য সব রকম সাহায্য সে পায়—যাতে অন্ততঃ বাচ্চাদের প্রধান প্রয়োজনগুলি মিটবার মত করে সে তার নিজের ব্যবহার পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জিত করতে পারে।

অনঘা—তাহলে আমরা এ বয়সে যে পর্য্যায়ে পড়ছি সেটা হচ্ছে "বাড়ীর অন্তরা।"

অচলা—আর আমাদের উচিত হচ্ছে মাকে সাহায্য করা যাতে তার ব্যবহারের কোনও প্রতিকূল প্রভাব বাচ্চার পক্ষে ক্ষতিকর না হয়—এই তো ?

অশোকা—আরে ভাই, তারও মুস্কিল আছে। আমি চাইলেই কি আর একালের মায়েরা আমায় তা করতে দেবে ?

অন্তরা—সত্যি,তোমরা হয়তো জানো না—অশোকা তো তার ছেলের বৌকে প্রথম থেকেই বার বারেছে—আর সর্ব্বদা বলেছে 'আমি তোমাদের বাচ্চাদের আয়া' হয়েই থাকতে চাই। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখো—বৌ তো সবসময় তার ছেলেমেয়েদের আগ্‌লে রাখে! পাছে তারা অশোকাকে বেশী ভালোবেসে ফেলে সেই ভয়ে হয়তো।

অরুণা—আমি বলবো যে মায়েরও প্রয়োজন বাচ্চার ভালোবাসা পাওয়া—তাকে তা পেতে দেওয়াই আমাদের কাজ হওয়া উচিত। আমরা বরং চেষ্টা করবো যাতে বাচ্চা

আর তার মায়ের মধ্যে কোন রকম ভালোবাসার অভাব না ঘটে কখনও।

এষা—আর আমি বলবো যে বাচ্চার বাবা হলেন বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ব্যক্তি। তাঁর ব্যবহারের উপরই বাড়ীর আর সবার ব্যবহার নির্ভর করে বেশী। তিনি যদি মায়ের প্রতি সদয় স্নেহ ব্যবহার না করেন তবে মায়ের পক্ষে শিশুর সব প্রয়োজন মিটানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ে—এমন কি অসম্ভবও হতে পারে।

অপ—হ্যাঁ, পরিবারের প্রতিটি পরিজনের পরস্পরের প্রতি এবং বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রীতিবোধ থাকলে, সেই পরিবারের মধ্যে যে আবহাওয়া থাকবে বলে আশা করা যায় সেই আবহাওয়াতেই শিশুর শৈশবের সব প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে।

ইভা—এবার তবে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করার উপায়টা সম্বন্ধে আলোচনা হোক্।

ইন্দিরা—আমি তাই চাই।

চপলা—আমিও।

অপ—তাহলে অশোকা যে প্রশ্নটা এনেছে সে সম্বন্ধে আমরা পরে আরো আলোচনা করবো কেমন? আপাততঃ এই আবহাওয়া সৃষ্টি করার কথাই হোক্—তাতে চপলার প্রশ্নের উত্তরটাও হয়ে যাবে যে সংসারের, সমাজের আসল আর প্রধান উদ্দেশ্যটি কি?

প্রথম থেকেই সুরু করা যাক্। বিবাহ থেকেই সুরু করা ভালো—যদিও বোঝাই যাচ্ছে যে শিশুকাল থেকে বড় হয়ে হয়ে প্রাপ্তবয়স অর্থাৎ বিবাহের বয়স পর্য্যন্ত আসা—তারপর নিজের সন্তানসৃষ্টি ও শিশু-পালনের মধ্য দিয়ে প্রৌঢ়ত্বে পৌছানো এবং বার্দ্ধক্যে জীবন শেষ করা—এ সব যেন একটি বৃত্তাকারেই ঘটে থাকে। বিবাহ থেকে আরম্ভ করলে আমাদের আলোচনার সুবিধে হবে ভেবেই আমি এটা বলছি।

চপলা—আচ্ছা, বিবাহেরই বা কী এমন প্রয়োজন আছে সেটাই তো আমার প্রথমে জানতে ইচ্ছা করে।

ইন্দু—এটা আবার কেমন প্রশ্ন হোল? অনাদিকাল থেকেই সবাই তো জানে, জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ এই তিনটিই মানুষের প্রধান সংস্কার।

কল্পনা—জন্ম আর মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাকৃত হয় না—কিন্তু বিবাহ জিনিষটি মানুষরাই তাদের জীবনে আনা দরকার মনে করেছে বলেই এটাকেও এ'দুটী অবশ্যম্ভাবী সংস্কারের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছে যাতে ও দু'টীর মত বিবাহ জিনিষটীকে সবাই অনিবার্য্যভাবেই নেয় এবং জীবনে পালন করে।

চপলা—সেটাই তো জানতে চাই যে কেন মানুষ এটাকে অনিবার্য্য বলে ধরে নেয় আর চিরকাল নেবে।

অপ—তাহলে আরও একটু গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, 'প্রাণী' বলতে আমরা কি বুঝি?

ইভা—যাদের প্রাণ আছে।

এষা—শুতে হবে না, বলতে হবে প্রাণ থাকার প্রমাণ কি?

ইভা—এই—চলে ফিরে বেড়াতে পারে, খাদ্য গ্রহণ করে, হজম করে, আর বৃদ্ধি পায় আর পরে মারা যায়।

এষা—আরে আসল প্রমাণটাই তো বল্লে না ইভা, যেটা এখানে এখনই দরকার।

ইন্দু—মানে বংশবৃদ্ধি পায়—তাইতো বলতে হবে এষা তোমার মতে? কিন্তু ইভা তো বলেইছে যে "বৃদ্ধি পায়"।

ইলা—আরে সে বৃদ্ধি তো নিজের শরীরটা পুষ্ট হওয়া আর বয়স অনুযায়ী লম্বা চওড়া হওয়া! দুটো জিনিষ সম্পূর্ণ আলাদা।

অপ—ঠিক তাই। তবে এখানে আমরা বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটাই আলোচনা করব। সব প্রাণীদের মধ্যে 'মানব-শিশুর'ই সবচেয়ে বেশীদিন লাগে স্বাবলম্বী হতে।

জয়া—আমি বলবো যে কোনদিনও তারা ঠিক স্বাবলম্বী হয় না। জীবনভোর একে অন্যের মায়াজালে জড়িয়ে থেকেই আনন্দে বাঁচতে চায়।

অপ—ঐ দেখো, জয়া একেবারে গোড়াতেই 'মায়াজাল' নিয়ে এলো! আরে আমি এখানে স্বাবলম্বী মানে—এই অবস্থার কথা বলছি যখন সে তার নিজের শরীর মনের এতখানি পুষ্টতা ও পূর্ণতা লাভ কোরেছে যে তার নিজের বাঁচবার জন্যে তার যা করা প্রয়োজন, করে

জীবন ধারণ করতে সক্ষম। মানব শিশুর এই অবস্থায় আসতে অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে ঢের বেশী সময় লাগে। এর পরে অংসবে জন্মা তোমার ঐ দল বেঁধে সংসারে এবং সমাজে বাস করার ইচ্ছা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা, সেটা মানুষের খুবই দরকার তাদের মনের স্ফূর্তি এবং নিরাপত্তা বোধের জন্যও বটে আবার জীবন-ধারণের একটী মহৎ উদ্দেশ্য থাকার প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্যও বটে!

অরুণা—আর এই সব কারণের জন্যই মানুষের, স্ত্রী পুরুষের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটী স্বয়ম্ভাবী হোলে তাদের শিশুদের সব প্রয়োজন মেটে না। অন্য প্রাণীদের যেমন সাধারণতঃ এক বছরের মধ্যেই শিশু বড় হোয়ে যে যার মত চলে যায়—বাপ মা আবার নতুন কোরে সঙ্গী গ্রহণ, সন্তান পালন করে থাকে, সেরকমটী মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বোলেই বিবাহ জিনিষটার দরকার হোয়েছে।

অতসী—তাছাড়া ঐ যে বল্লে মানুষ সমাজবদ্ধজীব! তারা তাদের বাপ-মা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন পাড়া-পড়শী সব নিয়ে থাকতেই ভালোবাসে। সে জন্যও 'বিবাহ' একটী প্রধান সংস্কার বলেই সারাজীবনে জন্ম ও মৃত্যুর মত একবার হোলেই সবদিক থেকে সুবিধা হয় মানুষের।

উমা—এসব নিয়ে তো অনেক গোড়চন্দ্রিকা হোল—এবার আবার আসল কথায় ফিরে যাওয়া যাক্। সংসারের আবহাওয়াটী কি করে সুষ্ঠু শিশু-পালনের উপযোগী কোরে তোলা যায় সেটাই তো আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিলো!

চপলা—তাতো আসবে, তার আগে এটাও তো বোঝা দরকার যে আজকাল কোন দেশেই 'বিবাহ'কে জীবনে জন্ম মৃত্যুর মত একবারই মাত্র ঘটতে দেওয়া চলবে এতখানি প্রাধান্য দিয়ে রাখা আর সম্ভবই হোচ্ছে না।

কল্পনা—তারও কারণ হোচ্ছে এই যে আমরা অনেকেই সংসারের, সমাজের আসল ও প্রধান উদ্দেশ্যটি ভুলতে বসেছি! সংসারে প্রত্যেকে নিজের কর্ত্তব্য পালন করলে আর এরকমটি হোতে পারতো না!

এষা—আমার একটি কথা মনে পড়ে গেলো। বলেই ফেলি। কোথাও কোথাও এমন সব আলোচনা নাকি হোচ্ছে—যেমন "আপনি কি নিজেকে ভালো স্ত্রী বলে মনে করেন?"

অপ—হ্যাঁ—বিলেতে দেখেছি হামেশাই মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় ওসব বার হয়। কতকগুলি কোয়েশ্চেন থাকে, আর তার উত্তরের ওপর নম্বর দেওয়া থাকে; কত নম্বর পেলে কি ধরের স্বামী বা স্ত্রী বলে নিজেকে ধরা যাবে তাও লেখা থাকে। এরকম আপনি কি নিজেকে ভালো 'বন্ধু', 'সঙ্গী', 'অতিথিপরায়ণ', 'অতিথি' ইত্যাদি বহু রকম গুণের ব্যাপারেও এইসব নম্বর দেবার রীতির বেশ প্রচলন আছে দেখেছি।

এষা—আমার এক বন্ধুর চিঠি পেলাম—সে লিখেছে যে ওখানে টেলিভিশনে সম্প্রতি এরকম একটি আলোচনা-চক্র নাকি দেখানো হোয়েছে আর তাতে প্রথমে 'স্বামী' সম্বন্ধে তার পরে 'স্ত্রী'-সম্বন্ধে আলোচনা হোয়েছে।

ছবি—বলো দেখি শুনি স্ত্রীদের কোন্ কোন্ গুণের জন্য কি রকম নম্বর দেওয়া হোলো?

এষা—শুনবে? তবে শোন চিঠিটি পড়ে শোনাই—

অপ—তোমারা যে আগেই নম্বর দিতে বসলে? প্রথমে বুঝতে চেষ্টা করা ভালো নয় কি—বিবাহ জিনিষটার কোন্ কোন্ বিশেষ উপকারিতার কথা ভেবেই এই 'বিবাহ' জিনিষটি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই প্রচলিত করা হোয়েছে?

উমা—একটি উপকারিতার কথা তো বলা হোয়েই গেছে যে মানব শিশুর বেশীদিন লাগে স্বাবলম্বী হোতে, ততদিন মা-বাবার স্নেহ এবং সাহায্য না পেলে তার দেহমনের সুষ্ঠু বিকাশ হওয়া-আর সুস্থতা বজায় রাখা কঠিন হোয়ে পড়ে; এজন্য মা-বাবা একত্র থেকে তাকে সাহায্য করবে বিবাহিত হবার এটাই প্রধান উপকারিতা; তাইতো?

অপ—হ্যাঁ, সেটা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের কথা হোল; স্বামী এবং স্ত্রীদেরও বিবাহিত থাকতে পারলে অনেক ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক সুবিধা পাওয়া সম্ভব হয়।

অরুণা—তাতো আমরা এমনিতেই বুঝতে পারব—মানুষ তো আর একা একা থাকতে পারে না। আমরা সমাজগত জীব, অনেকের সঙ্গে মিলে মিশেই থাকতে সুখ পাই।

অপ—হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু এই বোঝাপড়ার মধ্যে আনন্দের অবদানটি যেমন আনন্দ দিতে পারে, তেমনই অনেক রকম অস্বস্তিকর অবস্থা ও দুঃখ বেদনাও আনতে পারে। তাই, আমরা 'বিবাহ' বলতে ঠিক কতখানি ব্যাপক একটি ব্যবস্থা করা হয়, সেটাই প্রথমে বুঝতে চেষ্টা কোরব দেখা যাচ্ছে যে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবার থেকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের সৃষ্টি হোচ্ছে। আবার ঐ দুটি পরিবারের মধ্যেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হোচ্ছে। আর এর প্রভাব এই দু'জনের বিবাহের পূর্ণ সফলতা বা সম্পূর্ণ বিফলতা, আর এই দুই অবস্থার-মধ্যকার নানা অবস্থা ও সুখ দুঃখের জন্য দায়ী হোতে পারে। আরও দেখা যায় যে সম্পূর্ণ সফল না হোলেও যদি কতকটাও সফল হয়—তাতেও দুজনেরই অধিকাংশ প্রধান প্রয়োজনগুলি মিটতে পারে। এতে এই দু'জন এবং তাদের দুই পরিবারের সকলে আত্মীয় প্রতিবেশী বন্ধুজনেরাও উপকৃত হয়; তাদের সন্তান-সন্ততি সমাজকে দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। এটিও আমরা বিবাহ জিনিষটির প্রবর্তন ও সংরক্ষণের চেষ্টার অন্যতম প্রধান কারণ বলে নিতে পারি। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। আপাততঃ এই দুজন বিবাহিত জীবনে নিজেরা কতটা সুবিধা নিজেদের দুজনের-কাছে পাবে সেটাই কতকটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

প্রথমেই বলতে হয় যে আমরা যত রকম সম্পর্ক কল্পনা করতে পারি পৃথিবীতে, এদের দু'জনের মধ্যে সেসব সম্পর্কই স্থাপিত হতে পারে; তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব থেকে আরম্ভ করে প্রতিটী সম্পর্কই কমবেশী ঘনিষ্ঠভাবে থাকে।

অরা—সম্পর্ক বলতে যে জিনিষটী আমরা বুঝি সেটা কিন্তু আমাদের কতগুলি প্রয়োজন কয়েকটী অবস্থার মধ্যে মিটাতে পারার জন্যই আমরাই তৈরী করেছি। যেমন ধর আমাদের প্রথম সম্পর্ক তো মায়ের সঙ্গে মাতৃগর্ভে, মাতৃ-ক্রোড়ে। সেই প্রথম সম্পর্ক যে প্রয়োজন সেই প্রথম অবস্থায় মিটাতে পারে আর কারো পক্ষেই তো সে প্রয়োজনটী সে ভাবে মিটানো সম্ভবই নয়। তারপর বাবার সঙ্গে সম্পর্ক, ভাইবোনদের সঙ্গে, পাড়া-পড়শী, স্কুলের সহপাঠী, সহকর্মী—সকলের সঙ্গেই কোন না কোন প্রয়োজন মিটাবারই উপায় নেতে গিয়েই তো আমাদের পরিচয় হয়েছে! তাই নয় কি?

অপ—হ্যাঁ বেশ বলেছ; আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই সব রকমের সম্পর্কই পরস্পরের প্রধান প্রয়োজনগুলি নিশ্চিত ভাবে মিটাবার সবচেয়ে সহজ উপায় বলেই বিবাহের সর্বোত্তম উপকারটীর কথা বলা হয়ে যায়।

ছবি—আশ্চর্য্য! জানো, আমার স্বামী আমাকে বিয়ের পর প্রথমেই এই কথাটাই বলেছিলেন! কিন্তু দেখো, সেটা তাঁর তো শুধু মুখের কথাই। তা না হলে কি তিনি আমাদের বিয়েটা এমন ভাবে ব্যর্থ হতে দিতেন?

মনা—তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের সত্যি একদিন আলোচনা হওয়া দরকার; কি বল?

ছবি—(অন্যমনস্ক ভাবে) কিন্তু কোন জিনিষ সম্বন্ধে জানা আর সেই মত করা তো এক কথা নয়! যাইহোক এ সব কথা পরে হবে'খন। আজ অপরাজিতা যা বলছ বল।

অপ—হ্যাঁ, যদিও সব রকম সম্পর্কই থাকা চলে, তবু স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রয়োজন অনুযায়ী পরস্পরের সঙ্গে এক এক সময় এক একটী সম্পর্ক রচনা করে চলে। তাই স্ত্রী স্বামীর কাছে কখনও বা সখী, কখনও গৃহিণী, বন্ধু, ভগ্নী, কখনও বা মায়ের মত হয়ে নানা সময়ের নানা প্রয়োজন মিটায় এবং অনুরূপভাবে স্বামীও স্ত্রীর প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়। এটি না হতে পারলে অর্থাৎ পরস্পরের বিশেষ প্রয়োজনগুলি এভাবে না মিটাতে পারলে মূল কারণটি যেন ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

ইরা—কিন্তু অনেক সময় তো আমরা দেখে থাকি যে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী যতক্ষণ থাকে বা স্বামীর জন্য যতটা সময় দেয় বা কাজ করে তার চেয়ে অনেক বেশীই পরিবারের আর সকলের সঙ্গে থাকে, তাদের সময় দেয় আর তাদের জন্যই কাজ করে থাকে। অথচ এতে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বা সংসারে কোন রকম অসুবিধা বা বিরক্তির আভাস দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে তো স্বামী বিদেশে চাকরী করে—প্রতি সপ্তাহে বা মাসে, এমন কি বছর দু'বছর বাদেও

একবার দেশে ফেরে স্ত্রীর কাছে এবং কিছুদিন থেকে আবার বিদেশে চলে যায়। তাতেও কারো মধ্যে কোনও অসন্তোষ থাকে না তো?

কল্পনা—তুমি যে প্রশ্নটি আনলে সেটি যেন মনে হয় আমরা কার কাছে কি রকম জিনিষটি আশা করে থাকি, সেইটি পাবার তৃপ্তি বা না-পাবার অতৃপ্তি এসবের মধ্যেই জড়িত আছে। 'বিবাহ-সম্পর্ক' সম্বন্ধেও তো এই রকমই হবে। স্বামী বা স্ত্রী একে অন্যের কাছে আর বিবাহের মাধ্যমে কি কি পেতে আশা করে এবং কি কি সে তাকে নিজেকে দিতে হবে বলে মনে করে তার উপরও তো কতকটা তাদের পাওয়া ও দেওয়া সম্বন্ধে তৃপ্তি-বোধ আর না-পাওয়ার জন্য অতৃপ্তি থাকবে! এই যে সব প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী দেশে থাকে—এরা স্বামীর পরিবার পরিচর্য্যা করে, তাদের স্নেহে ও স্বামীর চিঠিপত্রে, মাঝে মাঝে দেখাশোনা হওয়া—এসবের মধ্যেই তার অতি আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাতে পারছে—আর বিবাহের মাধ্যমে তার বিশেষ কিছু অন্য রকম আশা পূর্ণ করার কামনা কোনদিন করেনি। পৃথিবী তার কাছে যেমন আসে পৃথিবীকে সে তেমন ভাবেই নিতে অভ্যস্ত—সুতরাং যা কিছু তার আয়ত্তে আসে তারই মাধ্যমে সে তার প্রয়োজন সমাজসঙ্গত ভাবে মিটিয়ে ফেলতে পারে। কাজেই অতৃপ্তি বা অসন্তোষের সম্ভাবনা থাকে না।—কি বল জয়া?

জয়া—ঠিক বলেছ। এই ভাবে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলতে পারলে যে জীবন কত সহজ হয়—সুখের হয়, এটাই আমার জীবনে আমি শিখেছি!

চপলা—তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে নিজের প্রয়োজন "তলি" কমাতে কমাতে প্রয়োজন "টুকু" করে ফেলতে হবে, এবং তার পরেও সেই অবশিষ্ট "টুকু"ও যা কিছু না চেয়ে বা সহজে পাওয়া যাচ্ছে তারই মাধ্যমে কোনমতে পূর্ণ করতে বা অপূর্ণতার দুঃখকে অস্বীকার করতে পারলেই জীবন সহজ হবে; কিন্তু সুখের হবে বলো কি করে?

উমা—এ তো সোজা কথা। এই তো শুনলে যে আমরা যে কি পেতে বা করতে আশা করি, তারই উপর "সুখ"-বোধের ব্যাপারটা রয়েছে। ঐ যে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—অর্থাৎ যে যার কর্ত্তব্য কার্য্য করে যাও—তার ফল এই হোক বা ওই হোক এসব আশা করো না—এই শাস্ত্র-বাক্য মেনে চললেই তো হয়ে গেলো। সত্যিই তো আশা না থাকলেই হতাশার দুঃখও নেই—আর ইচ্ছামত ফল পাব কি পাব না এ দুর্ভাবনার যন্ত্রণা নেই—তার জন্য শরীর বা মনের ক্ষতি বা সংসারের অশান্তিরও সম্ভাবনা নেই। আমাদের মধ্যে দেখ যারই আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের তালিকা যত বড়—তারই তত দুঃখ পাবার সম্ভাবনা!!

চপলা—ভালোই বলেছ বটে! তবে জেনে রেখো যে বর্ত্তমানের অনেক দুঃখ কষ্ট সবাই ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা থাকার ফলেই সহ্য করতে পারে। জগতের সব কিছু বড় বড় আবিষ্কারের অনুপ্রেরণাও এই আশা, আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিলো। আর কর্ত্তব্যের কথা বলছো? জেনে রেখো যে কর্ত্তব্য করা তখনই সম্ভব হয় যখন সকলেই সমান ভাবে কর্ত্তব্য পালন করে কর্ত্তব্য পালনকে মর্য্যাদা দেয়। আমি তো দেখি যে কর্ত্তব্য পালনের দায়টি সবলে মেয়েদের উপরই দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে, আর তাতে আমার মনে হয় কোন মেয়েই সুখী হোতো পারে না।

জয়া—অবশ্য সুখী হোতে পারে, তবে সবাই নয়। সকলের "সুখ বোধ"-এর ধারণা বা অনুভূতি তো আর এক হোতে পারে না। এ জিনিষটা আমাদের নিজের নিজের পৃথিবীর সব কিছু সম্বন্ধে মূল্যবোধ-এর ওপরই নির্ভর করে। ছোট বেলায় সে যা দেখেছে, করেছে, শিখেছে তাই থেকেই সে তার নিজের মনে সব কিছু সম্বন্ধে একটি মূল্যায়ন স্থাপন করে নিয়েছে। এটি যদি তার পরবর্ত্তী বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে সাহায্য না করে, তবে তো তার অসুখী হবারই সম্ভাবনা থাকবে।

অশোকা—তার মানে ছোটবেলার চিন্তাধারা যে লাইনে চলবে তার আর নড় চড় হবে না?

জয়া—সাধারণতঃ সেই রকম সম্ভাবনাই বেশী, তবে সেটা তো সম্ভাবনা মাত্র। অর্থাৎ হোতেও পারে, নাও হোতে পারে। আমরা যদি সারাজীবনে যা সব দেখি সে সব

বুঝতে চেষ্টা করার মতো সময় আর শক্তি পাই, আমাদের জীবনে সে সব বুঝবার সুফল প্রয়োগ করার সুযোগ সুবিধা পাই, সবচেয়ে বড় কথা আমাদের মনকে একেবারে শক্ত না কোরে ফেলে আমাদের চারপাশের সবকিছু জানবার বুঝবার সহজ স্বাভাবিক ইচ্ছাটি বজায় রাখতে পারি, তবে তো বয়সের সঙ্গে ক্রমাগত সেই সম্ভাবনাটির রূপান্তর ঘটতে থাকবে। তবু দেখো এতদিনের আলোচনায় এটা তো বোঝাই গেলো যে আমাদের মন যতটা স্বচ্ছন্দ (flexible) থাকলে এসব পুরোপুরি হোতে পারে ততটা স্বচ্ছন্দ থাকে না—কতকগুলি দিকে কতকটা শক্ত হোয়েই পড়ে।

এষা—আমার মতে চপলার কথাগুলি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কর্ত্তব্য পালন করতে চাইলেই সব সংসারে সেটা পালন সম্ভব হয় না, সংসারের অন্য সব পরিজনেরা সব সময় তাতে সহায়তা করে? বরং আমি তো দেখি যে এক ধরণের সংসার এবং পরিজনের সংখ্যাই বেশী সেখানে কর্ত্তব্যপরায়ণতাকে যেন একটি দুর্বলতার মতোই দেখা হয়। সেখানে ছেলেমেয়েদের কর্ত্তব্য পালনের শিক্ষা ছোটবেলা থেকে দিয়ে তারা কর্ত্তব্য পালন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে জেনেই যেন যত রকমে সম্ভব তাতে বাধা সৃষ্টি করেই চলেন তাঁরা। তাতে কর্ত্তব্যপালন কোরছি না এই অপরাধ-বোধ নিয়ে অত্যন্ত মানসিক কষ্টে থাকতে হয়, আর অন্যদের কাছেও নিন্দনীয় হোতে হয়।

চপলা—আবার অনেক সময় তাঁদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য পালনের বেলায় তাঁরা খুবই সচেতন, এমন কি আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত আশা করে থাকেন কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁদের কর্ত্তব্যের বেলায় সেটা তাঁদের চোখেই পড়ে না, বলতে গেলেও বিরক্ত হন, আমাদের 'স্বার্থপর' 'অকৃতজ্ঞ' বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

ইভা—তোমাদের নিজেদের রকম কোন অভিজ্ঞতা আছে নাকি? দুজনে দু'টি উদাহরণ দাও দেখি।

এষা—দিচ্ছি। আমার নিজেরই ছোটবেলার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি। একবার স্কুলের ছুটির সময় আমি আমার মা'র সঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে অনেক দিন মানে সারা গ্রীষ্মের ছুটিটা ছিলাম। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, প্রচুর আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, লিচু ইত্যাদি আমাদের বাগান ভর্ত্তি। মা বোরের অনাবৃষ্টি ও পূর্ণিমায় ভাত খান না। এই রকম এক অনাবৃষ্টির দিনে আমি সকাল থেকেই মাকে বোরবার বলেছি যে তাঁকে আমি লুচি বা রুটি তরকারি তৈরী করে দিই বা তিনি যা বলেন গুছিয়ে দিই, তিনি কখন খাবেন ইত্যাদি। আমার সঙ্গেও মাকে খেতে (তাঁর যা ইচ্ছা) বলেছি আমি কখন কখন খেয়েছি সারাদিনে। কিন্তু তিনি বারবার বলেন যে তাঁর মোটেই খিদে নেই, বিকেলের দিকে তিনি আম, কাঁঠাল, দুধ ইত্যাদি খাবেন। এমনি করে দুপুর গড়িয়ে গেলো, আর তিনি খাবার আগেই তাঁর কাছে তাঁর গ্রামের কজন বন্ধুরা বেড়াতে এলেন। তাঁরা মা সকাল থেকে কিছু বিশেষ খাননি শুনে খুব দুঃখ কোরতে লাগলেন। আমি তো ভয়ানক অপ্রস্তুত বোধ করলাম; বার বার বলতে লাগলাম যে মা যে বল্লেন, মা'র খিদে নেই; নইলে আমি তো খাবার তৈরী করে দিতেই চেয়েছি কতবার। কিন্তু সে কথায় কেউ-ই গুরুত্ব দিলেন না বরং বল্লেন যে, উনি বল্লেন বলেই তুমি কিছু করে দিলেনা? আমি তো মরমে মরে গেলাম, কিন্তু মা আমার হোয়ে তাঁদের একটি কথাও বল্লেন না, বরং সত্যি যেন আমি আমার কর্ত্তব্য করিনি এইভাব নিয়েই যেন রইলেন বলে আমার মনে হোতে লাগলো। এতে আমার এতো দুঃখ হোয়ে ছিলো যে আমি সেকথা আজও ভুলতে পারিনি।

চপলা—এবার আমার উদাহরণটি বলি, কেমন? আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু আমারই সঙ্গে পড়তো। মেয়েটি সুন্দর এবং নম্র ও শান্ত স্বভাবের ছিলো। বি, এ, পাশ করার পরে তার নানা রকম বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগলো। যখন একটি ছেলে তার বন্ধুর দলবল নিয়ে তাকে দেখতে এল, তখনই মেয়েটির এ ছেলেটি সম্বন্ধে কেন ভয়ের ভাব এসেছিলো—অথচ অন্য ছেলেরাও তাদের বন্ধুদের নিয়ে তাকে দেখতে এসেছে—আমাদের দেশে যেমন হয়ে থাকে, তাদের দেখে কিন্তু তার কখনও এমন কিছুই মনে হয় নি। মেয়েটি যখন দেখলো যে বিয়ের কথা এগানেই এগিয়ে যাচ্ছে—তখন একদিন তার মাকে বলেও ছিল যে

এ বিয়েতে তার কোন মতামত নেওয়া হবে না কি? মা বলেছিলেন, তোমার বাবার উপর কথা বলা "উচিত" হবে না কারো। বললে উনি হয়তো রাগে দুঃখে হার্ট ফেল করে মারাই যাবেন। ওখানে কথা দিয়েছেন তিনি। সুতরাং তার বিয়ে ওখানেই হোল। যাইহোক শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে মেয়েটি বুঝলো যে শিশুকাল থেকে সে যা সব 'ভালো' বলে শিখেছে সে সবই এখানে 'বোকামী' বলে ধরা হয়, এবং এদের দরকারী কোন জিনিষ—সে যা কিছু হোকনা কেন—পেতে এরা কোন কাজকেই হীন বা অন্যায় বলে মনে করে না। এ পরিবারের সকলেই তাই প্রথম থেকেই এ মেয়েটিকে 'তালিম' দিতে আরম্ভ করে দিল—তাদের মত করে গড়ে তুলবার জন্য। মেয়েটির নিজ প্রকৃতির জন্যই হোক্ বা তার বয়স কুড়ি বছরের বেশী হবার ফলেই হোক্—সে এসব ঠিক মতো নিজের মনে গ্রহণ করতে পারলো না। অবশ্য কাউকে ঘুণাক্ষরে একথা জানতেও দিলো না। কিছুদিন পরে যখন সে বাপের বাড়ী এলো তখন তার মাকে চুপিচুপি সব বলল। আরও বলল, মা আমায় শ্বশুর-বাড়ী যেতে বল না; ওরা অন্য রকম লোক আমি ওদের মত হতে না পারলে ওরা আমায় মেরেই ফেলে দেবে—আমায় তোমরা আর ফিরে পাবে না।

মা বললেন, সেকি কথা, তুমি শ্বশুর বাড়ী যাবে না সমাজে আমরা মুখ দেখাবো কেমন করে? তোমার বাবাও এটা পছন্দ করবেন না। মেয়েটি তবু বলল, আমি তো আর নিজে গিয়ে এ বিয়ে করিনি, তোমরাই দিয়েছ, ইচ্ছা করে আমার খারাপ বিয়ে দিয়েছ তা নয়, তোমরা ঠকেছ। তা, সেটা স্বীকার করে নিয়েই সমাজে থাকবে। তখন বাবা হার্টফেল করে মারা যাবার সম্ভাবনার কথা ভেবেই তাঁর কথা মেনে চলেছিলাম আমরা—আর এখন যে আমি নিশ্চিত জানি যে আমায় ওরা বাঁচতে দেবে না কারণ এ বয়সে ছোটবেলার সব শিক্ষা (তাও তোমরাই দিয়েছ) ভুলে গিয়ে আমি তো কিছুতেই ওদের মত হতে পারছি না, চেষ্টা করেও দেখেছি—বুঝেছি যে কিছুতেই পারব না, তবু তোমরা, অন্তত তুমি নিজেও আমার দিকটা দেখবে না? আমার উপরও কি তোমার কর্তব্য নেই, শুধু তোমাদের কথা শুনে চলাই আমার কর্তব্য? তার মা বেচারী খুবই বিব্রত হলেন, দুঃখ পেলেন, ভয়ও পেলেন—তারপর তার বাবাকেও সব কথা বললেন। বাবা কিছুতেই সব জিনিষটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। স্ত্রী-কন্যার কোন কথাই শুনলেন না, মেয়েকে যখন নিতে এলো শ্বশুরবাড়ী থেকে তখন তাকে পাঠিয়েই দিলেন। (কেমন ক্লান্তভাবে চুপ করে চপলা)

অরু (রুদ্ধশ্বাসে)—তারপর? তারপর কি হলো?

চপলা—(যেন ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌ল) ও হ্যাঁ। মাস দুয়েক পরে কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে মেয়েটি খুন হল। কে যেন ছোরা মেরেছে দু'তিন জায়গায়। পাড়ার অনেকেই বললে এটা ওদেরই কাজ—কিন্তু কারো বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যায় নি কিছু।

অরু, ইরা, এবা ও ইতা (সমস্বরে)—কি সাংঘাতিক! ওঃ!

অভয়া—হাঁ কাগজে যেন পড়েছিলাম এরকম একটা ব্যাপার।

অশোকা—এ রকম তো কত হয়, কটা আর কে জানে বলো!

কল্পনা—(কতকটা যেন নিরুপায়ভাবে আলোচনার মোড় ঘোরাবার জন্যই) দেখো, পরিবারের আবহাওয়াটি কি রকম হোলে শিশুর মনোবিকাশের উপযোগী হবে সেটাই তো আমরা বুঝতে চাইছি! পরিবারের প্রত্যেকের শৈশবের অভিজ্ঞতার প্রভাব থাকবে এই আবহওয়ায় এটাও বোঝা গেলো। তার সেইসব বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিভিন্ন প্রভাবের মধ্যেই শিশুর পিতামাতাকে শিশুর প্রয়োজন মিটাবার উপযোগী সব ব্যবস্থা করতে হবে এটাও বুঝলাম। এইসব সুষ্ঠুভাবে হোতে পারার একটি উপায়ও পাওয়া গেলো সেটা হোচ্ছে সবকিছু সম্বন্ধেই একটি স্বচ্ছন্দ বা নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী রাখতে হবে, অর্থাৎ একবার একটি জিনিষ একভাবে হোয়েছে বলেই যে সেটি আর কোনদিন অন্যভাবে হোতে পারে না এ রকম অনমনীয় বা শক্ত মনোভাব যত কমিয়ে দেওয়া যায় ততই ভালো।

অরু—সত্যি, আমার জীবনে এভাবে আমি নিজেকে

অনেকবারই অন্য রকম (reorganised) করে ফেলতে বাধ্য হোয়েছি ; তবে সেটা আমার পক্ষে করা সম্ভবও হোয়েছে নানাকারণে, আর তাতেই দেখেছি যে সুখী হওয়া যায়, শান্তি পাওয়া যায়। রবি ঠাকুরের সেই গানটি বারবার নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছি—"এই জনমে ঘটালে মোর জন্মজন্মান্তর"। আরও দেখেছি যে নিজে যতটা শান্ত হোতে পেরেছি, ঐ আবহাওয়াটি তৈরী করা, তাকে সংসারে বজায় রাখাও ততটাই সহজ হোয়েছে। এরই ফলে বুঝতে পেরেছি যে আমরা যাকে 'মন্দ' বলি তা নিছক 'মন্দ' নয়! প্রতিটী মন্দের সঙ্গেই একটি যেন পরিপূরক (compensatory) ভালো দিয়ে ঈশ্বর তাকে সুসম্পূর্ণ কোরেছেন। সংসারে নানা ধরণের নানা পরিজনের মধ্যেও তাই আমি চেষ্টা করে যাই কার কি কি পরিপূরক 'ভালো' আছে সেটাই খুঁজে বার কোরতে। এতে অবশ্য অনেক সময় যাকে 'ভালো' ভেবেছি তার মধ্যেও ঐ পরিপূরক দোষও বার করে ফেলেছি—কিন্তু সেও তো আবিষ্কার! সমগ্র মানুষটিকে জানবার পক্ষে অপরিহার্য্য !! আরও বুঝেছি যে, সব আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হবারও একটি এ রকম পরিপূরক ভালো অবদান আছে—সেটি হোচ্ছে আশাতীত পাওয়া। আমার অনেক আশা যেমন অপূর্ণ রয়ে গেলো তেমনই আমি যেন তার অনেক বেশী অন্য ভাবে পেয়েছি যা কোনদিনই পাবো বলে কল্পনাও করিনি। গীতার কথা বলছিনে না? সত্যি কর্মফলত্যাগ করা যে যায় তা দেখেছি নিজে কর্ত্তে পেরে। প্রার্থনার মধ্যে যে সুন্দর একটি আত্মসমর্পণের উপায় আছে তাতেই যেন আমাদের মনে এমন একটি নমনীয়তা আসে যাতে আমাদের মন তার শক্ত ভাবটি ছেড়ে দিতে পারে। আগে যে মনের সচেতন (conscious) অবচেতন (subconscious) স্তরের বিষয়ে আলোচনা হোয়েছে মনে আছে তো! মনের এই প্রার্থনারত অবস্থাতেই যেন আমাদের চেতনা এই সকল স্তরেই সহজে আনাগোনা করতে পারে ; তাতেই যেন আমরা নিজেকে বুঝতে ও দরকার মতো অন্তভাবে চালিত করতে পারি। আচ্ছা চপলা, তুমি কি প্রার্থনা কর কখনও?

চপলা—কার কাছে প্রার্থনা কোরবো? কোথায় ঈশ্বর?

অশোকা—ঐ তো! বলো, শোননি? ঈশ্বর তোমার মনেই তো।

অপ—এ ভাবে যদিও সংসারের কতগুলি সমস্যা মিটানো যেতে পারে, নিজের মনেও অনেক শান্তিতে থাকা সম্ভব হয়, তবু এ ভাবে তো সংসারের সমস্ত সমস্যারই মীমাংসা করা সম্ভব হয় না তাও তো দেখা গেলো এবার আর চপলার ছুটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে? ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে এই যে সামাজিক পরিবেশটির কথাও আমাদের ভাবতে হবে, শুধু সংসারের পরিবেশটিই ভাবলে চলবে না ; কারণ সমাজের বাউরেই আমরা বেশীদিন বাদ দিয়ে থাকতে পারবো না ; আমার জীবনে না হোক আমার সন্তান সন্ততির জীবনে যে আমাদের সমাজের সর্ব্বস্তরের সঙ্গে একটি যোগসূত্রে মিলতে হবে তাও তো বেশ বোঝা গেলো ঐ সব উদাহরণ দিয়েই। এজন্য আমাদের কাজ আরও ব্যাপকভাবে সমাজের সর্ব্বস্তরেই করা দরকার।

চপলা—এইসব আলোচনায় আরও বোঝা গেলো যে সবকিছু বলা বা করার পরেও একটি জিনিষ থেকে যাচ্ছে সেটা হোচ্ছে সব চেষ্টা সত্ত্বেও এমন দেখা যায় যে দুটি মানুষ (বা সমিতি বা সংসার ইত্যাদি) কিছুতেই মিলেমিশে এক হোয়ে থাকতে পারছে না বা পারবে না, তখন তাদের একটি সমাজসঙ্গত ভাবেই আলাদা হোয়ে গিয়ে নিজে নিজের মত বাঁচা এবং অন্যকে তার মতো বাঁচতে দেওয়াই ভালো এবং সেই ব্যবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে যে ক্ষতির পরিমাণ বা 'মন্দ' দেখা যায় তারই পরিপূরক 'লাভে'র বা 'ভালো' দিকটাও দেখতে পারলেই ভালো হয়।

ছবি—আমি এই বুঝছি যে এসব আলোচনায় সবচেয়ে বড় উপকারিতা হোচ্ছে এই যে আমাদের পক্ষে আমাদের নিজের নিজের জীবনের বড় বড় দুর্যোগের মুখে নিজেরা যেন নিজেকে বুঝে একটি ঠিকমতো সিদ্ধান্তে পৌঁছানর সহজ হয়ে যায়, আমরা আমাদের নিজেদের বা অপরের 'দোষগুণ' বিচার করতে না চেয়ে এটা 'ক্ষমতা বা অক্ষমতা' বলেই বুঝতে পারি, সমগ্র মানুষটাকে গ্রহণ করতে বা বর্জন করতে

পারি। নিজেকেও ঠিক ওই ভাবেই যেন নেওয়াও অনেক খানি সহজ হোয়ে যায়। আজ আমি ভুল করেছি না ঠিক করেছি এই দ্বন্দ্ব থেকে যেন মুক্ত হোয়ে গেলাম।

কল্পনা—তবু দেখো, এটা তো সকলে মানো যে 'জন্মা' যে রকম বলো সে ভাবে অথবা অন্য কোন আরও উন্নত উপায়ে সকলকে নিয়ে সুখী হোয়ে সুখী কোরে জীবনের পথে চলতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হয়?

ছবি—তা মানি। আর সেই সাধনাই তো আমরা সবাই মিলে করবো ঠিক করেই এ কাজে নেমেছি!

বৈজ্ঞানিকের শেষরক্ষা

॥ অধ্যাপক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ॥

(ছ-অঙ্ক নাটিকা)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

[রামধনের ভেতরের দিকের একখানা বড় ঘর। একদিকে সেলফ্, আলমারিতে নানারকম বই ও জার্নাল সাজানো; আর একদিকে একটা টেবিলের উপর হারমনিয়াম, রেডিও রিসিভার, টেপ রেকর্ডার, গ্রামোফোন ইত্যাদি রক্ষিত, মাঝখানে আর একটা টেবিলের উপর নানারকম বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী যন্ত্রপাতির সংগ্রহ]

রামধন—(স্বগতঃ) অমিয়র কাল আসার কথা ছিল। কাল এলো না, আজ এখনও আসছে না কেন? ওর সাথে আবার কতক্ষণ কাটে কে জানে! যাই ততক্ষণ রেডিও রিপেয়ারের কাজটা ধরি।

[রেডিও যন্ত্রটী খুলিয়া ওর একটী নির্ধারণের চেষ্টা]

[কিছুক্ষণ পরেই "রামধন আছ" বলিয়া অমিয়র প্রবেশ, সঙ্গে কমল]

রামধন—কে অমিয়, এসো। এই, কমলও যে। আচ্ছা অমিয়, তুমি বসো। কমলের সাথে দুটো কথা বলে নেই।

কমল—কথা বলবেন, না বকুনি দেবেন?

রামধন—প্রশংসা ও তিরস্কার দুটোই পাবে। প্রথমেই তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছি যে তুমি সেদিন বিকাশদের ক্লাবে আলোচনাচক্রে হেরে যাওনি। কিন্তু তুমি কবিদের ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক অনধিকার চর্চা করেছো। এটা মোটেই ভাল করোনি। বিজ্ঞানকে বড় করে দেখানোর জন্য সাহিত্য ও কাব্যকে ছোট ও সস্তা করার প্রচেষ্টা আমি কখনও পছন্দ করিনে।

কমল—একটু বেশী ইনস্পায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলুম। যাক্ ভবিষ্যতে সংযম ও সীমা রক্ষা করে চলবো। আমি তাহলে চললাম।

[কমলের নিষ্ক্রমণ]

অমিয়—কমলের দোষ কি রামধন? তুমি তো ওদের মাথায় ছিট ধরিয়ে দিয়েছো।

রামধন—ছিট জন্মগত, ও কেউ ধরিয়ে দিতে পারে না, অমিয়।

অমিয়—আচ্ছা রামধন, এম. এসসি পাশ করেছিস্। স্বাস্থ্য আছে, অর্থ সম্পদও আছে। অথচ একটানা এক-দিকে চলছিস। কোন বৈচিত্র্য কি আনবি না জীবনটাতে?

রামধন—প্রকৃতির নিয়মের কি কোন ব্যতিক্রম হয়েছে তাতে।

অমিয়—এখানেও আবার প্রকৃতির নিয়ম এনে ফেললি?

রামধন—ফেলবো না? এ তো স্যের নিউটনের গতির প্রথম নিয়ম। কোন বস্তু স্থির থাকলে স্থিরই থাকবে, গতিশীল হলে সোজা সরল রেখাতেই চলতে থাকবে যদি না বাইরের কোন ফোর্স বা বল ঐ স্থির অথবা সচল অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় অর্থাৎ এভরি বডি কন্টিনিউজ ইন্ ইটস্ ষ্টেট অফ্ রেষ্ট অর্ ইউনিফর্ম মোশন ইন্ ষ্ট্রেট লাইন আনলেস ইট্ ইজ কমপেল্ড বাই সাম্ একস্টার্নাল ইম্প্রেসড ফোর্স টু চেঞ্জ ষ্টাট ষ্টেট অফ রেষ্ট অর্ ইউনিফর্ম মোশন ইন্ এ ষ্ট্রেট লাইন্। টেবিলের উপর যে বইখানা রয়েছে তার নিজের কোন শক্তি নেই যে আপনা থেকে কোথাও চলে যাবে, তেমনি মাটিতে বা মেঝেতে গড়িয়ে দেওয়া বলটার নিজের কোন সাধ্যি নেই যে থেমে যাবে। মাটির ঘর্ষণের প্রতিরোধ বলই ওকে থামিয়ে দেয়। বলটা সোজা ঊর্ধ্ব আকাশে ছুঁড়ে দিলে ওটা অনন্তকাল আকাশ ভেদ করে ঊর্ধ্বে চলে যেতো, কিন্তু পৃথিবীর মহাকর্ষ ওকে আবার নীচে মাটির দিকে টেনে আনছে। জড়বস্তুর এই ধর্মই তো জড়ত্ব বা ইনারসিয়া।

অমিয়—এ সব তো নূতন করে জানবার নেই, সবই জানি। কিন্তু এর সাথে তোর মনের ইচ্ছার সম্পর্ক কি?

রামধন—মনের ইচ্ছারও ঐ ইনারসিয়া ধর্মটি আছে। তুমি তোমার শিক্ষা, পরিবেশ ও সংস্কারের প্রভাবে ভাল মন্দ নিরপেক্ষ যেমনি আছো, তেমনি থাকবে। যতক্ষণে বাইরের কোন্ আকর্ষণবল তোমার মনের ইচ্ছা বদলে না দেয়। অর্থাৎ, এ ম্যান্ উইল্ কন্টিনিউ টু বি গুড্ ব্যাড অর্ ইন্ডিফারেন্ট্ আনলেস্ হি ইজ্ ইন্ফ্লুয়েনস্ড বাই সাম একস্টারনাল ইনফ্লুয়েন্স টু বিকাম্ আদারওয়াইজ।

অমিয়—তা হলে তুমি বলতে চাও প্রাকৃতিক নিয়ম গুলো শুধু matter বা জড়বস্তু নিয়ে নয়, মনের ক্ষেত্রেও তার প্রয়োগ আছে?

রামধন—বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাই-ই।

অমিয়—তা হলে মনের নিষ্ক্রিয়তা fatalism বা অদৃষ্টবাদেরই সামিল। মানুষের নিজের ইচ্ছায় কিছু করার ক্ষমতা নেই, বাইরের শত সহস্র প্রভাবের সে অধীন।

রামধন—ইজম্ টিজম্ বুঝিনে। পরিষ্কার প্রাঞ্জল প্রাকৃতিক নিয়মটাকেই আমি বড় স্থান দিতে চাই।

অমিয়—আচ্ছা, তোর জীবনটা এ ভাবেই কাটিয়ে দিতে পারবি? মিটিং করে, ক্লাব করে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করে মূল্যবান সময় নষ্ট করবি। কোন দায় দায়িত্বের কাজই মাথায় নিবি না।

রামধন—এ প্রশ্ন তোমার নিরর্থক, অমিয়। আমি যে মূল নিয়মের কথা বললুম তারপরে তোমার এ প্রশ্ন অবান্তর নয় কি? তবে একটা কথা মনে রেখো। আমি তোমাদের দশজনের মতই মানুষ। তোমাদেরই মত আমার জীবনেও নানা phase বা অবস্থা থাকে।

অমিয়—না, তোর সাথে পুরো ডগ্মেটিক না হলে পেরে উঠবো না। [ক্ষণকাল পরে] হ্যাঁ, কাল মনটা ভাল ছিল না বলে তোর কাছে আসতে পারিনি; সে কথা এখানে এসেই তোকে বলার সুযোগ হয় নি।

রামধন—মন খারাপ হয়েছিল কেন?

অমিয়—একজন লোককে একটা কড়া কথা বলেছিলুম।

রামধন—ঠিকই হয়েছে।

অমিয়—কি ঠিক হোলো! এখানেও কোন নিয়মের আভাস পেলি নাকি?

রামধন—নিশ্চয়ই। নিউটনের এটা তৃতীয় নিয়ম, নয় কি? এভরি একশন্ হ্যাজ এ্যান্ ইকোয়াল এণ্ড অপজিট রিএ্যাকশন। অর্থাৎ ক্রিয়ামাত্রের প্রতিক্রিয়া থাকবে। তুমি যদি কাউকে কড়া কথা বলো বা কটূক্তি করো তবে তার প্রতিক্রিয়া থেকে অব্যাহতি নেই। তুমি যাকে কটূক্তি করবে তার মন যদি তোমার চেয়ে সবল হয় তবে প্রতিক্রিয়ার ফলে তোমার মানসিক বিপর্য্যয় হবে বেশী। ছোট একটা বল একটা বড় বলের সাথে ধাক্কা খেলে কি হয় তো জানো। বড় বলটা ধাক্কা খেয়েও স্থির থাকে, কিন্তু ছোট বলটা আবার বেগে উল্টো দিকে ফিরে আসে। কটূক্তি কাউকে না করাই ভালো। যদি কর্তেই হয় নিজের মনটাকে সবল করে নিতে হবে।

অমিয়—রামধন, সত্যি তুই কথার এত মায়াজাল সৃষ্টি করতে পারিস যে তোর কাছে এলে সব যুক্তি সব দৃঢ়তা দুর্বল হয়ে যায়।

রামধন—এতে জীবন যাত্রার পক্ষে কোন অন্তরায় আসে না তো? তবে আর কি? দুনিয়ায় যারা কর্মব্যস্ত মানুষ তারা কি আর এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়! আমি যে এ সব কথা বলি, সেজন্য কত লোকে আমাকে কত কি বলে! আমি তাতে কান দেই না, বা গায়ে মাখি না!

অমিয়—সবই তো ভাল কথা। কিন্তু একটা কথা শুনে উদ্বেগ বোধ করছি। তুই নাকি শৈলগিরির এ জায়গা ছেড়ে কোথায় চলে যাবি?

রামধন—ভবিষ্যতের কথা কি করে বলি? তবে অসম্ভব কিছু নয় বলা চলে।

অমিয়—তুই গেলে সঙ্ঘ কে দেখবে?

রামধন—একটা লোকের অভাবেই যদি কোন জনপ্রতিষ্ঠান না টেকে তবে সে প্রতিষ্ঠান থেকেই বা কি লাভ! আর সঙ্ঘ টিকবেই না কেন যদি সবাই একটা আদর্শ ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করে যায়? সদস্যদের ভেতরে স্বার্থপরতা, অন্যায় জিদ ও নেতৃত্বের মোহ থাকলে এ সব জনপ্রতিষ্ঠান কোন কালেই বাঁচতে পারে না।

অমিয়—ঠিক বলেছিস ভাই। আপাতত এখান থেকে তোর কোথায়ও যাওয়ার কোন প্রোগ্রাম নেই তো?

রামধন—স্যার, অমিয়, ভাবছিলাম কাউকে জানাবোনা। আমার দিন পনেরো পরে বাইরে যেতে হবে আমার এক প্রাক্তন অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপকের কাছে। ওর পরিবারে আর কেউ নেই, একমাত্র বিদুষী ভক্তিমতী পালিতা কন্যা ছাড়া। আমার ইচ্ছা মাস করেক অধ্যাপকের সান্নিধ্যে থেকে চলে আসবো।

অমিয়—খুব ভাল কথা। তা হলে আমাদের সঙ্ঘটাকে এ কয়দিনে রি-অরগানাইজ ও পাকাপোক্ত করে যা, যাতে তোর সাময়িক অবর্তমানে এটা ভেঙে না পরে।

রামধন—পরশু দিন একটা ঘরোয়া মিটিংয়ে আলোচনা করে সব ঠিক করা যাবে। তুই সদস্যদের জানাবার ব্যবস্থা করিস।

অমিয়—ঠিক আছে, তাই চললাম। [অমিয়ের নিষ্ক্রমণ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—১ম দৃশ্য

[অধ্যাপক সুরজিত বাবুর ড্রইংরুম, সুরজিত বাবু একটা চেয়ারে উপবিষ্ট হয়ে খেলার পড়ায় লিপ্ত আছেন। সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিল, আরও সামনের বিস্তৃত জায়গায় গোল কয়েক চেয়ার]

রামধন—স্যার, ভেতরে আসতে পারি?

সুরজিত—ইয়েস্, কাম ইন্।

[রামধনের প্রবেশ ও অধ্যাপককে পা ছুঁয়ে প্রণাম, অতঃপর অধ্যাপকের নির্দেশে একটা চেয়ারে উপবিষ্ট হয়ে]

রামধন—আমায় চিনতে পেরেছেন স্যার?

সুরজিত—তোমাকে ভুলে যাবো, সে কি কথা রামধন? সমন্বয় মাসিক পত্রিকায় তোমার লেখা আলোচনা, প্রবন্ধ আমি সাগ্রহে নিয়মিতভাবে পড়ে থাকি। কোন কোন ক্ষেত্রে মত-পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিক ভাবে তোমার বক্তব্য আমার ভালই লাগে। এখানে কতদিন থাকবে ঠিক করেছো?

রামধন—কিছু ঠিক নেই স্যার। এখানে মন বসলে এখানেই বেশ কিছুদিন থাকার সংকল্প আছে।

সুরজিত—(ক্ষণকাল ভেবে) খুব ভাল কথা রামধন। তুমি তো বিয়ে করোনি রামধন?

রামধন—না স্যার। আমার তো কেউ নেই যে বিয়ের চেষ্টা করবে। আর নিজের বিয়ের চেষ্টা নিজের করতে কোন উৎসাহ পাইনে।

সুরজিত—কি রকম মেয়ে তুমি পছন্দ করো?

রামধন—স্বাস্থ্য, উচ্চশিক্ষা ও বুদ্ধি থাকলেই হোলো। অন্য কোন দাবী নেই, স্যার।

সুরজিত—একটি মেয়ে আছে যে তোমার তিনটে দাবীই পূরণ করতে পারে। রং চেহারাও খারাপ নয়। ওর সাথে আলাপ পরিচয় করে দেখো। যদি মেয়েটির শিক্ষা দীক্ষা সব কিছু সামগ্রিকভাবে তোমার মনকে টানতে পারে তবে তুমি ওকে তোমার সহধর্মিণী ও সহকর্মিণীরূপে গ্রহণ করতে পারো।

রামধন—মেয়েটি কে, কোথায় থাকে, স্যার?

সুরজিত—মেয়েটি আমার অকৃত্রিম বন্ধু এডভোকেট

সলিল চৌধুরীর কন্যা। মেয়েটির নাম অমলা। একমাত্র সন্তান অমলাকে দশ বছর বয়সের রেখে ওর মা অসুখে ভুগে মারা যান। বন্ধু সলিল আর বিবাহ করেন না। কলকেতে, মিশনারী স্কুলে লেখাপড়া করে অমলা বি, এস, সি পাশ করে। তার পরে স্থানীয় একটা মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে। স্কুলের একটা আলাদা কোয়ার্টারে ও থাকে। বাবার রেখে যাওয়া বাড়ীর এক অংশে ভাড়াটেরা থাকে। বাকী অংশ লক-আপ করা অবস্থায় আছে।

রামধন—সলিল বাবুর বাড়ীখানা কোথায়, স্যার ?

সুরজিত—এই সহরেরই উপকণ্ঠে নিজের তৈরী করা বাড়ীতে থাকতেন। উনি আর জীবিত নেই। গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে ওর বাড়ীতে আমি যাই। সে বছর দুই আগের কথা। মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে সলিল আমাকে অনুরোধ করেছিল তার কন্যা অমলার সব ভার তার মৃত্যুর পরে আমি যেন গ্রহণ করি। পরলোক-যাত্রী বন্ধুর শেষ অনুরোধ রক্ষার প্রতিশ্রুতি আমি সানন্দে দান করি। বন্ধু কয়েক দিন পরেই শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তারপর থেকেই অমলার অভিভাবকত্ব আমার উপর বর্তায়। [ক্ষণকাল ভেবে] হ্যাঁ দেখো রামধন, আজ মঙ্গলবার, আসছে শনিবার অমলা আমার এখানে আসবে ও দিন দুই থাকবে। তুমি ঐ সময় এসে ওর সাথে আলাপ পরিচয় করতে পারো।

রামধন—আপনার ইচ্ছামতই হবে, স্যার।

[জনৈক যুবকের প্রবেশ]

প্রণব—স্যার ভেতরে আসতে পারি ?

সুরজিত—ইয়েস্, কাম ইন্। [প্রণবের প্রবেশান্তে] এই যে প্রণব, কি খবর ?

প্রণব—[হাত জোড় করে নমস্কার জ্ঞাপন করে] স্যার, আজ বুধবার। আসছে রবিবার আমাদের বিজ্ঞান সমিতির মাসিক আলোচনা-চক্র সন্ধ্যে সিক্সের ওটা থেকে। আপনি যদি সম্ভব হয় যাবেন দয়া করে।

সুরজিত—এ রবিবার আমার যোগ দেওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। (ক্ষণকাল ভেবে) প্রণব, আগে এর সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই। তার পর তোমাকে একটা অনুরোধ করবো। (রামধনকে দেখাইয়া) এ আমার প্রাক্তন ছাত্র রামধন। ও বিজ্ঞান তো জানেই, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সব কিছু চিন্তা করে এবং তা ভাষায় প্রকাশ করারও একটা অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে। [প্রণবের যুক্ত করে নমস্কার]

রামধন—স্যার, ওর [প্রণবকে লক্ষ্য করিয়া] পরিচয় তো দেলাম না। ঘুরজিত হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা ভুল হয়ে গেছে। ওর নাম প্রণব বক্সী। দর্শনে এম, এ পাশ করে অধ্যাপনা করছে। এই জায়গারই স্থায়ী বাসিন্দা। [রামধনের যুক্তকরে নমস্কার]

প্রণব—আপনার অনুরোধটা কি এবারে বলুন স্যার।

সুরজিত—ভাবো, রামধন আসছে রবিবার তোমাদের আলোচনা-চক্রে যাবে এবং আলোচনায় সক্রিয় অংশ নেবে। রামধন, তোমার আপত্তি নেই তো ?

রামধন—আপনার, আজ্ঞা শিরোধার্য্য করলাম।

প্রণব—আচ্ছা, এবার তাহলে যাই স্যার। নমস্কার [যুক্ত করে]। হ্যাঁ রবিবার আমি নিজে এসে রামধনবাবুকে রিটিএ নিয়ে যাবো।

রামধন—আমিও এখন যাই, স্যার। কাল আবার আসবো। [পা ছুঁয়ে প্রণাম]

সুরজিত—এসো, এসো।

[রামধন ও প্রণবের নিষ্ক্রমণ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—বিজ্ঞানসমিতির সভাকক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ ৬টা। সদস্যগণ ও নিয়মিত শ্রোতাদের অনেকেই উপস্থিত। রামধন প্রণবের সহিত একটু আগেই আসে]

সমিতির সভাপতি—আমাদের আলোচনা-চক্রে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মননশীল বক্তা রামধনবাবু এসেছেন আমাদের আমন্ত্রণ চিঠি পেয়ে। এর মোটামুটি পরিচয় আপনাদের একটু আগেই দেওয়া হয়েছে। আমাদের সমিতির উপদেষ্টাদের ইচ্ছা আজ রামধনবাবু আলোচনা-চক্র পরিচালনা করুন।

জনৈক সভ্য—আমি এ প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করলাম।

অপর এক সদস্য—বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভগবান সম্বন্ধে উনি কিছু বলুন।

রামধন—ভগবান সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভগবান আছেন বলে মেনে নেওয়া। ভগবান নেই বল্লে কোন হাঙ্গামা থাকে না। ভগবান আছেন বল্লে তখনই প্রশ্ন উঠবে তাঁকে দেখা যায় কিনা। চোখ দিয়ে আমরা দেখি। কিন্তু চোখের দেখার শক্তি সীমাবদ্ধ। স্থূল জিনিষ অনেক কিছু আমরা চোখ দিয়ে দেখি। বাতাস ও বাতাসের মত অনেক গ্যাস চোখে দেখা যায় না। তাদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দেখে ওদের অস্তিত্ব স্বীকার করি। রোগজীবাণু দেখতে হলে চাই অনুবীক্ষণ মাইক্রোস্কোপ। পদার্থের অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন্ ইত্যাদি এত সূক্ষ্ম যে চোখে দেখার কথা ভাবাই যায় না। বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে এদের বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছি আমরা। কাজেই কোন কিছু চোখ দিয়ে দেখা না গেলেই তার অস্তিত্ব নেই একথা যুক্তিসহ নয়। শব্দের অস্তিত্ব কান দিয়ে, গন্ধের অস্তিত্ব নাক দিয়ে আমরা জানতে পারি। আমার ভাষণের মাঝখানে আপনাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই।

অনেক সদস্য—বেশ তো, কি আপনার প্রশ্ন বলুন।

রামধন—আচ্ছা আমরা এই যে ঘরে বসে আছি, বলতে পারেন ইন্দ্রিয়দ্বারা জানা যায় না এমন কি কোন জিনিষ আছে এর ভেতরে?

অনেক সদস্য—কেন? বাতাস, রোগজীবাণু, ধূলিকণা এ সব আছে।

রামধন—আর কিছু নেই? ধরুন, গান বাজনা, কথা চীৎকার, কান্না, হাসি?

অনেক সদস্য—কিছু বুঝতে পারছি না।

[অন্যান্য সদস্য ও শ্রোতারা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চায়ী করবে।]

রামধন—দেখুন এ ঘরে নানা দেশের বেতার তরঙ্গ বিদ্যমান আছে। একটি রেডিও রিসিভার টেবিলের উপর ফিট করে রাখুন, এই ঘরখানি গানে কথায় বা বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠবে। নিস্তব্ধ ঘরখানা গমগম করে উঠবে।

এখন আমি আসল কথায় আসছি। একাগ্র মন না থাকলে বিজ্ঞান বলুন, সাহিত্য, কবিতা বলুন কোনটারই সাধনা হয় না। ভগবানের অস্তিত্ব বুঝতে হলে শুধু একাগ্র মন হলেই হবে না। পৃথিবীর সমস্ত চিন্তা ভাবনা কামনাশূন্য মন হওয়া চাই। যারা এরূপ মনের অধিকারী তারাই ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, ভগবানের ঐশ্বর্য সম্পন্ন ঐ মূর্তির প্রতিবিম্ব মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। সম্ভবত এই হোলো ভগবানকে দেখার প্রকৃত অর্থ। বিজ্ঞানের দিক থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভক্ত, সন্ন্যাসী যারা তারা অবশ্য হয়ত শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত ইত্যাদি তত্ত্বদ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন বা করছেন। আপনারা সকলেই শিক্ষিত ও জ্ঞানী। আমি আপনাদের সামনে চিন্তা করার একটা নূতন দিক খুলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম মাত্র। এখন আপনারা নূতন দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে নিজেরা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন।

সভাপতি—রামধনবাবু, আপনার প্রথম আলোচনা আমরা সাগ্রহে শুনলাম এবং এ আলোচনায় আমরা উপকৃতও হলাম। আপনি এবার দ্বিতীয় আলোচনা করুন বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন এদের সমন্বয় নিয়ে।

রামধন—আপনারা জানেন দুটী সমান্তরাল রেখা কখনও পরস্পরকে কাটাকাটি করে না। অঙ্কের ভাষায় এরা বহুদূরে অর্থাৎ ইনফিনিটিতে গিয়ে মিলিত হয়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কেও একই কথা। এরা প্রত্যেকে একটা সমান্তরাল রেখায় চলছে। কেউ কাউকে কাটাকাটি করে না, অর্থাৎ কারোর সাথে কারোর বিরোধ নেই। কিন্তু সব কটি গিয়ে মিশেছে অনন্তে। এই অনন্তকে আমরা আমাদের মনের অবস্থানুযায়ী পরম লক্ষ্য বলে কিছু ভাবতে পারি। কাজেই অল রোড্স লিড টু রোমের সদৃশ উক্তি হিসাবে বলা যায় অল রোড্স্ লিড টু ইনফিনিটি। ইনফিনিটি হলো অদৃশ্য, অব্যক্ত একটা পরম সত্তা।

অনেক সদস্য—রামধনবাবু, অল্প কথায় একটি কঠিন জিনিষ আপনি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। খুব ভাল

লাগলো আপনার দ্বিতীয় আলোচনা।

সভাপতি—রামধনবাবু, অনেকেই বলেন মানুষ ভোগে নয়, ত্যাগেই কীর্তিমান হন। এর একটা বৈজ্ঞানিক উপমা দেখিয়ে তৃতীয় এবং শেষ বক্তব্য রাখুন।

রামধন—বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে সুন্দর একটি উপমা তুলে ধরেছেন। আমি সেটাই সংক্ষেপে বলবো।

সূর্য্যের আলোতে লাল হলুদ নীল সবুজ বেগুনি ইত্যাদি ৭টা রং আছে। সূর্য্যের আলো যখন লাল জবার উপর পড়ে তখন জবা ফুলটি লাল রংটা ত্যাগ করে বাকীগুলো শোষণ করে। তাই জবা ফুল দেখতে লাল। নীল শাড়িখানা সূর্য্যের সব বাকী রংগুলো শোষণ করে নীল রংটা ছেড়ে দেয়, তাই সে দেখতে নীল। এ রকম যে জিনিষ সূর্য্যের যে রংটা ছেড়ে দেয় সেই রংটাই হোলো জিনিষটির রূপের নিশানা। ছেড়ে দেওয়া হোলো ত্যাগ, আর শুষে নেওয়া হলো ভোগ। কাজেই ফুলের কীর্তি তার ত্যাগে, ভোগে নয়। মানুষের বেলাও তাই।

সভাপতি—উপমাটী খুব সুন্দর। আজ সভার এখানেই পরিসমাপ্তি। আমি আমার নিজের এবং উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে রামধনবাবুকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একখানা ভক্তিমূলক সঙ্গীতের পর সভা ভেঙ্গে যাবে। [রবীন্দ্রনাথের "এই বিশ্বনাথে যেখানে যা সাজে···" এই গানখানি গীত হবে।]

[দৃশ্য শেষ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

[বছর তিনেক পরে—স্থান—বিজ্ঞান-সংস্কৃতিসংঘ-গৃহ সময় অপরাহ্ণ]

সৌমেনবাবু—শেষকালে বিজ্ঞান-সংস্কৃতিসঙ্ঘ এমনি করে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এ বড় পরিতাপের বিষয় বিকাশবাবু। রামধনবাবু তিন বছর হোলো এ জায়গা থেকে চলে গেছেন। তারপর থেকে ওর কোন খবর আমি পাইনি।

কমল—এখান থেকে যাওয়ার মাস ছয় পরে রামধনবাবুর একখানা চিঠি পেয়েছিলাম তাতে উনি বিবাহ করেছেন বলে জানিয়েছিলেন। তাঁর বিবাহের খবরটা কাউকে না জানানোর নির্দেশও ছিল ঐ চিঠিতে।

বিকাশ—আমাকেও একখানা চিঠিতে বছর খানেক আগে লিখেছিলো ও নানা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে। সুযোগ সুবিধা পেলে এখানে একবার আসবে। তারপর থেকে ওর কোন পাত্তা নেই।

অমিয়—আমাদের কেউ কেউ আগেই বলেছিলেন, রামধনবাবু একজন খেয়ালী মাগপাটে লোক। ঘরের টাকা পয়সা খুব ব্যয় কর্ত্তেন বলে সংঘটা চলছিলো। কিন্তু সময় সময় ওর বিজ্ঞান-ব্যাখ্যা আমাদের ভারী অতিষ্ঠ করে তুলতো। এখন দেখছেন তো সব ছেড়ে ছুঁড়ে রামধনবাবু বিয়ে করে পাক্কা সংসারী হয়ে পড়েছেন।

কমল—আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে দিন সাতেক আগে একটা খবর পেয়েছি। খবরটার উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়ার আগ্রহ বোধ না করায় চেপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

বিকাশ—কি খবর কমল?

কমল—তিনি নাকি বেশ কিছুদিন হোলো সন্ন্যাসী হয়েছেন এবং ৪।৫ দিনের মধ্যে এখানে আসবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হয়ত গতকাল এ জায়গায় এসেও পড়েছেন।

সৌমেনবাবু—প্রথমে বিয়ে, তারপরে সন্ন্যাস গ্রহণ, কিছুই বুঝতে পারছিনে। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

[ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায় বলতে বলতে রামধন সংঘ-গৃহের প্রবেশ দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াবে। ২।৩ জন সদস্য একসঙ্গে বলে উঠবে এই যে রামধনবাবু, আসুন। রামধনের গৃহমধ্যে প্রবেশ। চেয়ারে উপবিষ্ট হয়ে]

রামধন—এখানে দেখছি আপনারা সকলেই আছেন। খুব খুশী হলাম। (এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া) অমিয়কে দেখছি না যে।

অমিয়—Welcome রামধন। আমি এই কোণার দিকে রয়েছি। প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে গেল যে।

রামধন—মোটেই তা হয়নি। সেকথা বলার জন্যই আমার এখানে আসা। নূতন জায়গায় গিয়ে মাস কয়েক কেটে যায় একই কার্যক্রম নিয়ে এখানে যেমন ছিল। তার

পরে আমার প্রাক্তন অধ্যাপক প্রভাত ভট্টর লাহিড়ীর একান্ত অনুরোধে নির্বাচনা শিক্ষিতা একটি মেয়েকে দেখে এবং ওর সাথে মিশে ওর প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে ওকে বিয়ে করতে রাজী হই। বিয়ে করার পরে আমার সোজা সরল পথে চলা বন্ধ হলো। স্ত্রীর আকর্ষণ-বলে আমাকে সংসার-বৃত্তে ঘোরাতে আরম্ভ করলো, পৃথিবী যেমন সূর্য্যের আকর্ষণে তার চারদিকে আবর্তন করে চলছে। সূর্য্যের চারদিকে যে পৃথিবী ঘোরে তার ভেতর যে দুটো বিপরীত বল ক্রিয়াশীল থাকে তা হয়ত আপনারা অনেকেই জানেন।

বিকাশ—জানলেও তোমার মুখে নূতন করে শুনলে আমরা খুশী হবো, রামধন।

রামধন—সূর্য্যের পৃথিবীর উপর একটা কেন্দ্রাভিমুখী টান বা আকর্ষণ-বল আছে। এর জন্যই পৃথিবী বৃত্তপথে ঘুরতে বাধ্য হয়। এই বলের নাম সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স বা অভিকেন্দ্রিক বল। আবার পৃথিবীর উপর একটা কেন্দ্র-বিপরীতমুখী বল আছে যার নাম সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স বা অপকেন্দ্রিক বল। এই বলের জন্য পৃথিবী সূর্য্য থেকে সরে যেতে চায়। যে কোন ঘূর্ণায়মান জিনিষের উপর অভিকেন্দ্রিক ও অপকেন্দ্রিক বলের যুগপৎ প্রভাব চলছে।

সৌমেনবাবু—এর সাথে আপনার জীবনের পরিবর্ত্তনের মিল কোথায় দেখিয়ে দিন।

রামধন—হ্যাঁ, সেই কথায়ই এখন আসবো। স্ত্রীর আকর্ষণের সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স বা অভিকেন্দ্রিক বল আমাকে আটকে রাখলো সংসার-বৃত্তে। নিজের ইচ্ছা ও অভিরুচির সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স বা অপকেন্দ্রিক বলের দরুণ ছিটকে পড়তে পারলুম না।

অনিমেষ—এখানে তোমার কথায় একটু ব্রেক টানো রামধন। একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

রামধন—কি জিজ্ঞেস করতে চাও, বলো।

অনিমেষ—সংসার-বৃত্তে আবর্তনের সময় তোমার যে নূতন অনুভূতি হোলো তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরো।

রামধন—একটা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা দিয়ে আরম্ভ করা যাক। ধরুন আমি বাঁ হাত দিয়ে হাত তিনেক লম্বা সোজা ও সরু বাঁশের টুকরার নীচের প্রান্ত ধরে টুকরা টাকে উর্দ্ধাধঃ ভাবে অর্থাৎ ভার্টিকাল পজিশনে রাখলুম উপরে প্রান্ত দিয়ে যদি একটা লোহা বা তামার রিং ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে রিংটির কি অবস্থা হবে? আপনার অভিজ্ঞতা থেকে জানেন রিংটী বাঁশের টুকরা বরাবর পৃথিবীর মহাকর্ষের জন্য নেমে এসে বা হাত স্পর্শ করে থেমে যাবে আশাকরি এ সিদ্ধান্ত সবাই গ্রহণ করলেন।

অনেক সদস্য—নিশ্চয়ই।

রামধন—এইবার মনে করুন বাঁশের টুকরাটির এক প্রান্ত হাতে ধরে বেশ একটু জোর করে লোহা বা তামার রিংটী ওর ভেতর দিয়ে গলিয়ে ঐ প্রান্তের কাছাকাছি জায়গায় রাখা হোলো। এখন নীচের প্রান্ত ডান হাত দিয়ে ধরে বাঁশের টুকরাটী ঘোরালে রিংটাও উপরের প্রান্তের কাছাকাছি জায়গায় অবস্থান করে ঘুরতে থাকবে। মহাকর্ষের জন্য নীচে নেমে আসবে না। সূত্রে ঘুরন্ত যে কোন জিনিষ পৃথিবীর মহাকর্ষকে এভাবে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এখন আসল কথায় আসা যাক্। বিয়ে করে মানুষ যখন সংসার-বৃত্তে ঘোরে, তখন সে পার্থিব আকর্ষণ ও প্রলোভন এড়িয়ে চলার কমবেশী ক্ষমতা অর্জন করে। তার মানে এই, বিয়ে যারা করে তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৈতিক বা সামাজিক পতনের ভয় কম থাকে।

সৌমেন বাবু—আপনার এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিসহ না হলেও বেশ গ্রহণীয়। এবারে সন্ন্যাস গ্রহণের কথায় আসুন।

রামধন—সুখে-শান্তিতে দু'বছর বিবাহ জীবন যাপনের পরে আমার স্ত্রী চলে যান পরলোকে একটা মারাত্মক অসুখের আকস্মিক আক্রমণে। স্ত্রীকে শ্মশানে দাহ করার পরে যখন ফিরি তখন এক সাধুর সাথে দেখা ও কথাবার্ত্তা হয়। সাধু আমার পত্নী-বিয়োগের কথা শুনে আমাকে অনেক ভাল ভাল কথা বলে মনকে শক্ত রাখার উপদেশ দেন এবং আমার ইপ্সিত কাজ কর্মে আমাকে ডুবে থাকতে বলেন।

অনেক সদস্য—তারপরে আপনি কি করলেন?

রামধন—স্ত্রী বিয়োগের ফলে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স তো আর রইলো না, তখন আমি আমার সোজা ইপ্সিত পথে চলা শুরু করলুম। আবার সেই ছাব, সেই সংঘ এবং আগেকার সব কিছু। তারপরে একটানা চলতে চলতে পূর্ব্বোক্ত সাধুর মাধ্যমে দেখা হলো এক যোগীপুরুষের সাথে। তার আকর্ষণ-বল এড়াতে গিয়ে দেখলুম এক নূতন বৃত্তে বন্দী হয়ে পড়েছি। যোগীপুরুষের ঐশ্বরিক শক্তি সেন্ট্রিপিটালের রূপ নিয়ে আমার চঞ্চলতা সীমাবদ্ধ করে দিলে। নিজের পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপ সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লো।

সৌমেনবাবু—এখনকার জীবনের গতি আপনার কেমন লাগছে?

রামধন—এখন ভালোই লাগছে।

অমিয়—এ ভালোলাগা কতদিন আর থাকবে। সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স যদি আবার অন্তর্ধান করে যায়?

রামধন—তার ভয় নাই। ঐশ্বরিক শক্তি তো আর যাবার নয়। কাজেই এখন বৃত্তে আশ্রয় পেয়েছি যে ছিটকে সরে পড়ার আর ভয় নেই। সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করায় যে বৈজ্ঞানিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি নিশ্চয়ই তা আপনারা এখন স্বীকার করবেন।

অমিয়—রামধন, আমি তোকে এতটা বুঝতে পারিনি। তুই সত্যিই একটা জিনিয়াস্, একটা সুপারম্যান।

রামধন—অমিয়, আমাকে অত বড় করে তুলো না। সুপারম্যান হওয়ার পথে এই তো প্রথম পদক্ষেপ। (ক্ষণকাল মৌন থেকে) বন্ধুগণ, আমি ইচ্ছা করছি কিছুদিন এখানে থেকে সংঘের কাজে সাহায্য করবো।

সৌমেনবাবু—আপনার কথায় আশ্বস্ত ও খুশী হলাম। আর আপনার বিজ্ঞানে আসক্তির চরম সার্থকতা দেখে আমরা সত্যের নূতন পথের সন্ধান পেলুম। বিজ্ঞান ধ্বংসের মূলে আর পরমার্থের সাথে এর চিরবিরোধ এ কথার কোন সমর্থন এরপর চলে না। আজ আমরা কৃতকৃতার্থ। আজ থেকে আপনাকে আমরা বিজ্ঞানানন্দ বলে ডাকব। আপনার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যোগশক্তির প্রভাবে আমাদের সংঘের দিন দিন কল্যাণ হোক ভগবানের কাছে এ আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। বন্ধুগণ, এখন সমাপ্তি-সংগীত গীত হওয়ার পরে সভার কাজ শেষ হবে।

[কোরাস গান]

প্রকৃতি তোমার অবোধ নিদ্রনে
বাঁধিয়ে রেখেছো ধরা
অজ্ঞান আঁধারে যবনিকা টেনে
করে সদা দিশেহারা।
কবির সৃজন জ্ঞানীর দর্শন
তোমারই বিধানে হয় প্রকটন
শাশ্বত প্রেম ধরম করম তোমারি মন্ত্রে গড়া,
তাই তো দেবতা তোমার পেয়ানে মুক্ত মনের কারা।
লহ আমাদের শ্রদ্ধাপূজন
রিক্ত মনের দান নিবেদন
জ্ঞানের আলোতে খুলে দাও চোখ
জাগাও প্রেমের কল্পধারা।

[দৃশ্য শেষ]

যিনি উচ্চ আদর্শ বুকে করে সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেবার পন্থারূপে কর্ম্মকে বরণ করেন, তিনি সৃষ্টি করবেন। যতখানি আদর্শের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে মানুষকে পেয়েছি, যতখানি আদর্শকে হৃদয়ে নিয়ে মানুষের ভিতর ডুবতে পেরেছি, ততখানি আমার কর্ম্ম সহজ ও বাস্তব। গঠন-কার্য্য জ্ঞানময় তত্ত্ব-জ্ঞানযুক্ত না হলে তা মানুষকে মানুষ করে না, নিজেও দাঁড়ে না; বরং ধীরে ধীরে সে আত্মহত্যা ক'রে দীর্ঘ দিনের জন্য কর্ম্মীকে অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করে যায়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত।

মানববাদী, সর্বোদয়ী ও গণতান্ত্রিক বন্ধুগণের নিকট আবেদন

॥ শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস ॥

স্বাধীন ভারতের পার্লামেন্টের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন শীঘ্রই হতে চলেছে। সেই সঙ্গে রাজ্য বিধান সভার ষষ্ঠ নির্বাচন। এর আগেকার চার-পাঁচটি নির্বাচনে সকল পূর্ণ বয়স্ক নরনারী গোপনে ভোট দিয়ে পছন্দ মতো প্রতিনিধি নির্বাচন করে সরকার গঠন করে এসেছেন। প্রতিনিধিরা যেসব পার্টির সভ্য ছিলেন সেই সব পার্টির নির্বাচনী ঘোষণা-পত্রে ভোটারদের কোন্ কোন্ সমস্যা সমাধান করবেন, দেশের কোন্ অভাব মেটাবেন, কতখানি উন্নতি ঘটাবেন তা' সব লেখা থাকত। সে সব কথা বিশ্বাস করে ভোটাররা তাদের প্রতিনিধি বেছে নিয়ে ভোট দিতেন। এবারও তাঁরা তাই করবেন।

দেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য। প্রতিনিধিদের অঙ্গীকার সত্ত্বেও জনসাধারণের সেই দারিদ্র্য ঘুচল না। অন্ন, বস্ত্র গৃহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা সমস্যা আজো ব্যাপকই। এই ব্যাপক দারিদ্র্য দূর করার অঙ্গীকার ছিল সব পার্টিরই। তথাপি ক্ষমতাসীন পার্টিরা এই দীর্ঘ বাইশ বছর রাজত্ব করেও তা দূর করতে পারলেন না কেন? অঙ্গীকার সত্ত্বেও এতদিন ক্ষমতাসীন থেকেও যখন পারেন নি তখন এই নির্বাচনের পরই যে তাঁরা পারবেন তার নিশ্চয়তা কোথায়? কী এমন নতুন লক্ষণ এবার তাঁরা দেখাতে পেরেছেন যা থেকে ভোটাররা বিশ্বাস করবে যে, এবার তাঁরা তা পারবেন? না, নতুন কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং আজ ভোটারদেরই ভাবতে হবে তাদের সমস্যাসমূহের কারণই বা কী এবং তা দূর করার উপায়ই বা কী? আর কেনই বা পার্টিরা তাদের সমস্যাসমূহ সমাধান করতে পারলেন না।

যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, ১৯৪৭ সনে স্বাধীন হবার পর তাঁরা দুটি পথে বিভক্ত হয়ে গেলেন। এক দল গেলেন জনগণের সমস্যাসমূহ, বিশেষতঃ দারিদ্র্য সমস্যার কারণই বা কী এবং সেই কারণ দূর করার উপায়ই বা কী তারই সন্ধানে, ক্ষমতার বাইরে থেকে। জনগণের মধ্যে থেকে, তাদের সঙ্গে মিশে সে সম্বন্ধে তাঁরা গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে থাকলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হল মানববাদীরা ও সর্বোদয়ীরা। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না, তাঁদের হাতে ক্ষমতা না থাকাতে না তাঁদের কথা ক্ষমতাসীনরা না শোনাতে।

আর একদল গেলেন ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরেই তো জনগণের সমস্যা দূর করা সম্ভব। অতএব তাঁরা ক্ষমতা দখলের ও তা রক্ষা করার সাধনায় লিপ্ত হলেন।

যাঁরা আমাদের দারিদ্র্য প্রভৃতি সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা দখলের পথে গেলেন তাঁরা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ক্ষমতায় বসলেন বটে কিন্তু তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে উপায়ের মধ্যেই মগ্ন হয়ে রইলেন। বর্তমানে ক্ষমতাটা যাতে থাকে তারই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং ভবিষ্যতেও ক্ষমতায় আসা যায় তারই পরিকল্পনা ও তোড়জোড় করতেই তাঁদের চিন্তা ও কর্মশক্তি আবদ্ধ হয়ে রইল। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁরা চিন্তা করার অবকাশও পেলেন না। অতি সহজ ভাবে, নকলনবিশি মনোভাব নিয়ে ভেবে নিলেন যে হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ওপর থেকে রচনা করে তা ঠিকেদারদের দিয়ে রূপায়ণ করতে পারলেই ভোটারদের দারিদ্র্য দূর হবে এবং তারা পার্টি-ভক্ত হয়ে উঠবে? ভবিষ্যতে ক্ষমতায় বসার পথ পরিষ্কার হবে।

মানুষের আর্থিক সম্পদ বাড়লেই তার সমস্যার সমাধান হয় না, সেই সঙ্গে যদি না তার মানসিক উন্নতি ঘটানো যায়। চারটি পরিকল্পনার কোনটাতেই এই মানসিক পুনর্বাসন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা নেই। মানসিক পুনর্বাসনের প্রধান সূত্র হল মানুষকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। ঠিকেদার ডেকে মানুষের আর্থিক পুনর্বাসনের চেষ্টা করলে

সেটা হয় না। তাতে মানুষের পরনির্ভরশীলতাই বেড়ে যায়, ভিক্ষুক-বৃত্তি বাড়ে। এই জন্যেই চার চারটী উন্নয়ন পরিকল্পনাতে জাতীয় আয় বাড়লেও অসন্তোষের সীমা নেই। সে জন্যেই দেখা যাচ্ছে যে গদীতে কোন না কোন পার্টি থাকা সত্ত্বেও জনগণের দারিদ্র্য দূর হচ্ছে না, নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে, জন-সাধারণের অশান্তি অসন্তোষ বাড়ছে।

অতএব ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, একদিকে যাঁরা সমস্যা বোঝেন ও তার সমাধান জানেন তাঁরা ক্ষমতার অভাবে তা রূপায়িত করতে পারছেন না। অন্যদিকে যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁরা ক্ষমতা দখল ও তা রক্ষা করার কলা কৌশল অনুশীলন করে চলেছেন, আসল উদ্দেশ্য ভুলে উপায়টাকেই উদ্দেশ্যে পরিণত করেছেন।

দেখা যাচ্ছে একদল জানেন উদ্দেশ্য লাভের তত্ত্ব, আর একদল বোঝেন উপায়ের কলা কৌশল। এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে না পারলে সমাধান হচ্ছে না। অর্থাৎ আজ দার্শনিক লোক-সেবাব্রতী, মানববাদী সর্বোদয়ী ও শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে ক্ষমতাবিদদের মিলন ঘটাতে হবে। তবেই শক্তির বন্ধ্যাত্ব ঘুচে উভয়ের সাধনাই ফলপ্রসূ হবে।

তবে কি মানববাদী সর্বোদয়ীরা পার্টিতে যোগ দেবে? কিংবা পার্টিরা দার্শনিক ও লোকসেবক হবে? অবশ্যই তা হবে না বা তা সম্ভবও নয়। এই উভয় শক্তির মিলন ঘটতে পারে যদি মানববাদী ও সর্বোদয়ীদের পরিকল্পনা যা এতদিন কেবল কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে তা তাঁরা হাতে কলমে রূপায়িত করার চেষ্টা সুরু করেন, তা হলেই এটি সম্ভব হতে পারে।

প্রত্যেকটি মানুষ যেমন অনন্য, তার পছন্দ অপছন্দ, সুখ দুঃখও তেমনি অনন্য, অপর কারও সঙ্গে তার মিল নেই। সেই জন্যে অপর কেউ মানুষের দুঃখ দূর করতে পারে না। নিজের সমস্যা নিজেকেই সমাধান করতে হয়, সেই জন্যেই মানুষ পরবশতাকে পরম দুঃখ রূপেই দেখে এবং সর্বপ্রকার রাষ্ট্ররূপের মধ্যে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্রকেই শ্রেষ্ঠতম মনে করে। কিন্তু দেশের ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও জন সংখ্যার বিপুলতার দোহাই দিয়ে প্রতিনিধি মারফত শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্র বলা চলে না।

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মানুষের সেই ক্ষমতাকে প্রতিনিধির হাতে হস্তান্তর করিয়ে তাকে নিঃস্ব, ক্ষমতাহীন করে তার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিনিধিদের কাছে তাকে নির্ভরশীল করিয়ে রাখলে তার পরবশতা ঘোচে না, গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়, জন সাধারণের সমস্যারও সমাধান হয় না। সেই জন্যেই ভারতে তিন তিনটি পঞ্চ বার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনাতে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার ওপর ব্যয় করার পরও দেশের জনসাধারণের মধ্যে এত বেশী অসন্তোষ এবং তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

ভুললে চলবে না যে মানুষকে স্বাবলম্বী করাটাই তার সব চেয়ে বড় উপকার করা, অর্থ নৈতিক সমস্যা সমাধানের সব চেয়ে বড় উপায়, নৈতিক সমস্যা সমাধানের সব চেয়ে বড় নিশ্চয়তা। স্বরাটত্ব লাভ করে পরবশতা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মবশ ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজ নিজ সমস্যা নিজ বুদ্ধি ও শ্রমশক্তির বলে সমাধান করার সুযোগসুবিধা লাভের জন্যেই তো স্বরাজের প্রয়োজন, স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করা গেছে, সংবিধানে ব্যক্তি-মানুষের স্বরাটত্বও স্বীকৃত হয়েছে, এখন এই অধিকারকে বাস্তবে কার্যকরী ও সার্থক করে তুলতে পারলেই দেশের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সমস্যারও সমাধান হবে।

এই বিরাট দেশের আটাশ কোটি ভোটার ছড়িয়ে আছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামে ও সহরের পাড়ায় পাড়ায়। এই সব ভোটাররা যদি তাদের নিজ নিজ গ্রামে ও সহরের পল্লীতে গ্রামসভা ও বুথসভায় সংগঠিত হয়ে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য পথ-নির্দেশ করতে থাকেন তা হলেই পরবশতা ঘুচে গণতন্ত্র সার্থক হয়ে উঠতে পারে। মানুষের সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহারের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারলেই সকল সমস্যার সমাধান মানুষ নিজেরাই করে নেবে।

নিম্নলিখিত কর্মসূচীটি গ্রহণ করলেই উপায়পন্থী শক্তি ও উদ্দেশ্যপন্থী শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটতে পারে।

১। বর্তমান নির্বাচনে যে সব প্রার্থী জয়ী হবেন তাদের নির্দেশ দান ও নিয়ন্ত্রণ করতে গ্রামসভা ও সহরের বুথসভাসমূহকে সংগঠিত, সক্রিয় ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা হোক।

২। সকল গ্রামসভার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ও গ্রামসভায় ও বুথসভায় সংগঠিত জনগণের সঙ্গে বিধান-সভা ও লোকসভার মারফৎ রাষ্ট্রের শাসনপরিচালন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য একটি ছায়া বিধান-সভা গঠন করা হোক। এই ছায়া বিধানসভা ছায়া অঞ্চল-সভা, ছায়া ব্লক-সভা, ছায়া জেলা-সভার কেন্দ্রীয় সভা রূপে গড়ে উঠবে।

জনগণ তাদের ব্যক্তিগত ও গ্রামগত ইচ্ছা, সুবিধা অসুবিধা ও বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিধানসভা ও লোক-সভায় প্রেরণের জন্য গ্রামসভার মারফৎ এই সব অঞ্চল, ব্লক, মহকুমা ও জেলা ছায়া-সভার মারফৎ রাজ্য ছায়া বিধান সভায় প্রেরণ করবেন।

এই ছায়া বিধানসভা ২৮০ জন বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র থেকে এক একজন প্রতিনিধি ও ৪০টি লোকসভা নির্বাচন থেকে এক একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে ও এদের মিলিত সভায় ৩০ জন নির্বাচিত সদস্যকে নিয়ে গঠিত হোক। ২১ জন সদস্য ও তাঁর মধ্য থেকে একজন সাধারণ সম্পাদককে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হোক।

জেলাসভা—জেলার ছায়া রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ নিজ নিজ জেলার ছায়া জেলা সভার সদস্য হবেন।

ব্লক সভা গঠিত হবে অধীনস্থ অঞ্চল সভাসমূহের দু'জন করে প্রতিনিধিকে নিয়ে, ব্লক নির্বাচনী কেন্দ্রের সদস্য এই সভার সভাপতি হবেন।

অঞ্চলসভা গঠিত হবে গ্রামসভার সভাপতি ও আর একজন নির্বাচিত সদস্যকে নিয়ে।

এই কর্মসূচী রূপদানের জন্য একটি সংস্থা গঠন করা হোক, তার নাম হোক পঞ্চায়েতী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা সমিতি।

কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, কিন্তু যিনি নিজ জীবনে সবকেই পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়া আস্বাদন করিতেছেন, তিনি কাহারও একচেটিয়া নন: তিনি প্রত্যেকের মাঝে পরিপূর্ণ থাকিয়াও প্রত্যেকেরই অধিক। কেহই কাহারও কাছে ধরা পড়িলেন না, সকলকেই সমভাবে জীবনে হজম করিতেছেন, তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধিক। 'They complete, by excluding each other' —De Broglie. পূর্ণযোগের এক একটি দৃষ্টিকোণ হইতেছে তপস্যা, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ · পূর্ণযোগ সর্বযোগের সমন্বয়।

—গীতাভাষ্য, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ

সাথী

॥ শ্রীসুনীতি সান্যাল ॥

নীচের সিঁড়ি থেকে কান্নামাখা স্বরে একজন মেয়ের গলা কানে ভেসে এল, 'ডাক্তার বাবু আছেন'? অর্পিতা গলা বাড়িয়ে দেখে একজন মেয়ে-কুলী খুব ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারের খোঁজে এসেছে। দেখেই অর্পিতা তার শ্বশুরকে ডেকে বলল, 'বাবা, জবা (মেয়েটীর নাম) আপনাকে ডাকছে'। বলতে বলতেই মেয়েটী সামনে এসে হাজির হয়ে কেঁদে ফেলল। সে যেন আর কথা বলতে পারছে না—কোন রকমে বলল, 'আমার ছেলেটা জ্বরে কেমন করছে,—ডাক্তার বাবু। আপনি দয়া করে চলুন, আমার ছেলেটাকে দেখে আসুন, আপনার ওষুধ খেলেই ছেলে আমার ভাল হবে'। কিন্তু ডাক্তারবাবু যে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যাবেলায় তিনি গায়ত্রী সন্ধ্যা আহ্নিক না করে রোগী দেখতে যাবেন? তাঁর যে ব্রাহ্মণ্য বিধির লঙ্ঘনে পরলোকের পথ ব্যাহত হবে? তিনি রেগে গিয়ে জবার সামনেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। অর্পিতা বার বার বলতে লাগল নিশ্চয়ই ওর ছেলে গুরুতর অসুস্থ নতুবা যারা বাড় ঝুঁক ছাড়া সহজে ডাক্তার ডাকেনা—তাদেরই একটি মেয়ে এই সন্ধ্যায় ডাক্তারকে ডাকবার জন্য এসেছে! অর্পিতার শ্বশুর কোন কথায় কান না দিয়ে হাত পা ধুয়ে আহ্নিকে বসে গেলেন। জবা কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল—সে অর্পিতার কাছে বলতে লাগল, 'তুমি বলনা ডাক্তার বাবুকে একবার গিয়ে আমার ছেলেকে দেখে আসুন'। অর্পিতাও সন্তানের জননী। সে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করল সন্তানের অসুস্থতায় মায়ের প্রাণের অবস্থা কী হয়। অর্পিতার চোখে জল এল—জবাকে বলল, 'তুই বাড়ী যা—আমি ডাক্তার বাবুকে পাঠাবার চেষ্টা করব'। কিন্তু অর্পিতার অনুনয় ব্যর্থ হল। অর্পিতার শ্বশুর আরও অধিকতর রেগে বললেন 'আমার সাধন ভজনের ব্যাঘাত করোনা'। অর্পিতা মনে মনে প্রশ্ন করে—এ কেমন সাধন ভজন? যে ভজনে মানুষের বিপদে মানুষ ছুটে যায় না, সে সাধন ভজন কি তারও কাম্য? কখনই নয়। এমন ভগবান, এমন স্বর্গ অর্পিতার মন চায় না। অর্পিতার মন চাইল কী করে সে জবার চোখের জল মোছাবে। কিন্তু তা আর হল না। পরদিন অর্পিতার শ্বশুর যখন জবার বাড়ী গেলেন—দূর থেকে দেখলেন জবার ছেলে উঠানে শায়িত—আর জবা পুত্র-শোকে পাগলিনী—জবার যে একটী মাত্র ছেলেই ছিল সম্বল! এ খবর যখন অর্পিতার কানে এল অর্পিতা তখন ভাবছে, 'আমি ত ওর এতটুকু সাহায্য করতে পারিনি। সমাজের বাঁধন, পরিবারের বাঁধন তুচ্ছ করে ওর সামনে গিয়েও ত ওকে এতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারিনি'!

অর্পিতার দিনরাত মনে পড়ে জবার সেই করুণ মুখখানা আর সেই করুণ সুর—'মাইজি, তুমি বল, তা হলে ডাক্তার বাবু আমার বাড়ী যাবে—আমার ছেলের বড় কষ্ট'!

ঘটনার ৬ মাস পর অর্পিতার চার বছরের একটি মেয়ের হঠাৎ খুব জ্বর এবং অর্পিতার শ্বশুর নিজে প্রাণপণ চেষ্টা করেও অর্পিতার মেয়েকে অর্পিতার কোলে রাখতে পারলেন না। বিধাতা ছিনিয়ে নিলেন। মেয়ে-হারা অর্পিতা কাঁদে আর ভাবে 'সেদিন জবার সাথী হতে পারিনি আজ সাথী হলাম'।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ
—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—
(৮৫)

১৮. ৩. ৫৭ যমুনায় যারা কলসী নিয়ে জল আনতে যেতেন তাদের আর জল আনা হতো না, যমুনায় কলসী ভাসিয়ে দিতেন। কথাটা সত্যি···কৃষ্ণ-কর্ম করা সত্যি কঠিন—মানুষের কর্ম আর কৃষ্ণের কর্ম এক নয়।—কৃষ্ণ-ছন্দ মত কৃষ্ণ-কর্ম করতে হবে···। জীবের করা না-করা প্রেরণা দেয় জীবের বিচ্ছিন্ন আমি—এখানে করা, না করা, অন্যথা করার মালিক জীবের অহংকার। কিন্তু কৃষ্ণ-কর্মের মালিক তিনি—তাঁর ছন্দে তাঁর মত করে করতে হবে।···তোমার কাজ তো বন্ধ হয়ে যায়—ভগবানের সৃষ্টি কি বন্ধ হয়েছে?···আমার এখানেও কর্ম করা তাই সোজা নয়···। লোকে অন্য রকম করে খেয়ে, চলে অভ্যস্ত—আমার এখানে খাওয়া আলাদা, চলা আলাদা, কর্ম আলাদা।···অন্যদের সংস্কারে অভ্যাসে আটকায় বলে এখানে থাকতে পারে না।···আমার রান্নায় তেল ঠিক রাখতে হবে···দরিদ্রের রান্না আমার···। আমি মাত্রার উপর জোর দেই।···সেইজন্যে গীতা বারবার বলেছেন রাগদ্বেষ—অর্থাৎ আসক্তিবিদ্বেষ—ত্যাগ না করলে কর্ম হবে না···। জ্ঞান তবু চলে—কিন্তু রাগদ্বেষ নিয়ে কর্ম চলে না—কতদূর দিয়ে দেখা যায় দেয়াল বন্ধ।···কৃষ্ণ বললেন তোমার আরম্ভ শেষ করে এস—আমার আরম্ভ তোমার আরম্ভ হোক—I have set the ball rolling···। আমাদের কি করতে হবে?—to walk with Him। বলতে শিখতে হবে তোমার চলার ধারাই আমার চলার ধারা।···কর্মীর পক্ষে বাঁচি আর মরি কাজ করতেই হবে···। একবার কলসী ভাসাতে হয় অর্থাৎ শরণাগত হতে হয়।···কর্মের একটা প্রবল টান আছে···এক কর্ম থেকে অন্য এক কর্মে টেনে নিয়ে যায়—মানুষকে কেন্দ্রচ্যুত করে, বহির্মুখীন করে—এইসব কারণে ভারতবর্ষের সাধনার যে ধারাটা বেশী প্রচলিত তারা কর্মকে বাদ দিয়েছে···। আমরা বলব তাঁর প্রেরণায় তাঁর ধারায় চলব—রাধারাণী অভিসারিণী—আমি তাঁর পথ ধরে চলব।···জীবের নিজের কর্ম নেই···কৃষ্ণের কর্মই তাকে করতে হবে। আমার এখানে অনেক লোক এসেছে—পারে নি থাকতে···তাদের খেয়ালের সঙ্গে মেলে না বলে।···আমাকে তিনি কেন এই বিরাটের মধ্যে এনে ফেলেছেন, কী আমি করতে পারব?···তবু আমাকে তো এই মাত্রার মধ্যে চলতেই হবে—পুরুষোত্তম-মাত্রা—কথা বলা, চলা, ফেরা সব কিছুতেই পুরুষোত্তম-মাত্রাটা বের করে নিতে হবে।···সকলেই সব জান, তখন আমার প্রয়োজন কি? সংসারের ঘটনায় চলতে তো আমি সব সময় জিজ্ঞেস করি, কেন না আমি জানি সেখানে আমি জানি না। দর্শনের ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করি না বটে।···এখানে কাজ করতে চাও তো কাজের মূল কোথায় ধরে নাও।···অমুকে যদি নিত্যগোপাল-ছন্দ জানত সব ঠিক হয়ে যেত।···সংসারে লোক বড় দিশেহারা···অমুক মেয়েরা যে দোল খেলল, কাদের সঙ্গে খেলল?···দৃষ্টি নেই।···নিত্যগোপাল কত ছোট ছোট ঘটনায় প্রতিও দৃষ্টি দিতে জানতেন। তাঁর মত এমন নিপুণ করে সংসার না করলে সংসার অচল।···অনেকে আয় করতে জানে, খরচ করতে জানে না,···অনেকে খরচ করতে জানে, আয় করতে জানে না···কয়জন এ বিধি মেনে চলতে পারে যে cut your coat according to your cloth? ···কত রকমের বিলাস থাকে মানুষের···রান্নার বিলাস, পরিবেশনের বিলাস এসবও কি কম আছে মানুষের?···অমুকে পেট্রল খরচ করে জলপ্লাবন দেখে এল···, ট্রাকে করে বন্ধুর মেয়ের বিয়ের কলাপাতা এনে দেয়—এগুলিও তো বিলাস। এখানে তো এরকম হবে না।···এখানে মাত্রা ঠিক রেখে চলতে

হবে।...এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের দেখে এও মনে হয় এক এক সময় যে, সন্ন্যাস যে fail করেছে, বেশ ধারণ করে সন্ন্যাসের যে প্রয়োজন নেই আজ—তারই বুঝি দৃষ্টান্ত রেখে গেল।...চিঠি এসেছে...সে সব তার নেয় এটা ইচ্ছা করে...। বেণু নেবে, সে ছেলে—তার কতগুলি সুবিধা আছেই.. তবে আগে পুরুষোত্তম-সাহিত্য বুঝতে হবে।... আমি রাগ করি ঠিকই—কারো উপরে রাগ করে আমি তা লুকিয়ে রাখি না, কারো কোন ক্ষতিও করি না।.. সবাই যদি সব জান তাহলে আমাকে ছুটি দিয়ে দাও. হয়তো সেই ছুটি নেবারই সময় এসেছে।..

প্রথমবার বৃন্দাবন যাই ১৯১৫ কিংবা ১৬ হবে বোধ হচ্ছে। নিত্যগোপাল বলে দিয়েছিলেন নিকুঞ্জের ঠিক উল্টোদিকে নূতন সীতানাথের মন্দিরে নগেনবাবুর ওখানে উঠতে। নগেনবাবু খুব স্নেহ করতেন আমাকে।...সেবা-কুঞ্জের আরতিতে প্রথমদিন গিয়ে আমি বসে আছি—দেখি সবাই আমাকে ঠেলে—আমি বুঝি নি যে দাঁড়াতে বলছে—ওখানের নিয়ম আরতির সময় পুরুষদের দাঁড়াতে হবেই, মেয়েরা ইচ্ছা করলে বসে থাকতে পারে। আমাকে ঠেলছে দেখে আমি ভাবলাম পেছনে যেতে বলছে বোধহয়—আমি পেছনে যেতে যেতে শেষে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেবাকুঞ্জের পট হচ্ছে রাস-শ্রমে ক্লান্ত রাধারাণীর পা টিপে দিচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।...আরতি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল রাধারাণীর পান-প্রসাদ যদি আমি পেতাম! ওমা, আরতি-শেষে দেখি পূজারী সব ভিড় ঠেলে আমাকে একটা পান দিয়ে গেলেন। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম!...চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকল—এ কী হল? আমার বৃন্দাবন আসা রাধারাণীর দরবারে স্বীকৃতি পেল?...

কুসুম সরোবরে থাকতে একদিন গৌর-নিতাই এলেন স্বপ্নে—বললেন বাংলায় যা এতদিন পরে দেখা হবে...। স্বপ্ন দেখার পরেও আমি বৃন্দাবন ছাড়ি না। তারপর একদিন খুব জ্বর হল...জ্বরের ঘোরে স্থির করে ফেললাম বাংলায় চলে যাব। ...মা চলে যাবার পর আবার বৃন্দাবন গেছি...বাবা ঠাকুরের কাছে লিখেছিলেন আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে।... নগেনবাবুর কাছে থাকতাম—ঠাকুরের সম্বন্ধে কথা হোত। ঠাকুর কে এটা জানবার জন্য নগেনবাবু আমাকে একটা রহস্যময় প্রশ্ন লিখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তুমি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করবে আমরা কার অনুগা হয়ে চিন্তা করব?...হগলীতে ফিরে এসে ঠাকুরকে প্রশ্নটা করবার জন্য কত সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।.. কিছুতে আর প্রশ্নটা ওঁর কাছে তুলবার সুযোগ পাই না। শেষ পর্যন্ত যখন প্রশ্নটা করলাম, বললেন ঠাকুর, 'শরৎ তুমি কি জান না ভগবান অন্তর্যামীরূপে তোমার যখন যা দরকার বুঝিয়ে দিচ্ছেন'। এরই পরে একদিন স্বপ্নে নিত্যগোপাল কে—তিনি যে কৃষ্ণ—এটা দেখালেন—আমার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক তাও দেখালেন...।

১৯. ৩. ৫৭। ঔ...। গীতায় পুরুষোত্তম কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন 'জহি শত্রুম্ মহাবাহো কামরূপম্ দুরাসদম্—কেননা কাম 'জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশনম্'।...কামের তিনটী অধিষ্ঠান—ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধি।...কামের উপর বিশ্ব এত বিরূপ কেন?—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম...—self centredness, আমার নিজের যা ভাল লাগে;—তাতে কল্যাণ হোক বা না হোক, জ্ঞান-বিজ্ঞান চুলোয় যাক—আমার যা ভাল লাগে তা করতেই হবে, পেতেই হবে...। এই কাম পরিচ্ছিন্ন...। এই কাম বলে আমি আমার ভাললাগাটুকু নেব—সে ভাললাগাটুকু সত্য তো হয়ই না—শিবও হয় না, সুন্দরও হয় না...। এভাবে যদি মানুষ চলে তাহলে সমাজ থাকে?...আমার আজকের ভাললাগা কালকে না-ও লাগতে পারে।...এই জন্য আমিকে কেন্দ্র করে জীবন অচল...। পরিচ্ছিন্ন জীবন একটা channel এ যেতে পারে—কিন্তু সামগ্রিক জীবন হয় না তাদের; সেখানে কর্মী জ্ঞানী হয় না, জ্ঞানী কর্মী হয় না, জ্ঞানী কর্মী ভক্ত হয় না। ..আমিকে কেন্দ্র করলে অসাম্প্রদায়িকতা আসে না।... ...আমি—অহম্—নাম ভগবানের।...'আমি' ভগবানের সেটিই নাম...আমি ব্রহ্ম...। এজন্যে আমি নাম সকলে প্রথমে নেয়।...ক্ষুদ্র আমিকে ব্রহ্ম-আমিতে তুলতে হবে।...

—ক্রমশঃ

সাময়িকী

রাজনীতির মূল লক্ষ্য ক্ষমতা দখল? যুগান্তর পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত সংবাদ—"—পশ্চিমবঙ্গে শাসক কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্য কি?

শাসক কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম আজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে বলেন, এই রাজ্যে আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য ক্ষমতা দখল। পশ্চিম বঙ্গে নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করতে পারলে তাঁরা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে পারবেন।"...যুগান্তর, ২৭শে ডিসেম্বর, রবিবার ১৯৭০।"

কংগ্রেস সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীজগজীবন রামের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত উপরোক্ত ভাষণ যদি স্টাফ্ রিপোর্টার মহাশয় ঠিক ঠিক ভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন তবে কংগ্রেস সভাপতি মহাশয়কে তাঁহার সহজ সরলতার জন্য ধন্যবাদ। কথাটি কানে খট করিয়া লাগিলেও সকল দলীয় রাজনীতির যে উহাই আসল লক্ষ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহা ছিল উপায় তাহাই যে অতিমাত্রায় দলীয় বুদ্ধির ফলে লক্ষ্যে পরিণত হইয়াছে এবং লক্ষ্য, আদর্শ, দেশের উন্নতি বা দুঃখ দুর্দশা বিমোচনের তথাকথিত promise এ সবই ক্ষমতা দখলরূপ লক্ষ্যে উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে! এ কথা এখন বুঝিতে খুব বেশী বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা গত চারটি নির্বাচন (পশ্চিম বঙ্গে পাঁচ বার) দেখিলাম। প্রতি নির্বাচনেই প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কথা ও ক্রিয়াকলাপও দেখিয়াছি। জগজীবন বাবু আজ যে কথা সরলভাবে বলিয়াছেন ঐ কথাই সকল রাজনৈতিক দলই জনগণের কল্যাণ করার কথার প্রলেপ দিয়া তাহাদের দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার কথাই শুনাইয়া আসিয়াছেন। মূল ২০ বৎসরে promiseএর পুনরাবৃত্তি ও ক্ষমতা আঁকড়াইয়া রাখিবার জিবির ছাড়া ভিন্নরূপ কোন উদ্যোগ কোন রাজনৈতিক দলেরই পাওয়া গেল না। কংগ্রেস অধিকন্তু বা বিনক্ত হইয়া যাহা করিয়াছে, কোন কোন প্রদেশে যেখানে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া যুক্তফ্রন্ট শাসনযন্ত্র অধিকার করিয়াছে সেখানে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত সকল দলই, কংগ্রেস যাহা ২০ বৎসরের অধিক কাল হইল করিয়া আসিয়াছে তাহারই পথ অনুসরণ করিতেছে মাত্র। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বিপ্লব প্রভৃতি ধ্বনি কথার কথা মাত্র। আসল লক্ষ্য ক্ষমতা দখল, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ। আবার নির্বাচনের দামামা বাজিয়া উঠিল। রাষ্ট্রপতি সংসদের মেয়াদ আরও ১৪ মাস বাকি থাকিতেই সংসদ ভাঙ্গিয়া দিয়া নতুন নির্বাচনের কথা ২৭ ডিসেম্বর '৭০ তারিখে ঘোষণা করিয়াছেন। এবারেও আমরা democracy রক্ষার কথা, সমাজতন্ত্রের কথা, বিপ্লবের কথা, শুনিতে পাইব। কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে demos-এর জন্য democracy, যে demos-এর হাতে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা, যে demos-এর কল্যাণ করার জন্য নির্বাচন, সেই demos-কে অন্ধকারে রাখিয়া ভোট বাক্সের মাধ্যমে তাহাদের সকল ক্ষমতা রাজনৈতিক দল বিশেষ বা কতিপয় দল করায়ত্ত করিয়া দলের প্রভুত্ব বিস্তারে প্রয়াসী। ইহার অতিরিক্ত আর কোন আসল উদ্দেশ্যই কাহারও নাই। Democracy-র মূল কথা Government of the people, by the people, for the people-এর স্থলে Government of the party, by the party, for the party-তে পর্য্যবসিত হইয়াছে ও হইতেছে। অবশ্য party কথাটা উহ্য রাখিয়া মুখে people বলা হয় মাত্র। দলীয় রাজনীতির ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি। Law of universality-র নিয়ম অনুসারে এই পরিণতি ভিন্ন অন্যরূপ হইত না। কেন না দলীয় বুদ্ধি সংকীর্ণ হওয়ার ফলে কিছুতেই সমগ্রকে স্বীকার ও ধারণ করিতে পারে না। পৃথিবীর সকল গণতন্ত্রী বা এক নায়কতন্ত্রী দেশ, সমাজতন্ত্রী বা জনতন্ত্রী দেশ —সব দেশেই দলীয় রাজনীতির

এই পরিণাম সুপরিস্ফুট। গণতন্ত্রের মূল সত্য তথাকথিত বুদ্ধিমানদের স্বার্থ বুদ্ধিতে আর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। গণতন্ত্রের মূল কথা সমাজের প্রতিটি মানুষের সমান ক্ষমতা, সমান অধিকার, সমান দায়-দায়িত্ব, এক কথায় স্বাবলম্বন। কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক ক্ষেত্রে সে স্বরাট। জনসাধারণকে স্বরাটে প্রতিষ্ঠিত করিবার কর্মোদ্যোগ গ্রহণ না করিয়া, তাহাদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ ও সুযোগ সৃষ্টি না করিয়া কেবল ফাঁকা গণতন্ত্রের কথা বলা নিরর্থক।

জগজীবনবাবুর কাছে নিশ্চয়ই ইহা অজানা নয় যে মহাত্মা গান্ধী গণতন্ত্রের এই মূল সত্যকে কার্য্যাত্মক রূপ দেওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের মধ্য দিয়া জনসাধারণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের বা গ্রাম-সভার হস্তে প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের কথা বলিয়াছিলেন। মহাত্মাজী ভারতবর্ষে যে বিপ্লব ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন পরবর্তী কালে তাঁহার অনুগামীগণ শাসনতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দান করিয়াছেন বটে কিন্তু পঞ্চায়েত-রাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াও কার্য্যতঃ গ্রাম-সভার হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা না দিয়া জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা ভোট বাক্সের মধ্য দিয়া পার্টির (অর্থাৎ গতকাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস) হাতে সুকৌশলে রাখিয়া দিয়াছিলেন। গান্ধীজীর বিপ্লব-প্রচেষ্টা এইভাবে betrayed হইয়া গেল। এখন ঐ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মহাত্মাজী-প্রদর্শিত বৈপ্লবিক পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া কংগ্রেস আর তাল সামলাইতে পারিতেছে না। গত সাধারণ নির্বাচনে অনেকগুলি প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পরাজয়ের ত্রুটি একে অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গেল। এখন আবার আরম্ভ হইয়াছে উক্ত কংগ্রেসের অন্যান্য দলের সঙ্গে আঁতাত করিয়া পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়া আসার আপ্রাণ চেষ্টা। মহাত্মাজীর বৈপ্লবিক পথ-পরিহারই যে তাহাদের পতনের মূল কারণ সে দিকে কোন নেতারই দৃষ্টি নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এখনও যদি তাঁহারা মহাত্মাজীর বৈপ্লবিক পথ আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করিয়া পুনরায় কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন তবে জনসাধারণের হৃদয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করা অতি অল্প সময়েই সম্ভব হইবে।

কংগ্রেসকে গদীচ্যুত করিয়া গদী দখলের জন্য যে সকল বামপন্থী দল মার্ক্স লেনিনের নামে সংগ্রামে অবতীর্ণ তাহারাও কংগ্রেসের ন্যায় একই দোষে দুষ্ট। তাহাদেরও আসল লক্ষ্য যেন তেন প্রকারেন গদী দখল। মহামতি লেনিনের যে বৈপ্লবিক আদর্শ—"Land to the peasant factory to the workers, power to the soviets—"(গ্রাম-সভা) এই আদর্শকে কার্য্যাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইহাদের আন্দোলন কোথায়? মার্ক্স লেনিনের বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া নিজেদের সুবিধামত নানা ব্যাখ্যা দান তথা মার্ক্স লেনিনের অভিপ্রায়ের অর্থান্তর করিয়া বাকচ্ছলনার সৃষ্টি করিতেছে মাত্র। ফলে ইহারাও বহুধা বিভক্ত হইতেছে। ইহারাও সমাজতন্ত্রের নামে সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া এবং রাষ্ট্রকে পার্টির কুক্ষিগত করিয়া প্রভূত বিস্তারে কৃতসঙ্কল্প। জনসাধারণ ইহাদের কথায় ভুলিলে আরও গভীর অন্ধকারে পড়িবে। ইহারাও যদি লেনিনের "Land to the peasant, factory to the workers, power to the soviets (গ্রাম-সভা)"-র আদর্শকে in matter and spirit গ্রহণ করিয়া উহার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে অবতীর্ণ হইত, তবে তাহারা মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে দেশকে এক ধাপ আগাইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইত, দেশও বাঁচিত, নিজেরাও ধন্য হইত।

আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে খাঁটি বিপ্লবী রাজনৈতিক দল একটিও নাই। কার্ল মার্ক্স লেনিন গান্ধীজীর কল্পনার মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। তাঁহারা সকলেই শোষণহীন মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজের চিত্রই আঁকিয়া গিয়াছেন। তবে এই বিরোধ কেন? কেনই বা এত প্রচারের প্রতিযোগিতা ও প্রাবল্য? লাঙ্গল যাহার জমি তাহার, যাহারা শারীর শ্রম, বুদ্ধিশ্রম খাটাইয়া সৃষ্টি করিবেন মালিক তাহারাই হইবেন, আমাদের শাসন (স্বশাসন) আমরা নিজেরাই করিব অর্থাৎ আমাদের

উন্নয়নের কাজগুলি, সমাজকে সচল রাখার কাজগুলি নিজেরাই করিব এই সকল সহজ কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে এত তত্ত্বকথার, এত যুক্তিজাল বিস্তারের প্রয়োজন কি? হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে বৈকি!—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ ১৯৩৭ সনে তাঁহার রচিত "স্বরাজের পূর্ণরূপ" পুস্তিকায় "জনজাগরণ" অধ্যায়ে লিখিতেছেন, "জনসাধারণ এমন করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রচারে বিপ্রতিপন্ন, বিক্ষিপ্তচিত্ত যে প্রত্যেকেই এক একটী 'চোরা কোঠার' আশ্রয়ে অন্তকে বেশ অস্বীকার করিবার বুদ্ধি লইয়া, 'নিষ্ঠা'র দোহাই দিয়া আত্মতৃপ্ত আছে। কাহারও আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনই বোধ হয় নাই যে, "বোধয়ন্তঃ পরস্পরং" না হইতে পারিলে পুরুষোত্তম হওয়া চলিবে না। জনজাগরণ পূর্ণভাবে আসিবেই না, যে পর্য্যন্ত না নেতাদের মিলন-বৈঠক রচিত হইবে। নেতারাই জনসাধারণকে আটকাইয়া রাখে নিজেদেরই 'মানদণ্ড' বজায় রাখিবার জন্য, অবশ্য মুখে তাহাদের বলিতে হয় বড় বড় আদর্শের কথা; নচেৎ লুঠটা নিরাপদ হইবে কেন? জনসাধারণ প্রাণপ্রধান, তাই চালাকি অনেক সময়ে তাহাদের চোখে ধরাই পড়ে না। তবে প্রাণধর্ম্মী মুক্ত পুরুষ যদি জনসাধারণের মধ্যে প্রাণ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন, তবে প্রাণোপাসক জনসাধারণ তাঁহার সঙ্গে প্রাণসাধনায় যুক্ত হইবে, চালাক নেতৃবৃন্দ তখন ফাঁপরে পড়িয়া জনসাধারণের চরণতলে আসিতে বাধ্য হইবেন।"—এত কথা বলার, এত যুক্তি কূটতর্কের প্রয়োজন তাঁহাদের এইখানেই। জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়া ক্ষমতা দখল ও প্রভুত্ব বিস্তারই যে তাঁহাদের কাম্য। সহজ কথাকে সহজভাবে বলিলে যে উদ্দেশ্যই (মূল লক্ষ্য—ক্ষমতা দখল) পণ্ড হইবে।

বর্ত্তমানে দেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে মানুষ সামনে কোন পথ দেখিতেছে না। সামনে তাহাদের ঘোর অন্ধকার। সাধারণ মানুষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিস্পৃহ; নির্ব্বাচনে সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া কেহ যেন ভাবিতে পারে না। অথচ রাজনৈতিক দলগুলি দেশে সাম্য, প্রগতি, শান্তি-প্রতিষ্ঠাকে নানা কারচুপি-দ্বারা ঠেকাইয়া রাখিবে ইহাও তো স্বীকার করা যায় না। জনসাধারণকেই অগ্রণী হইতে হইবে। নির্ব্বাচন আগত—যাঁহারা দলীয় রাজনীতির মোহমুক্ত, যাঁহারা সত্যই আন্তরিক ভাবে দেশে শোষণের অবসান হইয়া সাম্য প্রগতি সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক কামনা করেন, তাঁহাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন, যে যেখানে যত জন ভোট দাতাকে পারেন বলিয়া দেন যে, যে দলেরই প্রার্থী তাহাদের নিকট ভোট চাহিতে আসুক তাঁহাদের নিকট এই দাবী উপস্থিত করেন যে, লেনিন-গান্ধী-মানবেন্দ্রনাথ প্রদর্শিত সমাজ-ব্যবস্থা অর্থাৎ (১) সাক্ষল যার জমি তার (২) কলের মালিক শ্রমিকরাই (৩) গ্রামসভার হাতে শাসন-ভার এই তিনটি ব্যবস্থার অবিলম্বে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে ইহাই তাহাদের নির্দ্দেশ। নেতাগণ তো মুখে বলিতেছেন জনসাধারণের নির্দ্দেশ লাভের জন্যই নির্ব্বাচনে অবতরণ। জনসাধারণের দিক হইতে ইহাই নির্দ্দেশ হউক। কোনরূপ দলবাজী করার অবকাশ আর নেতাদের দেওয়া যাইতে পারেনা। কোনরূপ শ্রেণীবাদ বা শ্রেণীসংগ্রাম আর চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না। শ্রেণীবাদের স্থলে 'সর্বদলবাদ' স্থাপন করিতে হইবে। ইহার জন্য নেতাদের যতখানি মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার রাখিতে হইবে। কোন একটি একক দল বা প্রতিষ্ঠানের হাতে যে ভারতবর্ষ থাকিতে পারিবে না, থাকিবে না এ সত্য বুঝিয়াও নেতাগণ দলীয় বুদ্ধির উর্দ্ধে উঠিতে পারিতেছেন না, ইহাই আজিকার দিনের সমস্যা। নেতাদের এ ভুল ভাঙিবে বহু বিনষ্টির পর।

শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস

উদ্বোধন

বর্ষসূচী, মাঘ ১৩৭৬—পৌষ ১৩৭৭ ; ১৯৭০

ওঁ নমো গীতা-জয়ন্তী ৪
শ্রীসুনীতি সান্যাল

অলবেরুনীর ভারতদর্শন ৮৫
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

আজি হতে শতবর্ষ আগে (কবিতা) ৬৮
শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী

আধুনিক দর্শনের গোড়ার কথা ১৭১
জনাব রেজাউল করীম

আমাদের কথা ১
ইরাবতীর তীরে ১৩২
শ্রীবিভা সরকার

একটি অমৃত ক্ষণ (কবিতা) ৭৪
শ্রীবিভা সরকার

এস মহামায়া, এস মহাকালী ২০০
শ্রীহৃষীকেশ দে

কবি কুমুদ-প্রয়াণে ২৪২
শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

কর্মযজ্ঞ ৪৫
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজীর পথে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ১৮
শ্রীসত্যব্রত ঘোষ

তপস্বিনী (কবিতা) ২২
শ্রীপাঞ্চজন্য

দর্শন ও শিক্ষা ১৯৭
শ্রীগায়ত্রী যতি

দাও ফিরে সে অরণ্য ১৯১
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

দুর্গাপূজার বৈপ্লবিক তত্ত্ব ১৬৫
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

দিব্যজীবন গড়ার আগে দারিদ্র্য দূর করতে হবে ৭৫
শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস

পাদপদ্ম বাড়াও বরদে (কবিতা) ১৯৯
শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

পারিবারিক জীবনে-আলোচনা ২৯, ৬১, ৯২, ১৩৭, ২৪৩
ডাঃ অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জিকা (১৯৪৩) ৩৪, ৫৭, ১০২

পুস্তক-পরিচয় ৬৭
শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস

প্রগতি ও বিশ্বপ্রেম ১৮৪
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রার্থনাকালীন ভাষণ ২০, ৪৪, ৮১, ১২৯, ২৬৩
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভক্ত-ভগবান (কবিতা) ১৪১
শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী

ফিরেছি প্রভা জানিয়ে ২০৬
শ্রীকহিদাস সাহা

বিবেকানন্দ ও সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ ১৮০
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায়

বৈজ্ঞানিকের শেষরক্ষা (নাটিকা) ২০৮, ২৪১
অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে তলা থেকে, উপর থেকে ঘটানো যায় না ১৯৪
শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস

মনের নিভৃত কোণে (কবিতা) ১৭০
শ্রীশান্তশীল দাশ

মানববাদী, সর্বোদয়ী ও গণতান্ত্রিক বন্ধুগণের নিকট আবেদন ২৫৯
শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস

মানুষের মূল্যায়ন ১৭৪
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

মায়ের কৃপালাভের তরে (কবিতা) ১৭৯
সেখ সদরউদ্দীন

মুক্তিলাভ ৭, ৪৮, ১১৪

অন্নাদী

মুর্শিদাবাদের বারাণসী ১৫০

শ্রীস্মরঞ্জন কাব্যতীর্থ

যুগদেবতা বিপ্লবী শ্রীনিত্যগোপাল ৪১

শ্রীরেণু মিত্র

যুগসমস্যা ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ২১৯

শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস

শতবর্ষের আলোকে মহাত্মা গান্ধী ৯০

শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী

শ্রীকৃষ্ণের পত্র সত্য ১৪৪

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব ২১৭

সম্পাদিকা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৮৮তম জন্মদিনে (কবিতা) ২৩২

শ্রীশান্তশীল দাশ

সভ্যতার জয়যাত্রা (কবিতা) ১৩৬

শ্রীহরিদাস সাহা

সমবায়—তত্ত্বে ২৩৭

শ্রীপার্বতী নাথ বিশ্বাস

সমবায় এবং সমন্বয়

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সমাবর্তন ভাষণ ১৫২

শ্রীঋতিকা মুখোপাধ্যায়

সমস্ত সম্পদ (কবিতা) ১৯৬

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

সাথী ২৬২

শ্রীসুনীতি সান্যাল

সার্ধ শতবার্ষিকীর আলোকে বিদ্যাসাগর ২০৩

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

সাময়িকী :—নরনারায়ণ আশ্রমে আলোচনা বৈঠক ৭৬

শোক সংবাদ ১২৭

নরনারায়ণ আশ্রমে আলোচনা বৈঠক

ইন্দিরাজী সমীপেষু

আমাদের কি করিতে হইবে ১৬

উচ্ছৃঙ্খল জনতা ও পশ্চিমবঙ্গবাসী ২১

রাজনীতির মূল লক্ষ্য ক্ষমতা দখল ? ২৫

সিদ্ধান্তদর্শন ৬৯, ১০৮, ১৮

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ২

শ্রীসত্যব্রত ঘোষ

লাঞ্ছন-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা ২৩৩

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

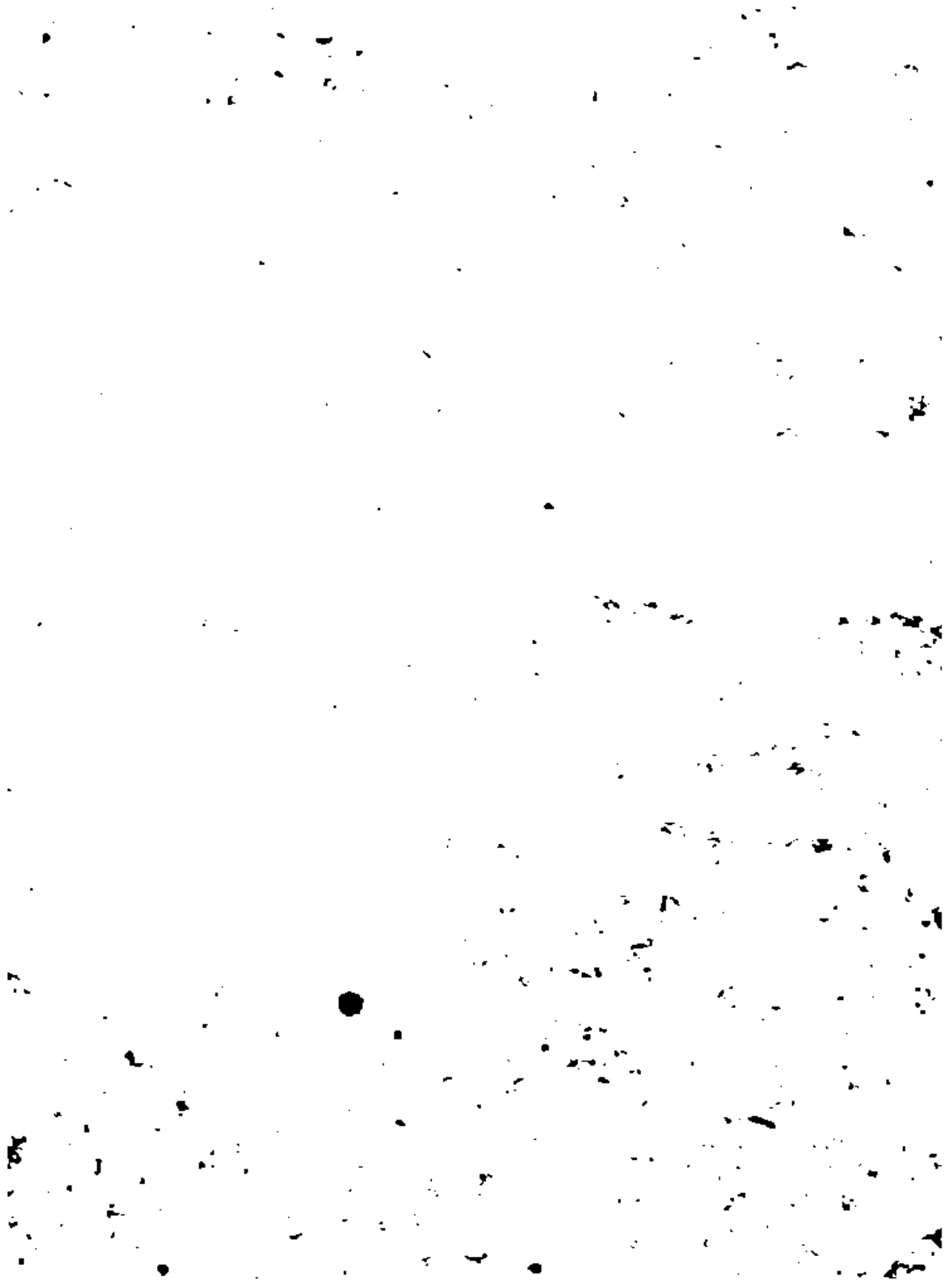

যে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আজও কোন কিছুর অপেক্ষা না করে ধর্ম্মের সাধনায় সন্ন্যাসী সাজতে পারে, সেখানে কি বিশ্বরূপী ধর্ম্মের পরিবার-সাধনা, সমাজ-সাধনা বা জাতি-সাধনার জন্য কয়েক হাজার সন্ন্যাসী কর্ম্মীও মিলতে পারত না? মিলবে কি করে? দেশ সেবার গোড়াতেই ত কর্ম্মীদের সুখ-সুবিধার কথা ভাবতে শিখান হচ্ছে। ধর্ম্ম-সাধনায় ত খাওয়া-পরার জন্য কেউ দায়ী নন। নেংটী পর, জোটে খাও, না জোটে উপবাস কর, তবে ত ভগবান মিলবে। দেশ-সেবকদের জন্য দেশ দায়ী, সেবকদের ইহাই ধারণা। এই ধারণা যেদিন উল্‌টে যাবে, সেদিন কারোও অপেক্ষা না করে, অনাহার অনিদ্রায় সেবা করবার লোভও জাগবে, কর্ম্মীও মিলবে। সন্ন্যাসী মেলে অথচ কর্ম্মী মেলে না—এর কারণ যে, সন্ন্যাসীর উপাস্য যেমন বিশ্বের দেবতা, উপাসনাও তেমনি বিশ্বের; আর কর্ম্মীদের উপাস্য বটে বিশ্ব কিন্তু তারা পন্থাটী চাচ্ছে ঠিক বিষয়ীদের মত আরামের। এ যাবৎ তাই কোন সঙ্ঘ দাঁড়ায়নি; দাঁড়াবেও না, যে পর্য্যন্ত কর্ম্মীবৃন্দ খাওয়া-পরায়, শোয়া-বসায় সন্ন্যাস গ্রহণ করতে না পারবে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

Central Regd. No. R. N. 2571/57 Phone No. 57-2540 UJJWALBHARAT

কুমারকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন কুমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে। 'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১। ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
- ১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) ২·০০
- ২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্য্যন্ত) ৮·০০
- ৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত) ৬·০০

২। ঈশোপনিষৎ ২·০০
৪। কেনোপনিষৎ ১·০০
৫। কঠোপনিষৎ ৩·০০
৫। প্রশ্নোপনিষৎ ১·০০
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ ১·৭৫
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২·৭৫
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩·৫০
মুণ্ডকোপনিষৎ
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে ৩·০০
৩। স্বরাজের পূর্ণরূপ ০·৫০
১। গীতাজিজ্ঞাসা ০·০৬
২। উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা) ০·৫০
৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-বৃত্তিতে আলোচনা ৩·০০
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২·০০

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী ইত্যাদি

শ্রীপ্রতিভা রায়ের

১। নারী-প্রগতির জন্মকথা ১·২৫
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ -শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা ০·৩১
৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ৫·০০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়ঋষি শ্রীনিত্যগোপাল ০·৬২
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২·০০
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ২·৫০
৪। রবীন্দ্র-হৃদয় ৫·০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (ডায়া—দেশবন্ধুনগর) ২৪ পরগণা

প্রতি সংখ্যা ৮০ পয়সা বার্ষিক পাঁচ টাকা